তৃতীয় ভাগের সূচীপত্র

১২৭৬ সালের মূল্য প্রাপ্তি

শ্রীযুক্ত বাবু	মহেন্দ্রনাথ রায়	... ...	২৲ টাকা
" "	অঘোরলাল ঘোষ	... ...	২৲
" "	গৌরচন্দ্র চন্দ	... ...	২৲
" "	যদুনাথ সরকার	... ...	২৲
" "	সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত	...	৭৲

মফঃসল

" "	রামচন্দ্র মল্লিক	... ...	২।৵০
" "	গোবিন্দচন্দ্র দাস	... ...	২৲

[হিসাবের ফর্দ্দ মুদ্রিত হইলে পর শেষের দুই টাকা পৌঁছে, সুতরাং হিসাবে উহার উল্লেখ নাই।]

অবোধবন্ধু

তৃতীয় ভাগ।

১২৭৬ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত
একত্রে বাঁধান মূল্য ... ... ২৲ দুই টাকা
প্রতি খণ্ড ... ... ।০ চারি আনা

দ্বিতীয় ভাগ।

১২৭৫ সালের পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত
শেষ চারি খণ্ড একত্রে বাঁধান, ইহাতে পৌলভর্জ্জীনীর উপাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে, মূল্য ... ... ।০ আট আনা

১২৭৫ সালের বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত
আট খণ্ড, প্রতি খণ্ডের মূল্য ... ... ৵০ দুই আনা

প্রথম ভাগ।

বার মাসের বার খণ্ড একত্রে কাপড়ে বাঁধান, মূল্য ... ... ১৲ এক টাকা

☞ অবোধবন্ধুকার্য্যালয়ে এবং নূতনবাঙ্গালাযন্ত্রালয়ে বিক্রয় হয়।

অবোধ-বন্ধু।

" করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

৩য় ভাগ] বৈশাখ (১২৭৬ সাল।) [১ম সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন।

১২৭৬ সাল, ১০ই বৈশাখ।

আমি ১২৭৫ সালের পৌষমাসের সংখ্যা অবধি অবোধবন্ধুর স্বত্বাধিকার শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীকে প্রদান করিয়াছি। অতএব গ্রাহকগণ অবোধবন্ধুর সমুদয় প্রাপ্য টাকা এবং যাবতীয় চিঠি পত্র তাঁহার নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

কলিকাতা, চিতপুররোড নিমতলা ষ্ট্রীট, মায়লেন জোড়াবাগান, ৫ নং বাটী।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
অবোধবন্ধুর ভুতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী।

—:০:—

মুখবন্ধ।

অবোধবন্ধু এইবার তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিতেছে। নানা কারণ বশতঃ ইহার যথা সময়ে আবির্ভাব বিষয়ে যে যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, এবার তাহার পরিহারার্থ আমরা বিশেষ যত্নবান হইব। কিন্তু তদানুষঙ্গিক কিঞ্চিৎ কলেবর বৃদ্ধি নিতান্ত আবশ্যক বোধ হওয়াতে দুই ফর্ম্মার পরিবর্ত্তে তিন ফর্ম্মা আয়তন করিতে সংকল্প করিয়াছি। এই উপলক্ষে মূল্যেরও আতিশয্য করিতে হইল। বর্ত্তমান মাস হইতে অবোধবন্ধুর কলেবর ২৪ পৃষ্ঠা, এবং বার্ষিক মুল্য ২ দুই টাকা স্থিরীকৃত হইয়াছে। বোধ করি পাঠক বর্গ তজ্জন্য অসন্তুষ্ট না হইয়া পূর্ব্ববৎ আনুকূল্য বিতরণ করিতে থাকিবেন।

—:০:—

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত।

প্রথম অধ্যায়

ইয়োরোপের মানচিত্রে ইটালি দেশের বামভাগে মধ্যমাকৃতি যে একটি দ্বীপ দৃষ্ট হয়, উঁহার নাম কর্সিকা। জলবায়ু, শীতাতপ, ইত্যাদি বিষয়ে এই দ্বীপ অনেক অংশে ইটালির অনুরূপ ইহার অধিবাসি

বর্গ জাতিতে ইটালীয় বলিলে বলা যায় এবং তাহাদিগের ভাষাও ইটালীয় ভাষা হইতে বড় বিভিন্ন নহে। সেই কর্সিকা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জন্মস্থান। তাঁহার পিতার নাম চার্লস্ বোনাপার্ট, তিনি দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে এক জন বিশিষ্ট ও মাতব্বর লোক ছিলেন। যৎকালে তাঁহার জন্মভূমি ফরাশি রাজসরকারের অধীন হইবার উপক্রম হয়, তখন তিনি সেই বিষয়ের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবার নিমিত্ত অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান ছিল যে, ফরাশি জাতির হস্তগত হইলে কর্সিকার স্বাধীনতা লোপ হইবেক, কারণ আচার ব্যবহার ও ভাষা বিষয়ে বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও যখন কোন জাতির শাসনকার্য্য অপর এক জাতির হস্তগত থাকে, তখন প্রবল জাতির নিকট দুর্ব্বল জাতিকে নানা প্রকারে হতমান ও অসুবিধাগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হয়, এই নিমিত্ত চার্লস্ বোনাপার্টের মানস ছিল যে, যদি কর্সিকা দ্বীপ আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে একান্তই অসমর্থ হয়, তাহা হইলে বরং ইটালির সহিত মিশ্রিত হউক, ফ্রান্স দেশের সহিত মিশ্রিত হইয়া কাজ নাই। বাস্তবিকও কর্সিকা দ্বীপ বহুকালাবধি ইটালির উত্তর পশ্চিম অঞ্চলবর্ত্তী জেনোয়া (১) নামক জনপদের অধীন হইয়া আসিয়াছিল। কালক্রমে সেই অধীনতা অসহ্য হওয়াতে কর্সিকাবাসীরা জন্মভূমির উদ্ধার সাধনার্থ বিস্তর প্রয়াস পায়। কিন্তু পরিণামে উহার ভাগ্যে প্রভু পরিবর্ত্ত ব্যতীত আর কিছুই ঘটে নাই, অর্থাৎ জেনোয়ার পরিবর্ত্তে ফরাশি জাতি কর্সিকার প্রভু হইয়া উঠিল। স্বদেশের এই দুর্গতির নিবারণ কল্পে যে সকল দিগ্‌দিগন্ত বিখ্যাত কীর্ত্তিকলাপের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, চার্লস্ বোনাপার্টের নাম তন্মধ্যে বিলক্ষণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়। তিনি কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, পায়োলি (২) নামক সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষীর সহচর হইয়া বিদেশযাত্রার বাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য লুশেন্ নিবারণ করাতে পিতৃ

[১। কর্সিকা দ্বীপ ও ইটালি উপদ্বীপ এ উভয়ের মধ্যে ভূমধ্য সাগরের যে অংশ বিদ্যমান আছে তাহার উত্তর তীরে জেনোয়া নগরের অবস্থিতি। সমুদ্র তটে সংস্থাপিত, এই সুবিধার প্রভাবে এবং শাসন কার্য্যের উৎকৃষ্ট সুশৃঙ্খলা থাকাতে জেনোয়া নগর এক সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তথাকার বাণিজ্য কার্য্য নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং ভূমধ্য সাগরবর্ত্তী অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর জেনোয়ার জয়পতাকা উড্ডীয়মান ছিল, কর্সিকা দ্বীপও সেই সামিলে থাকে।

২। কর্সিকার স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত যে সকল চেষ্টা করা হইয়াছিল, পায়োলি সে সমস্ত উদ্যমের সময় বিশিষ্ট পুরুষকার প্রদর্শন করেন, এবং এক প্রকার অধ্যক্ষ ছিলেন বলিলে হয়। ইয়োরোপ সমাজে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার নাম সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত হইয়াছিল এবং কর্সিকার হিতৈষী পুরুষকারপরায়ণ সুনিপুণ সর্দ্দার বলিয়া তাঁহাকে সকলে আদর অপেক্ষা করিত। জন্মভূমির অবয়ব ক্ষুদ্র, লোক সংখ্যা স্বল্প, আত্মরক্ষণোপযোগী আয়োজন সমস্তও যৎসামান্য, এই সকল আলোচনা করিয়া ইংরেজ স্পেনীয় প্রভৃতি পরাক্রান্ত জাতিদিগের আনুকূল্য প্রার্থনা করিতে স্বদেশ হইতে বহির্গত হয়েন।

তুল্য গুরুলোকের কথায় সে সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন।

চার্লস বোনাপার্ট যে নারীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম লিটীশিয়া। নিজে যেমন সুশ্রী সুপুরুষ ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার পত্নীও কোন অংশে তাঁহার অযোগ্য হয়েন নাই। এই মহিলা এরূপ রূপবতী ছিলেন যে, পুত্রের শৈশবদশায় তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত পারিসনগরে যাত্রা করিলে তথাকার নাগরেরা তাঁহার নিরুপম অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সাহস ও অকুতোভয়তার ইয়ত্তা ছিল না। স্বাধীনতা উদ্ধার সম্পর্কে তাঁহার স্বামীকে যে সকল বিপদে পতিত হইতে এবং যে সকল দুর্গম স্থানে গতিবিধি করিতে হইয়াছিল, লিটীশিয়া কুত্রাপি কখন পতির পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই, ঘোটকে আরোহণ পূর্ব্বক নিরন্তর প্রাণবল্লভের সহচরী হইয়া অরণ্য পর্ব্বত নদ নদী খাল প্রান্তর অতিক্রম করিতেন; আপন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা পর্য্যন্ত এই রূপে ক্ষেপণ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। কথিত আছে যে, নেপোলিয়নকে গর্ভে ধারণ কালে জননী এই সমস্ত ক্লেশাবহ সংকটে বারংবার পতিত হইয়াছিলেন। অল্পবয়সেই তাঁহার বৈধব্য দশা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ ত্রিশ বৎসরে পদার্পণ না করিতেই তাঁহার পতিবিয়োগ হইল; কিন্তু তৎকাল মধ্যেই তাঁহার ত্রয়োদশ সন্তান জন্মিয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে কেবল পাঁচটি বালক আর তিনটি বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নেপোলিয়নের সহোদর সহোদরা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, অবশিষ্ট সন্তান গুলি শৈশবেই কাল গ্রাসে পতিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জন্মগ্রহণ বাল্যকাল—শিক্ষা—প্রথমে ব্রিয়েন্ নগরস্থ বিদ্যালয়ে পরে পারিস নগরীস্থ যুদ্ধ বিদ্যালয়ে শিক্ষা।

কর্সিকা দ্বীপের প্রধান নগরীর নাম য়্যাজেশিও। ১৭৬৯ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসের ১৫ ই তারিখে বেলা সাড়ে এগারটার সময় ঐ নগরের কোন ভবনে নেপোলিয়ন ভূমিষ্ঠ হয়েন। প্রসবের পর যে শয্যার উপরি তাঁহাকে শয়ন করান হইয়াছিল কথিত আছে যে, সেই শয্যাপটে হোমরের (৩) গ্রন্থে বর্ণিত বীরপুরুষদিগের যুদ্ধ বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে চিত্রিত ছিল। উত্তরকালে নেপোলিয়ন যুদ্ধকার্য্যে তাদৃশ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া এই তুচ্ছ বিষয়টি লোকে বিস্মৃত হয় নাই।

৩। যেমন এদেশে রাম রাবণের যুদ্ধ অথবা, কুরুক্ষেত্র সংগ্রাম, গ্রীকদিগের পৌরাণিক শাস্ত্র মধ্যে গ্রীক ও ট্রয়নিবাসীদিগের পরস্পর সংগ্রাম সেইরূপ প্রসিদ্ধ এবং তদ্দেশীয় ভাষার কবিতা সমূহের আকর স্বরূপ। হোমর প্রণীত ঈলিয়ড নামক মহাকাব্য গ্রীকজাতির রামায়ণ ও মহাভারতের স্থানীয় হইয়া আছে। সেই নিমিত্ত অদ্যাপি ইয়োরোপের পশ্চিম খণ্ডনিবাসী জাতিরা, শাস্ত্রচর্চা বিষয়ে গ্রীকজাতির ছাত্র স্বরূপ বলিয়া সেই সকল কথা বিস্মৃত হয় নাই বরং সাংসারিক গৃহকর্ম্মের কথা বার্ত্তার ন্যায় মনোমধ্যে জাগরূক রাখিয়াছে।

লোকের জ্ঞান হইয়াছিল যে, নিয়তি যেন সদ্যোজাত শিশুর ভবিষ্যৎ বীরকীর্ত্তি সমূহ সূচনা করিবার নিমিত্তই তেমন রণরঙ্গ-চিহ্নিত শয্যাতে শয়ন করাইয়াছিলেন। বাল্যকালে নেপোলিয়ন চতুর তেজস্বী ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। জোসেফ্ নামে তাঁহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, অল্পকাল মধ্যেই নেপোলিয়ন তাঁহাকে সর্ব্বাংশে অতিক্রম করিয়া উঠেন এবং আপনার অধীন করিয়া রাখেন। শৈশবে তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত সমস্ত, কিছুতেই ভয় নাই, কাহাকেও দৃক্‌পাত নাই, সকলকেই তৃণজ্ঞান, অধীর, চঞ্চলস্বভাব, এইরূপ ছিলেন বলিয়া তাবৎ ইতিহাসলেখকেরা একবাক্য হইয়া বর্ণনা করে।

বড় হইয়া যিনি যে বৃত্তি অবলম্বন করেন তাঁহার শিশু কালের ক্রীড়া বিহারাদিও কিয়দংশে তদনুরূপ হইয়া থাকে, যাঁহাদের এপ্রকার সংস্কার আছে, তাঁহারা নেপোলিয়নের বাললীলাতে উহার প্রমাণ পাইবেন। তিনি পিত্তলের কামান, ক্রীড়াদুর্গ নির্ম্মাণ প্রভৃতি যুদ্ধ সংঘটিত ব্যাপার লইয়াই খেলা করিতেন। তাঁহার আর এই এক অভ্যাস ছিল, নিজগ্রামের সন্নিহিত সমুদ্রতটে এক গিরিগুহা ছিল, উহার সম্মুখে নানা বৃক্ষ জন্মিবাতে সে স্থান এরূপ জঙ্গলময় বোধ হইত যে, বালকেরা একাকী তাদৃশ স্থানে যাইতে সাহস করে না। কিন্তু নেপোলিয়ন সুযোগ পাইলেই সেই গিরিগুহার মধ্যে যাইয়া বসিয়া থাকিতেন, নিকটে জনপ্রাণী নাই, পর্ব্বতময় তীরভূমির উপর সমুদ্রের তরঙ্গ অনবরত আঘাত করিয়া গম্ভীর রূপে শব্দায়মান হইতেছে, তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার এক প্রকার আমোদ বোধ হইত। জীবনের শেষে যখন নির্জ্জন নিরালয় দূরবর্ত্তী সেন্ট হেলিনাদ্বীপে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তখনকার অবস্থা আর এই বাললীলা এককালে স্মরণ হইলে সহসা মনে উদয় হয়, যে এই অদ্ভুত ব্যক্তির বাল্যকালে যেরূপ অগাধ অসীম জলধি সন্নিধানে সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া কালক্ষেপ করিতে সুখানুভব হইত, শেষদশাতেও দৈবের প্রভাবে ইহাঁর কপালে তাহাই ঘটিয়াছিল।

নেপোলিয়নের বাল্যকাল সম্পর্কে নানা গল্প প্রচলিত আছে। কেহ বলে তিনি কোন উদ্যানে ফল চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছিলেন, কিন্তু সুমধুর বক্তৃতা প্রভাবে উদ্যানস্বামীকে পরিতুষ্ট করিয়া অব্যাহতি পান। কোন কোন স্থলে লেখা আছে যে, তিনি আপনার পরিচ্ছদাদির বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসুক থাকিতেন; তাঁহার পায়ের মোজা গোড়ালিতে আসিয়া খসিয়া পড়িত, নগরের বালকেরা তাঁহাকে পরিহাস করিতে করিতে সঙ্গে যাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। কিন্তু এ সকল গল্পের প্রতি বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করিতে হইবেক না, বড়লোকের বালককাল লইয়া প্রায়ই নানা কথা উঠিয়া থাকে; তাঁহার তৎকালীন চতুরতা বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি নানা গুণের কীর্ত্তন করিতে লোকের অত্যন্ত ব্যগ্রতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেক সুবুদ্ধি-রচনাও ঘটিয়া উঠে।

যাহা হউক, স্বভাবতঃ তাঁহার সৈনিক-বৃত্তি অবলম্বন করিতে ইচ্ছা ছিল, কি না,

তাহা বিদিত নাই; কিন্তু তিনি যে বয়সে যুদ্ধবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়েন, তখন যে আপনি আপনার ব্যবসায় স্থির করিয়া লইয়াছিলেন একথা বিশ্বাস্য নহে। কারণ যখন তাঁহার বয়স আট বৎসর নয় মাস মাত্র, তখন পিতা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ইটালীর কোন কোন স্থান এবং ফ্রান্সের দক্ষিণ বিভাগ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ব্রিয়েন্ নগরস্থিত যুদ্ধ বিদ্যালয়ে তাঁহার নাম লেখাইয়া দিলেন। তথায় সরকারী খরচের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার সৈনিকবৃত্তি শিক্ষা হইতে লাগিল; যৎকালে নেপোলিয়ন ভূমিষ্ঠ হয়েন, তাহার দুই মাস পূর্ব্বে কর্সিকা দ্বীপ ফরাশি রাজত্ব মধ্যে ভুক্ত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি ফরাশি প্রজা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন; কিন্তু নিজে তিনি ইটালীয় ভাষা বই আর কোন ভাষা বিনা উপদেশে শিক্ষা করেন নাই।

পাঠশালায় নিবিষ্ট হইবার পর এই নবাগত বৈদেশিক ছাত্রকে নানা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে বিদেশী জ্ঞান করিত, কেহই আমল দিতনা, তাঁহার সুদীর্ঘ নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট এই নাম লইয়া বিদ্রূপ পরিহাস করিত, এই রূপে নানা প্রকারে তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়া ছিল। কিন্তু কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া তিনি একান্ত মনে অধ্যয়নাদি করিতে লাগিলেন, ফরাসি ভাষা শিক্ষা করিতে বিশেষ রূপ মনোনিবেশ করিলেন, গণিত শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইতে লাগিলেন, এবং অবিলম্বে অধ্যাপকদিগের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। যিনি জর্ম্মন ভাষা শিক্ষা করাইতেন, তিনি ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার প্রতি পরম সন্তুষ্ট ছিলেন। গুরুতর অধ্যবসায় সহকারে গ্রন্থ পাঠে নিযুক্ত থাকাতে তাঁহার ভব্যতা শিষ্টাচার প্রভৃতি লৌকিক শিক্ষা বিষয়ে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই যেন শাস্ত্রীয় চিন্তাতে ভোর হইয়া আছেন, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেন না, যখন মনোযোগ করেন, তখন উত্তর দিবার সময় তাঁহার নানা অঙ্গ ভঙ্গি ও মুদ্রা দোষ হয়, কথা সকল জোরে জোরে কহেন, এবং ভাবভক্তি দেখিলে জ্ঞান হয় যেন কাহাকে মারিবেন কি ধরিবেন; ইত্যাকার বর্ণনা তাহার পঠদ্দশার বিষয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়; বিশেষতঃ তাঁহার দুই চক্ষু একেত স্বভাবতঃ অতি উজ্জ্বল ছিল, তাহাতে আবার সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবার অভ্যাস ছিল, তন্নিমিত্ত চক্ষের জ্যোতি এরূপ সতেজ ও প্রখর হইয়া উঠিয়া ছিল যে, কাহারো প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সে যেন জড়সড় হইয়া যাইত, যেন তাহার জ্ঞান হইত গাত্রে আসিয়া কি বিঁধিতেছে। যখন তিনি প্রথম ইটালি হইতে আসেন, তখন তাঁহার শরীরের বর্ণ যার পর নাই ফর্শা ছিল, কিন্তু ফ্রান্সের সুশীতল জল বায়ু কিছু দিন সংস্পর্শ হইলে তিনি অনেক মলিন হইয়া উঠেন।

তিনি যে সময় উক্ত বিদ্যালয়ে অবস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে একবার দুরন্ত হেমন্তের প্রাদুর্ভাব হয়। মাঠ রাজপথ হর্ম্ম্যচূড়া প্রভৃতি তাবৎ স্থল বরফে বরফময় হইয়া গেল, পাঠশালার ছাত্রবর্গের সর্ব্ব প্রকার

ক্রীড়া কৌতুক বন্ধ হইল, কেবল অঙ্গ চালনার নিমিত্ত বিদ্যালয়সম্পৃক্ত এক প্রকাণ্ড সুদীর্ঘ গৃহ মধ্যে পাদচারণা করিয়া শরীরের রক্ত কথঞ্চিৎ গরম হইত। এই বিষম উত্ত্যক্তিকর শীতকালে নেপোলিয়ন সহাধ্যায়ীদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন যে, রাশি রাশি বরফ জমা করিয়া কেল্লা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এক দল ছাত্র সেই কেল্লার আক্রমণ করুক, অন্য দল রক্ষা করুক, এই ক্রীড়া দ্বারা সময় এক প্রকার সচ্ছন্দে কাটিতে পারে। যেমন সংকল্প, তেমনি কার্য্যারম্ভ, তাবৎ বালক এই ক্রীড়াযুদ্ধে একতান মনে প্রবৃত্ত হইল এবং প্রায় এক পক্ষ কাল ইহাতে পর্য্যবসিত হইলে পর, যখন তুষারপিণ্ড নিক্ষেপ প্রক্ষেপ করাতে কয়েক জন বালকের সাংঘাতিক আঘাত লাগিল, তখন কর্ত্তৃপক্ষের আদেশানুসারে সেই ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হওয়া হইল।

শৈশব কালেই নেপোলিয়নের মনে এই সংস্কারের স্ফূর্ত্তি হয় যে, উপরিতন লোকে সাধারণের প্রতি যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করেন, দৃঢ়তা সহকারে সেই সকল প্রতিপালন করান আবশ্যক, এবং যাঁহারা তদ্বিষয়ের অধ্যক্ষ, তাঁহাদের উচিত যে, খুব কড়াক্কড়ি করেন। এই নিমিত্ত যখন এতাদৃশ কোন কর্ম্মের ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইত, তিনি তখন কাহারো অনুরোধ উপরোধ মানিতেন না, কাহাকেও সমীহ করিতেন না, যে কেহ নিয়মের এক চুল অন্যথা করিত, তৎক্ষণাৎ তাহার উপর শক্ত হুকুম চালাইতেন, তাঁহার আর এই গুণ এক ছিল যে, পঠদ্দশায় পাঁচ জনের সমক্ষে কোন প্রকারে অপদস্থ হইলে তাঁহার যৎপরোনাস্তি লজ্জাবোধ হইত। একদা লাটিন ভাষাতে অনাবেশ নিবন্ধন শিক্ষক তাঁহাকে অপমান পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া সিঁড়ির নীচে দাড় করাইয়া দেন, ইহাতে নেপোলিয়নের এরূপ ঘৃণা বোধ হইল যে, তিনি যেন অপস্মার রোগে আক্রান্ত হইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গশরীর সঘনে কম্পিত এবং হস্তপদ লোলিত হইতে লাগিল। ঈদৃশী দশা দেখিয়া শিক্ষকেরা সশঙ্কিত হইয়া অবমানবেশ প্রত্যাহরণ করিয়া লইলে তবে তিনি সুস্থ হইলেন।

ব্রিয়েন বিদ্যালয়ে কিয়ৎকাল যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষার পর তাঁহার পারিস্ নগরীস্থিত সৈনিক পাঠশালাতে স্থানান্তর হওয়া হয়, তথায় আসিয়াও তিনি পূর্ব্ববৎ বিদ্যানুশীলনে তৎপর থাকিলেন। প্রগাঢ় অভিযোগ সহকারে গণিত ও ইতিহাস শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রকরণেও মনোযোগ দিলেন। কিন্তু যেমন লোকত যে সকল সভ্যতা ভব্যত প্রচলিত আছে, তৎসমুদায়ের শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল না, তেমনি শাস্ত্রসম্পর্কেও বর্ণশুদ্ধি বা ব্যাকরণশুদ্ধি বা রচনার তাৎপর্য্য ইত্যাদি অত্যাবশ্যক পরিপক্কতা উপার্জ্জন করিতে বড় একটা চেষ্টিত হয়েন নাই। তজ্জন্য অতি সামান্য সামান্য শব্দের বানান ভুলিতেন, আর সৌষ্ঠব বা পরিপাটীর রচনা কাহাকে বলে, তাহার কিছুই ধার ধারিতেন না। এই অসংপূর্ণতা নিবন্ধন তাঁহাকে উত্তর কালে অনেক স্থলে লজ্জিত হইতে হইয়াছিল। এইরূপ কিছু কাল অতীত হইলে ১৭৮৫ অব্দের আগষ্ট

মাসে তিনি পরীক্ষা দিয়া পাঠ সাঙ্গ করিলেন এবং গোলন্দাজ (১) সৈনিক দলে একজন ক্ষুদ্র লেফ্‌টনেণ্ট স্বরূপ নিযুক্ত হইয়া বিদ্যালয়ের নিকট বিদায় লইলেন।

সুরবালা কাব্য।

প্রথম ভাগ।

প্রথম সর্গ।

"Her eyes's dark charms it were vain to tell;
But gaze on those of the Gazelle;
It will assist thy fancy well"

১

ওহে নীলোজ্জ্বল রূপ গগণ মণ্ডল,
অমেয় অনন্ত কাণ্ড, প্রকাণ্ড আকার;
ব্রহ্মের অণ্ডের অর্দ্ধ খণ্ড অবিকল,
গোল হয়ে ঘেরে আছ মম চারিধার।

২

তব তলে, এ গম্ভীর নিশীথ সময়,
দেখ পড়ে আছি এই ছাতের উপরে;
জগৎ নিদ্রাভিভূত, স্তব্ধ সমুদয়,
ভোঁ ভোঁ করে দশদিক, পবন সঞ্চরে।

৩

হেরিলে তোমার রূপ নিশীথ নির্জ্জনে,
অপূর্ব্ব আনন্দ রসে উথলে হৃদয়;
তুচ্ছ করি নিদ্রা আর প্রিয়া প্রিয়ধনে,
আসিয়াছি তাই আমি হেথা এ সময়।

৪

অসংখ্য অসংখ্য তারা চোকের উপর,
প্রান্তরে খদ্যোত যেন জ্বলে দলে দলে;
স্থানে স্থানে দীপ্তি দেয় নক্ষত্র নিকর,
কত স্থানে কত মেঘ কত ভাবে চলে।

৫

ছালি গাঁথা ছায়াপথ, গোচ্ছা সেলিহার,
তোমার বিশাল বক্ষে সেজেছে উচিত;
যেন এক সুনির্ম্মল নির্ঝরের ধার,
সুবিস্তৃত উপত্যকা বক্ষে প্রবাহিত।

৬

শূন্যে শূন্যে মেঘমালে নাচিয়ে বেড়ায়,
চঞ্চলা চপলা মালা তব নৃত্যকরী;
যেন মানসরোবর লহরী লীলায়,
উল্লাসে সন্তরে সব অলকাসুন্দরী।

৭

কোথা সে চন্দ্রমা তব শির আভরণ,
পবিত্র প্রেমের যিনি স্পষ্ট প্রতিরূপ;
জগৎ জুড়ায় যাঁর শীতল কিরণ,
যাঁর সুধা লোলে সদা চকোরী লোলুপ।

৮

ধরণী দুখিনী আজি তার অদর্শনে,
স্তব্ধ হয়ে বসিয়ে আছেন মৌনবতী;
ঢেকেছেন সর্ব্ব অঙ্গ তিমিরাবরণে,
প্রিয় পতি অদর্শনে সুখী কোন্ সতী।

৯

প্রাতঃকালে ভ্রমি আমি প্রান্তরের মাঝে,
আরক্ত অরুণ ছটা করিতে লোকন;
চক্রাকার বৃক্ষাবলি চারিদিকে সাজে,
তোমায় মস্তক পরে করিয়া ধারণ।

(১) সেনার অন্তঃপাতি যে দলের উপর কামান চালাইবার ভার অর্পিত থাকে, তাহাদিগের নাম গোলন্দাজ।

১০

সে সময় শোভা তব ধরে না ধরায়,
শ্যামাঙ্গ ছুরিত হয় রতন কাঞ্চনে;
বলাকা নিকটে গিয়ে চামর ঢুলায়,
নলিনী নিরখে রূপ সহাস আননে।

১১

তোমার মেঘের ছায়া দিবা দ্বি প্রহরে,
গঙ্গার তরঙ্গে মিসে সাজে মনোরম;
শ্বেত, নীল, পদ্মদল যেন একস্তরে,
অথবা স্থানেতে যেন যমুনা সঙ্গম।

১২

বিকালে দাঁড়ায়ে নীল জল ধর শিরে,
তোমার ললিত বালা ইন্দ্রধনুসতী;
থামায় সান্ত্বনা কোরে বাদল বৃষ্টিরে,
প্রেম যেন শান্ত করে ক্রোধোদ্ধত পতি।

১৩

কেতু তব দেখা দেয় কখন কখন,
মনোহরা অপরূপা শল্লকী আকারা;
মুখখানি দীপ্তিমান তারার মতন,
সর্ব্বাঙ্গেতে মুক্তাময়ী ফোয়ারার ধারা।

১৪

চতুর্দ্দিকে মহা মহা সমুদ্র সকল,
লাফায়ে লাফায়ে ওঠে লোভে জলধরে;
তোলপাড় কোরে করে ঘোর কোলাহল,
তোমার কাছেতে যেন ছেলে খেলা করে

১৫

ঘোর ঘর্ঘর গর্জ্জ, উদগ্র অশনি,
বেগ ভরে করে যেন ব্রহ্মাণ্ড বিদার।
দীপ্ত হয়ে ছুটে আসে দহিতে অবনি;
কিন্তু সে নমিয়ে তোমা করে নমস্কার।

১৬

তোমার প্রকাণ্ড ভাণ্ড অনন্ত উদরে,
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ বোঁ বোঁ কোরে ধায়;
কিন্তু যেন তারা সব অগাধ সাগরে,
মাছের ডিমের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

১৭

কত স্থানে কত কত সমীর সাগর,
নিরন্তর তরঙ্গিয়ে হুহু হুহু করে;
আবরি প্রগাঢ় নীলে তব কলেবর,
ঢাকায়ে রয়েছে যেন প্রলয়ের ডরে।

১৮

মানুষের বুদ্ধিবেগ বিদ্যুতের ছটা,
তোমার মণ্ডল চক্রে ঘোরে চক্রাকারে;
ভেদ করে দুর্ভেদ্য তিমির ঘোর ঘটা,
যা এসে সমুখে পড়ে, কাটে খর ধারে।

১৯

কিন্তু সে যখন ধায় ভেদিতে তোমায়,
পুনঃ পুনঃ ধাক্কা খেয়ে আসে পাছু হোটে;
বুদ্ধি থাকা একতর বিপত্তির প্রায়,
বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই ফোটে।

২০

অহো কি আশ্চর্য্য কাণ্ড, তোমার ব্যাপার,
ভাবিয়ে করিতে নারি কিছুই ধারণা;
এবিশ্বে কিছুই নাই ত্বাদৃশ প্রকার,
কেবল ঈশ্বর সহ সুস্পষ্ট তুলনা।

২১

ঈশ্বরের ন্যায় তুমি সূক্ষ্ম নিরাকার,
বিশ্বব্যাপী, বিশ্বাধার, বিশ্বের কারণ
ঈশ্বরের ন্যায় সব ঐশ্বর্য্য তোমার,
অথচ কিছুই নও ঈশ্বর যেমন।

২২

সুরবালা উপহার দিলেম তোমারে,
এ যদি এ নরলোকে স্থান নাহি পায় ;
ইন্দ্রধনু সৌদামিনী সখী সহকারে,
ত্রিদিব সুন্দরী যেন ত্রিদিবেতে যায়।

২৩

এক দিন দেব তরুণ তপন,
হেরিলেন সুর নদীর জলে ;
অপরূপ এক কুমারী রতন,
খেলা করে নীল নলিনী দলে।

২৪

বিকশিত নীল কমল আনন,
বিলোচন নীল কমল হাসে ;
আলো করে নীল কমল বরণ,
পুরেছে ভুবন কমল বাসে।

২৫

তুলি তুলি নীল কমল কলিকা,
ফুঁ দিয়ে ফুটায় অফুট দলে ;
হাসি হাসি নীল নলিনী বালিকা,
মালিকা গাঁথিয়ে পরিছে গলে।

২৬

লহরী লীলায় নলিনী দোলায়,
দোলেরে তাহায় সে নীল মণি ;
চারি দিকে অলি উড়িয়ে বেড়ায়,
করি গুনু গুনু মধুর ধ্বনি।

২৭

অপসরী কিন্নরী দাড়াইয়ে তীরে,
ধরিয়ে ললিত করুণ তান ;
বাজায়ে বাজায়ে বীণা ধীরে ধীরে,
গাহিছে আদরে স্নেহের গান।

২৮

চারি দিক্ দিয়ে দেবীরা আসিয়ে,
কোলেতে লইতে বাড়ান কোল ;
যেন অপরূপ নলিনী হেরিয়ে,
কাড়াকাড়ি করি করেন গোল।

২৯

তুমিই সে নীল নলিনী সুন্দরী,
সুরবালা সুর ফুলের মালা ;
জননীর হৃদি কমল উপরি,
হেসে হেসে বেশ করিতে খেলা !

৩০

হরিণীর শিশু হরষিত মনে,
জননীর পানে যেমন চায় ;
তুমিও তেমনি বিকচ নয়নে,
চাহিয়ে দেখিতে আপন মায়।

৩১

আহা, তাঁর ভাবী আশার অম্বরে,
বিরাজিতে রাম ধনুর মত ;
হেরিয়ে তোমায়, মনের ভিতরে,
না জানি আনন্দ পেতেন কত !

৩২

আচম্বিতে হায় ফুরাল সকল,
ফুরাল জীবন ফুরাল আশা ;
হারায়ে জননী নন্দিনী বিহ্বল,
ভাঙিল তাহার স্নেহের বাসা !

৩৩

ঠিক তুমি তাঁর জীয়ন্ত প্রতিমা,
জগতে রয়েছ বিরাজমান ;
তেমনি উদার রূপের মহিমা,
তেমনি মধুর সরল প্রাণ।

৩৪

তেমনি বরণ, তেমনি নয়ন,
তেমনি আনন, তেমনি কথা;
ধরায় উদয় হয়েছে কেমন,
অমৃত হইতে অমৃতলতা!

৩৫

পিতামহী তব হইয়ে কাতর,
বলিলেন বসি করিয়ে কোলে;
"আমার সুয়োর হবে ভাল বর,
এ মেয়ে হেরিলে কেবা না ভোলে?"

৩৬

করিতেন তিনি লালন পালন,
মা-মরা মেয়েরে মায়ের মত;
তাঁহারো ত্বরায় হইল নিধন,
দিন কত কাল না হতে গত।

৩৭

জনক তোমার করুণ অন্তর,
হেরি নিরাশ্রয় স্নেহের ধনে;
রাখিতেন সদা চোকের উপর,
আড় হলে ব্যথা পেতেন মনে।

৩৮

পারকতা গুণে পরিশ্রম বলে,
হইত তাঁহার অনেক আয়;
কুমারী রতনে রাখিতে কুশলে,
করিতেন প্রায় সকলি ব্যয়।

৩৯

দেবতুল্য তাঁর মহত চরিত,
শিখাত সুনীত সদা তোমায়;
তাঁহারি যতনে হইতে শিখিত,
নারীজনোচিত কলাকলা

৪০

লইয়ে যেতেন বিদেশ ভ্রমণে,
দেখাতেন কত নয়নলোভা;
নগরে, প্রান্তরে, গিরি, নদী, বনে,
নূতন জিনিস, নূতন শোভা।

৪১

অপরূপ সব দরশন করি,
জনমিত মনে কতই সুখ;
হরষে হাসিয়ে গলা ধরি ধরি
চুম্বিতে সোহাগে পিতার মুখ।

৪২

কোথায় এখন সে সুখ সময়,
কোথায় জনক করুণানিধি;
কোথায় কিরণ, অরুণ উদয়,
সকলি হরেছে দারুণ বিধি!

৪৩

আপন বলিতে কেহ নাই আর,
দয়া মায়াহীন যাহারা আছে;
না থাকিলে কিছু বিভব তোমার,
দাঁড়াতে তাহারা দিতনা কাছে।

৪৪

পিতৃ পুণ্য বলে তুমি গো এখন,
হয়েছ ষোড়শী রূপশী নারী;
পিতার মতন পাইয়াছ মন,
শিখেছ উদার ব্যাভার তাঁরি।

৪৫

'শ্যামল বরণ, বিমল আকাশ,
হৃদয় তোমার অমরাবতী;
নয়নে কমলা করেন নিবাস,
আননে কোমলা ভারতী সতী।

৪৬

সীতার মতন সরল অন্তর,
দ্রৌপদীর মত রূপসী শ্যামা;
কালরূপে আলো করি চরাচর,
কে গো এ বিরাজে মুগ্ধা বামা!

৪৭

বালিকার মত ভোলা খোলা মন,
বালিকার মত বিহীন লাজ;
সকলেরে ভাবে ভেয়ের মতন,
নাহিক বসন ভূষণ সাজ।

৪৮

কিবে অমায়িক বদন মণ্ডল,
কিবে অমায়িক নয়ন গতি;
কিবে অমায়িক বাসনা সকল,
কিবে অমায়িক সরল মতি!

৪৯

কথা কহে দুরে দাঁড়ায়ে যখন,
সুরপুরে যেন বাঁশরী বাজে;
আলু থালু চুলে করে বিচরণ,
মরিগো তখন কেমন সাজে!

৫০

মুখে বেশি হাসি আসে যে সময়,
করতল তুলি আনন ঢাকে;
হাসির প্রবাহ মনে মনে বয়,
কেমন সরেশ দাঁড়ায়ে থাকে!

৫১

চটকের রূপে মন চটা যার,
শোকে তাপে যার কাতর প্রাণী;
বিরলে ভাবিতে ভাল লাগে তার,
এ নীল নলিনী প্রতিমা খানি।

৫২

প্রভুত্বের মহা বাসনা সকল,
নাচাইতে আর নারে যে জনে;
যশ যাদু মন্ত্রে হইতে বিহ্বল,
সরম জনমে যাহার মনে;

৫৩

নট নাটশালা এই দুনিয়ায়,
কিছুই নুতন ঠ্যাকেনা যারে,
কালের কুটিল কল্লোল মালায়,
যাহা ঘোটে যায় সহিতে পারে;

৫৪

কেবল যাহার সরল পরাণে,
ঘোচেনি পাবন প্রেমের ঘোর;
প্রণয় পরম দেবতার ধ্যানে,
বসিয়ে রয়েছে হইয়ে ভোর;

৫৫

তাহারি নয়নে ও রূপ মাধুরী,
যমুনা লহরী বহিয়ে যায়;
স্বপনে হেরিছে যেন সুরপুরী,
রস ভরে মন পাগল প্রায়।

৫৬

সুরবালা! মম [illegible]খা সহৃদয়,
হেরিয়ে তোমায় পাগল হেন;
ভূতলে হেরিলে চাঁদের উদ[illegible],
চকোর পাগল হয় [illegible]?

ইতি সুরবালা কাব্যে নায়িক[illegible]

প্রথম সর্গ।

বেকন্ সন্দর্ভ।

৬।—সন্দেহ।

পাখীর মধ্যে বাদুড় যেরূপ, চিন্তার মধ্যে সন্দেহ সেইরূপ। বাদুড় সন্ধ্যাকালের অন্ধকারে উড়িয়া বেড়ায় সেইরূপ যে বিষয় আমরা ভাল জানি না সেই বিষয়েই সন্দেহ উপস্থিত হয়। সন্দেহ থামাইয়া রাখা ভাল, অন্ততঃ তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়াও চাহি।

সন্দেহে মন মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় হইয়া উঠে, বন্ধু বান্ধবের সহিত বিচ্ছেদ এবং কার্য্যেরও অনেক ব্যাঘাত জন্মে সুতরাং কাজকর্ম্ম স্থির ও সমভাবে চলিতে পারে না। ইহাতে রাজা যথেচ্ছাচারী ও স্বামী স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাসী হয়; বিজ্ঞ লোকদিগেরও বুদ্ধির স্থিরতা ও মনের প্রফুল্লতা থাকে না।

সন্দেহ হৃদয়ের দোষে উৎপন্ন হয় না মনের দোষে হইয়া থাকে। কারণ দৃঢ়প্রকৃতি লোককেও সন্দিগ্ধ-চিত্ত দেখা যায়। ইংলণ্ডের সপ্তম হেনরী ঐরূপ ছিলেন; তাঁহার মত সন্দিহান অথচ দৃঢ়প্রকৃতি লোক দেখা যায় না। এরূপ প্রকৃতিতে অল্প অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। কারণ ইহারা সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়া সন্দিগ্ধ চিত্ত হয় না। কিন্তু ভীরু-প্রকৃতি লোকে শীঘ্রই সন্দিহান হয়।

অল্প জ্ঞানে লোকে যেরূপ সন্দিগ্ধ চিত্ত হয় সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। সুতরাং অধিক জ্ঞান লাভ করাও সন্দেহকে মনে মনে স্তম্ভিত না রাখাই ইহার প্রকৃত ঔষধ।

মানুষে কি চায়? তাহারা মনে করে যে তাহারা যে সকল লোককে কার্য্যে নিযুক্ত করে ও যাহাদের সহিত ব্যবহার করে তাহারা ঋষি? তাহারা কি ইহা বিবেচনা করে না যে উহাদের নিজের অভিসন্ধি আছে এবং নিজ অভিসন্ধির প্রতিই উহাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টি? সুতরাং সন্দেহকে সত্য বলিয়া উহার ফলাফল বিবেচনা কর; এবং মিথ্যা বলিয়া থামাইয়া রাখ, ইহা হইতে সন্দেহকে সুস্থির রাখিবার আর উৎকৃষ্ট উপায় নাই। বিপদ নিবারণের জন্য মানুষের যে বিষয়ে সন্দেহ তাহা সত্য বলিয়া জ্ঞান করা ভাল, তাহাতে তাদৃশ অনিষ্ট ঘটে না, যে সন্দেহ আপনা হইতে মনের মধ্যে উদিত হয়, তাহা কেবল মধুমক্ষিকার শব্দ মাত্র; কিন্তু যাহা নিপুণতার সহিত পরিপোষিত হইয়া আখ্যান ও কথার ছলে লোকের মনে বিন্যস্ত হয় তাহা মধুমক্ষিকার হূলস্বরূপ।

যে ব্যক্তির উপর সন্দেহ হয়, স্পষ্টরূপে তাহাকে সন্দেহের কারণ বলাই সন্দেহ কাননচ্ছেদের উপযুক্ত কুঠার নিশ্চয় জানিবে। তদ্দ্বারা শীঘ্রই সত্য মিথ্যা নিশ্চয় জানা যায় এবং সন্দিগ্ধ ব্যক্তিও, পাছে আবার সন্দেহের কোন কারণ উপস্থিত হয়, বলিয়া সাবধান হইয়া চলে। কিন্তু নীচপ্রকৃতি লোকের সহিত এরূপ ব্যবহার ভাল নয়, কারণ যদি তাহারা একবার জানিতে পারে তাহাদের উপর

সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাহারা আর কখ
বিশ্বাসী হইতে চেষ্টা করিবে না। এব
জন ইটালী দেশীয় পণ্ডিত বলিয়াছে
"সন্দেহ বিশ্বাসকে একেবারে জবা
দেয়।" বোধ হয় ইহাতে বিশ্বাস উত্তে
জিত হওয়াই উচিত।

৭।—উপধর্ম্ম।

যে প্রকার রূপ ও ব্যবহার কল্পনা করিলে ঈশ্বরের গৌরব হানি হয় এরূপ কল্পনা অপেক্ষা ঈশ্বর নাই এ মত ভাল। নাস্তিকতা কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস মাত্র; কিন্তু উপধর্ম্ম তাঁহার পক্ষে গালির স্বরূপ; বাস্তবিক উপধর্ম্মে ঈশ্বরকে বিকৃতাকার করিয়া তুলে।

প্লুটার্ক এ বিষয়ে ভালই বলিয়াছেন; তিনি বলেন "প্লুটার্ক নামে কোন ব্যক্তি ছিল না লোকে যদি এ রূপ কথা বলে তাহাও বরং ভাল, তথাপি প্লুটার্ক নামে একজন ছিল ও সে তাহার সদ্যঃপ্রসূত সন্তানদিগকে ভক্ষণ করিত; ঐরূপ অপবাদ কেহ আমাকে যেন না দেয়।" কবিগণ এই রূপে কালের স্বভাব চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন। ঈশ্বরের উপর এইরূপ ঘৃণাকর ব্যবহার আরোপ যত অধিক পরিমাণে হইবে সেইপরিমাণে মনুষ্যের বিপদও বাড়িতে থাকিবে।

নাস্তিকতায় লোকের বিবেচনা ও দূরদর্শিতা থাকে, স্বাভাবিক ভক্তি শ্রদ্ধাদিরও লোপ হয় না, সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন ও আপন সুখ্যাতির প্রতিও থাকে। যদিও নাস্তিকদের মনে ধর্ম্মের লেশ মাত্র নাই, তথাপি এই সমস্ত দ্বারা বাহিরে সদ্ব্যবহারশীল হইতে পারে। কিন্তু উপধর্ম্ম ঐ সমুদায়কে অপদস্থ করে এবং মনুষ্যের মনে এক প্রকার যথেচ্ছাচার করিতে থাকে।

নাস্তিকতায় কখন কোন দেশে বিদ্রোহাদি উপস্থিত হয় নাই, কারণ নাস্তিকদের পারলৌকিক সুখের আশা নাই বলিয়া তাহারা ঐহিক সুখের পক্ষে অতিশয় সাবধান ও সতর্ক থাকে। আমরা দেখিতেছি যে সময়ে লোকের মন নাস্তিকতাপ্রবণ হয় সে সময়ে কোন উৎপাত থাকে না। অগষ্টস্ সীজরের সময়ে অধিকাংশ লোক নাস্তিক ছিল বলিয়া তখন কোন উপদ্রব ছিল না; কিন্তু উপধর্ম্মের জন্য অনেক দেশে অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। ইহাতে রাজ্যরূপ নক্ষত্রচক্রে এক নূতন প্রবহ বায়ু আনিয়া ফেলে, উহা দ্বারা শাসন প্রণালীর সমুদায় গ্রহ নক্ষত্র এক কালে উৎসন্ন হইয়া যায়।

সাধারণ লোকই উপধর্ম্মের অধ্যক্ষ; এবং সমুদায় উপধর্ম্মেই বিজ্ঞলোকে নির্ব্বোধদিগের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যুক্তি দ্বারা দেশীয় আচারের সংস্থাপন না করিয়া প্রচলিত আচারের যাহা কিছু অনুকূল তর্ক দেখিতে পান তাহাই উহার রক্ষার্থ বিন্যস্ত করিয়া থাকেন।

ট্রেন্টের মহাসভায় সাম্প্রদায়িক দর্শনবিদ্‌দিগের অধিক প্রাদুর্ভাব ছিল, ঐ সভায় কোন কোন যাজক বলিয়াছিলেন

“সাম্প্রদায়িক দর্শনবিদেরা জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের সদৃশ; জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গ্রহদিগের কক্ষ্যা বৃত্তাকার বা অণ্ডবৃত্তাকার নহে ইহা সত্য জানিয়াও আকাশ মণ্ডলের ঘটনা সকল সুসংস্থুল রাখিবার জন্য উহাদের কল্পনা করিয়া থাকেন সেইরূপ সাম্প্রদায়িক দর্শন বিদেরা প্রচলিত আচার রক্ষা করিবার জন্য নানা বিধ কূট ন্যায় ও কূট যুক্তি কল্পনা করিয়াছেন।

বাহ্য আড়ম্বর, বাহ্যেন্দ্রিয়-সন্তোষ, কপট ধার্ম্মিকতা, পৌরাণিক বৃত্তান্তে অতিশয় ভক্তি, অর্থপিপাসা ও দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য যাজক দলের চাতুরী, সত্য অভিসন্ধি আছে বলিয়া অশুদ্ধ মতে শ্রদ্ধা, সাংসারিক কার্য্য দেখিয়া ধর্ম্ম কার্য্যের বিচার করা, এবং রাষ্ট্রবিপ্লবকালে সাধারণ লোকের অসভ্যতা এই সকলই উপধর্ম্মের কারণ। উপধর্ম্মকে অনাবৃত রাখিলে অধিকতর বিকৃতাকার দেখায়। একটি বানর যদি মানুষের মত বেশ বিন্যাস করে তাহাকে যেরূপ বিকৃতাকার দেখায় সেইরূপ উপধর্ম্ম যত ধর্ম্মের অনুরূপ হইতে ইচ্ছা করিবে ততই উহাকে কুৎসিত দেখাইবে। যেরূপ উত্তম খাদ্য দ্রব্য পচিয়া পোকা হইয়া যায়, সেইরূপ সুন্দরাচার বিকৃত হইয়া কদাচারে পরিণত হয়।

যখন লোকে বিবেচনা করে পূর্ব্বকার উপধর্ম্ম হইতে যত অন্তর হওয়া যায় ততই মঙ্গল এবং যখন সাধারণ লোকে ধর্ম্মসংস্কার আরম্ভ করে তখন এক প্রকার উপধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে গিয়া আর এক প্রকার উপধর্ম্ম আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অসদ্ আচারের সহিত অনেক সদাচারও দূরীভূত হয়। অতএব যেন মন্দের সহিত ভাল শুদ্ধ বাহির হইয়া না যায়, এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

৮।— প্রেম।

নাট্যশালা প্রেমের নিকট যত ঋণী, মানুষের জীবন তত নহে। নাট্যশালায় প্রেম সংযোগান্ত(Comedy)নাটকের প্রধান বিষয় এবং কখন কখন বিয়োগান্তেরও (Tragedy) হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাতে সাংসারিক কার্য্যের অনেক অনিষ্ট হয়; প্রেম কখন বিদ্যাধরীরূপে কখন বা রাক্ষসীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মানুষের অমঙ্গল উৎপাদন করে। প্রাচীন বা ইদানীন্তন সময়ের যে সকল বড়বড় লোকের জীবন বৃত্তান্ত আমরা জ্ঞাত আছি তন্মধ্যে প্রেমানুরাগে উন্মত্ত প্রায় হইয়াছেন, এমন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং বোধ হইতেছে যাঁহাদের অন্তঃসার আছে ও যাঁহারা মহৎ-কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত তাঁহাদের হৃদয়ে প্রেম অধিকার লাভ করিতে পারে না। কিন্তু মার্কস আন্টোনিয়াস যিনি রোম সাম্রাজ্যের অর্দ্ধাংশের অধিকারী হইয়াছিলেন, এবং আপিয়স্ ক্লডিয়স্ যিনি রোমের একজন নিয়মকর্ত্তা ও ডিসেম্ভার ছিলেন, ইহাঁরা

এ নিয়মের বহির্ভূত। আণ্টোনিয়স অতিশয় ইন্দ্রিয়াসক্ত ও অব্যবস্থিত ছিলেন কিন্তু আপিয়স্ ক্লডিয়স্ স্থিরচিত্ত ও বিজ্ঞ লোক ছিলেন, ইহাতে বোধ হইতেছে যে, কেবল অসংযতচিত্তদিগের হৃদয়ে প্রেম প্রবেশ করে এমত নহে, অসাবধান হইলে সম্পূর্ণ সংযতমনস্কদিগের হৃদয়েও কখন কখন প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে।

মানুষই মানুষের পক্ষে চিন্তার সুবিস্তীর্ণ ভূমি; এপিকিউরসের এ কথা ভাল বোধ হইতেছে না; মানুষ ঈশ্বরধ্যান ও অন্যান্য মহৎকার্য্যের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে, চক্ষুও তাহাকে মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছে, পশুদিগের মত সে উদরের দাস নহে কিন্তু একটি ক্ষুদ্র পুত্তলিকার নিকট দণ্ডবৎ প্রণিপাত ও আপনাকে দর্শনেন্দ্রিয়ের দাস করা ব্যতীত কি তাহার আর কোন কর্ত্তব্য নাই?

যখন এই রিপু দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে তখন ইহার কার্য্য অতিশয় বিস্ময়জনক; ইহাতে বস্তু সকল কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাদের মূল্যের কিরূপ তারতম্য হয় তাহা "প্রেমের নিকট নিরন্তর অতিশয়োক্তিও সুন্দর লাগে" এই বাক্য দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। ইহা কেবল কথাতেই নহে মনে ও কার্য্যেও এইরূপ; দেখ যত চাটুকার আছে তন্মধ্যে লোকে আপনিই আপনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চাটুকার, কিন্তু প্রেমানুরাগী ব্যক্তি ইহা হইতেও অধিক; কারণ কেহই এমত অহঙ্কৃত নাই, যে যেরূপ প্রেমানুরাগী ব্যক্তি তাহার প্রেমের পাত্রকে অসম্ভব গুণশালী বিবেচনা করে সেই রূপ আপনাকে অলীক গুণশালী ভাবে। অতএব প্রেমানুরাগী হওয়া ও বিজ্ঞ হওয়া কদাচ একত্র সম্ভবেনা। এ কথা ভালই বলা হইয়াছে যে, যদি প্রেম উভয়ের না হয়, তবে যাহাকে সবার অধিক ভাল বাসা যায় তাহার নিকট যেরূপ প্রেমিকের হীনতা প্রকাশ পায় এমন অন্য কোন প্রেমপাত্রের বা অপর ব্যক্তির নিকট নহে; কারণ ইহা একটি প্রধান ও অব্যভিচারী নিয়ম যে, প্রেমের বিনিময়ে হয় তাদৃশ প্রেম নতুবা গূঢ় ঘৃণাই তাহার পুরস্কার হইয়া থাকে। অতএব প্রেম যে শুদ্ধ অন্যান্য বিষয়ে জলাঞ্জলি দেয় এরূপ নহে আপনাকেও আপনি জলাঞ্জলি দিয়া থাকে। তাহার পক্ষে মানুষের কত দূর সতর্ক হওয়া উচিত বিবেচনা কর। অন্যান্য ক্ষতির বিষয়ে একজন মহাকবি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি বলেন "যিনি হেলিনাকে মনোনীত করিয়াছিলেন তাঁহার লক্ষ্মী ও স্বরস্বতী উভয়কেই পরিত্যাগ করা হইয়াছিল।" কারণ যিনি প্রেমের দাস হইয়া পড়েন তাঁহার ধন বুদ্ধি সকলই লোপ পাইয়া যায়।

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের সময়ে মানুষের মন অতিশয় দুর্ব্বল থাকে, ঐ সময়েই প্রেমানুরাগ উদ্বেল হইয়া উঠে। যদিও দুঃসময়ে ইহা কদাচিৎ দেখা যায় বটে, কিন্তু এই দুই সময়েই প্রেম উত্তেজিত ও বলবান হয় সুতরাং ইহা মূর্খতার ফল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

যখন প্রেমকে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে না দিলে আর চলে না তখন যাঁহারা ইহাকে প্রকৃতাবস্থায় রাখেন এবং সংসারের গুরুতর কার্য্য হইতে পৃথক করিয়া ফেলেন তাঁহাদেরই মঙ্গল; কারণ যদি ইহা সাংসারিক কার্য্যের সহিত একবার লিপ্ত হয় তাহা হইলে সৌভাগের অনেক ব্যাঘাত জন্মে এবং লোকে কখনই আপন উদ্দেশ্য প্রকৃত প্রস্তাবে সাধন করিতে পারে না।

সৈনিকেরা কিরূপে প্রেমানুরাগী হয় বুঝিতে পারি না, বোধ হয় তাহারা যেরূপে সুরাসক্ত হয় প্রেমাসক্তও সেই রূপে হইয়া থাকে; কারণ অতিশয় ক্লেশের বিনিময়ে আমোদের অত্যন্ত প্রয়োজন।

মানব প্রকৃতির মধ্যে অন্যকে ভাল বাসার একটি প্রবৃত্তি আছে, যদি ইহা এক বা কতকগুলি ব্যক্তির উপর রাখা না যায়, তবে অনেকের উপর বিস্তীর্ণ হয়, এবং লোক সকলকে যোগী ও পরম হংসের মত দয়ালু ও উদারস্বভাব করিয়া তুলে।

দম্পতী প্রেম মনুষ্য সৃষ্টি করে, মিত্র প্রেম উহাকে পোষিত করে এবং অব্যবস্থিত প্রেম মানবজাতিকে নীচ করিয়া ফেলে।

৯।—বিবাহ ও অবিবাহাবস্থা।

যাঁহার স্ত্রী পুত্র আছে তিনি সৌভাগ্যের নিকট এক প্রকার জামিন রাখিয়াছেন। স্ত্রীপুত্র থাকিলে গুরুতর পুণ্য বা পাপের অনুষ্ঠান সম্ভবে না। যাহাতে সাধারণের অতিশয় উপকার হইয়াছে এরূপ মহৎ কার্য্য প্রায়ই অবিবাহিত বা নিঃসন্তান লোক হইতে হইয়াছে। স্ত্রীর সহিত স্বামীর যেরূপ প্রীতি ও সে যেরূপ স্ত্রীর ভরণার্থ ধন দিয়া থাকে, ইহাদেরও সাধারণের সহিত সেইরূপ প্রীতি ও সাধারণের উপকারার্থ ইহারাও সেইরূপ ধন বিতরণ করিয়াছে তথাপি যাহাদের স্ত্রীপুত্র আছে উত্তর কালের জন্য তাহাদের বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত; কারণ উত্তর কালের হস্তেই তাহাদের অকৃত্রিম স্নেহপাত্র সকলকে সমর্পণ করিতে হইবে, ইহা তাহারা বিলক্ষণ জ্ঞাতই আছে।

এরূপ কতকগুলি লোক আছে, যদিও তাহারা অবিবাহাবস্থায় জীবন যাপন করে, কিন্তু অন্যের দিকে তাহাদের দৃষ্টিপাত নাই। যাহা কিছু আপনার সুখের জন্যই করিয়া থাকে এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা তাহাদের মতে অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। আরও কতকগুলি লোক আছে তাহারা স্ত্রীপুত্রদিগকে ব্যায়ের তলপ-চিঠী বলিয়া বোধ করে। আবার কেহ কেহ এমন মূর্খ ও অর্থপিশাচ, যে, লোকে তাহাদিগকে আরও অধিক ধনী বিবেচনা করিবে বলিয়া তাহারা নিঃসন্তান হওয়া একটি অহঙ্কারের সামগ্রী বিবেচনা করে। বোধ হয় কাহারও মুখে শুনিয়া থাকিবে "অমুক বড় ধনী" এবং কেহ তাহাতে আপত্তিও করিয়া থাকিবে "না, উহার

ছেলে পিলের খরচ অনেক।" বুঝি সন্তানাদি থাকিলে ধনী হওয়ার কিছু হানি হয়।

স্বাধীন হইবার ইচ্ছা বিবাহ না করিবার প্রধান কারণ। বিশেষতঃ কেহ কেহ এরূপ আত্মসুখাভিলাষী ও আত্মচ্ছন্দানুবর্ত্তী আছে যে, তাহারা কোন প্রকার বাধাই সহিতে পারে না; এমন কি, জামার বন্ধক বোতামও তাহাদের পক্ষে শিকল বেড়ী স্বরূপ।

অবিবাহিত লোক উৎকৃষ্ট বন্ধু উৎকৃষ্ট মনিব ও উৎকৃষ্ট ভৃত্য হইয়া থাকে, কিন্তু সকল সময়ে উৎকৃষ্ট প্রজা নহে; কারণ তাহারা অতি অল্প কারণেই পলাইয়া যায়, এবং অধিকাংশ পলাতক লোকই অবিবাহিত। যাজক দল অবিবাহিত থাকাই ভাল, কারণ যাহার সাংসারিক ব্যয় অধিক, সে কখন অধিক খয়রাত করিতে পারে না। জজ ও মাজিষ্ট্রেটদিগের পক্ষে বিবাহ ও অবিবাহ দুইই সমান, কারণ যে সকল জজ মাজিষ্ট্রেট কাণপাতলা ও ঘুসখোর তাহাদের চাকর আবার স্ত্রী হইতে পাঁচগুণ মন্দ। সৈনিকদের পক্ষে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, উপদেশ সময়ে প্রধান সেনাপতিরা সৈনিকদিগকে তাহাদের স্ত্রীপুত্রদিগের বিষয় মনে পড়াইয়া দেয়। তুরস্ক সৈনিকেরা বিবাহে অতিশয় ঘৃণা করে, তজ্জন্যই তাহারা অতিশয় নীচপ্রকৃতি।

স্ত্রীপুত্র থাকিলে মানুষের মন অনেক নরম হয়। যদিও অনেক সময়ে অবিবাহিত লোকদিগকে পরোপকার করিতে দেখা যায় বটে, সে কেবল তাহাদের অন্যান্য ব্যয় অনেক অল্প বলিয়াই জানিবে। সময়ে সময়ে তাহাদের হৃদয় এত নির্দ্দয় ও কঠিন হয় যে তাহা কেবল বিধর্ম্ম দণ্ডধরদিগের পক্ষেই শোভা পায়। ইহা কেবল তাহাদের মনে স্নেহভাব অতি অল্প বার উদিত হয় বলিয়াই হইয়া থাকে। গম্ভীর প্রকৃতি লোকেরা দেশীয় রীতি অনুসারে চলিয়া থাকেন সুতরাং সচরাচর তাঁহাদিগকে অনুকূল ও প্রণয়-বান্ ভর্ত্তা হইতে দেখা যায়। দেখ ইউলিসিস্ অমর হওয়া অপেক্ষাও বৃদ্ধা স্ত্রীকে লইয়া থাকা শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়া ছিলেন।

সতী স্ত্রীলোক প্রায়ই অহঙ্কৃত হয় ও আপন মতই মত বিবেচনা করে; বোধ হয় তাঁহাদের সতীত্বাভিমানই ইহার প্রধান কারণ। যদি স্ত্রীলোকে স্বামীকে বিজ্ঞ বলিয়া জানে তবে সে নিশ্চয় সতী ও স্বামীর বশীভূত হইবে, কিন্তু স্বামীকে সন্দিহান দেখিলে কখনই তাহাকে বিজ্ঞলোক বিবেচনা করিবে না। পত্নী যুবাদিগের বারনারী, প্রৌঢ়দিগের সহচরী ও বৃদ্ধদিগের ধাত্রী স্বরূপ; অতএব কখন্ বিবাহ করা উচিত এ বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইতে পারে। যিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন তিনি এক জন বিজ্ঞ লোক। তিনি বলেন "যুবা ব্যক্তির এখনও সময় হয় নাই," "বৃদ্ধের সময় গত।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় মন্দ

পুরুষের ভাগ্যে ভাল স্ত্রী যুটে; বোধ হয় এরূপ স্বামীরা সময়ে সময়ে দুই একবার যে সদয় ব্যবহার করে সেই সদয় ব্যবহার অধিকতর মূল্যবান বিবেচনা করিয়াই হউক, অথবা আপন সহিষ্ণুতা দেখাইবার জন্যই হউক অসৎ-স্বভাব স্বামীর নিকট স্ত্রীলোকে শান্তভাব ধারণ করে। কিন্তু যদি তাহারা বন্ধুবান্ধবের অমতে নিজে মন্দ স্বামী মনোনীত করে তবে নিশ্চয়ই আপন মূর্খতার ফল আর অধিক কষ্টকর না হয় এই জন্য স্বামীর দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া থাকে।

সংসার।

(১[illegible] বৈশাখ।)

নিশাচর মায়া সম দেখি এ সংসার,
এই দেখি এক ভাব পরক্ষণে আর।
শারদ-প্রদোষ-নভ-বিচিত্র শরীর।
চলদল-দল যেন সতত অস্থির।
অনাদি অনন্ত কাল নমস্কার করি,
ক্ষমতা চিন্তিলে ভাবি কে বিধি কে হরি।
অচিন্ত্য প্রভাব তব অসংখ্য আকার,
প্রতি অঙ্গে বিসম্বাদ একি চমৎকার।
ধন্য ধন্য মায়া তব না দেখি এমন,
কি ছার রাবণ ইন্দ্রজিত বিভীষণ।
যতনে বর্ণিয়া মহীরাবণ চতুর
বৃথা গর্ব্ব এ তোমার বাল্মিকী ঠাকুর।
ওই দেখ, দেখ দেখ জন্মিল কুমার
আনন্দে পূরিল পুর জুড়ালো সংসার।
উঠিল উৎসবধ্বনি বাদ্য গণ্ডগোল —
মঙ্গল শংখের শব্দে বাড়িল কল্লোল।
স্নেহ নীরে ঢল ঢল জনক নয়ন;
সহ উপজিল আশা সংসার বন্ধন।
অমৃত লহরীসম শিশুর ক্রন্দন,
শ্রবণে প্রবেশি মূর্চ্ছা করে রে হরণ।
ভুলিল প্রসব ব্যথা উপজিল বল;
স্নিগ্ধ হলো রক্ত আঁখি পেয়ে হর্ষ জল;
উৎসুক হইয়া মাতা ভাবে মনে মন
কতক্ষণে স্তন দিয়া জুড়াই জীবন।
আগন্তুক প্রতিবাসী আত্মীয় স্বজন,
সকলে প্রফুল্ল হেরি জুড়ায় জীবন!
ইন্দ্রিয় সন্তুষ্ট হয় হৃদয় মোহিত
আনন্দে ডুবিয়া রই শরীর সুখিত।
কিসলয় সম শিশু বাড়ে দিন দিন;
জনক জননী আশা ক্রমশঃ প্রবীণ।
হাত পা নাড়িয়া জাদু খেলে নিজ মনে
বংশের গৌরব চালে অঙ্গের ক্ষেপণে।
কাঁচা মুখে কাঁচা হাসি কাড়িলয় মন,
জলজ অন্তরে শোভে আরক্ত বরণ।
রাঙ্গা ঠোঁটে ভাঙ্গা কথা কত সুধাধরে;
বুঝি না কি বলে বীণা তবু প্রাণ হরে।
জুড়িয়া মায়ের কোল বেঁচে থাক ধন,
জনক জননী আশা করোরে পূরণ।
ও কি হলো, ফের ফের, কর দরশন,
"কি হলো কি হলো হায়" উঠিল ক্রন্দন
হায় রে নিষ্ঠুর কাল একি ব্যবহার
অভাগীর আশা বন্ধ করিলি সংহার।
হরেছ প্রাণের পতি ভেঙ্গেছ তরণী,
ফলক ধরিয়া তবু ভেসেছিল ধনী;
সেটুকু লইলি কাড়ি, পাষাণ সমান,
ডুবিল ডুবিল ওই হারালো পরাণ।
আহা তার আর্ত্তনাদে পুরিল হৃদয়
অপার সংসার জল; নারী বইত নয়।

একি রে তামাসা তোর একি খেলা খেল ;
দেখ আঁখি মেল কাল, ভয়ে মারা গেলি ।
কেন দিলে, দেখাইলে সুখের পুতলি,
কেন বা লইলে তার চক্ষে দিয়া ধূলি !
হাহাকার রবে বামা ধরণী লুটায়,
আজন্ম বৃত্তান্ত স্মরি বুক ফাটি যায় ।
এটী তাব, ওটী তাব, এখানে বসিত,
সেথায় খেলিত, ভাল এটী গো বাসিত ।
এত ক্ষণে ঘরে আসি বসিত দুয়ারে,
সুধাবরে মা মা বলে ডাকিত আমারে ।
মুছায়ে গায়ের ধূলা করিয়া চুম্বন,
কালি যে দিয়াছি তারে স্তন্য এত ক্ষণ ।
সেইত রয়েছে সব বসন ভূষণ,
কেন নাহি হেরি মোর জীবনের ধন ।
বাছার সামগ্রী তোরা বুকজুড়ান ধন
আজি কেন মনস্তাপ কর উৎপাদন ।
সেইত আইল রবি আলো ত্রিসংসার ;
মোর শয্যা ঘেরি কেন রলো অন্ধকার ;
উঠরে সোণার জাদু হলো কত বেলা ;
এসেছে ওদের ছেলে যাও কর খেলা ।
সেইত এসেছে সন্ধ্যা অন্ধকার তায়,
মা বলি ডাকিয়া কেন ঝুলনা গলায় ।
কি দোষ হয়েছে জাদু কি কষ্ট পেয়েছ,
কেনরে এখনো মোরে ভুলিয়া রয়েছ ।
এস না আমার বাছা আমায় বলনা
ধন প্রাণ দিয়া তোর পূরাই বাসনা,
সত্য কি ত্যজিলি মারে ওরে দাগাদার,
বলিয়া ডুকুরে উঠে করে হাহাকার ।
মনে হলো গর্ভাবস্থা প্রসব-যন্ত্রনা,
সত্য হতে কল্পনার দ্বিগুণ তাড়না ।
অজ্ঞান তন্দ্রায় রহে অভিভূত প্রায়
শব্দমাত্রে “ বাছা এলি ” বলি উঠি চায় ।
মোহ বশে হেরিবারে তুলিয়া নয়ন,
চারি দিক শূন্য হেরি নামায় বদন ।
স্থলে জলে শূন্যে প্রাণী অপ্রাণী স্থাবরে,
যে দিকে ফিরায় চক্ষু ভাসে আঁখি নীরে
শয়নে ভ্রমণে নিদ্রা আহার ব্যবহারে
আলাপ আমোদে আর মন নাহি সরে ।
ফুরালো সংসার সুখ ; মিছে আর বাস
সংসারে, হয়েছে তার জীবিত বিনাশ ।
সহজে অশক্ত নারী তাহে শোক-ক্ষীণ,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পুন হলো আঁখি হীন ।
সাহস হারালো, বুক ভাঙ্গিল এখন,
সংসার গহনে কিসে করে বিচরণ ।
চারি দিক্ অন্ধকার না চলে চরণ,
অনুমাত্র রশ্মি ছিল করিলি হরণ ।
বৈশাখে পতাকা যেন কম্পিত শরীর,
নিরন্তর হাহাকার সতত অধীর ।
আর না দেখিতে পারি বাহিরায় প্রাণ,
কে পারে বারিতে কাল তুমি বলবান ।
মরি মরি, এসো, শুন, হও অগ্রসর,
মানস হরিছে হেথা মোহন সুস্বর ।
নানা রবে নানা বাদ্য জুড়ায় শ্রবণ,
যুবক যুবতী কত হরষে মগন ।
সহজে ললিতকায়, আনন্দে উজ্জ্বল,
হাব ভাব সদালাপে করিছে বিকল ।
মনোরথ সলিলে সিঞ্চিয়া আশালতা,
এত কালে ফলবতী করিল বিধাতা ।
মিলিল যুবকে অনুরূপা সীমন্তিনী
অনুরূপ পতি পেয়ে পুলকিত ধনী ।
যেন পূর্ণিমার নিশা নিশানাথ পেয়ে
পুলকে হাসিয়া উঠে থাকিয়ে থাকিয়ে ।
সহজ সরল দৃষ্টি ত্যজিল নয়ন
এঁকে বেঁকে বিন্ধে পরস্পর প্রিয়জন ।

ভিন্ন ভিন্ন কৌতুক হতেছে ক্ষণে ক্ষণ ;
ক্ষণে বাড়ে অনুরাগ আনন্দিত মন।
সন্তোষে অন্তর পূরে ; অর্দ্ধ স্ফুট বাণী ;
আঁখির মিলনে সুখী কুমার কামিনী।
এ কিরে বিধির কাণ্ড ; এ কি চমৎকার ;
নিমিষে অচেনা মন মিশে একাকার।
কোথা হতে কি প্রণয় পশিল অন্তর,
মা বাপ হইল পর ; ছার অন্য পর।
কি দেখা হইল হায় ! কি মেলা মিলিল,
নবীন নীরদ হেরি বিজলি মাতিল।
সংসার সুখের স্থান এবে হলো জ্ঞান,
হেরিয়া হর্ষিত হই ; জুড়ায় পরাণ।
থাক উভে সুখে থাক না জান বিয়োগ
নিরন্তর হেরি যেন চিত্রাচন্দ্র-যোগ।
পাগল করিলি মোরে একি রে জঞ্জাল,
নিমেষে বিরূপ মোরে দেখাইছ কাল।
আহা যেন সূর্য্যক্লিষ্ট ছিন্ন কিসলয়,
মলিন হয়েছে ধনী ও কি প্রাণে সয়।
কেন কেন সীমন্তিনী লোহিত নয়ন ;
নিভৃত কবোষ্ণ অশ্রু বহে কি কারণ।
কেন বুক থেকে থেকে উঠিছে কাঁপিয়া
নিশ্চল হইয়া কেন, দেখ না চাহিয়া।
মুক্তবেণী কেন ধনী নাহি অঙ্গবেশ,
কেন হে সংসার কাজে না দেখি আবেশ।
উঠ উঠ, সারাদিন তাপিয়া তপন,
হীন-বল হয়ে করে স্বস্থানে গমন।
কর কর বেশভূষা বান্ধ লো কবরী,
প্রিয় ভেটিবারে চল আইল শর্ব্বরী।
ও কি ! কেন প্রিয় নামে বহে অশ্রুধার
শিরীষ কুসুমে কেন উপজিল ধার।
ধন্য রে শকতি তব অচিন্ত্য সময়,
তব বলে সুধা বিষ, বিষ সুধা হয়।

বুঝেছি ভেঙ্গেছে ধনি তোমার কপাল,
ঘটায়েছে পোড়া কাল বিষম জঞ্জাল।
অকালে মরিল পতি শুকালো বাসনা,
ঘুচিল ঐহিক সুখ ; ফুরালো কামনা।
জ্বলিছে নিয়ত তনু বিচ্ছেদ আগুনে,
দুর্ভাগ্য ; পেয়েছ স্বাদ ভুলিবে কেমনে !
হতেছে জীবিত নদী দিন দিন ক্ষীণ,
শুকালো প্রণয় হ্রদ, বহে কত দিন ;
পতি বিনা যুবতীর সংসার গহন
প্রতিপদে প্রকাশয় ভীষণ দর্শন।
কর্ণ মাত্রে রলো সুখ, দ্বন্দ-সুখ মনে,
থাকিল বদনে হাস, কুশল নয়নে।
মনোহর এ সংসার সুখের আগার
দুঃখময়, মরুসম ধরেছে আকার।
কেন্দোনা বলিতে নারি; লোকাচার বটে ;
কি বলে বুঝাব কিন্তু বুদ্ধি নাহি ঘটে।
একি বুঝাবার দশা বুঝায়ে রাখিব,
খসিয়া পড়িল ভিত্তি কোথা ঠেকা দিব।
বিদায় লইনু ধনি অক্ষম ভাবিয়া,
কালে ভাবি অনিবার যদি তোষ হিয়া।
হেথা দেখ মনসুখে ফিরিতেছে যুবা,
বলবীর্য্য উল্লাস মুখেতে শোভে কিবা।
প্রতিপদে প্রফুল্লতা হতেছে প্রকাশ,
অঙ্গের চালনে হের কত মনে আশ।
উদ্যোগ খেলিছে তার জিহ্বার চালনে,
সাহস বিরাজমান অঙ্গের ক্ষেপণে।
বিপদে বিপদ নাহি গণে ; নব রাগ।
উৎপাটে দ্বিরদ-রদ যদি হয় রাগ।
রোগ, শোক, পরিতাপ, বিবেক ভীরুতা
পাষাণ সমান বুকে ঠেকি হয় ভোতা।
অসাধ্য সাধিতে ধায় ; কষ্ট ডাকি লয়।
পরিশ্রমে বাড়ে স্ফূর্ত্তি, আলস্য বিলয়।

নিরানন্দ নাহি মনে, সদা হাস্য মুখ।
অবজ্ঞা-নিহত হয়ে দূরে যায় দুঃখ।
লভিয়া সংসার সহ নব পরিচয়,
সকল নূতন দেখি প্রফুল্ল-হৃদয়।
বাড়ায় প্রত্যেক বস্তু নব অভিলাষ,
গুণাগুণ নাহি গণে যদি হয় আশ।
নাহি ভাবে পরিণাম ; না ভাবে সাধন ;
কার্য্য সিদ্ধিমাত্রে সদা ধাইতেছে মন।
সহায় নাহিক খোঁজে, পর-উপদেশ ;
আপন বিশ্বাসে ধায় নাহি ভীতি-লেশ।
দুর্গম অজ্ঞাত মার্গ শুনি লাগে ডর,
আশ পাশ নাহি চায় হয় অগ্রসর।
ভীরু বলি উপহাসে, শুনি "সাবধান,"
দর্পে "রসো" বাক্যে নাহি কভু দেয় কাণ।
মনে করে কাল্পনিক সংসার সৃজন,
কল্পনায় নিজ পথ করে উদ্ভাবন,
কাঁটা খোঁচা নাহি দেখে, বিষম, বন্ধুর,
চলিতে উঁচুটে পড়েঅঙ্গ হয় চুর।
রিপু চয় বলে পথ ; নূতন আগ্রহ ;
ইন্দ্রিয় সহজ বন্ধু ফিরিতেছে সহ।
যুক্তি, কি দীর্ঘ-সূত্রতা, দূর দরশন,
স্বপনে নবীন যুবা দেখেনি কখন।
কর্ত্তব্য হইলে স্থির কে করে বারণ,
ইন্ধন থাকিতে অগ্নি সাধ্য কি দমন।
দেখিলে উদ্‌যোগ বাড়েঅন্য চিন্তা হরে,
আপনি উন্মত্ত নয় মাতায় পরেরে।
সফল হউক যুবা তব অভিলাষ ;
সকলের পূজ্য হও মনে মম আশ।
আহা মরি ; হেথা দেখ ! ভেঙ্গেছে শরীর,
অতিকষ্টে পদার্পণ, ফিরিছে স্থবির।
বিহার ফুরালো, গেল আহারের সুখ,
আলস্য-বিশ্রাম স্থান হইয়াছে মুখ।
নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, মোহ, অনুতাপ আর,
মিলিয়া দহেছে দেহ, করেছে অঙ্গার।
আপন শরীর বশ নহে আপনার,
নড়িতে বিপদ বোধ, মূর্চ্ছা বারেবার।
ভুঞ্জিয়া সংসার সুখ হয়েছে অরুচি ;
আশ্চর্য্য ! ছাড়িতে দেহ কিন্তু নাহি রুচি।
ইন্দ্রিয় বিকল হলো, রিপু বলহীন,
মানসমুকুর কালে হয়ছে মলিন।
আগু পাছু ভাবি হয় সতত অস্থির ;
ভয়ে হু হু করে প্রাণ চক্ষে বহে নীর।
সারহীন দেহ যেন পোড়া কাট খান ;
সে কেবল বিড়ম্বনা জুড়ে আছে স্থান।
সাহস লইয়া দেহ হইয়াছে নত ;
হলোরে মাটীর ঠাট মাটীতে প্রণত।
ছেড়েগেছে রস ; তেজ হলো অন্তর্ধান,
বিশ্লিষ্ট হয়েছে গ্রন্থি নাহি সহে টান।
আহা ! ওই বাহু দণ্ড শুষ্ক তরুখণ্ড,
অনাশে বিপক্ষ পক্ষ কোরে লণ্ডভণ্ড,
পাহাড় ভেদিয়া, তরু কোরে উৎপাটন,
অপার আপগা-জল কোরে সন্তরণ,
কঠোর ধরণী পিণ্ড কোরে বিদারণ,
অকর্ম্মণ্য মাংস পিণ্ড ঝুলিছে এখন !
অনাশে পাষাণ, লৌহ চিবায়ে ভেঙ্গেছে ;
শেষে অহঙ্কার সহ রদন খসেছে।
দিনৈকে যোজন কত করিয়া ভ্রমণ,
উদ্‌যোগ লইয়া খোঁড়া হয়েছে চরণ।
ঘন নিরানন্দ মেঘ কজ্জল বরণ,
ঘিরেছে স্থবির তব জীবন তপন।
আহা প্রতিপত্তি সহ কাটাইয়া কাল,
সংসারের হইয়াছ এখন জঞ্জাল !
আজ্ঞায় উঠেছে যারা আজ্ঞায় বসেছে,
এখন ফিরিয়া নাহি দেখে ; কাল গেছে।

দেবতা সদৃশ মুখ সংসার শোভন,
কদাকার পিণ্ডমাত্র হয়েছে এখন।
ঘৃণার্হ হইয়া হলে ভূমণ্ডলে বাস,
বিভীষিকা শিশুর, যুবক উপহাস;
আত্মীয়ের গলগ্রহ, পৃথিবীর ভার;
এ হেন হীনের দশা নাহি দেখি আর।
ঠেলেছে সন্তান, নাহি দেয় দরশন;
এস গো বিরতি সতী সেবসে এখন।
প্রণমামি পুরাতন; করি হে মনন,
অন্তে লভ শ্রীহরির চরণ-দর্শন।

ফের দেখ; মনোহর নগর শোভিছে,
কত মত্ত নরনারী আনন্দে ফিরিছে।
অভাব জানে না কভু লক্ষ্মী অধিষ্ঠান;
আতুরে বিলায় কৃপা দীনে অন্নদান।
কোথাও সুতন্ত্রী বীণা বাজিছে মধুর;
কোথাও নর্ত্তকী পদে রণিছে নূপুর।
কোথাও মনের হর্ষে যুবা গায় গান;
আনন্দে নাচিছে শিশু কাড়ি লয় প্রাণ।
সুরমা সৌরভ ছুটে নাসিকা জুড়ায়।
আকিঞ্চন, উদ্‌যোগ ফিরিছে পায় পায়।
দেখ দেখ! ভয়ে আর না পারি দেখিতে,
ঘিরিল ভীষণ শত্রু সেনা চারি ভিতে।
মার মার শব্দে-কর্ণ হইল বধির,
কোন্ প্রাণে দেখ দেখ দ্বিধা করে শির।
হাহাকার রবে বামাকুলের ক্রন্দন,
ভয়াতুর শিশুরবে পুরিল গগন।
সন্তান লইয়া কোলে ভয়ে পাগলিনী
বনদগ্ধা কুরঙ্গিনী ছুটিছে জননী।
কাহারো মরিল পতি কাহারো তনয়;
লইয়া সতীত্ব ধন মনে বড় ভয়।
বিচিত্র প্রাসাদ যত হলো ছার খার,
দেখিতে দেখিতে স্বর্গ নরক আকার।

পরিত্রাহি আর্ত্তনাদ, নাহি অন্যরব;
দুঃখের একাধিপত্য; পলালো উৎসব;
কাটা ছেঁড়া ভাঙ্গাচোরা নরনারী দেহ
ব্যাপিল নগর পথ, নাহি গণে কেহ।
পূতি গন্ধে ঘ্রাণ ফাটে; বাহিরে উদগার;
ধূ ধূ করে চারিদিক্ ভীষণ আকার।
থাকিয়া থাকিয়া বুক উঠিছে কাঁপিয়া;
হৃদয় শুকালো কণ্ঠ ধরিল চাপিয়া।
শৃগাল, কুক্কুর, গৃধ্র জোটে পালে পাল;
নগর শ্মশান হলো, হাঁরে দুষ্ট কাল!
শোকে ভয়ে কাঁপে কায়; চল চল চল;
উদ্ধারে অক্ষম; হবে থাকিলে কি ফল।

জুড়ালো জুড়ালো দেহ; ধন্য ইন্দ্রজাল;
এ হেন দেখিয়া তোরে কে দুষিবে কাল;
বিস্তৃত বট বিটপী সম পরিবার
প্ররোহ প্রসবি নিত্য বাড়ায় আকার।
সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে বল; দেখিতে দেখিতে,
বহু আশে আসে জীব আশ্রয় লইতে।
বিমুখ না হয় কেহ; অনন্ত শরীর;
জুড়ায়ে তাপিত দেহ চিত্ত করে স্থির।
নিরন্তর রম্য রবে পুরিত অন্তর;
কে কোথা বসিছে কেহ না লয় খবর।
স্বয়ং সহিয়া তাপ বাঁচায় অন্যেরে;
অকাতরে পর ভার বহে শিরোপরে।
উল্লাসে হতেছে অঙ্গে বেপথু সঘনে,
দৃষ্টি মাত্রে হরে আঁখি লোটাই চরণে;
যথা ইচ্ছা তথা থাকি মনে স্থির রয়
তাপিত হইলে আসি লইব আশ্রয়।
কিন্তুরে বিষম কাল এ কিরে করেছ,
দেখিতে দেখিতে তার মূল উপাড়েছ।
পিষেছ শরীর তার হরেছ বিভব,
ভেঙ্গেছ প্ররোহ গুলি ছিঁড়েছ পল্লব।

স্কন্দ-ছিন্ন বিটপ ফেলেছ ইতস্তত,
তপন পাইয়া কাল করিছে তাপিত ;
মলিন হইয়া মুখ হইয়াছে নত,
বিমুখ পথিক দেখি যেন লাজ হত।
ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদ্র কীট জোটে অনিবার,
তেমন বিশাল তনু হলো ধূলিসার।
ক্ষণ পরে আর তার চিহ্ন মাত্র নাই,
প্রাচীন পথিক মুখে নাম মাত্র পাই।

দেখ হেথা, ধন্য শিশু পুণ্যের প্ররোহ,
মনের আনন্দে সদা প্রফুল্লিত দেহ।
জনক জননী কোলে সুখেতে খেলিছ,
নবোদ্ভিন্ন কুবলয় আলো করি আছ।
ওষ্ঠের স্ফূরণ মাত্রে ধায় দাসী দাস,
ইঙ্গিতে বুঝিয়া লয় কি হয়েছে আশ।
হাতে হাতে ফিরিতেছ ; না ছুঁলে ধরণী,
সোণার পুতুল যেন হেরি জাদুমণি।
যতন তপন তাপে নূতন মুকুল
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে, হরে নয়ন পুতুল।
স্নেহ জলে সিক্ত ; যেন শোভে ইন্দীবর
প্রভাতে তুষার ধৌত স্নিগ্ধ কলেবর।
সহজে বালক বট ; কিন্তু বাছা ধন,
নিরন্তর হাস্য মুখ ভুলেছ ক্রন্দন।
ভূষিতে সামগ্রী কত যোটে ভারে ভার,
যাচিতে সংসারে কিছু না দেখি তোমার।
থাক থাক সুখে থাক করি আশীর্ব্বাদ,
নীরোগ হইয়া পুর জননীর সাধ।

কেরে ; কেন হেথা বাছা লুটিছ ধূলায়,
কেন রে কোমল আঁখি জলে ভাসি যায়।
অন্ন নাই ক্ষীণ কুক্ষি অঙ্গে নাহি স্নেহ ;
কে তুমি কাহার বাছা পরিচয় দেহ।
মা মা রবে পড়ি কেন করিছ ক্রন্দন।
কোথায় জননী, কেন না দেয় দর্শন।
কেন তোর পিতা আসি নাহি লয় তুলে।
আয় রে সোণার জাদু আয় করি কোলে।
বুঝিরে দুর্ভাগ্য ছেলে খেয়েছ জননী,
জনক হরেছে লীলা ; হয়েছে ধরণী
শূন্যময় অন্ধকার তমিস্রা রজনী,
এই যে দুলিতে ছিলে আনন্দের কোলে ;
জুড়ালে জীবন জাদু আধ আধ বোলে।
ধন্যরে করাল কাল প্রভুতা দেখালি।
এ যে বাঘিনীর বাছা কেমনে হরিলি।
দেখরে চাহিয়া মুখ মলিন হয়েছে ;
শৈশব সহজ স্ফূর্ত্তি ছেড়ে পলায়েছে,
শুকাইলি স্নেহ বারি ; কি করেছ মনে,
আকুল শফরী আর খেলিবে কেমনে ;
দেখ রে চাপল্য তার ছাড়িয়া শরীর
ধরেছে কোমল আঁখি করেছে অস্থির।
মনের বাসনা যত মনে হলো লয়,
কি ভাবি গোলাব কুঁড়ি টিপে কর ক্ষয়।
নাশিলি নূতন মন সদ্‌গুণ পালক,
করিলি ময়ূর শিশু কুক্কুট শাবক।
মাতা না থাকিলে ঘরে যাইবারে বন
বলেছে চানক্য নাহি বুঝি প্রয়োজন।
বোঝেনি দেখেনি কবি মাতৃহীন দশা,
সংসার অরণ্যতার ! না চলে ভরসা।
অভিমান মনে রয় প্রকাশ না হয়।
পায় রে মোহন কোপ আঁখিতে বিলয়।
কোথায় আহার করে, কোথায় শয়ন,
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা নাহি করে কোন জন।
সতত চকিত চিত সাহস-বিহীন
চোরের সমান ফেরে কাঁদে অনুদিন।
অন্যে করে অপরাধ ভয়ে কাঁপে কায়,
বোবার মাথায় ভার পাছে রে চাপায়।

অস্তগত হলো রবি আইল রজনী.
আপন তনয় ডাকি লইছে জননী।
হরে গো অঙ্গের ব্যথা সস্নেহ চুম্বনে।
নির্ভয়ে ঘুমায় শিশু প্রফুল্ল বদনে।
এ যে রে অভাগা ছেলে কোথায় জননী,
ভয়ে কাঁপে দেখি সন্ধ্যা তমিস্র বরণী,
প্রকৃতি ঢাকিল ক্রমে মলিন বসনে,
প্রসর অভাবে দৃষ্টি প্রবেশিল মনে।
স্নেহময়ী জননীর আকৃতি হেরিয়া,
ফুকুরে কাঁদিয়া উঠে মা, মা বলিয়া।
ভাসিয়া জনক হস্ত করে প্রসারণ,
শূন্যে বাড়াইয়া হাত করিছে ক্রন্দন।
দেখিতে দেখিতে আর দেখিতে না পায়
বোঝে না অবোধ ছেলে মিটি মিটি চায়
নিভৃত হইল লোক ; গভীর রজনী,
বুকভাঙ্গা ঝিঁ ঝিঁ রবে পুরিল ধরণী।
নিদ্রা নাই চক্ষে ; কিন্তু ভয়ে স্পন্দহীন,
সকাতর মা মা রব কণ্ঠে হয় লীন।
দেখ ; বক্ষ অপ্রশস্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
বুঝিরে ফাটিয়া যায় থাকিয়া থাকিয়া,
কান্দিয়া অসুখে নিশা হলো অবসান,
হলো রে দুধের ছেলে প্রবীণ সমান।
বলিতে পরুষ বটে না বলিলে নয়
গ্রাসহ উহারে কাল কষ্ট কর ক্ষয়।

আহা কি ভোজের বাজী খেলিছ হেথায়,
সম্ভ্রমে চকিত চিত ; লোমাঞ্চিত কায়।
ঐশ্বর্য্য লালিত ধন্য পুরুষ প্রধান,
চরণে লুটিছে সুখ ; যাচক সম্মান।
সংসার বাসনাধীন ; দুর্ল্লভ দর্শন,
দেব কিবা নর বলি ভাবে কত জন।

দ্বারীর প্রহার দ্বারে বিলায় গৌরব,
বধির করিছে কর্ণ জয় জয় রব।
ধন মদে মত্ত সদা ; ধরা শরা গণে ;
প্রাচুর্য্যে সমান জ্ঞান মৃত্তিকা কাঞ্চনে।
অপূর্ব্ব প্রাসাদ যেন কুবের ভবন,
যে দিকে ফিরাই আঁখি কাড়ি লয় মন।
সাদা, কাল, পীত, নীল, হরিত বরণ,
ত্রিকোণ, বর্ত্তুল আদি বিচিত্র গঠন ;
কতমত কত দ্রব্য দেখিতে সুন্দর,
আনিয়া জোটায় নাকি ভরিয়া সাগর।
দুরাক্রম্য বিন্ধ্যাচল-শির নামাইয়া,
অমূল্য রতন না কি আনিল কাড়িয়া।
উদ্যানে রোপেছে শুনি পুষ্প পারিজাত ;
দ্বারে আছে হরিপ্রিয়া যোড় করি হাত।
একবার হলে বার দর্শন আশায়
আলু থালু ধায় লোক ডাকে আয় আয়।
উঠিল রথের গোল হুড়ো হুড়ি তাড়া ;
ওই দেখ ওই দেখ পড়েগেল সাড়া।
নকীব ফুকারে ; বাদ্য বাজে সুমধুর,
গাড়ি, ঘোড়া, লোক জন ধাইছে প্রচুর।
সম্মুখে দৌড়ায় দাস, দর্পে দেয় তাড়া,
ভয়ে ভীত ধায় লোক পেয়ে মাত্র সাড়া,
বিচিত্র বসন বেশ ; শোভা অনুপম।
গোলাবে নিবারে ধূলি ; কুঙ্কুমে কর্দ্দম।
মহার্হ বসনে রথ্যা করে আবরণ।
কত শত অভিমানী নোয়ায় বদন।
প্রণাম আশীষ আশে অসংখ্য মানব
ব্যাকুল হইয়া করে অহম্পূর্ব্ব রব।
দৈববশে যথা যথা পড়িছে কটাক্ষ,
গৌরব, সন্তোষ বৃষ্টি হৃষ্ট করে বক্ষ।

কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।

অবোধ-বন্ধু।

" করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী ॥"

৩য় ভাগ] জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৬ সাল। [২য় সংখ্যা।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় অধ্যায়।

নেপোলিয়ন সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইবার তিন বৎসর পরে ফ্রান্স দেশে ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লব নামক তুমুল কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছিল। সেই ঘোরতর ব্যাপারের ফলিতার্থ এই যে, বহুকাল পূর্ব্বে ফ্রান্সের শাসনকার্য্য ইউরোপীয় অন্যান্য জনপদের শাসনপ্রণালীর ন্যায় সর্ব্বজনবিজ্ঞাত নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী অনুসারে নির্ব্বাহিত হইত, প্রজাবর্গের ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সম্মতি গ্রহণ না করিয়া রাজা করগ্রহণ করিতেন না, গুরুতর রাজনিয়ম সকল তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে সংস্থাপিত হইত না, সন্ধিবিগ্রহাদি বিষয়ে নরপতিকে তাঁহাদিগের মতামত জিজ্ঞাসা করিতে হইত, ইত্যাদি। কিন্তু কালক্রমে রাজার ক্ষমতা ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, চতুর্দ্দিকের বিপক্ষবর্গ ফ্রান্সের সর্ব্বনাশচেষ্টা মুহুর্মুহু আরম্ভ করাতে, দেশের তাবৎ লোকে স্বদেশ রক্ষার প্রতি মনোযোগী হইয়া, রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতেছে কি হ্রাস হইতেছে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখে নাই; বিশেষত একাদিক্রমে অনেক ফরাসি নরপতি সর্ব্বাংশে রাজার যোগ্য নানা গুণে ভূষিত হইয়াছিলেন বলিয়া রাজকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধিনিবন্ধন প্রজালোককে বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই; বরং অনেক প্রকারে দেশের উন্নতি হইয়া আসে, কৃষি বাণিজ্য অতি বিস্তার হইয়া উঠে, সরস্বতী রাজসভায় পরম সমাদর প্রাপ্ত হইয়া ফ্রান্সরাজ্যের প্রতি সাতিশয় বাৎসল্যভাব ধারণ করেন, তাঁহার কৃপাকটাক্ষ দ্বারা, কি বিজ্ঞানশাস্ত্র কি সাহিত্য, বিদ্যার তাবৎ শাখা প্রশাখার এতাদৃশ উজ্জ্বলতা ও ফরাশি ভাষার এতাদৃশ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠে যে, ক্রমে ইয়োরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবীতে ফ্রান্স

রাজ্যের অধিরোহণ করিবার সম্ভাবনা হয়। তদ্ব্যতীত, ফ্যাশি জাতির ন্যায় সাহসিক জাতি ভূভারতে আর দ্বিতীয় নাই; চতুর্দ্দিকে শত্রুদলে পরিবেষ্টিত বলিয়া ইহাকে অগত্যা যুদ্ধ বিদ্যার ভয়ানক অনুশীলন করিতে হইয়াছে; তদ্দ্বারা ইহারা যুদ্ধবিষয়ে যেরূপ সুপটু, তেমনি অকুতোভয়। সংগ্রাম যেন ইহাদিগের আমোদের মধ্যে। ইন্দ্রিয়-সেবাতে একতান এবং ভোগসুখে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য থাকিলেও, বিলাস ও সৌখীনতার একশেষ করিলেও, ইহাদিগের যুদ্ধানুরাগ নিবৃত্ত হয় না। ইহারা সুকোমল শয্যা, সুশান্ত সংসার-সুখ, চমৎকার বিদ্যানন্দ, রমণীয় পল্লীগ্রাম বাস, সুমধুর প্রেমামৃত এ সমস্ত সুকুমার ব্যাপারের মধ্যস্থল হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দুরন্ত তরবারিধারার সম্মুখীন হয়। এই গুণ থাকাতে সুনিপুণ পরাক্রান্ত নরপতিকে ইহারা দেবতার ন্যায় ভক্তি করে এবং তাঁহার অধীনে যুদ্ধানুরাগ চরিতার্থ করিতে পাইলে আর কিছু চায় না। এই সকল কারণ একত্র হইয়া ফ্রান্সের রাজার ক্ষমতা ক্রমে অনিয়ন্ত্রিত করিয়া আনিয়াছিল; কিন্তু এতদ্দ্বারা বিশেষ দুর্ঘটনা এই ঘটিয়াছিল যে, রাজসভা-সঞ্চারি ব্যক্তিদিগেরও এই সঙ্গে প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইয়া উঠে। যে সকল ধনাঢ্য বা উচ্চপদাধিরূঢ় ব্যক্তি সর্ব্বদা রাজার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন, তাঁহাদিগের পক্ষে রাজার প্রিয়পাত্র হইবার অনেক সুযোগ হইত। তাঁহারা রাজার প্রসাদস্বরূপ নানা মানসম্ভ্রম, তালুক, জায়গীর প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। নরপতির অনুগ্রহ-ভাজন হইলে যে কত সুখসম্ভোগ হইত, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। সেই সকল সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে নিয়মিত রাজস্ব দিতে হইত না; সাধারণ প্রজাবর্গের উপর অশেষবিধ আধিপত্য করিতে পাইতেন; তালুকের রাইয়তদিগের অর্থশোষণ পূর্ব্বক সহরে আসিয়া বাবুগিরি করিতেন, কত ছল, কত অসীলা কত বাব ধরিয়া শ্রমজীবী ইতর লোকদিগের মেহনতের কড়ি নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেন। যাবৎ রাজার কৃপাদৃষ্টি থাকিত, তাবৎ ঈদৃশ অসংখ্য প্রকার যথেচ্ছাচার করিলেও দায়গ্রস্ত হইতেন না। যতদিন সুযোগ্য নরপতির হস্তে রাজ্যভার সংস্থাপিত থাকিত, কিম্বা নরপতি অকর্ম্মণ্য হইলেও যতদিন কর্ম্মদক্ষ সুনিপুণ বিচক্ষণ কোন ব্যক্তি রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে পাইতেন, তত দিন পূর্ব্বোক্ত গুরুতর নানা দোষ সত্ত্বেও কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই। সুপাত্র পুরুষেরাই রাজার প্রিয়পাত্র হইতেন, সম্ভ্রান্ত লোকদিগের দ্বারা সামান্য লোকের প্রতি অত্যাচার হইলে যথাযোগ্য শাস্তিবিধান হইত, অপাত্রে রাজকোষ বর্ষণ হইত না এবং শাসনপ্রণালীতে নানা ত্রুটি থাকিলেও প্রজাসাধারণের বিশেষ কোন ক্লেশ হয় নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চতুর্দ্দশ লুই নামক ভুবনবিখ্যাত নরপতির পরলোকের পর সুযোগ্য রাজার অন্তর্দ্ধান হইল, উপযুক্ত রাজমন্ত্রীও অপ্রাপ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার পৌত্র পঞ্চদশ লুই

যৎপরোনাস্তি অকিঞ্চিৎকর রাজা মাত্র হইয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই, দুষ্কর্ম্মান্বিত এবং আনুষঙ্গিক অমিতব্যয়ী হইয়া দেশের আয়ব্যয় বিষয়ে ক্রমে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে লাগিলেন এবং তৎপরীহারার্থ প্রজাসাধারণের উপর অতি দুঃসহ অত্যাচার হইতে লাগিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ক্রমে ততোধিক অবিমৃষ্যকারী ও কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত হইয়া উঠিলেন; রাজমন্ত্রীরা ক্রমেই চারি দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন এবং কাল সহকারে ঘোরতর এক বিসংষ্ঠুল কাণ্ড ঘটিবার সূত্রপাত হইয়া উঠিল। ইহাই ফ্রান্‌স দেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের এক প্রধান কারণ। অন্যান্য অপ্রধান যে দুই এক কারণ উহার সহকারিতা করিয়াছিল, তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

ইয়োরোপে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার হওয়া অবধি রাজা ও পাদ্রি দিগের বরাবর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা হইয়া আসিয়াছিল। রাজা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত পৃথিবীর রক্ষাকর্ত্তা স্বরূপ, সুতরাং তাঁহার কথা অমান্য করিলে শুদ্ধ যে ইহকালেই শাস্তি হইবে এরূপ নহে; পারত্রিক যন্ত্রণাও তাহার সহিত সংসৃষ্ট আছে। তিনি ধরাধামে অবস্থিত দেবতার প্রতিনিধি স্বরূপ, তাহার মাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়, তাহার প্রভাব অনিবার্য্য, তাহার আজ্ঞা অনুল্লঙ্ঘনীয়; অগত্যা তাঁহাকে সময়ে সময়ে প্রখরতা অবলম্বন করিতে হয়, তাঁহাতে প্রজাবর্গের কিছু ক্লেশ হয়, কিন্তু সেই ক্লেশে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতে নাই; তাঁহার আচরণকে অত্যাচার জ্ঞান করিতে নাই; বিনীতভাবে সে সমুদায় গ্রহণ করিতে হয়; যদি তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ পদবী প্রদান করা ভগবানের অভিপ্রেত না হইত, তাহা হইলে তিনি কখন ঈদৃশ অপ্রতিহত সামর্থ্য তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতেন না। অতএব রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা কিংবা রাজার ক্ষমতা লোপ করিবার চেষ্টা পাওয়া অতীব গর্হিত কর্ম্ম। এই সমস্ত মত পাদ্রিরা যত্নপূর্ব্বক তাবৎ লোককে শিক্ষা দিতেন। এ গুলি যেন খ্রীস্টধর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপ ছিল; সুতরাং ভক্ত খ্রীষ্টানমাত্রেই এ সকল কথার প্রতি যার পর নাই আস্থা প্রদর্শন করিতেন এবং এ অংশে যাহার ন্যূনতা থাকিত অর্থাৎ যিনি রাজকীয় ক্ষমতার সেরূপ মহিমা স্বীকার করিতেন না, তিনি নাস্তিক ও অর্ব্বাচীন বলিয়া পাচজনের নিন্দাভাজন হইতেন। এই প্রকারে পাদ্রিরা রাজপদের আনুকূল্য করিয়া নরপতির নিকট অশেষবিধ অনুগ্রহ লাভ করিতেন। তাঁহাদিগের নানা সুবিধা ভোগ হইত, নিয়মিত রাজস্ব দিতে হইত না, জমীদারদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে হইত না, বার্ষিক বৃত্তি ইত্যাদির বিলক্ষণ ঘটা ছিল এবং সচ্ছন্দে পরম সুখে দিনপাত করিবার বিশেষ সুযোগ হইত। কিন্তু খ্রীস্টশাকের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে শাস্ত্রচর্চ্চা সমধিক প্রবল হইয়া উঠাতে এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি ঘটিবাতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা সঞ্চার হইবার সূত্রপাত হয়। যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ে

সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন, তাঁহারা তত পুরাতন তত অসংবদ্ধ, তত উন্মত্তপ্রলাপসদৃশ ধর্ম্মপ্রণালীর প্রতি আর ভক্তিভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। বিজ্ঞানের আলোক দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত চিত্তক্ষেত্রে বাইবলের অন্ধকারাচ্ছন্ন অসংগত অনেক কথা লয় প্রাপ্ত হইয়া গেল। বিশেষত ফ্রান্সে এই স্রোত যেমন প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, তেমন আর কুত্রাপি নহে। যে স্বভাবসিদ্ধ অকুতোভয়তা-গুণে তাহারা সংগ্রামে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়াছে, তাহারি প্রভাবে সকল বিষয়ে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার অভ্যাস তাহাদিগের অসাধারণ গুণ। তাহারা ইষ্টানিষ্ট আশঙ্কা করিয়া বুদ্ধির প্রসর বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না যে দিকে বুদ্ধি ধাবমান হয়, সেই দিকেই বুদ্ধিকে চালাইয়া দেয়। চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত না করিলে যে সকল মত কথঞ্চিৎ বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিলে সে গুলি একেবারে অশ্রদ্ধেয় ও উপহাসাস্পদ হইবার সম্ভাবনা। এই কারণে নাস্তিক্যবুদ্ধি ফ্রান্স দেশে ক্রমে বহুলপ্রচার হওয়াতে নানা বিষয়ে অনেক প্রকার নূতন নূতন মতের সৃষ্টি হইল। পাদ্রিদিগের প্রতি নিষ্ঠা রহিল না, সুতরাং রাজকীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধাচরণে প্রত্যবায় জন্মে, এ বুদ্ধিও তৎসঙ্গে অন্তর্হিত হইল; যেহেতু সে সংস্কারের মূলীভূত কারণ খৃষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস। আর যাঁহাকে রাজকার্য্যে নিতান্ত অপটু, একান্ত ব্যসনাসক্ত, ও দুষ্কর্ম্মের সাগরে নিমগ্ন হইতে দেখিতেছিল, তিনি ভগবানের প্রেরিত রক্ষাকর্ত্তা ইহা চক্ষু কর্ণ সত্ত্বে কি রূপে বিশ্বাস হইতে পারে? সুতরাং তৎকৃত অর্থশোষণ বা তাঁহার পারিষদবর্গের দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রজাপীড়ন ক্রমেই অসহ্য হইতে লাগিল, এবং লোকের মন রাজপদের প্রতি ক্রমেই অপরক্ত এবং রাজ্যের বর্ব্বর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি ক্রমেই বিরূপ হইয়া উঠিল।

পূর্ব্বাবধি এই সকল ও অন্যান্য অনেক কারণ একত্র হইয়া ফ্রান্স রাজ্যে দুরন্ত উৎপাত ঘটিবার সম্ভাবনা সংঘটিত হইয়া থাকে। পরে যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ষোড়শ লুই নামক রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন রাজকোষ একেবারে নিঃশেষ হওয়াতে এবং প্রজাদিগকে বলপূর্ব্বক আর অধিক রাজস্ব দিতে আজ্ঞা করা অপরামর্শ স্থির হওয়াতে, ফ্রান্সের 'ষ্টেটস্ জেনরল' নামক প্রতিনিধিসমাজ আহ্বান করিবার সংকল্প হইল। বহুকালাবধি এই প্রতিনিধিসমাজের কোন সংবাদ লওয়া হয় নাই; অতিপূর্ব্বকালে এই সমাজের উপর রাজস্ব বন্দোবস্ত করিবার ভার ছিল; ইহার মত না লইয়া রাজা কর গ্রহণ করিতেন না; কিন্তু ফ্রান্সের রাজারা বলপূর্ব্বক প্রতিনিধি সমাজকে সেই অধিকার-ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রায় দেড় শ বৎসরের পর, যার পর নাই গরজ হওয়াতে যখন সেই প্রতিনিধি সমাজকে পুনর্ব্বার আহ্বান করা হইল, তখন ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লব নামক প্রকাণ্ড

নাটকের প্রস্তাবনা আরম্ভ হইল। প্রজাদিগের তরফ যে যে প্রতিনিধি এই সমাজে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এক নূতন প্রকারের লোক; তাঁহারা প্রায় খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন না, রাজ পদের তাদৃশ গৌরব করিতেন না, জমীদারেরা রাইয়তদিগকে ক্লেশ দিয়া নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়, ইহা সহিতে পারিতেন না, শুদ্ধ রাজার হুকুমে কেহ কারারুদ্ধ হয় ইহা তাঁহাদিগের ভাল লাগিত না; প্রজালোকের মাথার ঘাম পায়ে পড়িয়া যে টাকা কড়ি উপার্জ্জন হয়, রাজকোষভুক্ত হইয়া তাহা বারাঙ্গনার লোভহুতাশনে আহুতি স্বরূপ হয়, অথবা অকর্ম্মণ্য জঘন্য চাটুকারদিগের সুখসম্ভোগে পর্য্যবসিত হয়, এ বিষয়ে তাঁহাদিগের ঘোরতর বিদ্বেষ ছিল। রাজকার্য্য সংঘটিত এ সমস্ত দোষ যাবৎ না উন্মূলিত হয়, তাবৎ তাহারা কপর্দ্দক মাত্রও দিবে না প্রতিজ্ঞা করিল। প্রজার নিকট এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা যিনি কখন শুনেন নাই, সেই রাজার পক্ষে এ সকল বিষয়ে সম্মত হওয়া কাপুরুষের কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান হইল। বিশেষত ষোড়শ লুই অতি শান্ত শিষ্ট লোক ছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাব কি তাহা তেমন বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং যে কাল উপস্থিত, তদনুরূপ আচরণ না করিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। প্রতিনিধিগণ স্বাভিমত-সিদ্ধি বিষয়ে যত ব্যাঘাত দেখিতে লাগিল, ততই তাহাদিগের জেদ বাড়িতে লাগিল। রাজা ও প্রজা উভয়ের মধ্যে ক্রমেই অবিশ্বাসের সঞ্চার হইতে লাগিল এবং পরিশেষে কাহাকেও রাজা করিয়া রাখিলে ভদ্রস্থতা আছে কি না লোকের এ প্রকার সংশয় হইল। অনেকে স্থির করিল যে রাজপদ উঠাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য; যিনি প্রকৃতরূপে যোগ্য হইবেন, তাঁহাকেই রাজকীয় কার্য্যের ভারার্পণ করা যাইবে; এই বন্দোবস্তই প্রজালোকের পক্ষে শ্রেয়স্কর। এই সংস্কার পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া উঠাতে ষোড়শ লুইর প্রাণদণ্ড হইল এবং ফ্রান্স দেশে প্রজাতন্ত্র নামক শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত হইল। নেপোলিয়ন উল্লিখিত তুমুল কাণ্ড সমস্তের সময় একজন সামান্য সেনাপতিমাত্র হইয়া রহিলেন। এ সকল বিষয়ে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করিতে পান নাই, কেবল মনোযোগ সহকারে সমস্ত ঘটনা অবলোকন করিতে লাগিলেন। রাজপদ উঠাইয়া দিবার পর ফ্রান্সে ঘোরতর দলাদলি চলিতে লাগিল, তৎকালে রবস্পিয়র নামক একজন প্রজাপক্ষের প্রতিনিধি ছিলেন; তিনি ও তাঁহার সহচরদিগের এই এক মত ছিল যে, যে কেহ রাজ পদ পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিবার প্রস্তাব করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড করিতে হইবে। এই রূপে অনেকের শাস্তি বিধান হইতে লাগিল। প্রাণ দণ্ডার্হ ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমে অধিক হইয়া উঠাতে, পূর্ব্বাবধি জল্লাদের কুঠারাঘাতে শিরশ্ছেদন করিবার যে পদ্ধতি প্রচলিত

ছিল, তাহা রহিত করিতে হইল। গিলটাইন নামক এক জন চিকিৎসক এক প্রকার যন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন, তাহার তলে কাহাকেও রাখিয়া কল টিপিয়া দিলে নিমেষ মাত্রে মুণ্ডপাত হইত। আবিস্কর্ত্তার নামানুসারে এই যন্ত্র গিলটাইন বলিয়া বিখ্যাত হইল। এক্ষণে সেই গিলটাইন যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হইল। রাজপক্ষপাতী ব্যক্তিদিগের দণ্ড বিধান করিতে করিতে উল্লিখিত রবস্পিয়র দল এরূপ উগ্রমূর্ত্তি হইয়া উঠেন যে, তাঁহারা নিজে রাজ্যশাসন সম্পর্কে যেরূপ ব্যবস্থা শ্রেয়স্কর বলিয়া জ্ঞান করিয়া রাখিয়া ছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথাটি কহিলেই তাহাকে তৎক্ষণাৎ গিলটাইন্ যন্ত্রসাৎ করা হইত। তাঁহাদিগের মতে যিনি মত দিতেন, তিনি জন্মভূমির বান্ধব, তাঁহাদিগের সঙ্গে অমত করিলেই ফ্রান্সের শত্রু, নরাধম, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া লোকের নিকট প্রচার করিয়া দেওয়া হইত। বিশেষত পারিসের যত ছোট লোক ছিল, রবস্পিয়র ও তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিরা তাহাদিগকে হাত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই গোমূর্খ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য জনসমূহ তৎকালে "স্বদেশ, জন্মভূমি, ফ্রান্সের স্বাধীনতা, তাবৎ লোকেই পরস্পর সমান, সকলেই পরস্পর সহোদরের ন্যায়" ইত্যাকার গুটিকতক লম্বা চোড়া কথা লইয়া উন্মত্ত হইয়াছিল। যে কেহ এই সকল কথা সম্বন্ধে যথেষ্ট মুখর হইতে পারিত, পাঁচখানা সাজাইয়া আড়ম্বর সহকারে বক্তৃতা করিতে পারিত, তাহারি প্রতি ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইত। পক্ষান্তরে, যে কেহ সে সকল কথার যথার্থতা বিষয়ে সন্দিহান হইত, কিংবা কহিত যে, "সকল লোক সমান কি রূপে, কারণ বুদ্ধি, বীর্য্য, নৈপুণ্য প্রভৃতি গুণে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়" ইত্যাদি; নির্ব্বোধ লোকে তাহারি প্রতি খড়্গহস্ত হইত। রবস্পিয়রের দলের এই সংস্কার ছিল যে, জনসমাজে প্রধান নিকৃষ্ট সম্পর্ক উঠাইয়া দিতে হইবেক, সকলেই স্বাধীন, কেহ কাহারো অপেক্ষা বড় নয়, কেহ কাহারো নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিবে না ইত্যাদি। এই সকল সমাজভ্রংশকর এবং লোকস্থিতির উচ্ছেদকারী কথাতে বিশ্বাস করিতে তাঁহারা অনেক মূর্খ লোককে শিখাইয়া ছিলেন। আর এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাদিগের বিজাতীয় প্রত্যয় ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন যে, ছলে বলে কৌশলে এতদ্বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিদিগের একবার উচ্ছেদ করিলে পৃথিবীর তাবৎ বিশৃঙ্খলা দূর হইবে; তখন মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার নিবৃত্ত হইবে; তখন সকলেই পরস্পরকে সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করত পরস্পরের মঙ্গল সাধনে রত হইবে; ঈর্ষ্যা দ্বেষ অভিমান অহঙ্কার প্রভৃতি উদ্দাম প্রবৃত্তি সমূহ ধরাধাম হইতে বিলীন হইবে; ভূলোক স্বর্গলোকের ন্যায় পরমরমণীয় সুখের নিকেতন হইয়া উঠিবে। এই নিমিত্ত উল্লিখিত দিগি-

দিকৃজ্ঞানশূন্য কয়েক জন পরামর্শ করিয়া নিজ মতের বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তি দিগকে সমূলে উন্মূলন করিতেই কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাদৃশ ব্যক্তি দেখিলেই তুচ্ছ কারণে, জন্মভূমির প্রতি বিশ্বাষঘাতকতা অপরাধে অপরাধী করিয়া আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিতেন, যদি আদালতের বিচারকর্ত্তা তাঁহাদিগের স্বপক্ষীয় না হইতেন, কিম্বা অতি তুচ্ছ দোষে নিষ্ঠুরতা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পরাঙ্মুখ হইতেন, তাহা হইলে রবস্পিয়রের দল যাইয়া গণ্ডমূর্খ জনতাকে খেপাইয়া দিতেন, বলিতেন তোমাদের বিচারকর্ত্তারা তোমাদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে, অমুক ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হইলে সে ফ্রান্সের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিবে না। এ কথা শুনিয়াই পারিসের তাবৎ ছোট লোক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আদালতে যাইয়া জটলা করিত, প্রাড়বিবাকদিগকে ভয় দেখাইত। তাঁহারা যদি অকুতোভয়তাসহকারে ছোট লোকের এই বিভীষিকার প্রতি দৃক্‌পাত না করিতেন, তাহা হইলে ক্রমে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগকে পদচ্যুত এবং হয় ত যাহার প্রাণরক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, তাহারি সঙ্গে গিলটাইন্ মঞ্চে আরোহণ করিতে হইত। তিনি চারি বৎসর ধরিয়া এই নিদারুণ অত্যাচার ফ্রান্স ভূমির উপর উপদ্রব করিয়াছিল, একারণ ইতিহাস মধ্যে সেই কয় বৎসর "বিভীষিকার আধিপত্য" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে রবস্পিয়রের প্রাণদণ্ড সহকারে বিভীষিকার রাজত্ব সমাপ্ত হইল এবং ঘোরতর অরাজক অবসানে যথা কথঞ্চিৎ এক প্রকার শৃঙ্খলা সংস্থাপন হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

যৎকালে রাজধানীতে উল্লিখতরূপে তুমুল ব্যাপার সমস্ত ঘটিতেছিল, এবং জনপদের তাবৎ প্রদেশেই লঘুমাত্রায় তাহার অভিনয়ক্রিয়া প্রদর্শিত হইতেছিল, তৎকালে নেপোলিয়ন অতি সামান্য এক জন কাপ্তেন মাত্র। তাঁহার ঐ সকল ব্যাপারের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিবার শক্তি এত অল্প ছিল যে, পরিণামে কি হইবে, অথবা উপস্থিত ব্যাপারে ভদ্র লোকের কি রূপে চলা উচিত ইহা তিনি একবারো মনে ভাবেন নাই। ভদ্রলোক হইবার উপযুক্ত গুণগ্রাম বিধাতা তাঁহাকে অধিক দেন নাই এবং তিনি যে ব্যবসাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, পরিণামদর্শিতাগুণ সে ব্যবসায় পক্ষে তেমন অধিক উপযোগী নহে, সৈনিক হইতে গেলে যে যে গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক, তাহা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। সাহস, অধ্যবসায়, যথেচ্ছাচরণলালসা, ও দুর্জ্জয় উন্নতিবাসনা এ সকল প্রবৃত্তি নেপোলিয়নের স্বভাবে ভরপুর বিদ্যমান ছিল। এতদ্ব্যতীত সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনকারী ব্যক্তিদিগের যাহা সচরাচর অধিক থাকে না, এরূপ এক অসাধারণ বুদ্ধি শক্তিরও অধিকারী হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ

করেন, তৎসঙ্গে দয়া অমায়িকতা কিংবা ভদ্রতার ভাগ কিছু স্বল্প থাকিলে লোকে যেরূপ হয়, তিনি তাহাই হইলেন। তিনি কি গতিকে নিজবাসনা চরিতার্থ করিতে পারিবেন, সেই পন্থা দেখিতে লাগিলেন। তিনি রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রারম্ভ সময়েই বন্ধুবান্ধবদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "আমি সামান্য কাপ্তেন বই নহি, সুতরাং আমার রাজপক্ষ অবলম্বন করা সাজে না; কাজে কাজেই আমাকে সামান্যদিগের সপক্ষ হইতে হয়। যদি আমি বড় জাঁদ্‌রেল বা তেমন কোন উচ্চপদারূঢ় সেনাপতি হইতাম, তাহা হইলে অবশ্যই রাজার দিকে হইতাম।" এই কথার ভঙ্গীতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নেপোলিয়নের স্বার্থপরতা কতদূর উৎকট ও জঘন্য। রবস্‌পিয়র্‌ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি আপন মতের দ্বারা উন্মত্ত-প্রায় হইয়া যৎপরোনাস্তি যথেচ্ছাচার করিতেছিল, তাহারাও ঈদৃশ বিজাতীয় স্বার্থপরতার বশীভূত ছিল না। তাহাদিগের যত অপরাধ কেবল বুদ্ধির দোষে ঘটিয়াছিল, তাহারা যাহাতে ভবিষ্যতে তাবৎ লোকের সুখোৎপত্তি হইবেক বলিয়া বিশ্বাস করিত, সেই সকল অনুষ্ঠানই একান্ত মনে সমাধা করিতেছিল। কিন্তু নেপোলিয়নের পক্ষে অন্যের ভাল মন্দ নিবন্ধন কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না; তাঁহার নিজের ক্ষমতাবৃদ্ধি হইলেই তিনি যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন। ক্ষমতাবলে পৃথিবী শুদ্ধ লোককে তাক করিয়া দিতেছি, আমি দৃক্‌পাত করিলে সংসার থরহরি কম্পমান, আমার যশ দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিতেছে, ইহাই তাঁহার হৃদয়ের সতেজ বাসনা ছিল। এই সকল ব্যাপার সিদ্ধ হইতে লক্ষ লক্ষ লোকক্ষয় হয়, বা পৃথিবীর পরম রমণীয় জনপদ সমস্ত মরুভূমির আকার ধারণ করে, বা ব্যবসা বাণিজ্য স্থগিত হওয়াতে কত কত ধনাঢ্য পরিবার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে বাধিত হয়, এ সকল বিবেচনা তাঁহার ছিল না। যদিও ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে তিনি নিতান্ত অজ্ঞাতকুলশীল ও অতি সাধারণ এক ব্যক্তির ন্যায় কালক্ষেপণ করিতেছিলেন, তথাপি তখনি তাঁহার হৃদয়াকাশে দুরাকাঙ্ক্ষা স্বরূপ ধূমকেতু উদয় হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল ও অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি তখনই মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে, যদি ইয়োরোপে কোন উচ্চপদ না পাওয়া যায়, তবে আসিয়াতে যাইতে হইবেক এবং যদি ঘটে, ত সেখানকার অগণিত অধিবাসীবর্গের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে হইবেক। নেপোলিয়নের আকৃতি অতি খর্ব্ব ছিল, এবং দেখিতে তেমন যে একজন প্রকাণ্ড পুরুষ, তাহা ও নয়। কিন্তু সেই অতি খর্ব্ব ও কগ্নশীর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান কলেবরের মধ্যে যে অন্তরাত্মা বিরাজ করিতেছিল, তাহার বাসনা সসাগরা ধরার সাম্রাজ্যলাভে চরিতার্থ হইত কিনা সন্দেহ। তদনুরূপ অধ্যবসায়, তদনুরূপ অকুতোভয়তা এবং তদনুরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি একত্র থাকাতে, উত্তর কালে

তিনি যে সকল লীলা করিয়া যান, তাহার উপযুক্ত সকল উপকরণই সঞ্চিত ছিল। কিন্তু যে গুণ বর্ত্তিলে পর ফ্রান্সের কিম্বা নর লোকের পক্ষে ঈদৃশ অসাধারণ ক্ষমতা সমস্ত হিতকারী হইয়া উঠিত, তাহা তাঁহার কিছুই ছিল না, অর্থাৎ পরোপকার করিবার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ থাকে নাই। যাহা হউক, যে সকল ঘটনা পরম্পরা দ্বারা তাঁহার ইয়োরোপ ক্ষেত্রেই মহামান্য পদবী প্রাপ্তির পক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুবিধা হইয়াছিল, তাহার বিবরণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

ফরাশিরা রাষ্ট্রবিপ্লবে উন্মত্ত হইয়া তৎকালীন রাজার প্রাণদণ্ড করিয়াছে, এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য নরপতির হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইল। তাঁহারা ভাবিলেন যে, দেখাদেখি স্বীয় প্রজাবর্গও যাহাতে সংক্রামক রোগবৎ উল্লিখিত ঐ সকল মতের অনুবর্ত্তী না হয়, যাহাতে তাঁহাদিগের রাজ্যে তাদৃশ সংক্ষোভ উপস্থিত না হয় এবং নিজ নিজ রাজপদের উপর কোন উপদ্রব না ঘটে, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষত ফ্রান্স রাজ্য হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিশৃঙ্খলার প্রথম আবির্ভাব সময়ে বহির্গত হইয়া যান। এইরূপে, জন্মভূমির কপালে যাহা থাকে, তাহাই ঘটিবে, ইহা ভাবিয়া যাঁহারা পলায়ন করিয়াছিলেন, রাষ্ট্রবিপ্লবকালীন রাজপুরুষেরা তাঁহাদিগের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বিষয় আশয় বাজেয়াপ্ত হওয়াতে তাঁহারা একেবারে ঘরের শত্রু হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ইংলণ্ড জর্মনি প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তত্রত্য নরপতিবর্গকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন এবং যাহাতে এই বিষয় তাঁহাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান হয়, তদর্থে নানা অলীক যুক্তি বিন্যাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন, ফ্রান্সের সম্ভ্রান্তবর্গ স্বদেশত্যাগী হওয়াতে এখন তথায় ছোট লোকেরি প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহারা যেরূপ নির্ব্বোধ ও অকর্ম্মণ্য, ততোধিক দুরাত্মা; তাহাদিগকে ততদূর বাড়িতে দিলে সকল দেশের ইতরলোকে প্রশ্রয় পাইবে, এবং সর্ব্বত্র ফ্রান্সের অনুরূপ নিদারুণ ব্যাপার ঘটনা হইবেক। কিন্তু যদি তাহাদিগের যথোচিত শাস্তি বিধান করা হয়, যদি রাজকর্ম্মের নূতন ব্রতী এই সকল কাপুরুষ ও নিস্তেজ লোকদিগের বিরুদ্ধে দেশান্তর হইতে সৈন্যচালনা করা হয়, তাহা হইলে তাহারা মাটী হইয়া যাইবেক; ফ্রান্স ভূমি সুশীতলভাব ধারণ করিবেন এবং এই পরমহিতকর অনুষ্ঠানে, যে সকল নরপতি সাহায্য দান করিবেন, তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া পরমরমণীয় সমৃদ্ধিশালী ফ্রান্স দেশ বখরা করিয়া লইয়া স্ব স্ব রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিতে পাইবেন। এই সকল অযুক্তির কুযুক্তির প্রতি কর্ণপাত করেন নাই, ইয়োরোপের পশ্চিমখণ্ডে এমন এক জনও

রাজা ছিলেন না। তথাকার সকল রাজ-সরকার মধ্যেই ফরাশি দিগের প্রতি এক প্রবল বিদ্বেষানল আবহমান কাল প্রজ্জ্বলিত ছিল, কারণ স্পেন, ইটালি জর্মনি, ইংলণ্ড, ইয়োরোপের পশ্চিমখণ্ডবর্ত্তী এই চারি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যস্থলে ফরাসীদিগের বাস, সুতরাং প্রত্যেকের সঙ্গে বরাবর খুটিনাটী চলিয়া আসিয়াছে। তাহাতে আবার তাহারা চিরকালই যেরূপ প্রবল পরাক্রান্ত ভাবে আপনাদিগের স্বাধীনতা অক্ষত রাখিয়া আসিয়াছে এবং মুহুর্ম্মুহু অতিদুর্ব্বহ অরাতিভারে প্রপীড়িত হইয়াও কস্মিন কালেও ন্যূনতা স্বীকার করে নাই। তদ্দ্বারা সকলে শুদ্ধ যে ফরাশিদিগকে দ্বেষ করিত এরূপ নহে, ভয়ও করিত। এই নিমিত্ত পশ্চিম খণ্ডবাসী নরপতি মাত্রের পক্ষে ফরাশি জাতি এক প্রকার অক্ষিশূল হইয়া অবস্থিত ছিল। এক্ষণে স্বদেশত্যাগী ফরাশি সম্ভ্রান্তদিগের কুমন্ত্রণা শুনিয়া তাঁহারা সকলে কৃতসংকল্প হইলেন যে, চারিদিক হইতে ফ্রান্সের উপর পড়িয়া এই দুর্দ্দান্ত বর্ব্বর দিগকে সমূলে সংহার করিয়া আসিয়া ইয়োরোপ ক্ষেত্র হইতে ফ্রান্স নাম অবলুপ্ত করিয়া দিবেন। এমন কি, যে ইংলণ্ড দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ অনেক উচ্ছৃঙ্খল কাণ্ডে লিপ্ত হইয়াছিল, এবং তৎকালীন নরপতি প্রথম চার্ল্‌সের প্রাণ দণ্ড পর্য্যন্ত করিয়া শেষ করিয়া বসিয়া ছিল, সেই ইংলণ্ডও বিরূপ হইল। ইংলণ্ডের সে সময়ের প্রধান রাজমন্ত্রী ছোট পিট (১), ফরাশি জাতির প্রতি ইংরেজদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ বিদ্বেষ আছে, তাহার পরতন্ত্র হইয়া বলপূর্ব্বক ফ্রান্সের বিশৃঙ্খলা নিবারণ স্বরূপ বিজাতীয় অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরাশিরা রাজাকে বধ করিয়া অতি অন্যায় করিয়াছে, তাহাদিগের শাস্তি দেওয়া আবশ্যক; এই ছুতো করিয়া ১৭৯২ অব্দে ইংলণ্ড, স্পেন্, ও জর্ম্মনি এই তিন রাজসরকার একত্র হইয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং অচিরাৎ ঐ দেশ আক্রমণার্থ সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে লাগিল।

ফ্রান্সের এই বিপত্তিই নেপোলিয়নের পদোন্নতির হেতু হইল। তাঁহার মত যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তির কাজে কাজেই ক্রমে ক্ষমতাপন্ন হইবার কথা; কারণ যখন আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ ব্যতীত উপায়ান্তর না থাকে, তখন সেনা সংক্রান্ত সুচতুর সুদক্ষ বীরপুরুষেরাই সর্ব্বজনের অনুরাগভাজন হন। নেপোলিয়নের পক্ষে অতি শীঘ্রই আপন গুণ প্রকাশ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। তৎকালে ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলবর্ত্তী টুলোঁ নগর ইংরেজ ও স্পেনীয় নাবীর হস্তগত হইয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ এই যে, ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চলের লোকে পূর্ব্বোল্লিখিত বিভীষিকার রাজত্বের প্রতি বড়ই উত্যক্ত হইয়াছিল।

(১) পিট নামে দুই পিতা পুত্রে ১৭৬০ সালের পর অবধি ১৮০৩ সাল পর্য্যন্ত ক্রমানুয়ে ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রীর কার্য্য করিয়া সুপ্রসিদ্ধ হয়েন। তন্মধ্যে পুত্রের নাম ছোট পিট বলিয়া ইতিহাস মধ্যে বিখ্যাত আছে।

'বিভীষিকার রাজত্ব' সংঘটিত অত্যাচার দ্বারা আপাতত অনেক অসুবিধা ঘটিলেও পরিণামে ভালই হইবে, তাহারা ইহা তেমন বুঝিতে পারে নাই; সুতরাং অদূরদর্শিতা সহকারে স্থির করিল যে, পারিস নগরের অধীনতা স্বীকার করা হইবেক না, বরং ইংরেজ কিম্বা স্পেনীয়দিগের সহিত যোগ দিয়া জাত্যন্তর হওয়া যাইবেক, তথাপি রবস্পিয়রের দৌরাত্ম্য আর সহ্য হয় না। এই অসহিষ্ণুতার বশবর্ত্তী হইয়া টুলোঁ, লিয়োঁ, মার্সেল প্রভৃতি ফ্রান্সের দক্ষিণ প্রদেশস্থ কতিপয় নগরের লোকেরা পারিসের সহিত সকল সম্পর্ক উচ্ছেদ পূর্ব্বক স্ব স্ব প্রধান হইবার উদ্যোগ পায়। তন্মধ্যে টুলোঁ নগর সমুদ্র তটে অবস্থিত বলিয়া তথাকার লোকে যুক্তি করিয়া, ভূমধ্যসাগরবর্ত্তী ইংরেজ ও স্পেনীয় পোতসেনার শরণাপন্ন হইল, সেনাধ্যক্ষদিগকে কহিল যে, আপনারা এ পুরী দখল করুন, এবং রাজধানী হইতে আমাদিগের বিরুদ্ধে যে সকল শত্রুতাচরণ করা হইবেক, তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। এই আবেদন ইংরেজ পোতসেনাধ্যক্ষদিগের পক্ষে বড় সুবিধার কথা বলিয়া বোধ হইল, যেহেতু তাঁহারা তৎকালে বলপূর্ব্বক ফরাশিদিগকে রাষ্ট্রবিপ্লব ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন। সুতরাং স্পেন্ ও ইংলণ্ডের পোতসেনা অবিলম্বে যাইয়া টুলোঁ নগর অধিকার করিল এবং যাহাতে হস্তবহির্ভূত না হয়, তদর্থে বিলক্ষণ অধ্যবসায় সহকারে নানা আয়োজন করিতে লাগিল।

এদিকে ফরাশিরাজপুরুষেরাও (২) টুলোঁ নগর যে বিপক্ষ হস্তেই থাকে, ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। ভূমধ্যসাগরের তটে সংস্থাপিত বলিয়া এই পুরী ফ্রান্সরাজ্যের পক্ষে বিশেষরূপে উপযোগিনী হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ লুই যে সকল সুন্দর রণতরী নির্ম্মাণ করিয়াযান, তাহা ঐ স্থানেই ছিল। সামুদ্রিক যুদ্ধাদির উপযোগী নানা আয়োজনও তথায় রক্ষিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ভূমধ্য সাগর হইতে ফ্রান্সে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত তেমন সুবিধার বন্দর আর ছিল না। এই শেষোক্ত হেতু বশতই, টুলোঁ নগর খোয়াইলে ফ্রান্সের নানা অনর্থের সম্ভাবনা ছিল, কারণ বিপক্ষেরা যখন ইচ্ছা এই দ্বার দিয়া ফ্রান্সে প্রবেশ পূর্ব্বক উৎপাত করিতে পারিত। সুতরাং টুলোঁনগর পুনরধিকার করিবার নিমিত্ত ফরাশি রাজপুরুষেরা বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। এই ব্যাপারে সর্ব্বপ্রথম নেপোলিয়নকে রণস্থলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়।

যৎকালে নেপোলিয়ন গোলন্দাজ সৈন্যদলের অধ্যক্ষ হইয়া টুলোঁনগরের অবরোধ নিমিত্ত সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত

(২) যদিও তখন রাজা ছিল না, তথাপি প্রজাপালনের ভার যাঁহাদিগের হস্তে অর্পিত ছিল, তাঁহাদিগকে তৎকর্ম্মকারী বলিয়া 'রাজপুরুষ' এই নাম দিলে বোধ হয় বিশেষ ক্ষতি নাই।

হইলেন, তাহার কয়েক মাস পূর্ব্বে অবরোধ কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত সেনাপতি অভাবে ফরাশি সৈন্যের চেষ্টা দ্বারা কোন ফলোদয় হয় নাই। তাহার বৃত্তান্ত এই যে, টুলোঁনগরের উত্তরাংশে এক ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, একারণ ফরাশি সেনা সম্পূর্ণরূপে নগর বেষ্টন করিতে পারে নাই। মধ্যে পর্ব্বত ব্যবধান থাকাতে তাহাদিগের সেনা দ্বিভাগে বিভক্ত না করিলে নগরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই অংশ ঘেরিবার যো ছিলনা; সুতরাং রীতিমত আবদ্ধ করিয়া নগরবাসীদিগের মধ্যে আহারের অপ্রতুল করিয়া দেওয়া অসাধ্য হইল। তদ্ব্যতীত, আহারের অপ্রতুল না হইবার আর এক বিশেষ হেতু এই ছিল যে, সমুদ্রের সহিত নগরের সম্পর্ক অবাধিত থাকাতে জাহাজ হইতে সচ্ছন্দে খাদ্য সামগ্রী সকল পুরীমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইতেছিল। এই সকল জাহাজের প্রতি গোলা চালাইতে না পারিলে সমুদ্রের সহিত নগরের সম্পর্ক বন্ধ হইবার উপায়ান্তর ছিল না, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে যে সেনাপতি ফরাশি সেনার অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন, যুদ্ধ বিষয়ে তাঁহার ঈদৃশ ঘোরতর অনভিজ্ঞতা বিদ্যমান ছিল যে, কোন্ স্থানে কামান বসাইলে জাহাজে যাইয়া গোলা লাগিতে পারে, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি যে স্থলে আপনার কামান বসাইয়াছিলেন, তথা হইতে জাহাজ পর্য্যন্ত গোলা যাওয়া দূরে থাকুক, সে পথের তিন ভাগের এক ভাগ বই গোলা ছুটিত না। নেপোলিয়ন যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইয়া যখন এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন প্রথমে অবাক্ হইয়া রহিলেন, পরে গণ্ডমূর্খ সেনাপতিকে পরোখ দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, এরূপে কামান বসাইবার কর্ম্ম নয়। সৌভাগ্যক্রমে সেই সেনাপতির অপারকতা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হওয়াতে অন্য এক ব্যক্তি তৎপদাভিষিক্ত হইয়া আসিলেন। ইনি দু এক বার কথা বার্ত্তা কহিয়া নেপোলিয়নের বিচক্ষণতা বুঝিতে পারিলেন এবং তদীয় উপদেশানুসারেই অবরোধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। নেপোলিয়ন দেখিলেন, যে নগরের দক্ষিণ পশ্চিমে যে উপকূলভূমি আছে, সে স্থান বিপক্ষের অধিকৃত; অথচ সমুদ্র হইতে নগরে আসিবার পথ বন্ধ করিতে হইলে সেই স্থানেই ফরাশিদিগের কামান বসান আবশ্যক। ইহা স্থির করিয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে সেই স্থান দখল করিবার পরামর্শ দিলেন। তিনি কহিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে নগরের প্রতি কোন উপদ্রব করিয়া কাজ নাই; সমুদ্রের সঙ্গে উহার সম্পর্ক খণ্ডন করিয়া দিলেই নগরবাসীরা নিরুপায় হইয়া অতিশীঘ্র আপনারাই নগর সমর্পণ করিতে পথ পাইবে না। এই পরামর্শ অনেকের মনে ভাল লাগে নাই, তাহারা কোন মতেই মনকে বুঝাইতে পারে নাই যে, নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর এক স্থান দখল করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম স্বীকার

করা যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু সেনাপতির বুদ্ধিতে নেপোলিয়নের যুক্তি উত্তম জ্ঞান হইল, সুতরাং তদনুরূপ কার্য্যারম্ভ হইল। ঘোরতর ভাবে দুই তিন বার আক্রমণ পূর্ব্বক ফরাশিরা বিপক্ষ সেনাদলকে নগরের দক্ষিণ পশ্চিমস্থিত উপকূল ভূমি হইতে তাড়াইয়া দিল, তথায় বিপক্ষেরা যে একটু কেল্লার মত বানাইয়াছিল, তাহাও দখল করিল এবং অবিলম্বে সারি সারি ফরাশি কামান তথায় সংস্থাপিত হইয়া সন্নিহিত সমুদ্রের উপর বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। এই ব্যাপার সম্পন্ন হইতে না হইতেই, নেপোলিয়ন যাহা আশংসা করিয়াছিলেন, তাহা ঘটিল। ইংরেজ ও স্পেনীয় রণতরীর অধ্যক্ষেরা নগর রক্ষা অসাধ্য বোধে এবং নগর সন্নিধানে জাহাজ রাখা অপরামর্শ জ্ঞান করিয়া তথাহইতে পলায়ন করিলেন এবং পুনর্ব্বার জয় জয়কার সহকারে টুলোঁনগরোপরি ফরাশি পতাকা উড্ডীয়মান হইল।

সুরবালা-কাব্য।

প্রথম ভাগ।

দ্বিতীয় সর্গ।

" Of its own beauty is the mind
diseased,
And fevers into false creation ? "

ছেলে বেলা এই সরল সুজনে,
লোকে অলৌকিক করিত জ্ঞান;
খুঁজিয়ে দেখিলে শিশু সাধারণে,
মিলিত না কেহ এঁর সমান।

২

চটুল সুন্দর কাহিল শরীর,
ছোট এক খানি বসন পরা;
মুখ হাসি হাসি কপোল রুচির,
নয়ন যুগলে আলোক ভরা।

৩

জ্বলে জ্বলে যেন মাথার ভিতর,
বুদ্ধি বিদ্যুতের বিলাস ছটা;
ঘেরি ঘেরি চারি দিকে কলেবর,
বিরাজিছে যেন তাহারি ঘটা।

৪

তখনই যেন বসি বসি শিশু,
জটিল জগত ভেদিতে পারে,
ফুটে ফুটে মাথা ছোটে যেন ইষু
আপনা স্থাপিতে আপনি নারে

পিছনে ছিলেন জ্ঞান-গরীয়ান্,
দাদা মহোদয় উদারমতি ;
বুদ্ধি-বিভাকর পুরুষ প্রধান,
সদা কৃপাবান্ ভেয়ের প্রতি।

৬

সেই সুগম্ভীর অসীম আকাশে,
এ শিশুর বুদ্ধি বিজলিমালা ;
যত খুসি, ছুটে বেড়াত অনাসে,
কাটিতে নারিত, করিত খেলা।

৭

বিজয়া দশমী আজি নিরঞ্জন,
চারিদিকে বাজে সানাই ঢোল ;
চলেছে প্রতিমা পথে অগণন,
উঠেছে লোকের হরষ রোল।

৮

সেজে গুজে শিশু সারি সারি আসে,
দাঁড়ায় যাইয়ে বাপের কাছে ;
এ শিশু অনাসে তাহাদেরি পাশে,
একা একছুটে দাঁড়ায়ে আছে।

৯

একে পোষ মাস হিমেল বাতাস,
তাহাতে রজনী হইয়ে এল ;
ঘরে খিটিমিটি হ'ল ঠুশ্ ঠাশ্,
শুধু গায়ে শিশু উবিয়ে গেল।

১০

সকাল বেলায় আসিল খবর,
বাড়ীর উপরে করিয়ে আড়ি ;
দুই ক্রোশ পথ চলি বরাবর,
হয়েছে দাখিল পিসির বাড়ী।

১১

চটিয়ে উঠিয়ে হঠাৎ কখন,
চোক্ রাঙাইলে বাড়ীর প্রভু ;
দাঁড়াত এ শিশু গোঁজের মতন,
প্যান্ প্যান্ কোরে কাঁদেনি কভু।

১২

কেবল ভাসিত জলে দু নয়ান,
কাতর কাঙাল আসিলে নাচে ;
বসায়ে যতনে দিত জলপান,
সুধাত সকল বসিয়ে কাছে।

১৩

পাঠ সমাপন না হ'তে না হ'তে,
বিদেশ ভ্রমণে উঠিল মন ;
যথা যে বিভূতি আছে এ ভারতে,
করিতে সকল অবলোকন।

১৪

কেবল আমারে বলি ঠেশে ঠেশে,
এক কানা কড়ি হাতে না লয়ে ;
চলিলেন যুবা পশ্চিম প্রদেশে,
সকের নবীন অতিথি হয়ে।

১৫

ফিরে এসে চিত্ত হ'ল স্থিরতর,
গেল সে ছেলেমো খেয়াল দূরে ;
শাস্ত্র সুধাপানে প্রফুল্ল অন্তর,
ভাব রসে মন উঠিল পূরে।

১৬

আচম্বিতে আসি হৃদয়ে উদয়,
শ্যামল বরণা নবীনা বালা ;
পেশোয়াজ পরা পারিজাতময়,
গলে দোলে পারিজাতের মালা।

১৭

গায়ে পারিজাত ফুলের ওড়না,
উড়িছে ধবলা বলাকা হেন ;
করে দেববীণা বিনোদ বাজনা,
স্বরগীয় সুরে বাজিছে যেন।

১৮

আহা সেই সব পারিজাত দলে,
কেমন সে শ্যামা রূপসী রাজে ;
শশাঙ্ক শ্যামিকা সুধাংশু মণ্ডলে,
নয়ন জুড়ায়ে কেমন সাজে !

১৯

সে নীল নলিন প্রসন্ন আননে,
কেমন সুন্দর মধুর হাসি ;
প্রভাতের চারু শ্যামল গগনে,
আধ প্রকাশিছে অরুণ আসি।

২০

নয়ন যুগল তাঁরা যেন জ্বলে,
কিরণ তাহার পীযূষময় ;
মৃণাল শ্যামল কর-পদতলে,
লোহিত কমল ফুটিয়ে রয়।

২১

সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী
স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী,
মানস সরস-নীল-মৃণালিনী ;
কে তুমি অন্তরে বিরাজ সতী ?

২২

আহা এই প্রেম প্রতিমার রূপ,
বয়সে বিরূপ নাহিক হবে ;
চির দিন সুর-কুসুম অনুপ,
সমান নূতন ফুটিয়ে রবে !

২৩

যত দিন রবে মনের চেতনা,
যত দিন রবে শরীরে প্রাণ ;
তত দিন এই রূপসী কল্পনা,
হৃদয়ে রহিবে বিরাজমান।

২৪

জনমে না মনে ইন্দ্রিয় বিকার,
পরম উদার প্রেমের ভাব ;
নাহি রোগ শোক জরা কদাকার,
পুণ্যবানে করে এ নারী লাভ।

২৫

বিরলে বসিলে এ মহিলা সনে,
ত্রিদিবের পানে হৃদয় ধায় ;
অমৃত সঞ্চরে নয়নে শ্রবণে,
শোক তাপ সব দূরে পলায়।

২৬

হয়ে আসে এক নূতন জীবন,
হৃদি-বীণা বাজে ললিত সুরে ;
নব রূপ ধরে ভূতল গগন,
আসিয়াছি যেন অমরপুরে।

২৭

সকলি বিমল, সকলি সুন্দর,
পাবন মুরতি সকল ঠাঁই ;
অপরূপ রূপ সব নারী নর
জুড়ায় নয়ন যে দিকে চাই।

২৮

হরষ-লহরী ধায় মহাবলে,
বুক ফাটে ফাটে, ফোটে না মুখ ;
বসি বসি ভাসি নয়নের জলে,
বোবার বিনোদ স্বপন সুখ।

২৯

ভাবুক-যুবক জন কলপনা,
নবীনা ললনা মূরতি ধরি ;
বাড়াইল কিরে মনের বাসনা,
বিরলে তাঁহারে ছলনা করি ?

৩০

তবে নিরাকারে ব্রহ্মজ্ঞানী-গণে,
বল কোন্ বলে মানিতে চায় ?
মনে কিছু মিছু বোঝে বা কেমনে,
যদি নাহি মানে কলপনায় ?

৩১

বল যোগিগণ বসি যোগাসনে,
নিমগন মনে কাঁরে ধেয়ায় ;
আচম্বিতে আসি তাঁহাদের মনে,
কাঁহার মূরতি স্ফুরতি পায় ?

৩২

কেন জলে ভাসে নিমীল নয়ন,
হাসি রাশি যেন ধরে না মুখে ;
কোন্ সুধা পানে খেপার মতন,
মহাসুখী কোন্ মহান সুখে ?

৩৩

বিচিত্ররূপিনী কল্পনা সুন্দরী,
ধারমিক-লোক-ধরম-সেতু ;
প্রণয়ী জনের প্রিয় সহচরী ;
অবোধের মহা ভয়ের হেতু।

৩৪

হেরি হৃদি মাঝে রূপসী উদয়,
পুলকে পূরিল সখার মন ;
শশীর উদয়ে দিশ আলোময়,
বিকশিল বেলফুলের বন।

৩৫

কি সুখেরি হায় সময় তখন !
কেমন সখার সহাস মুখ !
কেমন তরুণ নধর গঠন,
কেমন চিতোন নিটোল বুক !

৩৬

মনের মতন করুণ জননী,
মনের মতন মহান্ ভাই ;
মনের মতন কল্পনা রমণী,
কোথাও কিছুরি অভাব নাই।

৩৭

সদা শাস্ত্র লয়ে আমোদ প্রমোদ,
আমোদ প্রমোদ আমার সনে ;
সতত পাবন প্রণয়-প্রবোধ,
প্রণয়িনী রূপে উদয় মনে।

৩৮

সুধাময়ী সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়া,
ছায়ার মতন ফেরেন সাথে ;
করেন সেবন, যেন সতী জায়া,
সেবেন যতনে আপন নাথে।

৩৯

সায়াহ্নের মত সে সুখ সময় ;
দেখিতে দেখিতে ফুরাল বেলা ;
ম্লান হয়ে এল দিশ সমুদায়,
লুকাল তপন-কিরণ-মালা।

৪০

বিবাহের কথা উঠিল ভবনে,
তাহা শুনি সখা গেলেন বেঁকে ;
জোর ক'রে আহা তবু গুরুজনে,
পরালেন বেড়ি চেয়ে না দেখে !

৪১

ক'নে দেখে ফাটে বরের পরাণ,
পরে দেখে দিলে বিয়ে কি হয় ?
যে ছবি হৃদয়ে সদা শোভমান,
এ ক'নে তাহার কিছুই নয়।

৪২

আগে যারে ভাল বাসিনে কখন,
যারে হেরে নাহি নয়ন ভোলে ;
যার মন নহে মনের মতন,
তার প্রেমে যাব কেমনে গোলে ?

৪৩

বিরূপ বিরস হেরিয়ে আমায়,
যদি চোটে যায় তাহার প্রাণ ;
মানময়ী বোলে ধোরে দুটি পায়,
ভাণ কোরে হবে ভাঙিতে মান।

৪৪

প্রেম-হীন হৈয় পশু-সুখ-ভাগ,
স্মরিতেও ছিছি হৃদয়ে বাজে ;
জনমে আপন হননের রোগ,
তবু ভোগ, ঠেকে সরমে লাজে।

৪৫

নিতি নিতি এই অরুচি আহারে,
ক্রমিক বাড়ুক মনের রোগ ;
উপরে এ কথা ফুটনা কাহারে,
ভিতরে চলুক নরক ভোগ !

৪৬

অনেকেই হেথা পশুর মতন,
পশু-সুখ-ভোগে নিকাম রত ;
অন্যকেও চাহে করিতে তেমন,
হয়ে থাক সবে পশুর মত।

৪৭

এই পেশাদারি ভাল নাহি লাগে,
তবু পরিত্রাণ নাহিক পাবে ;
যদি দেখে, কেহ দলে থেকে ভাগে,
পশু দলবল খেপিয়া যাবে।

৪৮

নোলা-সকসোকে কুচুটে কুকুর,
আহার তাহার মড়ার মাস ;
ঘোড়া দেখে তবু তেড়ে আসে ক্রূর ;
খাইতে দিবে না নধর ঘাস।

৪৯

যত হাঁদা নাদা ভেদা গাধারাম,
গোবরগণেশ লাগাবে গোল ;
ধেই ধেই ঘোরতর ধূমধাম,
ঢেঁড়া পিটে নেচে বাজাবে ঢোল।

৫০

দাঁত দুই পাটি করিয়ে বাহির,
বলিবেক " ছোঁড়া সেজেছে সঙ,
দেখেছ কেমন হয়েছে অধীর,
ধরেছে কেমন নুতন ঢং !"

৫১

নিগূঢ়, মহত চরিতের ঢং,
অবোধে না বুঝে করে কুনাম ;
" অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং,
দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্। "

৫২

তাহাদের সেই পশু-কোলাহলে,
মানুষেরি দেখি বিষম দায় ;
হয়তো দাঁড়ায় একেলা বিরলে,
নয় এ দুনিয়া ত্যজিয়া যায়।

৫৩

ভেবে এই সব ঘোর চিন্তাজালে,
জড়াইয়ে গেল যুবার মন ;
বিষাদের যবনিকার আড়ালে,
ভাবী আশা হ'ল অদরশন।

৫৪

ভাল নাহি লাগে শাস্ত্র আলোচন,
ভাল নাহি লাগে রবির আলো ;
ভাল নাহি লাগে গৃহ পরিজন,
কিছুই জগতে লাগেনা ভাল।

৫৫

উড়ু উড়ু করে প্রাণের ভিতর,
পালাই পালাই সদাই মন ;
যেন মরু হয়ে গেছে চরাচর,
শুধু ঘেরে আছে কাঁটার বন।

৫৬

কল্পনারে লয়ে জুড়াইতে চান,
খুঁজিয়ে বেড়ান হৃদয় মাঝে ;
কোথাও তাহারে দেখিতে না পান,
বুকে যেন বাণ আসিয়ে বাজে।

৫৭

অয়ি কোথা আছ জীবিত রূপিণী !
পতির পরাণ বাঁচাও সতী ;
হেরিয়ে সঙ্গিনী, বুঝিগো মানিনী
চলিয়ে গিয়েছ অমরাবতী ?

৫৮

সহসা মানস তামস মন্দিরে,
বিকশিল এক নূতন আলো ;
ভেদ করি অমা নিশির তিমিরে,
প্রাচী দিশা যেন হইল লাল।

৫৯

প্রকাশ পাইল সে আলো মালায়,
অমরাবতীর বিনোদ বন ;
কত অপরূপ তরু শোভে তায়,
চরে অপরূপ হরিণী গণ।

৬০

বিমল সলিলা নদী মন্দাকিনী,
দুলে দুলে যেন মর্মেরি রাগে ;
ভাঁজি কুলু কুলু মধুর রাগিণী,
খেলা করে তার মেখলা ভাগে।

৬১

নিরিবিল এক তীরতরু তলে,
সে সুন্দররূপসী উদাস প্রাণে ;
বসিয়ে কোমল নব দুর্ব্বাদলে,
চাহিয়ে আছেন লহরী পানে।

৬২

বাম করতলে কপোল কমল,
আকুল কুন্তলে আনন ঢাকা ;
নয়নে গড়ায়ে বহে অশ্রুজল,
পটে যেন স্থির প্রতিমা আঁকা।

৬৩

অঙ্গের ওড়না ভূতলে লুটায়,
লুটায় কবরী কুসুম মালা ;
পারিজাত হার ছিঁড়েছে গলায়,
গোলে পড়ে করে রতনবালা।

৬৪

ঘুমায় অদূরে বীণা বিনোদিনী,
বাঁধা আছে সুর, বাজে না তান ;
এই কতক্ষণ যেন এ মানিনী,
গাহিতে ছিলেন খেদের গান।

৬৫

ঝোরে ঝোরে পড়ে তরু থেকে ফুল,
ঠেকে ঠেকে গায় ছড়িয়ে যায়;
মধুকর কুল আকুল ব্যাকুল,
গুনু গুনু রবে উড়ে বেড়ায়।

৬৬

স্বভাব সুন্দর চারু কলেবরে,
বিকশে সুষমা কুসুম রাজি;
সুরসীমন্তিনী অভিমান ভরে,
কেমন মধুর সেজেছে আজি!

৬৭

মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার চাচর কেশ;
মধুর তোমার পারিজাত হার,
মধুর তোমার মানের বেশ।

৬৮

পেয়ে সে ললনা মধুর মুরতি,
দেহে যেন ফিরে আসিল প্রাণ;
হেরিয়ে সখার হয় না তৃপতি,
নয়ন ভরিয়ে করেন পান;

৬৯

আচম্বিতে ঘোর গভীর গর্জ্জন,
বজ্রপাত হ'ল ভীষণ বেগে,
পড়িলেন তিনি হয়ে অচেতন,
মরমে বিষম আঘাত লেগে।

৭০

দাদা তাঁর কুল প্রধান পুরুষ,
কত কি নির্ভর যাঁহারে করে;
সেই মহীয়ান মনের মানুষ,
ত্যজিলেন প্রাণ আপন করে।

ইতি সুরবালা কাব্যে কল্পনা নামক
দ্বিতীয় সর্গ।

হিরডোটস্।

হিরডোটস্ পুরাবৃত্ত শাস্ত্রের সূত্রকার* বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ধর্ম্ম সংক্রান্ত অথবা পৌরাণিক ইতিহাস পরিত্যাগ করিলে হিরডোটসের প্রণীত গ্রীশদেশের পুরাবৃত্ত নামক গ্রন্থখানিকে এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ বলিয়া গণনা করিতে হয়। কিন্তু কেবল পুরাতন বলিয়াই যে হিরডোটস্ এতাদৃশ আদরণীয় হইয়াছেন এমত নহে; কথিত আছে যে গ্রীক ভাষাতে ইঁহার রচনা অতি উৎকৃষ্ট, এবং অনুবাদ পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঘটনাগুলির প্রকৃত বৃত্তান্ত লিখিবার জন্য হিরডোটস্ সাতিশয় উৎসুক ছিলেন; এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি যথোচিত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। হিরডোটসের সেই মূল গ্রন্থ

* যিনি যে শাস্ত্র প্রথম উদ্ভাবিত করেন, তাঁহাকে তাহার সূত্রকার বলা এক রীতি আছে। যথা ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রের সূত্রকার, গৌতম ন্যায় শাস্ত্রের সূত্রকার ইত্যাদি। বটে, সূত্রের আকারে শাস্ত্রের মূল নিয়ম লিপিবদ্ধ না করিলে এই নাম দেওয়া সংগত কি না সন্দেহ। কিন্তু যথোপযুক্ত নামান্তরের অসদ্ভাব দেখিয়া সূত্রকার এই শব্দের লক্ষণ কল্পনা পূর্ব্বক শাস্ত্রবিশেষের সর্ব্ব প্রথম প্রবর্ত্তয়িতাকে এই নাম দেওয়া নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ হইবেক না।

হইতে অধুনা ভূরি ভূরি ইতিহাস গ্রন্থ সংকলিত হইয়াছে বটে এবং এক্ষণে পুরাবৃত্ত শাস্ত্র রচনা বিষয়ে তাঁহার সময় অপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই, তথাচ হিরডোটসে্র অনুবাদ পাঠ করিয়া যেরূপ আমোদ জন্মে এবং তাঁহার বর্ণিত বৃত্তান্ত সমস্ত মনোমধ্যে যেরূপ সংস্কারবদ্ধ হয়, এক্ষণকার বিরচিত গ্রন্থপাঠে কদাচ সেরূপ হয় না। হঠাৎ এরূপ মনে হইতে পারে, এবং প্রস্তাব লেখকের নিজেরও এক সময়ে এইরূপ বোধ ছিল যে, এক্ষণকার উৎকৃষ্ট ইংরাজি পুরাবৃত্ত মধ্যে হিরডোটস্ এবং অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থের সারভাগ অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। ঐ সকল প্রাচীন পুস্তকে প্রণেতাদিগের যে সমস্ত ভ্রম আছে তাহা বাছিয়া পরিত্যাগ করা অতীব দুরূহ, সুতরাং অধুনাতন পুরাবৃত্ত পাঠ করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। কিন্তু সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে হিরডোটসের সহিত পরিচয় হইলে এ বিবেচনা সর্ব্বাংশে সমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না।

ইংরাজি ভাষাই এক্ষণে আমাদিগের চক্ষুস্বরূপ হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজদিগের মনের ভাব, আচার ব্যবহার, সামাজিক নিয়ম, রাজনীতি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই আমাদিগের সহিত বিস্তর প্রভেদ আছে। ইংরাজি পুরাবৃত্ত লেখকেরা হিরডোটস্কে যে ভাবে দেখিয়াছেন এবং যে যে বিষয়ে লোককে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়াছেন তদনুসারেই তাঁহারা হিরডোটসের সার সংগ্রহ করিয়াছেন; সুতরাং আমাদিগের মনে যে সকল বিষয় জানিবার জন্য কৌতুক জন্মে এবং যে সকল বৃত্তান্ত অতি উপাদেয় বোধ হয় এরূপ অনেক কথা তাঁহাদিগের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়া অসম্ভাবিত নহে। ফলতঃ আমরা হিরডোট্সের। গ্রন্থ পাঠ করিলে, সংকলিত ইতিহাসে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, এরূপ অনেক নূতন নূতন বিষয় যে জানিতে পারি তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে মূল পাঠের ক্ষমতা না থাকিলে অগত্যা অনুবাদ পাঠ করাও কর্ত্তব্য। সত্য বটে যে, হিরডোটসের অনেক ভুল আছে এবং তাঁহার লিখিবার পরে অপরাপর ইতিহাসবেত্তারা তাহার যে সকল ভুল দেখাইয়া দিয়াছেন এবং অন্যান্য অভ্রান্ত প্রমাণ দ্বারা অধুনা যে সকল বিষয় সাব্যস্ত হইয়াছে, তৎসমুদায় বিশেষ রূপে পাঠ না করিলে হিরডোটসের লিখিত বিষয়ে পরিপক্ক জ্ঞান জন্মে না। কিন্তু এই কারণে হিরডোটসের এবং তাঁহার সদৃশ অপরাপর প্রাচীন ইতিহাস বেত্তাদিগের প্রতি উপেক্ষা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে

যদিও হিরডোটস পুরাবৃত্ত শাস্ত্রের পিতা স্বরূপ বলিয়া মান্য, তত্রাপি তাঁহার নিজের জীবনবৃত্তান্ত নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। কথিত আছে যে, আসিয়া খণ্ডের এসিয়ামাইনর প্রদেশের মধ্যে প্রাচীন কোরিয়া রাজ্যের অন্তর্গত হালিকার্ণেসস্ নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হালি-

কার্ণেসস্ বাসীরা অতি প্রাচীন কালে গ্রীসদেশ হইতে আসিয়াছিল, এই জন্য হিরডোটসকে জাতিতে গ্রীক বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক। হালিকার্ণেস্সের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বুড্রুন নামক স্থানের নিকটে আছে। হিরডোটসের জন্মকালের নিশ্চিত বিবরণ কিছুই জানা নাই। নানাবিধ প্রাচীন কিংবদন্তীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা সচরাচর এইরূপ অনুমান করেন যে, তিনি খৃষ্টের জন্মের ৪৮৪ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এক জন প্রাচীন ভূগোলবেত্তা বলিয়াছেন যে, হিরডোটসের পিতার নাম লিক্সিস্ এবং তাঁহার মাতার নাম ড্রায়ো। তিনি যখন যৌবন কাল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তৎকালে হালিকার্ণেসসে লিগ্‌ডেমিস্ নামক একজন অতিশয় দুর্দ্দান্ত রাজা ছিলেন। তিনি নির্ব্বাসনের আজ্ঞাই দিন, অথবা তাঁহার অত্যাচারের প্রতি বিরক্তি প্রযুক্তই হউক হিরডোটস্‌কে হালিকার্ণেসস্ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তিনি তদনন্তর স্যামস্ উপদ্বীপে যাইয়া বাস করেন। কিছু দিন পরে সুযোগ দেখিয়া আপন জন্মভূমিতে প্রত্যাগত হন এবং দুরন্ত লিগ্‌ডেমিসকে রাজ্যচ্যুত করিবার সময় সহকারীতা করেন। কিন্তু এই মহৎকার্য্য করিয়াও তিনি স্বদেশ বাসীদিগের প্রীতিভাজন হইতে পারেন নাই; সুতরাং তাঁহাকে অগত্যা পুনরায় বিদেশ গমন করিতে হইয়াছিল।

কথিত আছে যে, তিনি গ্রীসদেশে গিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীসের কোথায় থাকিতেন তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। পরে যখন এথীনিয়নদিগের মধ্যে একদল লোক দক্ষিণ ইটালিতে উঠিয়া গিয়া তথায় থুরিয়াই বা থুরিয়ম নগর স্থাপন করে, হিরডোটস সেই সময়ে তাহাদিগের সঙ্গী হয়েন। ইটালির মানচিত্রে ট্যারেণ্টো উপসাগরের পশ্চিম দিকে ক্রেটী নামক একটি ক্ষুদ্র নদী দৃষ্ট হইবেক। এই নদীর মোহানার নিকট প্রাচীন থুরিয়াই নগরের অধিষ্ঠান ছিল। ঐ স্থানে হিরডোটসের মৃত্যু হয়। হিরোডোটস্ কত বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হয়েন তদ্বিষয়ে পুরাবৃত্তবেত্তাদিগের মধ্যে বহুল মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইহা নিরূপণ করা কেবল হিরডোটসের জীবন চরিত্র বলিয়া নহে, ইহার দ্বারা গ্রীসদেশের প্রাচীন ইতিহাস সংক্রান্ত অনেক কথার মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু এরূপ বিতণ্ডার স্থলে লেখক কেবল এই মাত্র বলিতে পারেন যে, যাঁহারা হিরোডোটসের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বয়স বলেন তাঁহাদিগের মতে তিনি খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৪০৮ বৎসরের অনধিক কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৭৮ বৎসর বয়সের অধিক পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৪৩০ বৎসরের পর পর্য্যন্ত যে জীবিত ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার যে বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসরের অধিক হইয়াছিল ইহাতে কেহ সন্দেহ করেন না।

কথিত আছে যে, হিরডোটস স্যামস উপদ্বীপে অবস্থিতি কালে পুরাবৃত্ত লিখি-

বার উদ্দেশে নানা দেশে ভ্রমণ করেন। তাঁহার পুরাবৃত্ত পাঠে সে কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তিনি প্রাচীন গ্রীসের সকল স্থান বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, বিশেষতঃ আথেন্‌স, থীব্‌স, কোরিন্থ ইত্যাদি কতিপয় নগরে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। আয়োনীয়ান এবং ইজিয়ন সাগরের মধ্যবর্ত্তী অনেক উপদ্বীপে গতিবিধি করেন। এসিয়ামাইনরের যে যে স্থানে গ্রীকজাতি উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল, তত্তাবৎ নগর ও রাজ্যে আর কৃষ্ণসাগরের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী থ্রেস্‌, সিথিয়া, কলচিস* প্রভৃতি জনপদও দর্শন করিয়া আসেন। তদ্ব্যতীত ইদানীন্তন পারস্য রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল, পূর্ব্ব দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত সমগ্র মিসর দেশ, বোধ হয় প্রাচীন কার্থেজ নগর পর্য্যন্ত ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলভাগ, এই সমস্ত প্রদেশে হিরডোটসের ভ্রমণকরা হইয়াছিল। † সেই প্রাচীন কালে এত দেশ ভ্রমণ করা বড় সামান্য ব্যাপার নহে; স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে কেবল এই জন্যই হিরডোটসের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মে।

হিরডোটসের পুস্তকে পারসীক জাতি কর্ত্তৃক সার্ডিস্‌ (বর্ত্তমান সার্ড) নগর অধিকার (খৃঃ পূঃ ৫৪৬ বৎসর) হইতে এথীনিয়ন জাতি কর্ত্তৃক হেলেস্পন্ট খাড়ির উত্তর তীরস্থিত সেষ্টস্‌ নগর অধিকার (খৃঃ পূঃ ৪৭৮ বৎসর) পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত বিবৃত আছে। এতদুপলক্ষে হিরডোটস পারসিক, মিসর দেশীয়, এবং অপরাপর অনেক জাতির আদি বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি কতক তাঁহার পূর্ব্বতন কোন কোন গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার নিদর্শন তাঁহার পুস্তকে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সকল গ্রন্থেব লোপ হইয়া গিয়াছে। অনেক বৃত্তান্ত তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ লোকের প্রমুখাৎ শুনিয়া সংগ্রহ করিয়া ছিলেন, তিনি কি স্বয়ং অবলোকন করিয়াছিলেন এবং পরের মুখেই কি শুনিয়াছিলেন এতদুভয় স্পষ্ট বাক্যে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আর স্থল বিশেষে যে যে বৃত্তান্তের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস জন্মে নাই তাহাও লিখিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে যে, মিশর দেশীয় ধর্ম্ম যাজকেরা তাঁহাকে অনেক বিষয়ের কাল্পনিক বিবরণ প্রদান

* গ্রীস দেশের প্রাচীন ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ এই স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহার বর্ত্তমান নাম মিঙ্গ্রেলিয়া আসিয়াটিক রুসিয়ার অন্তর্গত কৃষ্ণ সাগরের পূর্ব্ব তীরে ও ককেসস পর্ব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত।

† হিরডোটস প্রাচীন কাইরিনী নগরে গিয়াছিলেন। উক্ত নগরের সর্ব্ব প্রথম অধিবাসীরা গ্রীস হইতে উঠিয়া আসে। ইহার আধুনিক নাম গ্রেনা। এক্ষণকার ট্রিপলি রাজ্যের পূর্ব্বাংশে ইহার অধিষ্ঠান। তথা হইতে প্রাচীন কার্থেজ নগর অতি নিকটই ছিল, সুতরাং হিরডোটসের তথায় যাওয়া পুরাবৃত্ত বেত্তাদিগের দ্বারা অনুমিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান টিউনিস নগরের অতি নিকটে প্রাচীন কার্থেজ অবস্থিত ছিল।

করে। সে সমুদায়ের প্রতি তাঁহাকে কাজে কাজেই বিশ্বাস করিতে হইয়াছিল। ধর্ম্মসংক্রান্ত অনেক অমূলক বিষয়ে হিরডোটস বিশ্বাস করিতেন বটে কিন্তু সেই সমস্ত বিষয় এই রূপ ভঙ্গীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, সে গুলি অবাস্তবিক বলিয়া সহজেই পাঠকের প্রতীতি জন্মে। নিজে কিন্তু তৎ সম্বন্ধে আপন মতামতের কোন কথা লিখিতে সাতিশয় সঙ্কুচিত হইতেন।

হিরডোটসের ইতিহাস নয় অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায় গুলি একাদিক্রমে সংখ্যা করা নহে তৎপরীবর্ত্তে এক এক দেবতার নামে এক এক অধ্যায়ের নাম করণ হইয়াছে যথা —

১ ম অধ্যায় ক্লায়ো অর্থাৎ পুরাবৃত্ত শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

২ য় ইউটারপি অর্থাৎ সংগীত সরস্বতী।

৩ য় ফেলিয়া, পল্লীগ্রাম বর্ণনা ও হাস্যরসাশ্রিত নাটকের অধিষ্ঠাত্রী।

৪ র্থ মেল্পমীনি, কাব্যের ঐ

৫ ম টরপ্‌সিকোরী, নৃত্যের ঐ

৬ ষ্ঠ ইরেটো, গীত ও আদিরসের ঐ

৭ ম পলিহীমনিয়া, অলঙ্কারের ঐ

৮ ম কালীয়োপী, বক্তৃতাশক্তির ঐ

৯ ম ইউরেনিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রের ঐ

সংসার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

হায় হায়! পোড়া কাল সতত জ্বালালি,
না পেতে টোপের স্বাদ টানিয়া বিন্ধিলি।
দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মী হলো অন্তর্ধান,
দৃষ্টিতে মিলালো সব; বাজী অবসান।
কেন হে গোষ্ঠীর পতি ভৃত্যের সমান,
চুপে চুপে গুপ্ত দ্বারে করিছ প্রস্থান।
অপূর্ব্ব প্রাসাদ এই কারে দিয়ে যাও,
রিক্ত পদে আহা মরি কত দুঃখ পাও।
নীচ হেন দেখি কেন নাহি গণে কেহ,
সংঘর্ষণে পিষ্ট হয়ে ক্লিষ্ট হলো দেহ।
মানস পূরিয়া লক্ষ্মী দীনে বিলায়েছ,
মুষ্টি আশে নীচদ্বারে কেন বসি আছ।
কমল কোমল শয্যা কাড়িয়া কে নিল,
কোন প্রাণে পোড়া কাল ভূমে শোয়াইল।
জাগিয়া যামিনী কেন করিছ যাপন,
পাশে কেন চারুকেশী না করে ব্যজন।
ভাবিয়া পূর্ব্বের দশা তনু জ্বর জ্বর,
মানসে অজ্ঞান মোহে লেগেছে সমর।
কোথা সে বান্ধব, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন,
নিদাঘে ফুরালো বারি ছোটে ভেকগণ।
আজ্ঞায় করেছে ধরা আত্ম সমর্পণ,
আজি কেন ধূলি মুষ্টি পেতে আকিঞ্চন।

পীড়িত পীড়িছে মরি, ঋতু দুরাচার,
বাণচ্ছিন্ন কুম্ভকর্ণে বানর প্রহার।
তপন, পবন এবে পাইয়া সময়,
দহিছে ভাঙ্গিছে দেহ ; ধিক্‌রে নির্দ্দয়।
অন্যে ভুঞ্জে অট্টালিকা ; বৈরী টিটিকারী,
শৃগালে কাড়িয়া খায় দেখে রে কেশরী।
মনের মতন তব আরাম শোভন,
ধরেছে কি দশা আসি কর দরশন।
ভেঙ্গেছে পল্লব যত ছিঁড়ে ফল ফুল,
ধূলায় পড়িয়া আছে পাদপের কুল।
সাধের মালতী তব উদ্যানে শোভন,
অযতনে শীর্ণ, আছে এখন তখন।
ময়ূর ময়ূরী কোথা ছেড়ে পলায়েছে,
না দেখি নবীন কলি ভ্রমর ত্যজেছে।
কাল যে দেখিতে ছিল কত আকিঞ্চন,
আজি ভাবো দৃষ্টি শূল কিসের কারণ।
শেষ সুখ পরসুখ শাস্ত্রকারে কয়,
দেখি তব মনঃপীড়া হয়েছে প্রত্যয়।
দুরন্ত গ্রীষ্মের শেষ শীতল বর্ষণ,
তাই বটে বোবা বিধি করেছে সৃজন।
ওকি ! ওযে রূপে কালি কামে জিনে ছিল
আজি সেই স্নিগ্ধ কান্তি ছেড়ে কোথা গেল।

অঞ্জন জিনিয়া বর্ণ সুরম্য কুন্তল,
হরিয়া শোনের নুড়ি বসালে কে বল।
ঢল ঢল ভাসা আঁখি তুলিয়া কে নিল,
পুরে দিয়া পোড়া কড়ি ভাল ফাঁকি দিল।
সূক্ষ্মাগ্র উন্নত নাসা ; মুকুতা বদন,
হরেছে ভেঙ্গেছে কেরে দুখানি শ্রবণ।
মোমের সুন্দর বাহু ; হাঁরে দুরাশয়,
খাঁম্‌চায়ে বিকৃত কোন্ করেছে নির্দ্দয়।
জিনি নব কোকনদ সুঠাম চরণ,
কে করেছে ফুটি ফাটা বিকৃত দর্শন।
দর্পে যেই ওষ্ঠ ওই বিম্বে জিনে ছিল,
গলিত কদলী দেখি লাজে লুকাইল।
কেনরে পাগল কাল ! কি দোষ পাইলি,
কেন অলক্তকরসে কালি ঢেলে দিলি।
কাল মেঘে রাকাশশি কিভাবি ঢাকিলি,
নবনীত পিণ্ড কেন গোময় করিলি।
কি ভাবি যত্নের চিত্র নয়নের ধন,
খুঁটিয়া নির্ব্বোধ হাঁরে করিলি এমন।
হৃদয়ে তুলিতে যারে হতো আকিঞ্চন,
তারে দেখি স্পর্শ ভয়ে ভীত হয় মন!
স্বরূপ বলোরে তোরে জিজ্ঞাসিব কাল,
সমভাবে কারো কি কাটেনা চিরকাল ?

কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত

অবোধ-বন্ধু।

"করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

৩য় ভাগ] আষাঢ়,—১২৭৬। [৩য় সংখ্যা।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

১৭৯৩ সালের শেষ ভাগে টুলোঁ নগর ফরাশিদিগের দ্বারা পুনর্ব্বার অধিকৃত হয়। তৎকালে নেপোলিয়নের বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসরের অধিক হয় নাই। এত অল্প বয়সে এরূপ বীরত্ব, এরূপ রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন করাতে ফ্রান্সদেশে তাঁহার যশঃশশধর উজ্জ্বল ভাবে উদয় হইলেন; ফরাশিরাজপুরুষেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদোন্নতি করিয়া দিয়া ইটালি অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। এই জনপদের মধ্যস্থলে রোমান্ কাথলিক ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান গুরু পোপ নামক নরপতির রাজত্ব ছিল। অতি পূর্ব্বকালে পোপেরা যৎসামান্য যাজক মাত্র ছিলেন, রোম নগরীর ধর্ম্মযাজকতা করিয়া কাল যাপন করিতেন। কিন্তু স্থান মাহাত্ম্যে তাঁহাদিগের ক্রমেই মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যৎকালে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রথম প্রাদুর্ভূত হয়, তখন এবং তাহার পর দুই তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত রোম নগরী ইয়োরোপ খণ্ডের অধীশ্বরী ছিলেন। কিন্তু কালক্রমে রোম সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ হইলেও রোমের ধর্ম্মযাজকদিগের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, বরং রোম নগরী বহুকালাবধি সর্ব্বজনের নিকট সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া তত্রত্য ধর্ম্মযাজক তাবৎ খ্রীষ্টানের নিকট সমধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাজন হইয়া উঠেন। রোম নগর ক্রমে তীর্থস্থান স্বরূপ হইয়া উঠে, অখণ্ড খ্রীষ্টমণ্ডল হইতে লোক জন আসিয়া রোমের ধর্ম্মযাজকের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ধর্ম্মযাজকেরাও সুচতুর লোক ছিলেন, যাহাতে এই ভক্তি চিরস্থায়িনী হয়, তাহার নিমিত্ত অশেষ উদ্যোগ, অশেষ চাতুরী অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইয়োরোপের পশ্চিম খণ্ড নিবাসী লোকদিগের মধ্যে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া উঠিল যে,

পোপই খৃষ্টানদিগের প্রধান গুরু; তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করা আর সাক্ষাৎ যিশুখ্রীষ্টের মত গ্রহণ না করা একই কথা;—স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার চাবি পোপের হস্তে সঞ্চিত আছে, তিনি মনে করিলে জঘন্য মহাপাতকী নরাধমকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন, অসন্তুষ্ট হইলে পরম ধার্ম্মিক সাধু পুরুষকে নরককুণ্ডে পাতিত করিতে পারেন; খৃষ্টান্ মাত্রেরি কর্ত্তব্য যে, ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয় সহকারে পোপের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে, নচেৎ পরকালে নিস্তার নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই সমস্ত মত অবাধে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু উল্লিখিত সময়ে লূথর নামক এক জন জর্ম্মানি দেশীয় মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া পোপের মাহাত্ম্য অস্বীকার পূর্ব্বক ইয়োরোপের পশ্চিম খণ্ডের খৃষ্টান্দিগকে দুই সম্প্রদায়ে বিভাগ করিয়া যান। প্রটেস্‌টান্ট্ নামক সম্প্রদায় পোপের প্রাধান্য স্বীকার করে না, আর প্রাচীন কাথলিক্ সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করে। যাহা হউক, লূথরের আবির্ভাব অবধি পোপদিগের ক্ষমতার অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে এবং ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে পোপেরা ইটালির অপরাপর নরপতির এক রাজা মাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ইয়োরোপের তাবৎ রাজসরকারেই এই পদ্ধতি চলিত আছে যে, প্রত্যেক রাজসভাতে অন্যান্য রাজার প্রেরিত এক এক জন দূত আসিয়া অবিচ্ছিন্ন কাল অবস্থিতি করেন এবং তদ্দেশীয় শুভাশুভ সংবাদ আপন প্রভুর নিকট প্রেরণ করেন। এতদ্দারা এই হয় যে, কোন রাজাই অন্য রাজার প্রতিকূলে সহসা কোন কার্য্যারম্ভ করিতে পারেন না, সুতরাং যখন বিপক্ষতা করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, তখন যে রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, তাঁহার দূতকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতে হয় যে, তুমি স্বদেশে প্রতিগমন কর।

উল্লিখিত প্রথানুসারে, ফরাশি রাজপুরুষদিগের পক্ষীয় যে রাজদূত রোম নগরে পোপের নিকট নিযুক্ত ছিলেন, একদা অকস্মাৎ রোমের জনতা উন্মত্তবৎ হইয়া তাঁহার প্রাণ বধ করিল। পোপকে এ বিষয়ের প্রতিবিধান করিতে কহিলে পর, তিনি বিশেষ মনোযোগী না হওয়াতে ফরাশি রাজপুরুষেরা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সেই উপলক্ষে নেপোলিয়ন ইটালিস্থিত ফরাশি-সেনার উপর অধ্যক্ষতা করিতে যান।

যৎকালে রাজ্যের বহির্ভাগে এইরূপ যুদ্ধসজ্জা প্রবর্ত্তমান ছিল, সেই সময়েই অভ্যন্তরে অর্থাৎ পারিস রাজধানীতে এক নূতন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া গেল। রব্‌স্‌পিয়র ও তাঁহার সঙ্গীদিগের অত্যাচার ক্রমে এত অসহ্য হইয়াছিল যে, তাঁহার বিপক্ষেরা পরিশেষে 'মরিয়া' হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। তাহারা ষড়্‌যন্ত্র করিয়া এক উদ্যোগে উল্লিখিত দলের অন্তঃপাতী প্রধান প্রধান ব্যক্তির নামে অভিযোগ উদ্ঘাটন পূর্ব্বক, এত দিন যে উপায়ে রব্‌স্‌পিয়রদল লোকের ধন প্রাণ

অপহরণ করিতেছিল সেই উপায় দ্বারাই তাহাদিগেরও উচ্ছেদ সাধন করিল। এতদুপলক্ষে রাজ্যশাসন বিষয়ে আবার পরিবর্ত্ত বিধান করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। সেই সময়ে যাঁহারা প্রাধান্য প্রাপ্ত হইলেন তন্মধ্যে যিনি সেনা সম্পর্কীয় কার্য্যসমূহের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন, তিনি নিজ পারিষদবর্গের পদোন্নতির নিমিত্ত সর্বত্র নূতন লোক নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনুসারে নেপোলিয়নকে ইটালি হইতে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দেওয়া হইল। তৎকালে 'লাভেন্‌ডী' নামক ফ্রান্সের পশ্চিমাঞ্চলস্থ এক প্রদেশে ঘোরতর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত ছিল, তথাকার সম্ভ্রান্ত ও কৃষাণগণ একমত হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লব সম্পর্কীয় রাজপুরুষদিগের প্রতি অপরক্ত হইয়া ফ্রান্সের প্রাচীন রাজবংশকে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত শস্ত্রধারণ করিয়াছিল। নেপোলিয়নকে তত্রত্য এক সৈনাপত্য পদ প্রদান করা হইল। তিনি কর্তৃপক্ষের আজ্ঞা অন্যান্য করিতে না পারিয়া পারিসে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু লাভেন্‌ডীতে যাইতে কোন মতেই স্বীকৃত হইলেন না। তিনি সেনাসম্পর্কীয় প্রধান কর্ম্মচারীকে অশেষ প্রকারে বুঝাইতে চাহিলেন যে, তাঁহার পক্ষে ইটালিতে থাকাই পরামর্শ, কারণ তিনি সে স্থানের সহিত বিলক্ষণরূপে পরিচিত আছেন এবং তদ্দেশীয় যুদ্ধে জয়লাভ হইবার অনেক সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার প্রভু কর্ণপাত করিলেন না, ইহাতে উভয়ের অকৌশল হইল; নেপোলিয়ন জিদ করিতে লাগিলেন; তিনি আপন মত পরিবর্ত্ত করিলেন না। পরিশেষে নেপোলিয়ন কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া সৈনিক পদবী হইতে নিঃসম্পর্ক হইলেন। এই ভাবে তাঁহার কয়েক মাস ক্ষেপণ করা হয়।

ইতিমধ্যে পারিসের অধিবাসীবর্গ তৎকালীন রাজপুরুষদিগের উপর আবার অপরক্ত হইয়া উঠিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে 'কন্‌ভেন্‌শন্‌' নামক যে প্রতিনিধিসমাজ সমাগত হইয়া ফ্রান্সের পূর্ব্বতন শাসনপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে অন্যথাভূত করিতে চাহিয়াছিল এবং রবস্‌পিয়র প্রভৃতি নিজমতোন্মাদিত ব্যক্তিবর্গের লীলাভূমি স্বরূপ হইয়াছিল, যে কন্‌ভেন্‌শন্‌ রাজার প্রাণদণ্ড, অগণ্য লোকের প্রাণদণ্ড করিয়া বিভীষিকার রাজত্ব জাজ্বল্যমান করিয়া তুলিয়াছিল, যাহার আজ্ঞানুসারে ফ্রান্সে শকাব্দা বদল হইয়া গেল, মাসের নাম, জিলা পরগণা ইত্যাদির নাম, ওজন বাটখারার নাম, মাপ পরিমাণ টাকা মোহর ইত্যাদির নাম নূতন হইয়া উঠিল, যে কন্‌ভেন্‌শন্‌ ফ্রান্স দেশকে সর্ব্বপ্রকারে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করাতে রাষ্ট্রবিপ্লব নামক প্রকাণ্ড ব্যাপারের যথার্থ মাহাত্ম্য রক্ষা হইয়া ছিল।[১] পারিসের

(১) ইয়োরোপে প্রাচীন কালাবধি খৃষ্টীয় শাক এবং জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি প্রভৃতি মাস প্রচলিত। এই সকল মাসের নাম রোমক জাতির দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপের সময় প্রকাশ হয়। তাহারা যে সকল দেব দেবী বিশ্বাস করিত, তাঁহাদিগের নাম দিয়াই মাসের নাম প্রস্তুত

লোকেরা এখন তাহারি প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহারা নিজে আপনাদের মধ্য হইতে এক দল সৈন্যের আয়োজন করিয়া বল পূর্ব্বক কন্‌ভেন্‌শনের উচ্ছেদসাধনে সসজ্জ হইল। কন্‌ভেন্‌শন্ ইহার প্রতিবিধান বিষয়ে উপায়ান্তর না দেখিয়া অপরক্ত নাগরিকদিগকে দমন করিবার ভার নেপোলিয়নের উপর অর্পণ করিলেন। নেপোলিয়ন সুবিবেচনা পূর্ব্বক পারিস নগরের মহলে মহলে এইরূপে কতকগুলি সৈন্যদল বিন্যাস করিয়া রাখিলেন যে, পুরবাসীরা সকলে একত্র হইয়া যে উৎপাত করিবার সংকল্প করিয়াছিল তাহাদিগকে উহা অসাধ্য বোধে পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৭৯৫ সালের ভাঁদ্‌মিয়ের মাসের ১৩ই ও ১৪ই তারিখে হাজার চল্লিশেক পুরবাসী লোক মিলিত হইয়া বন্দুক বর্শা তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নগরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লী হইতে নির্গত হইল এবং কন্‌ভেন্‌শনের অধিবেশন ভবনের দিকে যাত্রা করিল। তাহাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, কন্‌ভেন্‌শনের সদস্যদিগকে বলপূর্ব্বক অপসারিত করিয়া আপন দলের সর্দারদিগকে রাজকার্য্যের

করিয়াছিল যথা, জানুয়ারি জেনস্ দেবতার নামে, মার্চ মার্স নামক যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামে, ইত্যাদি। কিন্তু ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় এই সকল পরম্পরাগত নাম রহিত হইয়া নূতন রচনা হইল যথা,—

জর্মীনাল অর্থাৎ মুকুল হইবার মাস } এই তিন
ফ্লোরেয়াল ... ...পুষ্পমাস } মাসের
প্রেরীয়াল্ .. ধান কাটার মাস } নাম বসন্ত

গ্রীষ্ম।

মেসীদর যে মাসে ধানের গাদা দেয়,
থর্মীদর ... .. যে মাসে তাত কোটে,
ফ্রুক্টীদর ... ... যে মাসে ফল পাকে।

ইত্যাদি। তদ্ব্যতীত, রাজকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে ফ্রান্স পূর্ব্বে ৩২ জিলাতে বিভক্ত ছিল, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে ৮৩ পরগণা করিয়া বিভাগ হইল। সকল পরগণাই আয়তনে পরস্পরের সমান এবং যে পরগণাতে যে নদী বা যে পর্ব্বত বা যে কোন অন্য বস্তু সুপ্রসিদ্ধ, তদনুসারে তাহার নামকরণ হইল। ওজন, বাটখারা, টাকা, পয়সা, জলীয় দ্রব্যের পরিমাণ, কাপড় ইত্যাদির মাপ, জমীর কালি এই সকল বিষয়ে এক সর্ব্বসাধারণ প্রণালী সংস্থাপিত হইল। সর্ব্বপ্রকার পরিমাণেই দশ গুণোত্তর রীতি অবলম্বিত হইল, অর্থাৎ দশ পয়সায় আনা, দশ আনায় টাকা, দশ টাকায় ১ মোহর; সেই রূপ ১০ ইঞ্চিতে এক ফুট, দশ ফুটে ১ গজ, দশ গজে এক [illegible]; সেই রূপ দশ ছটাকে এক পোয়া, [illegible] পোয়াতে এক সের, দশ সেরে এক [illegible]ণ, ইত্যাদি। এই প্রণালী তাবৎ পরিমাণের পক্ষেই সংস্থাপন করা হইল। এই সমস্ত মহাপরিবর্ত্তের কর্ত্তা কন্‌ভেন্‌শন্ নামক প্রতিনিধি সমাজ। অদ্যাপি মাসের নাম ব্যতীত আর সকল ব্যবস্থাই অক্ষত রহিয়াছে এবং তদ্দ্বারা হিসাব পত্রের পক্ষে এক বিশেষ সুবিধাও হইয়া থাকে।

(২) ফরাশিরা রাষ্ট্রবিপ্লব উপলক্ষে যে নূতন মাসের নাম সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার অন্যতরের নাম ভাঁদ্‌মিয়ের। ২৮এ সেপ্টেম্বর অবধি ২২এ অক্টোবর পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি দিবসের এই সংজ্ঞা হইয়াছিল।

ভারার্পণ ও নূতন প্রকার শাসনপ্রণালী সংস্থাপন করিবে। কিন্তু নেপোলিয়ন আপনার অধীনস্থ সৈনিকদিগকে এরূপ স্থান বুঝিয়া বুঝিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন যে, অতিসামান্য প্রয়াস দ্বারাই পুরবাসী দলের চেষ্টা বিফল করিয়া দেওয়া গেল। দুই তিন স্থান হইতে অত্যল্প সংখ্যক দুই তিন দল সুশিক্ষিত সেনা অগ্রসর হইবামাত্র, অত যে ঘটা করিয়া পুরবাসীরা আসিতেছিল, তাহারা ভয় পাইয়া গেল। যে যে রাস্তাতে তাহাদের বড় জটলা হইয়াছিল, সে সমস্তই অচিরাৎ পরিষ্কার হইয়া গেল এবং উল্লিখিত ১৪ ই তারিখের শেষ বেলার মধ্যে নেপোলিয়নের বিচক্ষণতা গুণে পুরবাসীদিগের বিদ্রোহ-বাসনা নিবারিত ও উপশান্ত হইল, তথাপি এই ব্যাপারে দুই শত আন্দাজ লোক হতাহত হয়। যে দিবসে এই ঘটনা হয়, তাহার নামানুসারে এই কাণ্ড ফরাশি ইতিহাসে '১৩ ই ভাঁদ্‌মিয়েরের ব্যাপার' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

১৩ ই ভাঁদমিয়েরের ব্যাপার উপলক্ষে বিজয়ী পক্ষকেই শাসন প্রণালী গত কিছু কিছু পরিবর্ত্ত সংস্থাপন করিতে হইল। এক্ষণে ডিরেক্‌টর নামক পাঁচ জন সর্ব্ব প্রধান রাজপুরুষ দৈনন্দিন রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত হইলেন। ইঁহারা আইন চালাইবার বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র হস্তক্ষেপ করিতে পাইতেন না। সে ভার অপর দুই সমাজের হস্তে ন্যস্ত হইল, একের নাম প্রবীণদিগের সমাজ, ইহা ইংলণ্ডীয় শাসন প্রণালীর অন্তঃপাতী সম্ভ্রান্তদিগের সভার[৩] অনুরূপ। অপরের নাম পঞ্চশতী অর্থাৎ পাঁচশ জনের সভা; ইঁহারা সকলেই প্রজার প্রেরিত প্রতিনিধি। এরূপ ব্যবস্থা নিরূপিত হইল যে, ডিরেক্‌টরেরা মধ্যে মধ্যে বদলী হইবেন। এ ব্যবস্থা সংস্থাপন কল্পে নেপোলিয়ন বিশিষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিলেন বলিয়া আপাতত তাঁহাকে ফ্রান্‌সের অভ্যন্তরস্থিত তাবৎ সেনাদলের সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে অধিরোপিত করা হইল। তিনিও স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মদক্ষতাগুণে অনেক সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন করিলেন; ন্যাশনাল্ গার্ড নামক যে এক শত চারি পল্‌টন্ সৈন্য ছিল এবং সমস্ত ফরাশি জাতির অন্তর্ভূত যুদ্ধক্ষম বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রকেই যে সেনাদলের মধ্যে নিবিষ্ট হইতে হইত, তিনি সেই নিতান্ত কার্য্যোপযোগী সেনাদলের অবস্থা অনেক অংশে উন্নত করিয়া তুলিলেন; আর তদ্ব্যতীত, ডিরেক্‌টরবৃন্দিগের সম্ভ্রম রক্ষা এবং আইন চালাইবার ব্যাপারে নিযুক্ত উল্লিখিত দুই সমাজের সম্ভ্রম রক্ষা, এই উদ্দেশে অন্য দুই দল সেনার আয়োজন করিলেন।

যৎকালে তিনি এই সকল প্রকরণ করিতে ছিলেন, তখন পারিস নগরে জোজেফীন্ নাম্নী এক রূপগুণালঙ্কৃতা রমণী বাস করিতে ছিলেন। ফ্রান্‌সের

(৩) তারিণীচরণ কৃত ভূগোল বিবরণের ইংলণ্ড প্রকরণে তথাকার 'শাসন-প্রণালী বিষয়ে অতি সুন্দর বর্ণনা বিদ্যমান আছে, সুতরাং চর্ব্বিত চর্ব্বণ পরিহারার্থ আমরা সে বিষয়ে কিছুই লিখিলাম না।

অধিকৃত আমেরিকাবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র দ্বীপে এই মহিলার জন্ম হয়। পরে তিনি পিতৃ মাতৃ বিয়োগে অনাথ ও নিরুপায় হইয়া ফ্রান্সে আগমন পূর্ব্বক স্বভাবসিদ্ধ নানা রমণীয় গুণগ্রামের প্রভাবে তত্রত্য ভদ্রসমাজে পরিগৃহীত এবং কিছুকাল গতে একজন সুপ্রসিদ্ধ পদস্থ সেনাপতির সহধর্ম্মিণী হইলেন। কিন্তু রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটিত অশেষ দৌরাত্ম্যের আনুষঙ্গিক তাঁহার স্বামীর প্রাণদণ্ড হয়, এ গতিকে তিনি এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তান লইয়া বিধবা হয়েন। একদা জোজেফীনের পুত্র নেপোলিয়নের দ্বারস্থ হইয়া আবেদন করিল যে, আমার পিতা যে তরবারি ব্যবহার করিতেন, তাহা প্রাণ-দণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের বিষয় বাজেয়াপ্ত হইবার নিয়ম অনুসারে সরকারি ভাণ্ডারে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমার পিতার ব্যবহারের সামগ্রী বলিয়া আমি সেই তরবারি খানি পাইলে বড়ই কৃতার্থ হই। অল্পবয়স্ক বালকের এরূপ তেজস্বিতা-সহকৃত কাতরতা দেখিয়া নেপোলিয়ন তরবারি প্রদান করিলেন এবং পিতার সামগ্রী পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবা মাত্র বালকের দুই চক্ষু অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইল, ইহা দেখিয়া তিনি আরো আর্দ্র হইয়া গেলেন, তিনি জোজেফীনের শিশুর প্রতি এরূপ সৌজন্য ও এরূপ করুণা প্রদর্শন করিলেন যে পুত্রের নিকট সেই সংবাদ শুনিয়া ভদ্রতা রক্ষার নিমিত্ত ঐ মহিলা নেপোলিয়নের ভবনে উপনীত হইয়া তাঁহার নিরুপাধি অনুকম্পার জন্য অশেষ প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। এই সূত্রে উভয়ের পরিচয় এবং কিছুকাল গতে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হইল। নেপোলিয়ন কিয়দ্দিনের আলাপে এরূপ মোহিত হইলেন যে, নারী বয়োধিকা হইলেও তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন, জোজেফীন্ নবযৌবনোদ্ধত যশস্বী যোদ্ধার গুণে অনুরাগিণী হইলেন। সুতরাং পরিণয়ক্রিয়া সমাধা হইল এবং নেপোলিয়ন এত দিন নিতান্ত উদাসীন ও গৃহশূন্য ব্যক্তির মত অবস্থিত থাকিয়া, অকস্মাৎ এক দিন পুত্র-কন্যাসমেত জোজেফীন্‌কে বিবাহ করিয়া পুত্র কলত্র পরিবৃত গৃহস্থ হইয়া উঠিলেন।

নেপোলিয়নের নব পরিণীত ভার্য্যার সহিত তখনকার প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল ; এ কারণ তাঁহার সুপারিস ও আনুগত্য দ্বারা নেপোলিয়ন বিবাহের অচিরকাল পরেই ইটালীয় সৈন্যদলের (৪) সর্ব্বাধ্যক্ষ সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হইলেন।

---

(৪) যাহারা যে দেশে লড়িতে যায়, ফ্রান্সের সেনা সম্পর্কীয় ভাষাতে তাহাদিগকে 'তদ্দেশীয় সৈন্যদল' এইরূপ বলা রীতি আছে, যেমন যে সেনাকে ইংলণ্ডে লড়াই করিবার নিমিত্ত পাঠান হইবেক বলিয়া স্থির হইল, ফরাসিরা সেই সেনাকে বলিবে 'ইংলণ্ডের সৈন্যদল' অথবা 'ইংলণ্ডীয় সৈন্য দল'।

সুরবালা-কাব্য।

প্রথম ভাগ।

তৃতীয় সর্গ।

" জ্বলিতন্ন হিরণ্যরেতস-
ঞ্চয়নাস্কন্দতি ভস্মনাঞ্জনঃ।
অভিভূতিভয়াদসূনতঃ
সুখমুজ্‌ঝন্তি ন ধাম মানিনঃ

অহো ভয়ঙ্কর এ ঘোর ঘটনা!
এত কি তোমার হইল ভার;
নিবালে আপনি আপন চেতনা,
বুকে শেল দিলে দুখিনী মা'র!

২

ডুবালে বিষাদে সতী সীমন্তিনী,
অবলা সরলা যুবতী জায়া;
কাঁদালে কোমলা বালিকা নন্দিনী,
ভুলিলে ভগিনী ভেয়ের মায়া!

৩

ছোট ভাই কত আশা ভরসায়,
বেড়েচোলেছিল তোমার সনে;
একেলা তাহারে ফেলে দুনিয়ায়,
পালাইতে দয়া হ'ল না মনে!

৪

দুরবহ ভার শিরে দিলে তার,
এড়াতে আপনি, জড়ালে তারে;
হায় যে হৃদয় তেমন উদার,
এত স্বার্থপর হ'তেও পারে!

হেরিয়ে তোমার মহান উদয়,
রিষে জরজর যাঁদের মন;
ভিতরে হৃদয় হলাহলময়,
মুখে মধুমাখা বচন কন;

৬

বাঁচিলেন তাঁরা তোমার মরণে,
শকুনি সুখিনী মানুষ ম'লে;
খল কাপুরুষ খুসি হয় মনে,
প্রতিবাসীগণে ফতুর হ'লে।

হা জনমভূমি, জাননা জননী,
শিরোমণি তব হরেছে কাল;
আচম্বিতে অস্ত গেছে দিনমণি,
আঁধারে জোনাকী জ্বলিছে ভাল।

আসল কিস্মতী বিপুল আকর,
পূরো আবিস্কার না হ'তে তার;
ভূকম্পে উঠিল কেঁপে ঘোরতর,
লুকাল গরভে ধরণী মা'র!

৯

এত দিন কত অমূল রতন,
কুড়াতো কাঙালি বাঙালি গণে;
ভূষিতো স্বদেশ, ভূষিতো ভবন,
ভূষিতো শরীর, ভূষিতো মনে।

১০

কেন হে কৃপণ করুণ-হৃদয়,
স্বদেশীয় ভ্রাতাগণের প্রতি;
মনেতে তোমার কি হ'ল উদয়,
আত্মঘাতে কেন ধাইল মতি!

১১

সেই দীর্ঘাকৃতি প্রশান্ত উদার,
মধুর গম্ভীর মূরতি তব ;
বিরাজে সতত সম্মুখে আমার,
শ্রবণে বাজে সে গভীর রব।

১২

বেলুনের মত দেহের বলন,
বরণ নূতন খুঁড়ের ডাল ;
যেন বায়্‌রনের অভেদ আনন,*
কর পদতল উজল লাল।

১৩

দুই চক্ষু যেন তারকা ঝলকে,
বিশ্ব ভেদ করি ধাইছে জ্যোতি,
প্রশস্ত বিমল ললাট ফলকে,
বিরাজেন যেন সুমতি সতী।

১৪

মনের তেজের প্রভা পরিকর,
উজলে দেহের রূপের ছলে ;
নর রূপ ধরি দেব দিবাকর,
বিহরেন যেন ধরণীতলে।

১৫

কিবে স্বরগীয় কান্তি শান্তিময়,
আনন মণ্ডলে প্রকাশ পায় ;
হয়েছে প্রশান্ত অরুণ উদয়,
তরুণ কিরণ রাজিছে তায় !

১৬

নিরখি নিরখি স্নেহের নয়নে,
দয়াময় কোন দেবতা হেন ;
করুণ হৃদয়ে ক্লান্ত জনগণে,
কৃপা বিতরণ করেন যেন।

১৭

অমায়িক লোক তোমার মতন,
এ দেশে কোথাও নাহিক পাই ;
তব তেজোরাশি করে ধরষণ,
জগতে এমন মানুষ নাই !

১৮

হে মহা পুরুষ বুঝি দেখে ছিলে,
ভবিষ্যতে কোন তেজের হানি ;
সহিতে নারিলে, অগ্রে উঠাইলে
আপন উপরে আপন পাণি !

১৯

কেহ না এগোয়্‌ জ্বলিলে অনল,
দুপায়ে মাড়ায় হইলে ছাই ;
পরিভব ভয়ে মনস্বী সকল,
প্রাণ ত্যেজে, তেজে রাখেন তাই।

২০

তেজ যে কি ধন কাপুরুষ জন,
চিনিতে পারে না মরণাবধি ;
হায় রে চেনে না অসতী যেমন,
সতীত্ব রতন সুখের নিধি !

২১

তুমি ছিলে খাঁটি তেজীয়ান লোক,
পাবেন আলোক হৃদয় মাজে ;
কাপুরুষ লোকে ভরেছে ভূলোক,
এ নরক কি গো তোমায় সাজে ?

* মূরের প্রণীত লর্ড বায়রনের এক জীবন বৃত্তান্ত আছে, অক্টেবো আকারে চারি খণ্ডে তাহা একবার মুদ্রিত হয়। সেই মুদ্রিত পুস্তকের প্রথম খণ্ডের গোড়াতে লর্ড বায়রনের যে প্রতিমূর্ত্তি মুদ্রিত আছে, তাহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ কর।

২২

হে দেব দেশের প্রতি কৃপা করি,
পাঠাও তোমার তেজের কণা;
বহুক উদার জ্ঞানের লহরী,
ঘুচুক নিস্তেজ কুক্রুটেপনা!

২৩

লোকে আর যেন তেজীয়ান্ লোকে,
বিপাকে পাড়িতে নাহিক চায়;
মনের পাতক জ্ঞানের আলোকে,
সময় থাকিতে দেখিতে পায়।

২৪

হরিতে না যায় মানীজন মান,
কারো দেখে কেহ না হয় দুখী;
হউক সকলে স্বরগ সমান
স্বাধীনতা সুখে পরম সুখী!

২৫

ভ্রাতৃশোক-শেলে সখা সুকুমার,
পড়িয়ে আছেন পৃথিবীতলে;
নয়ন মুদিত রয়েছে তাঁহার,
নিশ্বাস প্রশ্বাস নাহিক চলে।

২৬

বিষম নীরব, স্তবধ ভীষণ,
নাহি আর যেন শরীরে প্রাণ;
নড়েনা চড়েনা, শবের মতন,
পাণ্ডাশ বরণ, বিহীন জ্ঞান।

২৭

চারিদিক আছে বিষণ্ণ হইয়ে,
ভূতলে চন্দ্রমা পড়েছে খসি;
মৃত শিশু যেন কোলে শোয়াইয়ে,
ধরণী জননী ভাবেন বসি।

২৮

কেঁদে কেঁদে যেন হইয়ে আকুল,
শোকময় গান অনিল গায়;
ছড়ায়ে ছড়ায়ে সাদা সাদা ফুল,
যেন শববপু সাজায়ে দেয়।

২৯

সুধাময় সেই শীতল সমীরে,
প্রাণের ভিতর জুড়াল যেন;
বহিল নিশ্বাস অতি ধীরে ধীরে,
স্বপনের মত স্ফুরিল জ্ঞান;

৩০

বোধ হ'ল দুই করুণ নয়ন,
চাহিয়ে তাঁহার মুখের পানে;
স্নেহ-প্রীতি-ময় করুণ বচন,
পশিয়ে শ্রবণে জীয়ায় প্রাণে।

৩১

রূপে আলো করি দাঁড়ায়ে সমুখে,
রসাঞ্জনময়ী অমৃতলতা;
ঢুলায়ে ফুলের পাখা বুকে মুখে,
ধীরে ধীরে কন সদয় কথা।

৩২

"কেন অচেতন, কি হয়েছে হায়,
হে জীবিতনাথ আজি তোমার!
ও কোমল তনু ধূলায় লুটায়,
নয়নে দেখিতে পারিনে আর।

৩৩

উঠ উঠ মম হৃদয়বল্লভ,
উঠ প্রাণসখা সদয় স্বামী;
মেল দুটি ওই নয়ন পল্লব,
হেরিয়ে আনন জুড়াই আমি।

৩৪

তাঁর শোকে আজি বাড়ীর সকলে,
যেন ভেকোহারা, ব্যাকুল মন;
যেন চারিদিকে দাবানল জ্বলে,
ফাঁপরে পড়েছে হরিণীগণ।

৩৫

প্রজাবতী তব কাঁদেন গুঙরি,
বুক ফেটে যেন উঠিছে স্বর,
গোঙরায় মরি কাতরা কুররী,
হৃদয়ে বিঁধিলে শবর শর।

৩৬

ধাইয়ে বেড়ান জননী তোমার,
বদনে মায়ের বিকট হাসি;
রহি রহি আহা করি হাহাকার,
লুটায়ে পড়েন উঠানে আসি।

৩৭

এমন সময় থাকা না যুয়ায়,
ধূলায় পড়িয়ে মোহের ভোলে;
বিপদে ধীরের ধীরতা কি যায়?
উঠ, ব'স গিয়ে মায়ের কোলে!

৩৮

করিয়ে আঁধার এ সুখ সংসার,
চলিয়ে গেছেন তোমার ভাই;
তুমি বিনে আর শোকাতুরা মা'র,
জুড়াতে জগতে কেহই নাই।

৩৯

অলৌকিক তাঁর বুদ্ধি গুণগ্রাম,
বৃথায় এখন রহিল রবে;
তব যশোধাম পিতার সুনাম,
একেলা তোমায় রাখিতে হবে।

দুভেয়ের কাছে নানা উপকার,
আশা করেছেন জনমভূমি;
পুরাও একাকী বাসনা তাঁহার,
প্রতিভা প্রয়োগ করিয়ে তুমি।

৪১

দাদা চিরদিন জানিতেন মনে,
তোমারে ভেয়ের মতন ভাই;
এখন তোমায় লোকের নয়নে,
কাজেতে তেমন দেখান চাই।

৪২

পাল পরিজনে, তোষ মিত্রগণে,
প্রাণপণে রাখ দেশের মান;
ক্ষম শত্রুকুলে, কৃপা বিতরণে
দুখীজনে কর দুখেতে ত্রাণ।

৪৩

একি পরিতাপ, খেদে হাসি পায়,
কারো মন্দ তুমি করনি কভু,
তবু শত্রু তব আছে এ ধরায়;
ক্ষমিতে তাহাই বলিনু প্রভু।

৪৪

লোকের সুখ্যাতি পশিলে শ্রবণে,
সুযশা সুধীর পিরিতি পায়;
হীন কাপুরুষে রোষে অকারণে,
রিষে মনে মনে জ্বলিয়ে যায়।

৪৫

যশের কমলে আজব সৌরভ,
ললিত মধুর ঝাঁজাল চোকা;
মধুকরে করে গুঞ্জি গুঞ্জরব,
গোবরে গোঙায় গুবুরে পোকা।

৪৬
ক্ষম শত্রুকুলে, যে যাহা বলুক!
যে যত ভ্রূকুটি কিয়ে লাগুক্ পিছে;
তোমার হৃদয় করুণা করুক,
করুণা-ভাজন, কৃপণ, নীচে!

৪৭
একেলাই তুমি এক শত জন,
কাহারো বিরহে দমিতে নাই;
সব মিলে যাবে মনের মতন,
এ দুনিয়া নয় এমন ঠাঁই!

৪৮
আহা আর তবে দাদা হারা হয়ে,
নিতান্ত অবোধ বালক হেন;
গোলযোগময় এ ঘোর সময়ে,
ভূতলে পড়িয়ে রহিলে কেন!

৪৯
হে ত্রিদিববাসী অমর সকল,
তোমরা আমারে সদয় হও;
বরষি পতির শিরে শান্তিজল,
মোহ যবনিকা সরায়ে লও!

৫০
অমনি কে যেন ধরিয়ে সখায়,
তুলে বসাইল ধরণী তলে:
চারি দিকে চাহি না দেখি দাদায়,
দুলিল পাষাণ মনের গলে।

৫১
ছেলে বেলা থেকে জনক বিহীন,
পালিলেন দাদা পিতার মত;
শিখায় সকল শাস্ত্র দিন দিন,
খুলিয়ে দিলেন জ্ঞানের পথ।

৫২
যে দাদা বড়ই বাসিতেন ভাল,
সব আব্দার যাঁহার ঠাঁই;
যে দাদা বংশের সমুজ্জ্বল আলো,
সে দাদা এখন বাঁচিয়ে নাই!

৫৩
চোকের উপরে সব শূন্যময়,
কাঁদিয়ে উঠিছে আপনি প্রাণ;
ভারে ভেরে ভেরে ডুবিছে হৃদয়,
ধীর নীরে যেন ডুবিছে যান।

৫৪
জ্ঞান-বলে প্রবোধিয়ে বার বার,
বাঁধিলেন তুলে ডোবান বুক;
সে অবধি আহা সখার আমার,
বিষন্ন হইয়ে রয়েছে মুখ!

৫৫
সুরবালা, আহা কেন গো তোমার,
নয়ন ভরিয়ে আসিল জল:
হয়েছ কি দুখী দুখেতে সখার!
কি আছে মনেতে ভাঙিয়ে বল।

৫৬
জান না কি হায় প্রেমের বিরহে,
প্রেমিকে কি ঘোর যাতনা পায়;
কি ঘোর অনলে তার প্রাণ দহে,
বুকের ভিতরে কি হয়ে যায়!

৫৭
ব'স তবে, আজি আসি অভাগিনী,
পোড়া বিধি যদি না লাগে বাদে
সখার প্রেমের করুণ কাহিনী,
শুনাব তোমারে মনের সাধে।

ইতি সুরবালা কাব্যে আত্মহত্যা নামক তৃতীয় সর্গ

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

সমালোচন।

বিশ্বশোভা—গ্রন্থকার শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দেবী। পরিমাণ ১১৭ পৃষ্ঠা, কলিকাতা গুপ্ত যন্ত্র।

যাঁহাদের সংস্কার আছে যে, ভাষার উন্নতি জাতীয় উন্নতির বিশেষ আনুকূল্য করিয়া থাকে, তাঁহারা শুনিয়া পুলকিত হইবেন যে, ইহার মধ্যেই এতদ্দেশে স্ত্রীলোক গ্রন্থকারেরা পুরুষের সঙ্গে গ্রন্থ রচনা বিষয়ে পাল্লা দিতে আরম্ভ করিলেন। কৈলাসবাসিনীর বাঙ্গালা রচনা-নৈপুণ্য অনেকেরি পরিচিত থাকিবেক। ইঁহার প্রণীত "হিন্দু মহিলা গণের হীনাবস্থা" বিষয়ক সুললিত রচনাটি অনেকেই আস্বাদান করিয়া থাকিবেন। সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদিগের চিরবদ্ধমূল একটি প্রতীতি আরো দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। আমরা জানিতাম যে, লোকে আপনার অবস্থা আপনি যেমন গুছাইয়া বলিতে পারে, সচরাচর সেরূপ পরিস্কার বিজ্ঞাপন পরের মুখে হয় না। এদেশের মহিলাগণ কি সকল যন্ত্রণা অহর্নিশি ভোগ করে, কি সমস্ত ব্যবস্থা তাহাদিগের উন্নতির পথে কণ্টক স্বরূপ হইয়া আছে, বাল্যকালাবধি কিরূপ অভ্যাস বশত তাহারা বড় হইয়া অত "খেলনার সামগ্রীর" মত হইয়া যায়, তত্তাবৎ লোককে বুঝাইতে গেলে স্ত্রীলোকে যেরূপ চতুরতা প্রদর্শন করিতে পারে, কৈলাসবাসিনী সে বিষয়ের দেদীপ্যমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের ভূয়সী প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং এতদ্দেশীয় পাঠকবর্গের যে কিছু কিছু সহৃদয়তা আছে, সেই কীর্ত্তিবিস্তার দ্বারা তাহাও সপ্রমাণ হইয়াছে।

সংপ্রতি কৈলাসবাসিনী যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহার আকাংক্ষা আরো উচ্চতর, ইহাতে আরো অধিক ভরসা প্রকাশ পাইতেছে। অমায়িক ও ভাবুক চিত্তে ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় আলোচনা করিলে সহজেই যে সকল আশ্চর্য্য জ্ঞানকৌশল ও ক্ষমতা প্রতীয়মান হয়, তাহার কীর্ত্তন করা এই গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্য। কৈলাসবাসিনী পরমেশ্বরের নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের বিস্ময়নীয়তা, সৌন্দর্য্য ও কৌশল সমস্ত লোকের চক্ষে সুস্পষ্ট করিয়া দিবার নিমিত্ত তৎসমুদায়ের এরূপ এক বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যাহাতে পদে পদে কাব্যামৃতরসের সংস্রব দৃষ্ট হইবেক। তিনি কবির চক্ষে সংসারের মূর্ত্তি দেখিতে বসিয়াছেন, এবং সেই দেখিবার সময় তাঁহার তুলিতে যে যে ছবি আসিতেছে, তাহাই আঁকিয়া গিয়াছেন। "বিশ্বশোভা" নামটি দিব্য হইয়াছে। ইয়োরোপে এক দল চিন্তয়িতা আছেন, তাঁহারা দর্শন আর কাব্য এ দুয়ের বিবাহ দিতে চাহেন। তাঁহাদিগের বাঞ্ছা যে, কাব্যের কমনীয় মাধুরীর সহিত দর্শনের গম্ভীর বৈদগ্ধীর সমাগম ঘটাইয়া কাব্যের চাপল্যভাব ঘুচাইয়া দিবেন এবং দর্শনের কার্কশ্য পরি-

হার করিবেন। সেই চেষ্টা কত দূর যুক্তিযুক্ত, তাহা নিরূপণ করা যদিও সুকঠিন হউক, তথাপি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহারা পরস্পরসম্পৃক্ত অতি সুন্দর তিনটি গত প্রচারিত করিয়াছেন। তাঁহারা কহেন যে, ব্রহ্মাণ্ডকে ত্রিবিধ ভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে, যথা যথার্থ, আবশ্যক আর রমণীয়। যথার্থ কি তাহা নিরূপণ করা দর্শনের উদ্দেশ্য; আবশ্যক কি তাহা মানবজাতির পক্ষে অপরিহরণীয় নানা সাংসারিক প্রয়োজন হইতে শিক্ষা হয়; আর রমণীয় কি তাহার অনুসন্ধানে কবিরা ব্যগ্র। "যথার্থের" শাস্ত্র দর্শন, "আবশ্যকের" আকর শিল্প, আর "রমণীয়ের" বিধান কাব্য নাটক চিত্র ইত্যাদি সুকুমারবিদ্যা। এই তিন গতের বিষয় বিবেচনা করিয়া যদি ঈশ্বরানুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে তিন বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ধ্যান করা যাইতে পারে। বিজ্ঞান শাস্ত্রের তত্ত্ব সমূহ আলোচনা কালে, ঈশ্বর কেমন কারিকর, তাঁহার কেমন হুনুরী, তাঁহার দূরদৃষ্টি কত অসীম, এই ভাবিয়া তাক্ হইতে হয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের যাহা যাহা দরকার, তাহা প্রায় সবই ভগবানের সুবিধান বলে সমাধা হইয়া যাইতেছে, ইহা ভাবিয়া রোমাঞ্চিত ও প্রীতিভক্তিরসে অভিষিক্ত হইতে হয়। আবার, তাঁহার সৃষ্টিতে কত "দেখিবার শোভা," কত "মানান" আছে, চারি দিকে তিনি কত বাহার অজস্র বর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্দ্বারা কত সুমিষ্ট, সুকুমার, যমুনালহরীতুল্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দলহরী সঞ্চার হইবার পথ করিয়া দিয়াছেন, তাহাও একটা অনুশীলনের বিষয় বটে।

"বিশ্বশোভা" গ্রন্থে সেই অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকার ধরাধামের অপরিমেয় অনন্ত শোভা সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁজিয়া খুঁজিয়া তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। কি ঋতুগণের পরম রমণীয় পরিণাম, কি নভোমণ্ডলের বহুরূপী বেশ ধারণ, কি তৃণলতাদির নয়নপ্রীতিকর সুস্নিগ্ধ সজ্জা, কি গিরি নদী নির্ঝরাদির শান্ত পাবন প্রতিমূর্ত্তি, কি ঝঞ্ঝাবায়ুর প্রবল প্রকাণ্ড আসুরিক পরাক্রম, ইহার কিছুই ছাড়া হয় নাই। স্বচ্ছ প্রাঞ্জল জলবত্তরল নারীজনোচিত সুমধুর বাঙ্গালাতে তিনি সকলকেই অবতীর্ণ করিয়া দিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে গীতের ন্যায় ললিত ছন্দ রচনা পূর্ব্বক গদ্যপদ্যময় এই নবীন চম্পূকাব্যের প্রথম অবতারণা বাঙ্গালাতে করিলেন।

এস্থলে স্ত্রীলোকের গ্রন্থরচনা প্রসঙ্গে একটি আক্ষেপ লিপিবদ্ধ না করিয়া নিরস্ত হওয়া গেল না। আমরা দেখিতেছি যে, কৈলাসবাসিনী বাঙ্গালা রচনার আসোরে ক্রমে একাকী হইয়া পড়িতেছেন। আমরা আর এক জন মহিলার নিকট যে সকল প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, তাহা সফল হইবার আর কই কিছু সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবীর নাম এত বিস্তার হইল, অথচ তিনি নিরুৎসুক

হইয়া বসিয়াছেন। কই, তাঁহার আর রচনা সম্পর্কের কোন বাসনা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার রচনাশক্তি সামান্য ছিল না, যে সমস্ত নমুনা বাহির হইয়াছে, তদ্দ্বারা জ্ঞান হয়, তিনি মনে করিলে পুরুষেতর গ্রন্থকার দলের ধুরন্ধর হইতে পারিতেন। তাঁহাকে যে শুদ্ধ স্ত্রী-লোকের রচনা বলিয়া সাধুবাদ করিতে হয়, এরূপ নহে ; পরন্তু লোকে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার উপদেশের নিকট মস্তক অবনত করিলেও করিতে পারিত এবং ওজোগুণান্বিত তদীয় রচনার অনুকরণ করিতে পথ পাইত না। কিন্তু বামাসুন্দরী নিস্তব্ধ হইয়া আছেন। তিনি কি ভাবিয়া-ছেন, একবার নামটা বিখ্যাত হইয়াছে, এক বার যশ উপার্জ্জন হইয়াছে, এখন সচ্ছন্দে বসিয়া তাহাই উপভোগ করা যাউক ? তাহা হইলে তাঁহার ভুল হইতেছে, বামাসুন্দরী এরূপ নিস্তব্ধভাব ধারণ পূর্ব্বক গ্রন্থপ্রণয়নে কৃপণতা করিলে তাঁহার যশ অচিরাৎ মলিন হইবেক। আমরা তাঁহার ঐকান্তিক সপক্ষ, আমরা আজিও তাঁহার ক্ষমতার পোষকতা করিয়া থাকি, যদি কেহ তাঁহার বিষয়ে এমন কোন কথা বলিতে যায় যে, "যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না," আমরা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি-বাদ করি, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক প্রস্তাব-টির দৃষ্টান্ত দিয়া ও তত্রত্য অশেষবিধ রচনাপরিপাটী দেখাইয়া দিয়া দুর্জ্জনের গ্লানি থামাইয়া রাখি। কিন্তু অধিক দিন এরূপ চলিবেক না, অতএব তাঁহার আর গয়ংগচ্ছ করা ভাল দেখায় না।

ভাষ্য ——

আমরা স্ত্রীলোককে "গ্রন্থকর্ত্রী" না বলিয়া "গ্রন্থকার" বলিয়াছি, তাহাতে পাছে পাঠকবর্গ ভাবেন যে, আমরা ব্যাকরণের স্ত্রীপ্রত্যয় প্রকরণ পড়ি নাই, এ আশঙ্কায় এই ভাষ্য লিখিয়া দিতে হইল। আমাদের বক্তব্য এই যে, আজি কালি ইয়োরোপে ও আমেরিকাতে স্ত্রী-জাতি ও পুরুষজাতির সমকক্ষতা লইয়া যে বাদানুবাদ চলিতেছে, আমরা সে সম্পর্কে সমকক্ষতার দলভুক্ত। আমাদের বিশ্বাস আছে যে, সভ্যতার উন্নতি সহকারে স্ত্রী ও পুরুষ ক্রমে সর্ব্বাংশে একরূপ হইয়া উঠিবেক, কেবল সন্তা-নকে গর্ভে ধারণ এই বিষয়ে যাহা কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকুক। আমরা মনে করি যে, অন্যান্য বৈলক্ষণ্য কৃত্রিম, অস্থায়ী, অনিত্য, আগন্তুক এবং উভয়ের সুখের ব্যাঘাতক। সুতরাং গ্রন্থ রচনা বিষয়ে লিঙ্গভেদ করা অনভিপ্রেত বলিয়াই আমরা স্ত্রীপ্রত্যয়ের শরণাপন্ন হই নাই।

প্রণয়ের খট্‌কা।

স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি যে ভাল-বাসা হয়, তাহাকেই প্রধানত প্রণয় কহে, আর আমি যাহাকে ভাল বাসি এবং যাহার আমাকে ভালবাসা ব্যতিরেকে আমার অচল হয়, সে আমাকে ভাল বাসে কি না, এই রূপ যে সংশয় ও

তজ্জনিত যে যন্ত্রণা, তাহারি নাম প্রণয়ের খট্‌কা।

নরলোকে প্রণয়ের তুল্য সুখের পদার্থ দ্বিতীয় নাই। আপনার আন্তরিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করাই ইহলোকের পরম সুখ; কিন্তু প্রণয়ের প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলে যেরূপ সুনির্ম্মল পরিস্কার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের উদয় হয়, তেমন আর কিছুতেই নহে। কিন্তু সন্দেহ প্রণয়ের নিত্য সহচর। ফুল যেমন কীটের দংশনে শুকাইয়া যায়, প্রণয় সেই রূপ সন্দেহের জ্বালায় অস্থির হইয়া অবশেষে নিস্তেজ ও মৃতপ্রায় হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সেই সন্দেহরোগের ঔষধ নাই। ভালবাসা মনের ভিতরকার কথা; ইহা কিছু চক্ষে দেখাইয়া দিবার নয়; কিন্তু মনের ভিতরে যে সকল ভাব আসে যায়, অপর ব্যক্তির চিত্তে তদ্বিষয়ক প্রত্যয় উৎপাদন করিয়া দেওয়া বড়ই দুর্ঘট। অতএব প্রণয় সম্পর্কে একবার অপ্রত্যয় হইলে তাহা অপনয়ন প্রায় হয় না; 'সঙ্গের সাথী' রোগের ন্যায় উহা যাবজ্জীবন প্রণয়ীকে ক্লেশ দিতে থাকে। হনুমান্ বটে আপনার বুক চিরিয়া দেখাইয়া দিতে পারিয়াছিল যে, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাহার কীদৃশ ভক্তি। সেই বিদীর্ণ বক্ষস্থলের মধ্যে যখন সিংহাসনারূঢ় ও পরস্পর বাম দক্ষিণ ভাবে উপবিষ্ট সীতা রামের মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল, তখন বানররাজের অচলা প্রভুভক্তির বিষয়ে আর কাহারো সন্দেহ রহিল না। কিন্তু সে ক্ষমতা কলিযুগে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অথবা দেবতার অংশ না হইলে সম্ভবে না। সুতরাং ইদানীন্তন কালে যদি তোমার স্ত্রী তোমাকে ভাল বাসে কি না, এমন সংশয় তোমার মনে উদয় হয়, তাহা হইলে তুমি যদি বুজদার হও, তবেই ত সেই অবলা সরলা বালার নিষ্কৃতি, নচেৎ তাহার মনের কথা সে তোমাকে কি রূপে প্রতীত করিয়া দিবে। এই অনল একবার প্রজ্বলিত হইলে কিরূপ জলে উহার শান্তি হইতে পারে? তুমি কেবল খুঁতই খুঁজিতেছ এবং পদে পদে তোমার স্ত্রীর ভালবাসার অপ্রতুল অনুসন্ধান করিতেছ। যদি সে বিষয়ের কোন লক্ষণ নাও দেখ, যদি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা দ্বারা তাহার চরিত্র সর্ব্বাংশে পরিষ্কার সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ ও ফর্শা বলিয়া বোধ হয়, তথাপি তোমার খট্‌কা ঘুচিবেক না। তোমার দোষানুসন্ধানচেষ্টা কখনই বিরত হইবেক না; তুমি বরাবরই ভাবিবে যে, হয় ত এইবার ধরিব; তুমি চিরকালই পত্নীর আচরণের নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির করিবার নিমিত্ত সচেষ্টিত থাকিবে। সুতরাং বলিতে হয় যে, তোমার চেষ্টা বিফল হওয়াই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর; তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা না হইলেই তুমি বাঁচ; তুমি যে নিগূঢ় তত্ত্ব উন্নয়নের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছ, তাহা বাহির হইলেই তোমার সুখে জলাঞ্জলি হইবেক।

প্রবল প্রজ্বলিত প্রেমের সম্পর্ক না থাকিলে এ খট্‌কা জন্মে না। তোমার প্রণয়িনীকে তুমি নিজে রমণীর শিরোমণি জ্ঞান না করিলে তোমার মনে

সংশয় হইবার কথা নাই। তুমি তাহার তুল্য সুন্দরী নারী চক্ষে দেখ নাই ; তাহার প্রত্যেক অঙ্গচালনা প্রত্যেক কটাক্ষ-বিক্ষেপ, তাহার সকলি তোমার পক্ষে অমৃতরসে অভিষিক্ত ; সুতরাং কাজে কাজেই তুমি ভাব যে, অন্যের নিকটও সে সেই রূপ। সকলেই তাহার নিমিত্ত লালায়িত এবং হাজার লোকের অভিলাষ-শিখা তাহার প্রতি প্রেরিত রহিয়াছে। এই বোধ বিদ্যমান থাকাতে নিরন্তর তোমার মনে গাইতে থাকে যে, যে ব্যক্তি এত লোকের প্রার্থনীয় বস্তু, সে কি কখন তোমার একেলার হইয়া থাকিতে পারে ? তুমি এমন কি গুণ ধর যে, তোমার প্রতি তাহার হৃদয় ঐকান্তিক অনুরক্তি ধারণ করিয়া থাকিবেক,—যে তাহার চিত্তকে তুমি তোমার আপনার অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া রাখিবে। এই চিন্তাই সন্দিগ্ধ প্রণয়ীর পক্ষে বিষের জ্বালা হইয়া উঠে। সে নিরন্তর ইহাতে দগ্ধ হইতে থাকে, এবং সে দাহ সহজে শান্ত হয় না, কারণ যেমন অতিরিক্ত অনুরাগের সংসর্গ না থাকিলে কখন উল্লি-খিত অসূয়া জন্মলাভ করে না, সেই-রূপ ঐ অসূয়ার বশবর্ত্তী হইলে বড় 'মি-রিক্‌চিড়ে' হইতে হয়। 'মিরিক্‌চিড়ে' লোক অল্পে সন্তুষ্ট হয় না। যেমন শ্মশানের সন্নিহিত ক্ষেত্রে যে ধান হইয়া-ছিল, সেই চাউলের ভাত খাইয়া ভোজন-বিলাসীর গা ন্যাকার ন্যাকার করে, যেমন বিছানার এক পাশে কোথা একটি চুল ছিল বলিয়া শয়নবিলাসীর সচ্ছন্দে নিদ্রা হইল না, সেইরূপ প্রণয়ের সম্পর্কে যিনি অসূয়ার দাস হন, তাঁহার প্রণয়ের সম্পূর্ণ প্রতিদান না হইলে তাঁহার মন উঠে না। মোটামুটি ভালবাসা পাইলে তাঁহার তৃপ্তি নাই। স্ত্রী শুদ্ধ সতী সাধ্বী হইলেই তাঁহার হয় না ; শুদ্ধ তাঁহার সোহাগ সহ্য করিয়া এবং অপর পুরু-ষের কামনা ত্যাজ্য করিয়া থাকিলেই তিনি খুশী নন। পরন্তু বিশ বৎসর বয়সের উচক্কা ছোঁড়ারা ষোড়শী বালার সহিত যেরূপ পিরিতের ভঙ্গিতে থাকে, অসূয়ার বশতাপন্ন ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পত্নীর নিকট তদ্রূপ প্রদীপ্ত অনুরাগের প্রত্যাশা করে। সে যেমন তাহার পত্নীর উপাসক, তাহার মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছে, তাহাকে বই জানে না, তাহার পত্নীও তাহার প্রতি সেই রূপ হওয়া চাই। সে নিজে তাহার প্রণয়িণীর পক্ষে উপাস্য দেবতা স্বরূপ হইতে চাহে। সে আপনিই প্রণয়িণীর একমাত্র বাসনা, এক মাত্র চিন্তা, হইতে অভিলাষ করে। যদি সে ছাড়া আর কোন ব্যক্তি উঁহার নিকট প্রশংসিত বা সাধুবাদের পাত্র হয়, কিংবা যদি আপনি ছাড়া আর কোন কিছুতে উঁহার আমোদ বোধ হয়, তবেই সর্ব্বনাশ। ফলত প্রণ-য়ের্ষ্যান্বিত পুরুষের নিকট দয়িতার দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত মহার্ঘ সামগ্রী, সেই সামগ্রী পাত্রান্তরে বিতরিত হইলে যেন স্বত্ব লোপ হইল, সে এইরূপ ছট্‌পট্ করে। এ রোগের উপদ্রব ঈদৃশ কদর্য্য যে, সকল বিষয়ই ব্যাধির উত্তেজক অহিতাচারের ন্যায় হইয়া রোগের বৃদ্ধি

সম্পাদন করে। যদি তোমার স্ত্রী সহজ চলন ধরিয়া চলে, যদি বিশেষ কোন সোহাগ বা প্রেম প্রদর্শন না করে, তাহা হইলে ত তোমার শয্যাকণ্টক উপস্থিত হয়। তুমি নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত কর যে, আদবেই ভাল বাসে না, তাহার বড়ই উপেক্ষা, বড়ই তাচ্ছল্য, এসব তাহারি লক্ষণ; যদি আবার তদ্বিপরীত হয়, যদি কথায় বার্ত্তায় পদে পদে তাহার প্রীতি প্রদর্শিত হয়, যদি খাইবার সময় আসিয়া পাখা করে, শুইবার সময় পা টেপে, মাতা ধরিলে তারও মাতা ধরে, যদি তোমার মন যোগাইতে অনবরত ব্যাকুল, তোমাকে বই জানে না, সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, তাহাতেও নিস্তার নাই। তুমি মনে করিবে, সকলি কপট ও ছলনা মাত্র; তোমার হৃদয়ে আরো পাঁচখানা উঠিতে থাকে; তুমি ভাব এরূপ আচরণ সুচতুর ব্যভিচারিণীদিগেরই সাজে। তাহাকে প্রসন্ন কি প্রফুল্ল দেখিলে তুমি জ্ঞান কর যে, আর কাহার চিন্তায় উল্লাসিত আছে। বিষণ্ণ বিমর্ষ দেখিলে তুমিই উহার কারণ বলিয়া বোধ হয়। ফলে, তোমার স্ত্রী যাহাই কেন করুক না, তাহার সকল কথা, তাহার সকল ভঙ্গিই তোমার সন্দেহের উত্তেজক হয়, তোমার চিত্তে নূতন নূতন অপ্রত্যয় জন্মিয়া দেয়, এবং তাহার অপ্রণয়ের অভিনব প্রমাণ স্বরূপ হয়; কিছুতেই তাহার রেয়াত বা অব্যাহতি নাই। অতএব বলিতে হয় যে, ভালবাসার উপর যখন অসূয়ার আবির্ভাব হয়, তখন সে ভালবাসার চেহারা এত বিশ্রী ও এত বিকট যে, বরং লোকের দ্বেষের পাত্র হওয়াও ভাল, তথাপি অমন ভালবাসা মাতায় থাকুক। যদি একজন অন্য জনকে দ্বেষ করে, তাহা হইলে সে যেমন উহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা পায়, যেমন পিছনে পিছনে ফিরে এবং দুষ্ট সরস্বতীর মত তাহার অনুগামী হইয়া উহাকে উচ্ছন্ন না দিয়া নিরস্ত হয় না; অসূয়াম্বিত প্রণয়ীও পত্নীর পক্ষে তদ্রূপ। ফলত প্রণয়েৰ্য্যার ভাজনভূত নারীর ন্যায় দুরদৃষ্ট দুনিয়াতে অপ্রসিদ্ধ। তবে এ কথা বটে যে, তাহার স্বামীর ততোধিক যন্ত্রণা।

যাঁহারা এই রিপুর বশীভূত হয়েন, তাঁহাদিগের বুঝা উচিত যে, ইহা দ্বারা তাঁহারা কেবল আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারেন। তাঁহারা যে সন্দেহকে মনোমধ্যে স্থান দেন, উহা প্রথমে অমূলক থাকিলেও অবশেষে তাঁহাদিগের দোষে সমূলক হইয়া উঠে। বিনা দোষে কাহাকেও অপরাধী করিলে গ্লানিকারকের প্রতি সহজেই অভক্তি এবং ক্রমে বিরাগ জন্মে। কোন অংশেই যে ব্যক্তি সন্দেহের উপযুক্ত পাত্র নহে, যাহার চরিত্র অক্ষত, এবং যে কায়মনোবাক্যে বিশুদ্ধ, যদি সেও সন্দেহ স্বরূপ অসহ্য অপমান এড়াইতে না পারিল, যদি গোয়েন্দার মত তুমি তাহার আচরণ সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলে, তাহা হইলে কি সে আর তোমারে ভাল বাসিতে পারে? আর এক কথা এই, কেহ আমাকে সন্দেহ করিলে আমায় বড় সতর্ক হইয়া চলিতে হয়, আমার হাত

পা যেন বাঁধিয়া দেওয়া হয়, আমার স্বাধীনতা নষ্ট হয়, আমাকে সর্বদা উদ্বিগ্ন সশঙ্কিত এবং তুমি কি ভাবিবে এই ভয়ে ভীত থাকিতে হয়। ঈদৃশ স্থলে আমার তোমার প্রতি গোড়ায় ভালবাসা থাকিলেও ক্রমে তিরোহিত হয়, তোমাকে আমার ভয় করে, শত্রু বোধ হয় এবং তুমি ভালবাসার যে ত্রুটি আশঙ্কা করিতেছিলে, বস্তুগত্যা তাহাই ঘটিয়া উঠে, কারণ আতঙ্ক অনুরাগের বিষম বিপক্ষ।

কিন্তু অসূয়ার অশুভকারিতা এই স্থানেই বিরাম হয় না। ইহার অনর্থ আরো অধিক দূর বিস্তারিত হইয়া উঠে। পত্নী পতির অসূয়াপাত্র এবং তদানুষঙ্গিক তাঁহার অনাদরভাজন হইলে যে মনোবেদনা পায়, উহার বিনোদনার্থ তাহাকে অনেক সময়ে অন্য এক ব্যক্তিকে দুঃখের দুঃখী করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ঈদৃশ দুঃখের স্থলে স্ত্রীলোক স্বজাতির সঙ্গে আপন দুঃখ বাটোয়ারা করিয়া যত নির্বৃতি লাভ না করে, অন্য পুরুষের কাছে মনের ক্লেশ নিবেদন করিতে পাইলে ততোধিক সুখী হয়। আর স্ত্রীজাতি এবং পুরুষজাতির পরস্পর আলাপ পরিচয় দেশাচারদোষে যতই কেন আটক করা হউক না, কোন দেশেই এরূপ শক্ত নিয়ম বাহাল হয় নাই, যদ্দ্বারা পরিণীত নারীর পতি ভিন্ন পুরুষান্তরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ হয়। সুতরাং পতির নিকট মনঃক্ষুণ্ণ হইলে স্ত্রীলোকে এমন কাহাকেও না কাহাকে পাইবে, যাহার সঙ্গে হৃদয়ের যন্ত্রণার কথা কহিয়া কিঞ্চিৎ সচ্ছন্দ লাভ করিতে পারে। সুতরাং স্বামী যতই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিবেন, অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহা স্ত্রীর পক্ষে তত প্রয়োজনীয় হইবেক। তাহার মনে প্রথমে পাতক না থাকিলেও সে শুদ্ধ হৃদয়ের বোঝা নামাইবার নিমিত্ত আর এক জনের সঙ্গে ক্রমে বন্ধুতাসূত্রে জড়িত হইবে। কিন্তু স্বামী ভিন্ন আর এক জনের সহিত স্ত্রীজাতির বন্ধুতা সঞ্চার হইলে পর ক্রমে সেই বন্ধুতা প্রণয়ে পরিণত না হইয়া যায় না, আর প্রণয়ের বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে বড় দেরি লাগে না। সত্য বটে, প্লেটো নামক গ্রীসদেশীয় দর্শনকার বলিয়া গিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়সেবা প্রণয়ের পক্ষে একান্তপক্ষে আবশ্যক নহে। দুই হৃদয়ের মিল ও একতানতা হইতে যে বিশুদ্ধ প্রেমানন্দ প্রবহমাণ হয়, তাহার নিকট শারীরিক ইন্দ্রিয়সুখ অতি তুচ্ছ ও অস্থায়ী। অতএব সে নিকৃষ্ট সুখের প্রতি সমুচিত হেয়জ্ঞান এবং উপযুক্তরূপ আত্মসংযমের অভ্যাস থাকিলে দাম্পত্যসম্পর্কের অসদ্ভাবেও একপ্রকার নির্ম্মল প্রণয় হইতে পারে। উন্নতাশয় মহাপুরুষবর্গ তাদৃশ প্রণয়ের রসাস্বাদে অধিকারী, কারণ তাঁহারাই আত্মসংযমের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে জানেন। কিন্তু প্লেটোর এই সকল বচনচাতুরী কেবল কাল অক্ষরেই ভাল সাজে, অর্থাৎ এ সকল কেতাবী কথা, বাস্তবিক নরলোকের আচারব্যবহারে প্রায় এ সকল

কথার প্রসর নাই। সাংসারিক ব্যবহারে ইন্দ্রিয়সুখ ও সাত্ত্বিক সুখ এত মিশ্রিত, এবং এক অপরকে এরূপ সজোরে আকর্ষণ করে যে, প্লেটোর উপদিষ্ট নির্ম্মল প্রেমের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে বিলক্ষণ অনুধাবন করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ফলত আমাদের মত জিজ্ঞাসা করিলে স্পষ্টাক্ষরে বলিব যে, যথায় ইন্দ্রিয়সুখের সম্পর্ক ঘটিলে বিষম গোলযোগের কথা হইবে, তথায় প্লেটোর মত চালাইতে যাইবার আবশ্যক করে না। এ সমস্ত কথা বলিবার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, সুবোধ মহিলারা যখন পতির আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া পুরুষান্তরের সহিত বন্ধুত্ব দ্বারা জুড়াইতে যায়, তখন তাহারা প্লেটোকে স্মরণ করিয়াই সে কাজ করে। বস্তুত প্লেটো যে বিষয়ের পরামর্শ দিয়াছেন, মানবস্বভাবসুলভ অপরিণামদর্শিতার প্রভাবেই সে ভাবের আবির্ভাব হয় এবং তাদৃশ সংস্কার বুদ্ধিতে বদ্ধমূল হয়। যখন কোন সুশীল রমণী আর এক পুরুষের সঙ্গে ভাব করে, তখন সে ভাবে যে, ইহাতে দোষ কি, আমি ত অসৎকর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম করিতেছি না, আমার স্বামী আমার সঙ্গে বড় লাগিয়াছেন, আমার জীবন ভারবৎ করিয়া তুলিয়াছেন, অনর্থক আমাকে সন্দেহ করিয়া জর্জ্জরীভূত করিয়াছেন, ইহাতে যদি আমি অমুকের সঙ্গে দু দণ্ড কথা কহিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ থাকি, তাহাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইবেক? ইহা আলোচনা করিয়া সে পুরুষান্তরের সঙ্গে ভাব করিয়া বসে। যদি বড় সুবোধ বড় সুশীল বড় চতুর হয়, তাহা হইলে এতদ্দ্বারা চারিত্রস্খলন বা সতীত্বভঙ্গ ঘটেনা বটে, কিন্তু মনের মধ্যে এক দুরপনেয় কালী জন্মিয়া যায়। যাহার ঘর করিতেই হইবে, সেই পতির প্রতি বিতৃষ্ণা ও তৎসহবাসে অরুচি হয়, ইহা সামান্য কষ্ট নহে। আর যাহাকে ভাল বাসিবার সম্পূর্ণরূপ সার্থক্য হওয়া সুদূরপরাহত, পতি ভিন্ন সেই দ্বিতীয় 'ভাবের লোকের' নিমিত্ত এক প্রকার দুঃসহ ঔৎসুক্যহুতাশন অন্তঃকরণকে জ্বালা দিতে থাকে। এইরূপ আধমরা হইয়া থাকিবার যাতনা যন্ত্রণা অনুভবেও আসে না। গ্রীকদিগের প্রাচীন পুরাণশাস্ত্রে "টাণ্টেলসের যন্ত্রণা" বলিয়া যে এক নরকযন্ত্রণা আছে, ইহা প্রায় তদ্রূপ। ঘোরতর নানা দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল স্বরূপ এই সাজা টাণ্টেলস নামক এক ব্যক্তির প্রতি পরলোকে আদেশ করা হয় যে, তিনি অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়া যখন নদীর জল পান করিতে যাইবেন, যখন দুর্নিবার পিপাসাভরে অস্থির হইয়া তিনি, এক নিশ্বাসে যেন নদী শুষিয়া লইবেন, এই ভাবে জলের উপর মুখ জুবাইতে যাইবেন, তখন দিব্যশক্তিপ্রভাবে সেই নদীর জল তাঁহার মুখে সংলগ্ন হইয়াই দশ হাত তফাতে সরিয়া যাইবে; তিনি সুপক্ক ফল দেখিয়া তাহা পাড়িবার তরে হাত তুলিলে ফলধারিণী শাখা তাঁহাদ্বারা সংস্পর্শ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ যাইয়া গগনস্পর্শী হইবে। পূর্ব্বোল্লিখিত স্ত্রীসঙ্ক-

প্রেমাতুর রমণীও তদনুযায়ী ক্লেশ-পরম্পরা ভোগ করেন। উইলিয়ম বেক্‌-ফোর্ড্ প্রণীত 'ভাথেক্' নামক এক আখ্যায়িকা আছে, তন্মধ্যে ইব্‌লিসের সমাজবাটীর যে বর্ণনা বিন্যস্ত হইয়াছে, তথায় উল্লিখিত আছে, নরকের অধিপতি ইব্‌লিসের উপাসক হইয়া যাঁহারা পরলোকান্তর তাঁহার প্রজা হয়েন তাঁহাদের অনেকের সেই সমাজ-বাটীতে অবস্থিতি হয়। সেই সভার ভিতর যাইলে দৃষ্ট হইবেক যে, তাঁহারা সকলে দক্ষিণ কর বক্ষস্থলের বাম ভাগে সংস্থাপন পূর্ব্বক পাদচারণা করিতেছেন, তাঁহাদিগের গাত্রত্বক্ অবরের মত স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে, সেই ত্বগিন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগের হৃৎপদ্ম দৃষ্টিগোচর হইতেছে,—উঃ কি ভয়ানক! প্রত্যেকের হৃদয়ই চিরজাজ্বল্যমান অনল-শিখাতে বেষ্টিত রহিয়াছে; তাঁহারা ইহলোকে ইব্‌লিস্ অর্থাৎ শয়তানের উপাসনায় কালযাপন করিয়াছিলেন, একারণ দুষ্টনিগ্রহকর্ত্তা ভগবান্ প্রতি-বৎসর কয়েক মাস ধরিয়া তাঁহাদিগকে ঐ সাজা ভোগ করান। সেই বহ্নিমালা-সমাকুলিত হৃৎপদ্মের উপর হস্ত সংস্থাপন করিয়া তাঁহারা গুম্ হইয়া জ্বালা সহ্য করিতেছেন, মুখে কথাটি নাই, অন্তরে প্রসন্নতার লেশ মাত্র নাই। বোধ হয় স্বামী সচ্চরিত সরলস্বভাব ভার্য্যার প্রতি সন্দিহান হইয়া এবং তাহাকে পুরুষান্তরের সহিত কথা বার্ত্তা দ্বারা বিনোদনাকাঙ্ক্ষী করিয়া সেই ইব্‌লিসের যন্ত্রণা সহ্য করান্।

সচ্চরিত্র ও পতিব্রতা-ধর্ম্মভঙ্গভীরু রমণীর ত এই দুর্গতি ঘটিবার কথা। কিন্তু যে সকল নারী তেমন গম্ভীরপ্রকৃতি নহে, যাহাদের স্বভাব চপল, অন্তঃকরণ তপ্ত, ভাবনাশক্তি সতেজ, এবং শৈশবের শিক্ষা তেমন পরিষ্কার নহে; যাহাদের বুদ্ধি কিছু অস্বচ্ছ এবং প্রকৃতি কিছু টল্-টল্ করে; তাহারা উল্লিখিত অবস্থায় পতিত হইলে প্রায় অসামাল হইয়া যায়। পতি বারংবার তাহাদিগের বিষয়ে সংশয় করাতে এক শ বারই সেই মন্দ কথা তাহাদিগের মনে পড়ে; তাহাদিগের হৃদয়ে শয়তান আসা যাওয়া করিতে করিতে ক্রমে আড্ডা গাড়িয়া বসে; প্রথমে যে কাজের প্রতি ঘোর ঘৃণা ছিল, ক্রমে তাহা মুহুর্মুহু চিন্তাপথের পথিক হইয়া চিরপরিচিতবৎ হইয়া উঠে; উহার বিকট মূর্ত্তি অপগত হয়; উহার বিশ্রী ও কদর্য্য চেহারা বিলুপ্ত হয়। সেই নারী অকস্মাৎ 'মরিয়া' হইয়া পড়ে। সে ভাবে, যদি আমার বদ-নামই হইল, তবে আর আমার কিসের ভয়? পাপের অপ্রতিষ্ঠা ও কলঙ্কের ভাগী হইলাম, তবে পাপের আনুষঙ্গিক সুখে বঞ্চিত হই কেন? এই রূপে তাহার স্বামী যাহা ভয় করিতেছিলেন, সে তাহা-তেই ঝাঁপ দেয়। অতএব বলিতে হইবেক, প্রণয়ের্ষ্যাপরায়ণ ব্যক্তি নিরপরাধ দয়িতার কলঙ্কশঙ্কা করিয়া তাহাকে কলঙ্কিনী হইবার পথে পদার্পণ করান।

এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, অসূয়ান্বিত স্বামীগণ যখন প্রেমাস্পদ বনিতাকে

হাতছাড়া করিয়া ফেলেন, তখন-তাঁহাদের যে কষ্ট হয়, উহার তুলনা আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না। কাছে থাকিবার কালে যে ব্যক্তিকে তাঁহারা বিধিমতে তিতি বিরক্ত করিয়াছেন, সে যখন তাঁহাদের সংশয় সমস্ত যথার্থ করিয়া চলিয়া যায়, তখন তাঁহাদের দুঃখের সীমা থাকে না, তখন তাঁহাদের আফ্‌সোস্ অনিবার্য্য হইয়া উঠে এবং কেন এরূপে ক্লেশ দিয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইলাম ইহা ভাবিয়া তাঁহারা ম্রিয়মাণ হয়েন।

পূর্ব্বোক্ত সকল কথার তাৎপর্য্য অনু-, ধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হইবেক প্রেমোন্মত্ত না হইলে প্রণয়েৰ্ষ্যা জন্মে না; ঈদৃশ পুরুষের মনে ইহা প্রগাঢ় রূপে বদ্ধমূল হয়। তন্মধ্যে তিন প্রকার স্বভাব হইতে এই রোগের উৎপত্তি কল্পে বিশেষ সাহায্য বিধান হয়; প্রথম, যাহাদের সুশ্রী বলিয়া অভিমান করিবার যো নাই, তন্নিমিত্ত ক্ষুব্ধ থাকিতে হয়; দ্বিতীয়, যাহারা ফাজিলচালাক; তৃতীয়, যাহারা দুশ্চরিত্র নারীজনের সহবৎ করিয়া বিগড়িয়া গিয়াছে।

প্রথম প্রকারের মনঃক্ষুণ্ণভাব নানা কারণে উৎপন্ন হইতে পারে। নিজে বৃদ্ধ, পত্নী যুবতী; নিজে নির্ব্বোধ, ভার্য্যা বুদ্ধিমতী, আপনার অঙ্গগত কোন বিরূপতা আছে, অথচ ভার্য্যা পরমা সুন্দরী; কিম্বা আপনি নিস্তেজ, দুর্ব্বল, সুতরাং হৃষ্ট পুষ্ট শক্ত সমর্থ রমণীর মনোরঞ্জনে পারক নহে। ইত্যাকার বিবিধ হেতুর সদ্ভাব থাকিলে লোকের মনে প্রণয়েৰ্ষ্যা জন্মে। তাহারা আপনাদিগকে ভালবাসার এরূপ অযোগ্য জ্ঞান করে, যে পত্নীর নিকট উহার লক্ষণ লাভ করিলে অপ্রতিভ হইয়া যায়; তাহাদিগকে সোয়াগ করিলে যেন বিদ্রূপ করা হয়; আয়না দেখিলেই তাহাদিগের বুকে যেন শেল বাজে; পলিত কেশ অথবা বলিত গাত্র তাহাদিগের যেন বাঘ বোধ হয় এবং মাতায় টাক পড়িলে যেন বজ্রাঘাত হয়। সুশ্রী সুপুরুষ ব্যক্তিকে তাহাদিগের ভাল লাগে না এবং রমণীয় বা মধুর বা হৃদয়হারী বস্তুমাত্রের প্রতি তাহাদের বিষম বিতৃষ্ণা।

দ্বিতীয়প্রকার যে স্বভাবের গুণে অসূয়ারোগ জন্মগ্রহণ করে, তাহার বিবরণ এই যে, ফাজিলচালাক হইলে সকল বিষয়ের গূঢ় অভিসন্ধি অনুসন্ধান করা এক অভ্যাস থাকে। যেমন পৌরাণিকেরা সাংসারিক তাবৎ ব্যাপারের মধ্যে ভগবানের লীলাখেলা উপলব্ধি করে; যেমন গোয়ালাপাড়ায় অতি বানু একটা ছোঁড়া জন্মিয়া তথাকার তাবৎ নারীর জাতি খাইয়া বেড়াইয়াছিল; ইহার ভিতরেও তাহারা সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের অবতার কল্পনা করে; যেমন ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে এক সংগ্রাম হয় এবং অনেক নরপতির প্রাণনাশ হয়, ইহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত পুরাণবক্তারা পৃথিবীকে ব্রহ্মার কাছে লইয়া গিয়া ভারাবতরণার্থ আবেদন করায়; সেইরূপ ফাজিলচালাক লোকে আপন পত্নীর প্রত্যেক দৃষ্টিপাত বা প্রত্যেক হাস্যের পর্য্যন্ত কূটার্থ কল্পনা করে।

নিজে তাহারা কপটী বলিয়া স্ত্রীকেও তদ্দোষাশ্রিত জ্ঞান করে এবং আঁচলের গেরোর ভিতরেও উপপতি লুকান আছে বোধ করে। এইরূপে ফাজিলচালাক লোকে সকলের উপর এক কাটি বাড়িতে গিয়া যত ভ্রমে পতিত হয়, অত আর কেহই নহে। ইহারা অপসিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত যাথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করে এবং ভ্রমকেই সত্যের প্রকৃত মূর্ত্তি বলিয়া আলিঙ্গন দান করে।

তৃতীয় প্রকারের যে সকল ব্যক্তি প্রণয়েষ্যার নিকট আপনাদিগকে বলিদান দেয়, ইহারা এক অদ্ভুত লোক। ফাজিল চালাকেরা যেমন বুদ্ধিবলে পত্নীর অপ্রণয় উন্নয়ন করে, লম্পটেরা সেস্থলে বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার দোহাই দেয়। নির্ব্বোধ স্বামীকে দুশ্চারিণী ভার্য্যা কর্ত্তৃক এত প্রকারে প্রতারিত হইতে তাহারা দেখিয়াছে যে, স্ত্রীজাতির সকল আচরণের ভিতরেই উহারা নিগূঢ় ছেনালী আছে বলিয়া স্থির করিয়া বসে। ছেনাল মেয়ে মানুষের সঙ্গেই তাহাদিগের বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল, সুতরাং স্ত্রীজাতির মধ্যে ভদ্রতা থাকিতে পারে বলিয়া তাহাদিগের মনে লয় না। কিন্তু অশেষবিধ পরীক্ষার পর যদি তাহারা কোন কিছু ধরিতে ছুঁতে না পারে, তাহা হইলেও তাহাদের অন্তঃশুদ্ধি নাই। তাহারা নিজে যেমন নানা অনিবারিত অবৈধ বাসনার বশবর্ত্তী, যেমন উজ্জ্বল কপোল বা উজ্জ্বল এক জোড়া চক্ষু দেখিলে, অবিহিত হইলেও তাহাদের হৃদয়ে আগুণ জ্বলিয়া উঠে, তাহারা অন্যকেও সেই দোষের দোষী জ্ঞান করে। তাহারা আপন মনের পাতক পত্নীর উপর আরোপ করে, এবং নরজাতিসুলভ পাতিত্যের অগম্য কেহই নাই, এই এক পরিপক্ক সিদ্ধান্ত থাকাতে সকলকেই সেই ত্রুটি দ্বারা কলঙ্কিত বলিয়া ধর্ত্তব্য করিয়া রাখে।

সংসার।

রোসো! ফের, ফের, হেথা দেখরে, চাহিয়া,
বিস্ময়ে রোধিল কণ্ঠ; দুরু দুরু হিয়া।
এই যে মনের সুখে যুবক যুবতী,
মিলিত দেখিনু যেন গিরিশ পার্ব্বতি।
সতত কৌতুক হাসে গিয়েছে সময়,
বিয়োগে ছাড়িত্নে শোভা বারি কুবলয়।
সংসার অসুখ যত ভুলিয়া মিলনে,
নিরন্তর তুষ্ট ছিল ভীষণ গহনে।
যথায় যেমন রাখ যদি পায় সঙ্গ,
সমান মনের ভাব; নাহি সুখ ভঙ্গ।
মিলন ত্যজিয়া অন্যে নাহিক বাসনা,
কণ্ঠগ্রহ ত্যজি নাহি ইন্দ্রত্বে কামনা।
দেহ ভিন্ন, এক মন একই প্রকার,
একের অভাবে অন্যে শূন্য এ সংসার।
আজি কেন ভিন্ন ভাব জিজ্ঞাসি তোমায়,
আঁখির মিলন, তাও প্রাণে নাহি সয়।
কেন রে তাপিত মীন জীবন ত্যজিয়া,
স্বেচ্ছায় সহিছে তাপ তীরেতে বসিয়া।
পবন আসিয়া আশে দুলাইছে অঙ্গ,
নাচেনা মাধবী তাহে নাহি রঙ্গভঙ্গ।
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মন কোথা ফেলে দিলি,
কেমনে তেমন সন্ধি বিশ্লিষ্ট করিলি।

সেই সে নয়নে রাগ ; ভিন্ন উপাদান,
মাধুর্য্য ত্যজেছে ভাব, কলহ প্রধান।
কেন পুর্ণিমার শশী লোহিত বরণ,
দেখি কুমুদিনী কেন নোয়ায় বদন ?
সেবিতে সংসার এই কটুতিক্ত নীর,
যতনে মিশায়ে ছিল প্রেমময় ক্ষীর।
এইত ওষ্ঠের প্রান্তে লয়ে ছিল তুলে,
বিরাগ বিষম বিষ এখনি মিশালে ।
সম্ভাষণে সে আগ্রহ কই কোথা গেল,
বুঝিরে সুদীর্ঘ কাল দুঃখে কেটে গেল ।
ক্ষিপ্ত হেন সদা ভাব ; মুখে নাহি হাসি,
অন্তর দহিছে কোপ ; মানস উদাসী।
নাশিলি দাক্ষিণ্য, দয়া, স্নেহাদি সদ্গুণ,
এবে দেখি স্নিগ্ধাচারে সতত বিগুণ।
কতবা দেখিব আর দেখাব বা বল,
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি হইনু বিকল।
কালি না উহারে আমি সংসার জীবন
স্বরূপ ভাবিনু কার্য্য দেখিয়া তেমন ?
গৃহকাজে ছিল ব্যগ্র সতত উদ্‌যোগ,
কেমনে হইবে সুখ, কি তাহে সুযোগ ?
কিসে কোন্ বস্তু কোথা উন্নতি সাধিবে,
পশ্চাৎ ভাবেনি কিসে ভবিষ্যৎ রবে।
মনের উৎসাহে যে সে কার্য্যে ল'তো ভাগ
পুনঃ পুনঃ প্রতিহত ; না হ'ত বিরাগ।
স্বয়ং উৎসাহী, দিত পরেরে উৎসাহ,
সাধিতে সংসার কার্য্য ধরে যেন দেহ।
আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু পুত্র পরিবার,
লইয়া সন্তুষ্ট, কষ্টে না ছিল বিকার।
"আমি কর্ত্তা মোর ভাত" গর্ব্ব নাহিছিল,
হাসিয়া ভৃত্যের কাজ যাচিয়া করিল।
ছেলে হয়ে ছেলে সনে করেছিল খেলা,
খুঁজিয়া মিলিত গোলে, কাটাইত বেলা।

বাতাসে উড়িলে কুটো কুড়ায়ে আনিত,
খুদের খবর, তাও আগ্রহে লইত।
মেশা মিশি কুটুম্বিতা সুখে পেয়ে লয়,
ভুলেছিল এ সংসার বাসা বই নয়।
দেখিতে দেখিতে তারে করেছ উদাসী,
যত্নের সংসার ত্যজি হয়েছে সন্ন্যাসী।
কেমনে তেমন রাগ নিমেষে নাশিলি,
কেমনে তনয় জায়া বদন ভুলালি।
দহন বেষ্টিত গেহ যেনরে ভাবিয়া,
মলিন বদন কোথা যায় পলাইয়া।
সেইত প্রেয়সী তার সেই আদরিণী,
কেমনে ঠেলিল পায়ে ; কেন কাঁদে ধনী।
তটিনী হিল্লোল ছলে আমোদে লাফায়,
কেন তারে নভস্বান্ হেরিয়া পলায়।
সুদৃঢ় নিগড় সম প্রণয় বন্ধন,
হেলায় ভাঙ্গিলি তারে কেমনে দুর্জ্জন ?
কোথা গেল অভিমান আত্মার গৌরব,
কীট হেন ভীত কেন নাহি অন্য রব।
চীৎকার ক্রন্দন আদি নানা কোলাহল,
যাহার পরাণ বায়ু, জ্ঞান, বুদ্ধি বল।
নীরব নিশ্চেষ্ট তার ভূধর কন্দর,
কেমনে অনাশে হলো চিত্ততোষকর।
সুমুখে ফুটন্ত কলি হাসে থরে থর,
কেনহে তোলেনা মাথা কি তাবে ভ্রমর ?
তেমন রিপুর বল কেমনে নাশিলি,
চঞ্চল ইন্দ্রিয় সেই কেমনে স্তম্ভিলি ?
সংসার সাগর তাহে ঝটিকা সঙ্কট,
মহাবেগে উঠে তায় তরঙ্গ বিকট।
পর্ব্বত ভাবায় স্রোতে মেদিনী বিদারে,
পরিত্রাহি ডাকে নর কেবা দেখে কারে।
তেমন ভীষণ দৃশ্যে যে না ভীত হলো।
আশার উড়ুপ ধরি আনন্দে ভাসিল।

সে কেন এখন হেন স্নিগ্ধ ধীর নীরে,
স্বেচ্ছায় সাহস পোত ছাড়ে ধীরে ধীরে ?
কেন ভাসে মৃত যেন, কোথা গেল বল ?
তাঁর লাভে নাহি চেষ্টা কেন রে নিশ্চল ?
বল বল ও না সেই দিগ্বিজয়ী বলী ?
যার নাম শুনি ভয়ে শিহরিত বলী ?
ওই না হাসিয়া হরি-রদন টুটিল
বাম করে শুণ্ড ধরি মাতঙ্গ রোধিল !
একাকী বিপক্ষ শত লীলায় নাশিল,
শফরী সম্রোতে যেন কুম্ভীর পশিল।
লাফায়ে শিখরী শিরে হেলায় উঠিল
অতুল বাহুর বলে সাগর তরিল।
আজি কেন তার দশা করেছ এমন
কারে দিলে তার বল, বদান্য সুজন ?
নিটোল তেমন দেহ আঁটালো বাঁধন,
এলায়ে খসালে তায়, চুপ্‌সেছে এখন।
সেই কিরে ওই বুক বিশাল মাংসল
বিপদ অশনি পাতে থাকিত অটল।
ত্বকে ঢাকা পাঁজরা গুলো ফোঁপরা পুন তায়,
করেছ রে আঁসপাত ফুঁয়ে উড়ে যায়।
ধুক্ ধুক্ করে বটে নিয়ত এখন,
মরিতেও জানি কিন্তু কাঁপেনি কখন।
মেদিনী কেঁপেছে ওর চরণ ক্ষেপণে,
চলে যেতে টলে পড়ে আজি সেই জনে :
হাতে আছে বটে লাঠি, মানী বটে সেই
ভিন্ন কাজে যুক্ত হয়ে সে গৌরব নেই।
ও হাতে উঠিলে যমে দেখাইত ভয়,
আজি ফেরে মড়া বয়ে, কার প্রাণে সয়।

গুরুভার সহ সেই মস্তক কাঁপিছে,
হাঁপায়ে হাঁপায়ে যেতে বসিয়া পড়িছে।
সে ধীর গম্ভীর ধ্বনি গেছে কোন দিকে,
দীন স্বরে চিঁ চিঁ করে যেন চামচিকে।
মানিলাম সত্য বটে সেকেলে প্রবাদ,
ভীষণ গাণ্ডীব আর অর্জ্জুন সংবাদ।
ও কি! ও কে? হাঁরে কাল, ও কে দেখাদিল,
উহারি প্রয়াণে তত শঙ্খ বেজেছিল ?
মাঙ্গল্য চন্দন চুয়া, সুগন্ধি জীবন,
করিল কুঙ্কুমক্ষোদ হর্ষে বিকিরণ।
মহার্হ ভূষিত যান, দিব্য পরিচ্ছদ,
নানা বাদ্য গর্জ্জে ছিল, বরিষা-নীরদ।
সাদরে আনন্দে লোক মনের কৌতুকে
দর্শন মানসে উপস্থিত চারি দিকে ?
এখন দেখিয়া কেন ফিরায় বদন,
কাছে এলে রোধে দ্বার, সশঙ্কিত মন।
কোথা সে দুন্দুভি ধ্বনি শঙ্খের নিনাদ,
ভীষণ ক্রন্দন ধ্বনি, কে সাধিল বাদ।
হস্ত চারি পরিমিত বংশ এক খান,
ছেঁড়া চেটা, তিন খেই দড়ি মাত্র যান !
পবিত্র সে নর দেহ দূষিত কেমনে ?
আশ্চর্য্য ! গোময় ছিটা দেয় কোন প্রাণে !
কাল্ যারে বুকে রাখি সাধ না পূরিতো,
বদন চুম্বনে ওষ্ঠ সঘনে স্ফুরিতো ;
ফেলিয়া মঙ্গল ঘট যারে বসায়েছে,
ঠেলে ফেলে স্বর্ণ রাশি টানিয়া লয়েছে ;
যারে না দেখিলে উড়ি পলাইত প্রাণ
আজ্ দূরে টেনে ফেলে পোড়া কাঠ খান!

কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট ১৪৯ নং ভবনে নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত

অবোধ-বন্ধু।

“করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥”

৩য় ভাগ　　শ্রাবণ,—১২৭৬।　　[৪র্থ সংখ্যা

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

যখন নেপোলিয়ন ইটালীয় সৈন্যদলের সৈনাপত্য গ্রহণপূর্ব্বক তথাকার যুদ্ধের অধ্যক্ষতা করিবার নিমিত্ত ইটালির উত্তরপশ্চিম প্রদেশে উপস্থিত হইলেন, তাহার পূর্ব্বেই যুদ্ধের আরম্ভ হইয়াছিল। তৎকালে ইটালির উত্তরাঞ্চল পীড্‌মন্ট, মিলানীজ[1] ও ভিনীশিয়া এই তিন পৃথক্ জনপদে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে পীড্‌মন্টের রাজা ইটালি জাতীয়; মিলানীজ বহুকালাবধি অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের অধীন থাকে এবং তাঁহার প্রেরিত জর্ম্মন-জাতীয় শাসনকর্ত্তা দ্বারা শাসিত হইত; আর ভিনিসের সাধারণতন্ত্রের রাজপুরুষেরা ভিনীশিয়া পালন করিতেন। কিন্তু ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব কালীন গবর্ণমেন্টের প্রতি অষ্ট্রিয়াই প্রধানত বিরূপ হয়েন, আর পীড্‌মন্টের অধীশ্বর অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্‌কুলের সহিত যৌন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকাতে কাজে কাজেই তাঁহাকে অষ্ট্রিয়ার সহিত একপক্ষ হইতে হইয়াছিল। আপাতত এই দুই ব্যক্তির প্রতি বৈরনির্যাতন করিবার নিমিত্ত ফ্রান্সের ইটালি-অভিমুখে যুদ্ধসজ্জা করা হয়।

তদ্বিষয়ে সর্ব্বাধ্যক্ষতা করিবার গুরুতর ভার যে নেপোলিয়নের উপরি অর্পিত হয়, তাহার নানা বিশিষ্ট কারণ বিদ্যমান ছিল। প্রথমত তিনি এক জন বিচক্ষণ

[1]। মিলান শহর যে রাজ্যের প্রধান পুরী, সেই রাজ্যের নাম মিলানীজ, নতুবা তন্নামপ্রসিদ্ধ কোন জনপদ সে প্রদেশে বিদ্যমান নাই, এ কারণ মিলানীজের সামিলে শাসনক্রিয়া সমাধা হইত, এই হেতুক মান্টুয়া নামক এক স্বতন্ত্র পরগনাও মিলানীজ রাষ্ট্রের অন্তঃপাতিত হইত। সেইরূপ ভিনীশিয়া বলিতে ভিনিস নামক রাজধানীর অধীনস্থ প্রদেশ।

লোক বলিয়া তাবৎ লোকের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন; টুলোঁ নগরের প্রত্যুদ্ধারকার্য্যে তিনি যথেষ্ট কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, প্রধান রাজপুরুষগণের সঙ্গে নিজ পত্নীর সম্পর্কে তাঁহার যথেষ্ট আনুগত্য ছিল এবং তাঁহারাও নেপোলিয়নের বড়ই প্রতিষ্ঠা করিতেন; এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর এক মহৎ গুণ এই ছিল যে, আলাপ পরিচয় করিলে অতি শীঘ্রই এক জন অসাধারণ লোক বলিয়া প্রতীত হইতেন। এই সমস্ত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি ইটালির সৈনাপত্যপদ প্রাপ্ত হইলে কেহই বিচিত্র বোধ করে নাই। তবে দু এক জন পরশ্রীকাতর দুর্জ্জন আপত্তি করিল যে, তাঁহার বয়স কম, ঈদৃশ অপ্রবীণ যোদ্ধাকে তাদৃশ গুরুতর সাংগ্রামিক ব্যাপারে প্রাধান্য করিতে দেওয়া পরামর্শ নহে। একদা তাহার সমক্ষে এই আপত্তি উত্থাপিত হইলে তিনি, অর্দ্ধেক পরিহাস অর্দ্ধেক রোষ প্রদর্শন করিয়া, বক্রোক্তিচ্ছলে এই ব্যক্ত করিলেন যে, "বয়স কম বয়স কম বলিতেছ! জাননা যে, এক বৎসর না যাইতে যাইতেই আমি মিলান্ পঁহুছিব।" 'মিলান' বলিতে ফরাশি ভাবায় হাজার বৎসর বুঝায়, অথচ ইতিপুর্ব্বে উল্লিখিত মিলানীজ্ প্রদেশের রাজধানীর নামও মিলান; অর্থাৎ তাঁহার ব্যঙ্গোক্তির তাৎপর্য্য এই যে "যে আমি অল্পদিনমধ্যেই মিলান (হাজার বৎসর বয়ঃক্রম অথচ মিলান সহর) পঁহুছিব, আমাকে আবার অপ্রবীণ কহ।" কারণ প্রথমাবধিই নেপোলিয়নের অবিচলিত প্রত্যাশা হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল যে, এক বার ফৌজ হাতে পাইলে হয়, তাহা হইলে বিজিগীষাবিষয়ীভূত অশেষ দেশ হস্তগত করিতে কত ক্ষণ। ফলত কিঞ্চিৎ পরেই দৃষ্ট হইবেক যে, মিলানে যাইবার প্রত্যাশা পূর্ণ হইতে এক বৎসর লাগা দূরে থাকুক্, বরং লড়াই আরম্ভ হইবার পর এক মাস মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত সাহঙ্কার বাগাড়ম্বর সফল হইয়াছিল।

যখন নেপোলিয়ন আগমন পুর্ব্বক ইটালীয় সৈন্যদলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন উহারা ফ্রান্সের সীমা পার হইয়া সমুদ্রকূলবর্ত্তী নীস্ নামক শহর সন্নিধানে সন্নিবিষ্ট ছিল। তাহাদের তদানীন্তন দুর্দশার ইয়ত্তা করা অসাধ্য। স্বদেশের সাধারণ তন্ত্রের প্রতি যে সকল দৌরাত্ম্য বিদেশ হইতে আচরিত হয়, সে সমুদায়ের শোধ দিতে আসিয়া রাজপুরুষবর্গ কর্ত্তৃক যার পর নাই উপেক্ষিত হইয়াছিল। ফ্রান্সের রাজভাণ্ডারে তখন যেরূপ টানাটানি ও অনাটন পড়িয়াছিল, তাহাতে সৈন্যবর্গের প্রতি অনাস্থা করাতে রাজপুরুষদিগকেও বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। যাহা হউক, নীস নগরে সন্নিবেশিত ফরাশি সেনার সাংগ্রামিক আয়োজন অতি যৎসামান্য ছিল। তাহারা নিয়মিত বেতন পাইত না; আটাইশ হাজার আন্দাজ এক দল পদাতিসেনা থাকে, উহাদের গাত্রবস্ত্র ও পায়ের জুতা পর্য্যন্ত অপ্রতুল হইয়াছিল; তিন হাজার সোয়ার

ছিল, কিন্তু তখন দুর্গতির পরা কাষ্ঠার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল; যদিও নীস্ নগর এবং সন্নিহিত আর এক অস্ত্রশালা মধ্যে কামান গোলা ইত্যাদির যথেষ্ট সরবরাহ বিদ্যমান ছিল, তথাপি উপযুক্ত বাহন অভাবে সে সমস্ত উপকরণ আবশ্যক মতে স্থানান্তর করিবার যো ছিল না; কেবল গোটা বার বৃহৎ বৃহৎ কামান কষ্টে স্বষ্টে জুতিয়া কথঞ্চিৎ লড়ায়ে আনয়ন করিতে পারা যাইত। এমন কি, আহার পর্য্যন্ত সুশৃঙ্খলে জুটিত না; সৈনিকেরা অনেক দিন ধরিয়া মাংস ও ব্রাণ্ডির মুখ দেখিতে পায় নাই। নগদ টাকা এত দূর দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে ডিরেক্টর সমাজ ইটালীয় যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দু হাজার লুইডোর[২] বই পাঠাইতে পারিলেন না। এই দুরবস্থা ক্রমেই সমধিক জঘন্য হইয়া উঠিতে ছিল; এবং ইটালি অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা স্বীকার পূর্ব্বক সুবিপুল জয়লাভ ব্যতীত, দুরবস্থা অবসান হইবার অন্য সম্ভাবনা ছিল না।

কিন্তু সেই যুদ্ধযাত্রা স্বীকার করা তেমন সহজ ব্যাপার থাকে নাই। একেত আল্প্স্নামক প্রকাণ্ড পর্ব্বত ঈশ্বরদত্ত প্রাকারমালার ন্যায় ইটালির পশ্চিম উত্তর প্রান্ত রক্ষা করে। এই প্রাকারসিদ্ধ দুর্গরাজ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে কোর হইয়া আসিয়া যে খানে ভূমধ্য সাগরকে স্পর্শ করিতেছে, তাহার অব্যবহিত পরেই আবার আপিনাইন নামক আর এক বিশাল বিস্তীর্ণ উত্তুঙ্গশেখর শৈলসঞ্চয় সাগরের প্রায় ধারে ধারে ইটালি আবরণ করিয়া গিয়াছে। সেই দুই পর্ব্বতশ্রেণীর সংযোগস্থল নীস্ নগর হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাংশে; সেই সংযোগস্থলের উচ্চতা অল্প বটে, এবং উহা অতিক্রম পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ দেশের অভ্যন্তরে সৈন্যচালনা করা যায় বটে, কিন্তু হইলে কি হয়? যে সমস্ত সদর রাস্তা তদভিমুখে চলিয়া যায়, স্থানে স্থানে সে রাস্তা এরূপ সংকীর্ণ ও শিলাময় এবং চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গিরিবেষ্টনের দ্বারা এরূপ আবদ্ধ যে, অত্যল্পসংখ্যক সেনাদলই বিপক্ষের যাত্রা নিষেধ করিতে সমর্থ হয়। তাহাতে আবার এক দিক হইতে পীড্মন্ট-রাজের প্রেরিত কলী নামক সেনানী ত্রিশ হাজার যোদ্ধ সমেত উল্লিখিত পার্ব্বতীয় সুঁড়ি রাস্তা সমস্ত রক্ষা করিতেছিলেন; অন্য দিকে মিলানীজ হইতে আন্দাজ ষাটি হাজার সংখ্যক অষ্ট্রিয় সৈন্য বোয়ালো নামক বহুদর্শী সেনাপতির তাবেদার হইয়া অগ্রসর হইতেছিল। সুতরাং আটাইশ হাজার ফরাশি সেনাকে নব্বই হাজার বিপক্ষদলের মহড়া লইতে না পারিলে আর অগ্রসর হওয়া হয় না। তদ্ব্যতীত, ইটালির উপদ্বীপ অংশে,

২। ত্রয়োদশ লুই নামক ফরাশিরাজা ১৬১১ খৃঃঅব্দে সমামখ্যাত এই সুবর্ণ মুদ্রা প্রচলিত করিয়া যান। ইহাকে লুইডোর কহে, তাহার কারণ, ফরাশিভাষাতে ডোর বলিতে সুবর্ণ নির্ম্মিত। ইহার মূল্য কমবেশ টাকাদশেক হইবেক।

পার্ম্মা, মডীনা, পোপের অধিপত্য, ট্যস্‌ক্যানি ও নেপল্‌স্‌, এই যে পাঁচ ক্ষুদ্রকলেবর মুলুক ছিল, ট্যস্‌ক্যানি ব্যতীত তাহারা সকলেই ফরাশির বিপক্ষ হইয়াছিল। প্রয়োজন হইলে তাহারা স্ব স্ব সৈন্যদলকে উত্তরে যাইয়া কস্‌লী ও বোয়ালোর সহিত যোগ দিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিতে বিলক্ষণ প্রস্তুত ছিল। ফলত ফরাশিরা যখন অর্থকৃচ্ছ্র, অন্নকষ্ট, বস্ত্রাভাব, সংখ্যালাঘব প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা দ্বারা ব্যতিব্যস্ত ছিল, তখন তাহাদের বিপক্ষপক্ষে প্রাচুর্য্য ও বলাধিকতা সম্পূর্ণ রূপে বিরাজ করিতেছিল। তাহারা তত্তাবৎ অসুবিধা উল্লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত সংগ্রামনৈপুণ্য ব্যতীত উপায়ান্তর দেখে নাই। তাহাদিগের সেনা যেমন অধিক ছিল না, তেমনি সর্ব্বত্রগামী ও ক্ষিপ্রকারী হওয়া তাহাদিগের পক্ষে আবশ্যক ছিল; তাহাদিগের যেমন তোপের আয়োজন ভালরূপ ছিল না, তেমনি তাহাদিগের এরূপ জায়গা বুঝিয়া লড়াই করা দরকার দাঁড়াইল যে, বিপক্ষে সহসা তথায় তোপের প্রয়োগ করিতে না পারে। তাহাদিগের সোয়ার ছিল না, কিন্তু পাহাড়ে সোয়ার বড় কাজে লাগিবেক না এই বলিয়া তাহারা মনকে বুঝাইল। তবে ভরসার মধ্যে এই ছিল যে, ইতিপূর্ব্বে ফ্রান্সের প্রতি যে সকল অত্যাচার ও অপমানের উদ্যোগ বিদেশ হইতে করা হয়, তদুপলক্ষে তাহাদিগের চিত্ত যৎপরোনাস্তি কষায়িত এবং বৈরনির্যাতন করিবার নিমিত্ত এক অক্ষোভ্য লালসা সঞ্চারিত হইয়াছিল। কিছুতেই হটিব না, এই প্রতিজ্ঞা প্রত্যেক সৈনিক পুরুষের মনে জাগরূক ছিল এবং স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছি এই সংস্কার তাহাদিগের শরীর উত্তপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। বিশেষত যে কয় জন সেনাপতি তাহাদিগের উপর সংস্থাপিত হইয়াছিলেন যথা মাসেনা, ওজরো, লাহার্প, সেরুরিয়ের জুবের, আর নেপোলিয়ন; সকলেই শক্ত সমর্থ পুরুষ; সকলের মনই সাধারণতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা ও ভক্তি ভাবে পরিপূর্ণ ও যুযুৎসারসে প্রদীপ্ত ছিল।

নীস্ নগরস্থ স্কন্ধাবারে[৬] উপস্থিত হইয়া নেপোলিয়ন এক বার যোধবর্গের আদ্যোপান্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, পরে তাহাদিগের সাহস উত্তেজনা উদ্দেশে সর্ব্বসমক্ষে এই বক্তৃতা করিলেন "সৈন্য-

৬। স্কন্ধাবার শব্দের প্রয়োগ সংস্কৃত কাদম্বরী গ্রন্থে দৃষ্ট হয়; ইহার প্রকৃত অর্থ কেহ উদ্ভাবন করিতে পারেন না। কিন্তু উল্লিখিত গদ্য প্রবন্ধের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ইহা যেরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে তথাকার সমভিব্যাহার পর্য্যালোচনা করিলে ইহাকে এক এক বার ইংরাজী হেডকোয়ার্টর শব্দের প্রতিরূপ বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদিগের নিমিত্ত বলিতে হইতেছে যে, হেডকোয়ার্টর বলিলে, যে স্থানে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি অবস্থিতি করেন, যথা হইতে সংগ্রাম সম্পর্কের তাবৎ হুকুম বাহির হয় এবং নানা স্থান হইতে সৈন্যদল সকল সেখানে আসিয়া জমা হইবার কথা।

গণ! তোমাদের গাত্রে বস্ত্র নাই, যথোপযুক্ত আহার নাই, রাজপুরুষদিগের উচিত ছিল এ সমস্ত সমবধান করিয়া দেওয়া; কিন্তু তাঁহারা কিছুই পারেন নাই। এ সমস্ত ক্লেশ সত্ত্বেও তোমরা এই সকল ইটালীয় পাহাড়ের মধ্যস্থলে অকুতোভয়ে অবস্থিতি পূর্ব্বক যে সহিষ্ণুতা—যে নির্ভীকতা প্রদর্শন করিয়াছ, তাহার বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু এই সাহস—এই সহিষ্ণুতাতে তোমাদের নাম নাই। আমি আসিয়াছি যে, পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলবতী ভূমিতে তোমাদিগকে লইয়া যাইব। সুসমৃদ্ধ কত জনপদ, ধনধান্যসম্পন্ন কত রাজধানী যে পথে রহিয়াছে, আমি তোমাদিগকে সেই পথ দেখাইয়া দিব। তথায় যাইলেই তোমাদের ধন মান যশ তিন লাভ হইবে। তোমাদিগকে ইটালির মধ্যে যাইতে হইবেক। কেমন, এই কাজে অগ্রসর হইতে কি তোমাদের ভরসা নাই?"

নেপোলিয়নের সর্ব্বপ্রথম সাংগ্রামিক বক্তৃতার এই চেহারা। সৈন্যগণকে চালনা করিতে তিনি যেমন সুপটু, তাহাদিগকে মাতাইয়া দিতেও তেমনি চতুর ছিলেন। সময়ে সময়ে সেই ওজস্বী বক্তৃতা শক্তি দ্বারা বিশেষ কাজ দর্শিয়াছিল, এ কারণ তাঁহার সেই সমস্ত সম্বোধনবাক্য বিলুপ্ত হয় নাই। এই শেষোক্ত বক্তৃতা দ্বারা ইটালির সৈন্যদল দুর্জ্জয় সাহসে অধিরোপিত হইল।

নেপোলিয়ন এই কল্প স্থির করিলেন যে, সেরুরিয়ের এক দল সেনা লইয়া পীড়মণ্ট-সেনাপতির সম্মুখ ভাগে তদারক করিতে থাকুন; লাহার্প যাইয়া ভল্‌ট্রি নামক স্থান দখল করুন, কারণ বোয়ালো যে রাস্তার উপরে অবস্থিত ছিলেন, উহা ভল্‌ট্রি হইয়া জেনোয়া শহর পঁহুছিয়াছে, সেই জেনোয়া শহর যাহাতে ফরাশি হস্তগত না হয়, তদুদ্দেশে বোয়ালোকে ভল্‌ট্রি হইয়াই আসিতে হইত; সুতরাং লাহার্প ঐ স্থান আটক করিয়া বসিলেন। আর ওজরো এবং মাসেনা ইঁহারা দুই জনে সৈন্যের অবশিষ্ট ভাগ লইয়া বরাবর সমুদ্রতীরে মোতায়েন থাকিলেন এবং কখন কোন দিকে বলচালনা করা আবশ্যক হইয়া উঠে, তদর্থে সুসজ্জ রহিলেন।

যখন বোয়ালোর শ্রুতিগোচর হইল যে, জেনোয়া নগর যায় যায়; এবং ফরাশি সেনা উপকূলপথে পূর্ব্ব মুখে আসিতেছে, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আল্‌পস্‌ ও আপিনাইন্‌ এই দুই পর্ব্বতশ্রেণীর সংযোগস্থল দিয়াই ফরাশিরা ইটালীমধ্যে প্রবেশ করিবে, কারণ সেই সংযোগস্থলই ঐ দুই পাহাড়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন ভূমি, যে হেতু আক্রমণকারী সেনাদলকে যখন অধিত্যকা অতিক্রম পূর্ব্বক পরদেশে আরোহণ করিতে হয়, তখন অধিত্যকা যত কম উচ্চ হয়, বিপক্ষের সম্মুখে তদুপরি আরোহণ করা তত সহজ হইয়া থাকে। বাস্তবিকও নেপোলিয়নের অভিপ্রায় তাহাই

ছিল। কিন্তু তিনি তন্মধ্যে আর এক যে নিগূঢ় কৌশল ভাবিয়া রাখেন, বোয়ালোর বুদ্ধিতে তাহা উদয় হইল না। সেই কৌশল এই; বোয়ালো জানিতেন যে, উল্লিখিত সংযোগস্থল লঙ্ঘন করিবার উপযোগী তিনটি সুবিদিত সর্ব্বজনপরিচিত গিরিপথ আছে, তিনটিই অতি সঙ্কীর্ণ, তিনটির চতুঃপার্শ্বেই উচ্চ উচ্চ দুরারোহ পর্ব্বতশিখর বিরাজ করিতেছে; অতএব সেই তিন পথ রুদ্ধ করিলেই কাহার সাধ্য সমুদ্রকূল হইতে ইটালির উত্তরাঞ্চলের মধ্যভাগে প্রবেশ করে। এই বোধ থাকাতে বোয়ালো স্বয়ং এক রাস্তায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন, আর অপর দুই রাস্তায় আপনার অধীনস্থ দুই জন সেনাপতিকে স্ব স্ব সৈন্যদল সমেত পাঠাইয়া দিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, শত্রুপক্ষের সেনা অতি স্বল্প, সুতরাং আপন সেনা বিভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যুদ্ধার্থ সজ্জিত রাখিলেও ক্ষতি নাই। সুতরাং ফরাশি সেনা যে পথেই কেন আসুক না, তাঁহার গ্রাস এড়াইতে পারিবেক না। আর যদি তাহারা গিরিমার্গে না উঠিতে উঠিতেই দৈবাধীন নিজ সৈন্যবর্গ সমুদ্রকূলে পঁহুছিতে পারে; তাহা হইলে ফরাশি সেনা যাইতেছে পূর্ব্ব মুখে, তাঁহার সেনা দক্ষিণ মুখে পাহাড় হইতে অবতীর্ণ হইয়া ফরাশি সেনার বাম পার্শ্বকে তিন স্থলে আক্রমণ পূর্ব্বক উহাকে ত্রিধা ভগ্ন ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে। এই বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি স্বয়ং ভল্‌ট্রি অভিমুখে ধাবমান হইলেন, ডারজেন্টো নামক সেনাপতিকে আপনার পশ্চিমাংশে এক পথে অগ্রসর করাইলেন এবং আরো পশ্চিমে আর এক দল চলিল।

কিন্তু নেপোলিয়ন বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যদিও জানা শুনা পথ তিনটি বই নাই বটে, তথাপি পার্ব্বত্য ভূমির স্বভাবই এই যে, চতুর্দ্দিকে অনেক গুপ্ত পথ বিদ্যমান থাকে, সেগুলি দুর্গম দুরারোহ বলিয়া লোকে সচরাচর ব্যবহার করেনা, কিন্তু প্রয়োজন হইলে কিঞ্চিৎ অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক সে সকল পথে গতিবিধি করা একেবারে অসাধ্য নহে। তাঁহার সৈনিকদিগের সে অধ্যবসায় যথেষ্ট ছিল; অতএব যেইমাত্র শুনিলেন যে, বিপক্ষ সেনা তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, অমনি উহা দ্বারা আপনার সুবিধাই বুঝিলেন। আপন সৈন্যসমূহকে শীঘ্র শীঘ্র ইতস্তত প্রয়াণ করাইয়া এবং অজ্ঞাত নিভৃত গিরিপথো দ্বারা অগ্রসর হইয়া ক্রমান্বয়ে তিন দল বিপক্ষকেই যে তিন দফায় উচ্ছেদ করিতে পারিবেন, তাহারি সুযোগ হইয়াছে বুঝিলেন। বোয়ালো সেই কথাটি অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই, এ অবিমৃষ্যকারিতার ফল অচিরে ফলিল।

১৭৯৬ খৃঃ অব্দের ১৩ই এপ্রিল তারিখে সেনাপতি ডার্জেন্টো অষ্ট্রিয় সেনার মধ্য বিভাগ লইয়া মণ্টেনট্ নামক গিরিপথ ধরিয়া আসিতে লাগিলেন, পথিমধ্যে রাম্পোঁ নামক ফরাশি সেনাপতির

সহিত দেখা হইল। ইনি তথায় বহু কাল নির্ম্মিত প্রাচীন এক ক্ষুদ্র ধূশের[৪] পিছনে আশ্রয় লইলেন, ডাজের্ণ্টো কোন ক্রমেই তাঁহাকে সেই স্থান হইতে হঠাইতে পারিলেন না, এবং সেই ধূশ পথের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া স্বয়ং আর অগ্রসর হইতেও পারিলেন না। সেই ১৩ ই রাত্রে নেপোলিয়নের সৈন্যবর্গ এক সুদীর্ঘ প্রয়াণ সমাধা করিল। লাহার্প্ও ওজরো, ইঁহাদের দুই দল সেনা আসিয়া মণ্টেনট্ পথে ধাবমান হইল এবং রাম্পোঁর সহিত যোগ দিল, আর মাসেনা এক অপরিজ্ঞাত পর্ব্বতীয় পথে উত্তীর্ণ হইয়া গোপনে গোপনে একেবারে ডাজের্ণ্টোর পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া দাখিল হইলেন। এই রূপে পর দিন প্রাতে ডাজের্ণ্টো দেখিলেন যে, তাঁহার অগ্র পশ্চাৎ দুই দিকই বন্দ হইয়াছে, সুতরাং তিনি দুই সেনার মাঝে পড়িয়া অক্লেশে পরাজিত হইলেন। যে বোয়ালো জানিতেন, ভল্‌ট্রিতে আসিয়া ফরাশিদিগকে আক্রমণ করিবেন, তিনি দুই দিন পরে নিজ সেনার মধ্য বিভাগের এই [illegible]তি শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

এই রূপে এক উদ্যমেই নেপোলিয়ন বিপক্ষের এক অংশকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন, স্বয়ং পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক ইটালির বক্ষস্থলে স্থানলাভও করিলেন। তিনি মন্টেনট্ গিরিপথের প্রভু হইয়া বর্ম্মীডা নদীর উপত্যকায় প্রবেশ করিলেন। এই নদী উত্তরবাহিনী, আপিনাইন হইতে নির্গত এবং সমুদ্রের বিপরীত দিকে বহমান হইয়া পো নামক সুপ্রসিদ্ধ প্রকাণ্ড স্রোতস্বতীর সহিত মিলিত হইতেছে। বর্ম্মীডার তটে আগমন পূর্ব্বক নেপোলিয়ন দেখিলেন, তাঁহার পুরোভাগের হতাবশিষ্ট অষ্ট্রিয় সেনা ডীগো গ্রামে আশ্রয় লইয়াছে, তথায় বোয়ালো আসিয়া একত্র হইয়াছেন। নেপোলিয়নের বাম ভাগে পীডমন্টের রাজধানী টিউরিনে যাইবার পথ, সেই পথে পূর্ব্বোক্ত সেনানী কলী পীড্মন্ট সেনাদল লইয়া মিলেসিমো নামক অতি সঙ্কীর্ণ কয়েক গিরিমার্গ রক্ষা করিতেছেন। কি ডীগো, কি মিলেসিমো, উভয়ত্রই রণভূমি এরূপ অপ্রশস্ত যে, সৈন্যসংখ্যার আধিক্য নিবন্ধন তাঁহার শত্রুর কোন উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব এক কালেই তিনি দুই জায়গায় যুদ্ধারম্ভ করিলেন। কিঞ্চিৎ ক্লেশের পর ফরাশিসেনার অপ্রতিহত পরাক্রম দ্বারা তিন চারি দিবসের মধ্যে দুই স্থানই সাবাড় হইয়া গেল। কলী ক্রমশঃ হঠিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে যেখানে যত

৪। কোথাও লড়াই হইবার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইলে রণক্ষেত্রে এক একটি অস্থায়ী মৃত্তিকাময় কেল্লা সময়ে সময়ে বানাইয়া থাকে, ইহা মৃণ্ময় প্রাচীরের-প্রায় সেনার চতুঃপার্শ্ব আবরণ করে। ঠিক ইহাকে না হউক, ঈদৃশ অস্থায়ী কেল্লাকে পশ্চিমের সিপাহী লোকে ধূশ কহে। সেই প্রচলিত নামই পরিগ্রহ করিতে হইল। যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কীয় তাবৎ বিষয়ের শিক্ষাগুরু ফরাশি জাতি ইহাকে 'রেদূৎ' কহে।

ক্ষুদ্র কেল্লা ছিল, ভিন্ন ভিন্ন ফরাশি সেনাপতিগণ দখল করিতে লাগিলেন; বোয়ালো ডীগো পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মিলান শহরে যে পথ গিয়াছে, তাহারি এক স্থলে স্থান গ্রহণ করিয়া অষ্ট্রিয়ার ইটালিস্থ আধিপত্যের প্রধান পুরী আবরণ করিয়া রহিলেন; তদ্রূপ কজলীও টিউরীন্ বাঁচাইবার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিলেন; কিন্তু অষ্ট্রিয় ও পীডমন্টীয় এই দুই সেনাদলের একত্র হইয়া অনিবার্য্য বেগে ফরাশি সেনার উপর পতিত হইবার সুযোগ এককালে তিরোহিত হইল।

পীডমন্ট-রাজকে সায়েস্তা না করিয়া মীলানীয় অভিমুখে যাত্রা অপরামর্শ বুঝিয়া নেপোলিয়ন সর্ব্বাগ্রে টিউরীন অভিমুখেই সৈন্য চালনা করিলেন, তখন বোয়ালোর প্রতি অণুমাত্র মনোযোগ করিলেন না। কজলী অশেষ চেষ্টা করিলেও ফরাশি সেনার জয়যাত্রা স্তম্ভিত বা বিলম্বিত হইল না। 'মণ্ডোভী' নামক গড় যখন ফরাশিদিগের অধিকৃত হইল, তখন তথায় যে অপরিমিত আহারসামগ্রী সঞ্চিত ছিল, তদ্দ্বারা ফরাশিসেনা মধ্যে দুর্ভিক্ষের নিরাস ও সুভিক্ষের আবির্ভাব হইল। ইতিপূর্ব্বে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের জন্য উহাদিগকে পল্লীগ্রামস্থ নিরীহ লোকদিগের উপর মধ্যে মধ্যে উপদ্রব করিতে হইত, এক্ষণে তদ্বিষয়ের আবশ্যকতা অতিক্রান্ত হওয়াতে, সুশিক্ষিত সুবিনীত সৈন্যদলের উপযুক্ত যে ভাবভঙ্গী, তাহা তাহারা পুনর্ব্বার ধারণ করিল।

এই রূপে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া নেপোলিয়নের অনুচরগণ যখন টিউরীন্ নগরের তিন ক্রোশ দূরে দেখা দিল, তখন পীডমণ্টের অধীশ্বর বুঝিতে পারিলেন যে, আর ভদ্রস্থতা নাই। তিনি যুদ্ধবিচ্ছেদের প্রার্থনা জানাইয়া দূত প্রেরণ করিলেন। তৎকালে নেপোলিয়ন্ স্বয়ং সন্নিহিত শেরাস্কু শহরে অবস্থিত ছিলেন, তিনি নিম্নলিখিত নিয়মে যুদ্ধবিচ্ছেদে সম্মত হইতে চাহিলেন যে, সার্ডীনিয়া-রাজ ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের বিরোধী নরপতিদিগের পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থায়ী সন্ধি স্থাপন করিবার নিমিত্ত পারিসে দূত পাঠাইবেন, যত দিন তথায় সেই সন্ধি নির্দ্ধারিত না হয়, তত দিন বৈতনিক অবৈতনিক,[১] তাঁহার যাবতীয়

১। ইয়োরোপে রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর উত্তর দেশীয় অসভ্য জাতিগণ যখন বসবাস করিয়া ছিল, তখন পরকীয় দেশে সুশৃঙ্খলে আত্মরক্ষায় সুবিধার নিমিত্ত উহারা স্বজাতীয় যোদ্ধাদিগকে বেতন না দিয়া জমী বিলি করিয়া দিত। যোদ্ধারা প্রতিবৎসর দিন-চল্লিশেক জমীদারের সহচর হইয়া লড়াই করিলেই জমীর মালগুজারী করা হইত। পরে ক্রমে যখন রাজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূস্বামী বলিয়া পরিগণিত হইলেন, তখন তিনি প্রজাগণের নিকট সেই রূপ খাজনাই অধিকাংশ আদায় করিতেন অর্থাৎ জমীর উপস্বত্ব ভোগীরা বৎসরের মধ্যে চল্লিশ দিন তাঁহার পক্ষে লড়াই করিয়া দিত। কালক্রমে সাংগ্রামিক ব্যাপার সমস্ত জটিল ও অভ্যাসসাপেক্ষ হইল, দূরদেশে সৈন্য প্রেরণ দরকার হইত, দুই চারি বৎসর যুদ্ধের কাণ্ড কারখানা না ভোগ

সৈন্যকে সংগ্রামসজ্জা পরিত্যাগ করিতে হইবেক। ফ্রান্স হইতে ইটালি আসিবার যে সকল রাস্তা পীডমন্ট্ হইয়া আসিয়াছে, সে সকলই ফরাশিরা ব্যবহার করিতে পাইবেক এবং সেই সকল পথের ধারে যে কেল্লা আছে, তাহার দু একটি ফরাশিদিগের হস্তগত থাকিবেক। আর সেই কেল্লার মধ্যে যে সমস্ত সাংগ্রামিক সরঞ্জাম এবং খাদ্য সামগ্রী ভাণ্ডারজাত করা আছে, তাহা পর্য্যন্ত ফরাশিসেনার প্রয়োজন নির্ব্বাহার্থ দিতে হইবেক।

এই সকল নিয়ম সম্বলিত সন্ধিপত্র ১৭৯৬ সালের ১৫,ই মে তারিখে স্বাক্ষরিত হইল। তদবধি ফ্রান্স ও ইটালির মধ্যবর্ত্তী আল্প্স্ পর্ব্বতের পথগুলি ফরাশি জাতির ব্যবহারযোগ্য হইল এবং আরো দূরান্তরে যুদ্ধচালনা করিবার উপযুক্ত এক আশ্রয়স্থান স্বরূপ হইয়া পীড্মন্ট্ জনপদ এক-প্রকার ফরাশিহস্তগতই রহিল।

নেপোলিয়নের প্রধানসেনাপতিপদ পাইবার পর সর্ব্ব প্রথম যুদ্ধকার্য্য এই রূপে অবসান হয়। তিনি ইহা দ্বারা এক মাস কাল মধ্যে আল্প্স্ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে না পারুন* উহার এক পাশ দিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইলেন।

করিলে কর্ম্মণ্য যোদ্ধা হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল, লাঙ্গল ছাড়াইয়া কাহাকেও রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিলে সেই সেনা দ্বারা রাজারো সুবিধা হইত না, প্রজাদিগেরও ক্লেশ বোধ হইত। এই সকল কারণে জমীর উপস্বত্বভোগী অবৈতনিক সৈন্যদল ক্রমে অপ্রচলিত হয়, এবং বৈতনিক ও ব্যবসায়ী সৈন্যের সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়ী সৈন্যেরা যুদ্ধকে বিদ্যা ন্যায় অভ্যাস করে, মাহিনা পায়, এবং প্রভুর আজ্ঞামতে সর্ব্বত্র যুদ্ধ করিতে যায়। কিন্তু ব্যবসায়ী সেনা প্রচলিত হইলেও পূর্ব্বোক্ত অবৈতনিক সেনা একেবারে উঠিয়া যায় নাই, বরং ইয়োরোপের অনেক রাজ্য মধ্যেই 'মিলীশিয়া' নামে উহা অদ্যাপি অপ্রকট ভাবে বজায় আছে। যখন দেশের উপর তেমন কোন ঘোরতর বিভ্রাট উপস্থিত হয়, এবং কেবল বৈতনিক সৈন্যদলের দ্বারা আত্মরক্ষা সুসাধ্য থাকে না, তখন শক্ত সমর্থ তাবৎ ব্যক্তিকে স্বদেশ রক্ষার্থ আহ্বান করা হয়। দেশীয় লোকের যুদ্ধাভ্যাস এককালে না রহিত হয়, এতদর্থে সন্ধির সময়ও মধ্যে মধ্যে মিলীশিয়া সেনাকে জড় করিয়া, বন্দুক ছোড়া, কুচ্প্যারেড ইত্যাদি অনুষ্ঠান করায়।

এই টিপ্পনীর সর্ব্ব প্রথমে ১ একের পরিবর্ত্তে ৫ পাঁচ হইবে।

* । অতি পূর্ব্বকালে যখন হানিবল নামক সুপ্রসিদ্ধ কার্থেজ সেনানী রোমের প্রতি বিপক্ষতাচরণ করিবার নিমিত্ত সমস্ত স্পেন, অখণ্ড পিরিনীজ পর্ব্বত এবং ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূল এই সকল অতি দুর্গম, জঙ্গলময় অসভ্য লোকাকীর্ণ অপরিচিত প্রদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক আল্প্স পর্ব্বতের পদতলে উপস্থিত হয়েন তখন এককাল গিয়াছিল। কিন্তু হানিবলের দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ দুরারোহ পর্ব্বতের দ্বারা নিরুদ্ধ হইল না। অশেষাবধ বাধার মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক তিনি পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া এই অদ্ভুত কীর্ত্তি দ্বারা আপন যশ অবিনশ্বর এবং রোমের অধিবাসীদিগকে কম্পান্বিতকলেবর করেন। হানিবলের সেই অলৌকিক লীলার কথা স্মরণ করিয়া নেপোলিয়ন আপনার আল্প স উত্তী

এবং আপনার সৈন্য অপেক্ষা সর্বাংশে বলবত্তর বিপক্ষদলের উপর অতি ঘোরতর তিন সংগ্রামে তাঁহার জয়ী হওয়া হইল, বিপক্ষ পক্ষের পনর হাজার লোক গ্রেপ্তার আর দশ হাজার সংহার হইল, এবং পঞ্চাশটা কামান আর একুশটা পতাকা কাড়িয়া লওয়া হইল। ছাব্বিশ বৎসর বই বয়ঃক্রম নয়, এতাদৃশ নবীন সেনাপতির পক্ষে জয়লক্ষ্মীর ঈদৃশ প্রিয়পাত্র হওয়াতে তাঁহার যশঃশশধর অকলঙ্ক ভাবে উদয় পাইল।

ইন্দ্রের সুধাপান।

[টহল—Ballad]

১

একদিন দেব দেবপুরন্দর,
বামে সচী সতী নন্দন ভিতর,
বলিল গন্ধর্ব্ব সখারে ডাকি ;
যাও চিত্ররথ সুধাভাণ্ড ভরি,
আন' ত্বরা করি পীযূষ লহরী,
আন' বাদিত্রবাদকে [illegible]

হইবার ব্যাপার উপ[illegible]কে সৈন্যদিগকে বলিয়াছিলেন "হানিবল আল্পসের মাথায় পা দিয়াছিলেন, কিন্তু আমারা পাশ কাটাইয়া আসিয়াছি।" অর্থাৎ হানিবলের কীর্ত্তি অধিক দুঃসাধ্য বটে, এবং তজ্জন্য তাঁহার অধ্যবসায়ের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু আমাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই ব্যাপারে সমধিক সংগ্রাম নৈপুণ্য ও চতুরতা প্রকাশ পাইতেছে।

আন' বাদিত্র সুধাতরঙ্গে,
যত দেবগণ বলিল রঙ্গে,
অমর মাতিল সুরেশ সঙ্গে

সুবর্ণ মঞ্চেতে সুর আখণ্ডল,
চারিদিকে যত অমরের দল,
বিজলির মত করে ঝলমল
শোভে পারিজাত হার গ্রীবাতে ;
বামে দৈত্যবালা রূপে ক'রে আ'ল,
কোথা সে চঞ্চল তড়িত উজ্জ্বল,
কোথা বা উমার রূপ নিরমল ?
পলকে পারে সে জগতে ভুলাতে।

আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর,
যার কোলে হেন নারী মনোহর,
কত সুখ তার হয় রে।
বীর বিনা আহা রমণীরতন,
বীর বই আর রমণীরতন,
বীর বিনা আহা রমণীরতন,
কারে আর শোভা পায় রে !

(চিতেন)

আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর,
বলিল যতেক কিন্নরী কিন্নর,
কত সুখ তার হয় রে ;
বীর বিনা আহা রমণীরতন,
বীর বই আর রমণীরতন,
বীর বিনা আহা রমণীরতন,
কারে আর শোভা পায় রে !

এ'লো চিত্ররথ মনোরথ গতি,
স্বর্ণপাত্রে সুধা, সঙ্গে বিদ্যারথী,*
উঠিল সুরব "জয় সচীপতি"
অমর মণ্ডলী মাঝেতে ;
দেব পুরন্দর দেবদল সহ,
সুধা সোমরস পিয়ে মুহুমুহ,
গন্ধে আমোদিত মারুত প্রবাহ,
গগণ কাঁপিল বেগেতে ;

বায়ু মাতোয়ারা, রবি, শশী, তারা,
অরুণ, বরুণ, দিক্‌পাল যারা,
সবে মাতোয়ারা সুধা পানেতে।
হ'লো ভয়ঙ্কর কাঁপে চরাচর
আকাশ, পাতাল, মহী, মহীধর,
জলধি হুঙ্কারে বেগেতে।

(চিতেন)

বায়ু মাতোয়ারা রবি শশী তারা,
অরুণ, বরুণ, দিক্‌পাল যারা,
সবে মাতোয়ারা সুধা পানেতে।

৪

বসিয়ে উন্নত আসন উপরে,
গুণী বিশ্বাবসু বীণা নিল করে,
মেঘের গরজে গভীর ঝঙ্কারে,
মোহিত করিল অমরগণে ;
দেবাসুর রণ গাহিতে লাগিল,
কিরূপে অসুরে অমরে নাশিল,
কিরূপে ইন্দ্র দেবরাজ হ'ল,
শুনাইল বীণা বাজায়ে গানে।

* এই অমর গায়কের আর একটি নাম বিশ্বাবসু।

পুলোমদুহিতা তোমারি গৃহীতা,
ওহে দেবরাজ তুমিই দেবতা ;
রণে পরাজয় ক'রে বাহুবলে,
এ অমরপুরী নিলে করতলে,
সমুদ্র মথিয়া অমৃত লভিলে,—
অহে দেব তব অসাধ্য ক্ষমতা।

হলো প্রতিধ্বনি পুলোমদুহিতা,
অহে দেবরাজ তোমারি গৃহীতা ;
ঘন ঘন ঘোর সুগভীর স্বরে,
কাননে, বিপিনে, নদী সরোবরে,
উঠিল নিনাদি "যতেক দেবতা।"
ভাবে গদ গদ মুদিত নয়ন,
শুনে সুরপতি হরষিত মন,
পুনরায় যেন হলো দৃঢ়তা।

(চিতেন)

হলো প্রতিধ্বনি পুলোম দুহিতা,
অহে দেবরাজ তোমারি গৃহীতা
ঘন ঘন ঘোর গভীর স্বরে,
কাননে, বিপিনে, নদী সরোবরে,
উঠিল নিনাদি "যতেক দেবতা।"

অতি সুললিত মৃদু সুস্বরে,
আবার গায়ক বীণা নিল করে,
মজাইল সুরললনা ;
দেখ দেখ চেয়ে নাগরের বেশে,
চোক্ ঢুলু ঢুলু আসে হেসে হেসে,
আড়ে আড়ে কথা নাহি অভিমান,
সদা আশুতোষ খুলে দেয় প্রাণ,
ওরে সুধা তোর নাই তুলনা।

সদা সেবে যারা সোমরস সুধা
ক্ষোভ লোভ শোক থাকে না ক্ষুধা,
রণজয়ী যেই সুধাপায়ী সেই,
শূর বিনে সুধা স্বাদ জানে না।

(চিতেন)

সুধারপ্রেমেতে বাজ্‌রে বীণা,
বল্‌ সুধাবই ধন্‌ চাহিনা,
অমন মধুর নাই পিপাসা ;
সুধা কিবা ধন সুধা সে কেমন,
সাধক বই কি জানিবে চাসা !

৬

দৈত্য অরিদল দম্ভে কোলাহল
ক'রে আস্ফালন করিল কত,
মত্ত মধুপানে দিতি সুত গণে
কি রূপে কোথায় করেছে হত।

তখন আবার বীণা-বাদ্যকর
বীণা নিল করে সকরুণ স্বরে,
অমর দর্প করিল চূর ;
আরক্ত লোচন ঘন গরজন,
ক্রমে ক্রমে সব হলো অদর্শন,
স্তব্ধ হইল অমর পুর।

সকরুণ স্বরে বীণা করে ধ'রে,
গাহিল যখন প্রলয় হবে,
যখন ঈশান হর হর বোলে,
বাজাবে বিষাণ ঘন ঘোর রোলে,
জলে জলময় হবে ত্রিভুবন,
না রবে তপন শশীর কিরণ,
জগত মণ্ডল কারণ বারিতে,
ছিঁড়িয়া পড়িবে ত্রিলোক সহিতে,
তখন কোথা এ বিভব রবে।

এই সুরপুরী এ সব সুন্দরী
এ বিপুল ভোগ কোথায় যাবে !
অতি ক্ষুণ্ণ মন যত দেবগণ,
ঘন ঘন শ্বাস করে বিসর্জ্জন,
ভাবিয়ে অধীর প্রলয় যবে ;
এই সুরপুরী এ সব সুন্দরী
এ বিপুল ভোগ কোথায় রবে !

(চিতেন)

এ বিপুল ভোগ কোথায় রবে,
বলিয়া কিন্নর গাহিল সবে,
জগত মণ্ডল কারণ বারিতে,
ছিঁড়িয়া পড়িবে ত্রিলোকসহিতে
তখন কোথা এ ঐশ্বর্য্য রবে !

৭

গুণী বিশ্বাবসু সঙ্গীতের পতি,
বীণা যন্ত্রে পুনঃ মধুর ভারতী,
গাহিতে লাগিল প্রেমের গাথা ;
বিলাপ ঘুচিল প্রেম উপজিল
রসে ডগমগ তনু শিহরিল,
একি সূত্রে প্রেম করুণা গাঁথা।

মৃদুল মৃদুল তাজ বে তাজ,*
মৃদুল মৃদুল নও বে নও,
বাজিতে লাগিল মধুর বোলে ;—
শ্রবণে শীতল যতেক শ্রোতা ;
সংগ্রামে কি সুখ, সকলি অসুখ,
দিন রাত নাই প্রাণ ধুক্‌ ধুক্‌,
মান মর্য্যাদা কথার কথা।

* দেবতারাই সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা, সুতরাং হিন্দুদিগের আগে না মুসলমানদিগের বোলে না হইয়া এই সুর যে লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে উদ্ভাবিত হইবে ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে।

ঘোড়া দড়বড়ি অসি ঝন্‌ঝনি,
কাটাকাটি গোল তীর স্বন্‌সনি,
কাণে লাগে তালা করে ঝালাপালা,
দেহ হয় আলা সমর-স্রোতে,
গতি অবিরাম নাহিক বিশ্রাম,
সমরে কি সুখ নারি বুঝিতে।
চির দিন আর দনুজ সংহার
ক'রে কত ভার সহিবে দেব;
বামে সচীসতী হের সুরপতি.
কর সুখ ভোগ রাখ বুকেতে.।—

বাখানিল যত কিন্নর কিন্নরী,
বাখানিল যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
বাখানিল দেবগণ পুলকে;
রতিপতি জয় হলো সুরপুরে,
ললিত মধুর বীণার সুরে,
সঙ্গীতের জয় হলো ত্রিলোকে।

স্মরে জর জর দেহ থর থর,
হেরে ঘন ঘন দেব পুরন্দর,
হৃদয়ে বামারে রাখিতে চায়;
নিমেশে হেরিছে নিমেশে ফিরিছে
নিমেশে নিশ্বাস বহিছে তায়।
শেষে পরাজিত অচেতন চিত,
সচী বক্ষস্থলে ঘুমায়ে রয়।

(চিতেন)

গাহিল কিন্নর স্মরে জর জর
দেব[illegible]ন্দর হলো পরাজয়,
নিমেশে হেরিছে নিমেশে ফিরেছে,
নিমেশে নিশ্বাস বহিছে তায়।
শেষে পরাজিত অচেতন চিত
সচী বক্ষস্থলে ঘুমায়ে রয়।

৮

বাজ্‌রে বীণা বাজ্‌রে আবার,
ঘন ঘোর রবে বাজ এইবার,
আরো উচ্চতর গভীর সুরে:
যাক দূরে যাক কামের কুহক
মেঘের ডাকে ডাক্‌রে পুরে।

অহে দেবরাজ ছিছি একি লাজ,
দেখ দেখ ওই দনুজ সমাজ,
রণ[illegible]াজ ক'রে আসিছে ফিরে;
শিরে ফণী বাঁধা করে উল্‌কাপাত,
কর সুরনাথ দনুজ নিপাত,
দেখ চরাচর কাঁপিছে ডরে।

জলদ নিনাদে করে হুহুঙ্কার
এ অমরপুরী করে ছারখার,
পূরণ আহুতি ক'রিবে এবে।
কর দম্ভ চূর, বজ্র ধর শূর,
রাখ হে ব্রহ্মাণ্ড, বাচাঁও দেবে।

শুনে বজ্রধর বেগে বজ্রধরে,
কড় কড় ধ্বনি গরজে অম্বরে,
ভয়ে হিমগিরি টলিল।
তখন উল্লাসে বিদ্যারথ হেসে
বীণা যন্ত্র থুয়ে রাখিল।

(চিতেন)

বেগে বজ্রধর গাহিল কিন্নরে,
কড় কড় ধ্বনি গরজে অম্বরে,
ভয়ে হিমগিরি টলিল।
তখন উল্লাসে বিদ্যারথ হেসে
বীণা যন্ত্র থুয়ে রাখিল!

বেকন সন্দর্ভ।

১০ মিত্রতা।

“নির্জ্জনে যিনি সন্তোষ লাভ করেন হয় তিনি একটি বন্য পশু নয় একটি দেবতা।” যিনি এই কথা বলিয়াছেন তিনিও ইহা হইতে অধিক সত্য মিথ্যা একত্র প্রকাশ করিতে পারিতেন না। সমাজের উপর স্বাভাবিক ঘৃণা ও আন্তরিক বিদ্বেষ থাকা বন্য পশুর লক্ষণ এ কথা সত্য, কিন্তু যে রূপ কানডিয়ার এপিমেণ্ডিস্, রোমের নিউমা, সিসিলির এপিডক্লিস্, টাএনার আপেলোনিয়স্ প্রভৃতি পৌত্তলিকগণ কেবল বাহ্য আড়ম্বরোদ্দেশে; এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রচীন ঋষিগণ ঈশ্বর চিন্তার জন্যই লোক সমাজ পরিত্যাগ করিতেন তাঁহাদের অন্য কোন প্রকার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্য ছিল না সেরূপ স্থল ব্যতীত নির্জ্জনে থাকিবার ইচ্ছায় দেবতার লক্ষণ কিছুই দেখা যায় না।

নির্জ্জন কাহাকে বলে ও তাহার অর্থ কত দূর বিস্তৃত লোকে ইহা ভাল জানে না। অধিক লোক থাকিলেই যে সেটি মিত্রসম্প্রদায় হইল এমন নয়। যদি প্রণয় না থাকে তবে জনতা কেবল চিত্রশ্রেণী মাত্র, এবং কথোপকথন কেবল অব্যক্তানুকার বলিলেও হয়। “বিস্তীর্ণ নগর একটি বিস্তীর্ণ মরুভূমি” এই কথাটি পূর্ব্বে যাহা বলিলাম তাহার সহিত অনেক মিলিতেছে। বিস্তীর্ণ নগরে মিত্রগণ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকে সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই দূরস্থ বন্ধুগণের সহিত তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা হয় না। ইহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় যে যদি প্রকৃত বন্ধু না থাকে তবে তাহার তুল্য কষ্টকর নির্জ্জনতা আর নাই; সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য মরুভূমি; ইহাই নির্জ্জনতা শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য। যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ মিত্রতার অনুপযুক্ত পাত্র সে বন্য পশু কখনই মানুষ নহে।

মনের সুখ দুঃখ ব্যক্ত করাই মিত্রতার প্রধান ফল। যে সকল রোগ বায়ু প্রভৃতির স্তম্ভনে উৎপন্ন হয় তাহা শরীরের পক্ষে অতিশয় ভয়ানক হইয়া উঠে, সেই রূপ মনের ভাব স্তম্ভিত রাখিলেও নানা প্রকার মানসিক রোগ উৎপন্ন হয়। দেখ, যকৃৎ পরিষ্কারের জন্য শালশা, প্লীহার জন্য লৌহ, ফুপ্ফুসের পীড়ায় শোধিত গন্ধক ও মস্তিষ্কের পীড়ায় বীবরের তৈল ব্যবহার হইতে পারে, কিন্তু অকৃত্রিম মিত্র ব্যতীত আর কোন ঔষধই অন্তঃকরণকে পরিষ্কৃত রাখিতে পারে না। দুঃখ, সুখ, ভয়, আশা, সন্দেহ, উপদেশ প্রভৃতি যাহাতে অন্তঃকরণ এক প্রকার ভারগ্রস্তের ন্যায় হয় এই সমুদায়ই মিত্রের নিকট ব্যক্ত করিতে পারা যায়।

প্রধান প্রধান রাজারা মিত্রতাকে যেরূপ মূল্যবান্ জ্ঞান করেন তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। অনেক সময়ে তাঁহারা বহুবিধ বিপদ্ স্বীকার করিয়াও

মিত্রতা ক্রয় করেন, কারণ রাজাদিগের সহিত প্রজা ও কর্ম্মচারীদিগের যে ভেদ আছে তাহাতে কতকগুলি লোককে অত্যুচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত এমন কি আপনার সমান না করিলে মিত্রভাব উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের অনেক সময়ে অসুবিধা ঘটে। এক্ষণকার ভাষায় উহাদিগকে প্রিয়পাত্র বা নর্ম্মসুহৃদ বলে। ইহাতে বোধ হয় যেন অনুগ্রহ করিয়া বা বিশ্রস্তালাপের জন্যই এরূপ মিত্রতা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু লাটিন শব্দ ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্যানুসারে প্রযুক্ত হয়। ঐ ভাষায় এরূপ ব্যক্তিদিগকে দুঃখভাগী কহে, কারণ দুঃখ-ভাগিতাই মিত্রতা রূপ গ্রন্থির দৃঢ়তা উৎপাদন করে। আমরা দেখিতেছি যে কেবল হীনমনস্ক ও আমোদপ্রিয় রাজারাই এইরূপ করিতেন এমন নয় বিজ্ঞ ও সুচতুর নরপতিগণও কখন কখন অমাত্যদিগের সহিত মৈত্রীবন্ধন করিতেন। তাঁহারা নিজে ও অন্যান্য সকলেই উহাদিগকে রাজমিত্র বলিয়া বিবেচনাও করিতেন।

সিল্লা যখন রোমের একাধিপতি হইয়াছিলেন তখন তিনি পম্পীকে এত উচ্চ পদে তুলিয়াছিলেন যে পম্পী সিল্লা হইতেও আপনাকে বড়লোক বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। যখন পম্পী সিল্লার বিরুদ্ধে আপনার এক জন আত্মীয়কে কনসলের পদ প্রদানে কৃতকার্য্য হইলেন তখন সিল্লা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া গর্ব্বিত বচনে পম্পীকে ভয় প্রদর্শন করিলে পম্পী উত্তর করিলেন "লোকে অস্তগামী সূর্য্য অপেক্ষা উদয়োন্মুখ সূর্য্যকে পূজা করিয়া থাকে।" সীজারের পক্ষেও ব্রুটস ঐরূপ ছিল। সীজার তাঁহার উত্তরাধিকারনির্ণয়পত্রে অগষ্টসের পরেই ব্রুটসের অধিকার অবধারিত করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির সীজারের উপর এত ক্ষমতা ছিল যে সেই তাহাকে মৃত্যুমুখে পর্য্যন্ত প্রেরণ করিতে পারিয়াছিল। যখন সীজার কতকগুলি দুর্নিমিত্তের জন্য বিশেষতঃ কালফরণিয়ার স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া সেনেট্‌কে বিদায় দিতে চাহিয়াছিলেন তখন এই ব্যক্তি সীজারের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আসন্ন হইতে উঠাইয়া কহিল "আমি ভরসা করি যে পর্য্যন্ত কালফরণিয়া সুস্বপ্ন না দেখেন সে পর্য্যন্ত আপনি সেনেট্‌কে বিদায় দিবেন না।" তাঁহার প্রতি সীজারের এত অনুগ্রহ ছিল যে আন্টোনিয়স্ তাঁহার এক পত্রে উহার "কুহকিনী" এই নাম দিয়াছিলেন। বাস্তবিকই ব্রুটস সীজারকে মোহিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আন্টোনিয়সের এই পত্র সিসিরো তাঁহার বক্তৃতায় অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। আগ্রিপা যদিও নীচ লোকের সন্তান ছিলেন তথাপি অগষ্টস্ তাঁহাকে এত উচ্চ পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন যে যখন তিনি তাঁহার কন্যা জুলিয়ার বিবাহের কথা মিসিনস্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন তখন মিসিনস উত্তর করিলেন "হয় আপনি আগ্রিপাকে আপনার

কন্যা সম্প্রদান করুন নতুবা তাহাকে বধ করুন, ইহার আর তৃতীয় উপায় নাই।” টাইবিরিয়সের নিকট সিজেনসের এত আধিপত্য ছিল যে লোকে তাঁহাদিগকে পরস্পর পরস্পরের মিত্র বলিয়া বিবেচনা করিত। টাইবিরিয়স্ সিজেনস্কে লিখিয়া ছিলেন, “আমাদের পরস্পর মিত্রতা আছে বলিয়া আমি তোমার নিকট এ সকল বিষয় গোপন করিলাম না।” তাঁহাদের এই রূপ অকৃত্রিম মিত্রতা থাকায় লোকে যেরূপ কোন দেব দেবীর নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে সেই রূপ সমুদায় সেনেট মিত্রতার নামে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেপটিমিয়স্ সুবরস্ ও প্লটিয়েনসেরও এইরূপ বা ইহা হইতে অধিক মিত্রতা ছিল, কারণ সর্ব্বস্ বল পূর্ব্বক প্লটিয়েনসের কন্যার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন এবং প্লটিয়েনস্ সর্ব্বসের পুত্রকে অপমানিত করিলেও তিনি তাহারই পক্ষের সমর্থন করিতেন। সর্ব্বস্ একবার সেনেটকে জানাইয়াছিলেন যে তিনি প্লটিয়েনস্কে এত ভাল বাসিতেন, যে এ ব্যক্তি তাঁহা হইতে অধিক কাল জীবিত থাকে ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। এক্ষণে ঐ সকল রাজারা ট্রাজান্ বা অরিলিয়সের মত সৎস্বভাব হইলে লোকে মনে করিতে পারিত যে এরূপ বন্ধুতা কেবল স্বাভাবিক ঔদার্য্যের ফল মাত্র। কিন্তু ইহাঁরা সকলেই সুচতুর, দৃঢ়মনস্ক ও স্বার্থপর ছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে তাঁহাদের সুখ সম্পত্তি অপরিসীম হইলেও তাহা কেবল সম্পূর্ণ সুখের অর্দ্ধাংশ মাত্র ছিল। মিত্রতা দ্বারা তাহার অপরাংশ পূরণ করিতে হইবে। ঐ সকল রাজারা একক ছিলেন না, তাঁহাদের স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিও ছিল তাহাতেও মিত্রতার সুখ উৎপন্ন করিতে পারে নাই।

কমিনিয়স্ তাঁহার প্রথম স্বামী হার্ডি চারলসের বিষয় যাহা বলিয়াছেন তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত হয় না। চার্ল্স কাহাকেও তাঁহার মনের কথা বলিতেন না, বিশেষতঃ যাহাতে তাঁহার মনে অতিশয় কষ্ট হইত তাহা একেবারেই অপ্রকাশিত রাখিতেন এজন্য তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে নির্জনতা তাঁহার বুদ্ধির অনেক হ্রাস করিয়াছিল। কমিনিয়স্ তাঁহার দ্বিতীয় স্বামী একাদশ লুয়ের বিষয়েও ঐরূপ বলিতে পারিতেন একাকতা তাঁহার অতিশয় কষ্টকর হইয়াছিল। “আপনার হৃদয় আপনি ভক্ষণ করিও না।” পাইথাগরাসের এই কথা যদিও দুর্ব্বোধ বটে কিন্তু উহা যাথার্থ্যে পরিপূর্ণ। পরুষাক্ষরে ব্যক্ত করিতে হইলে যে সকল লোকের আপন মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিবার উপযুক্ত মিত্র নাই তাহারা আপনাপন হৃদয়ের পক্ষে রাক্ষসস্বরূপ; কিন্তু একটি বিষয় অতিশয় আশ্চর্য্য; আমি তাহার উল্লেখ করিয়া বন্ধুতার প্রথম ফলের বিষয় শেষ করিব। লোকে আপন মনের ভাব অকৃত্রিম মিত্রের নিকট ব্যক্ত করিলে

তাহাতে দ্বিবিধ ফল উৎপন্ন হয়। ইহাতে আনন্দেরও বৃদ্ধি হয় ও দুঃখও মন্দীভূত হইয়া পড়ে; কারণ মিত্রের নিকট আহ্লাদের কথা ব্যক্ত করিয়া সমধিক আনন্দ প্রাপ্ত না হয় এবং দুঃখের কথা বলিয়া দুঃখের হ্রাস না করে এরূপ লোক পৃথিবীতে অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন রসায়নবিদ্‌গণ মনুষ্যের শরীরের উপর প্রস্তরবিশেষের গুণ খাটে বলিয়া থাকেন সেইরূপ মানুষের মনের উপরেও বন্ধুতার গুণ খাটিয়া থাকে। প্রস্তরবিশেষে যদিও পরস্পর বিরুদ্ধ ফল উৎপন্ন করে তথাপি প্রকৃতির কোন অনিষ্ট হয় না প্রত্যুত উপকারই হইয়া থাকে বন্ধুতা দ্বারাও সেইরূপ ঘটে। এ স্থলে রসায়নবিৎদিগের উদাহরণ না লইয়াও সংসারের সচরাচর ঘটনাতেও ইহার প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায় কারণ সমবায় শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়াকে বলবতী ও আগন্তুক ক্রিয়াকে দুর্ব্বল করে; মনের উপরেও বন্ধুতার কার্য্য সেইরূপ।

বন্ধুতার প্রথম ফল যেরূপ প্রণয়াদি অন্যান্য বৃত্তির স্বাস্থ্যকর ও দুঃখরূপ ঝঞ্ঝাবায়ুকে অপসারিত করিয়া প্রণয়াদির পক্ষে নির্ম্মল দিবস স্বরূপ হয় বুদ্ধির পক্ষে বন্ধুতার দ্বিতীয় ফলও সেইরূপ ইহাতে চিন্তাকে বিশৃঙ্খলারূপ অন্ধকার হইতে প্রকাশিত করে সুতরাং ইহা তাহার পক্ষে সূর্য্যের নির্ম্মল আলোক স্বরূপ। লোকে বন্ধুদিগের নিকটে যে অকপট উপদেশ প্রাপ্ত হয় ইহা কেবল তাহার উপরে বলা হইল এমত নহে। মনে মনে নানাবিধ চিন্তার উদয় হয়, অন্যের নিকট তাহা ব্যক্ত করিলে উপদেশ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বুদ্ধি পরিষ্কার হইয়া যায় ও মনের মধ্যে আর কোন গোলযোগ থাকে না সে সহজেই চিন্তা সকলের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে ও তাহাদিগকে সুশৃঙ্খল করিতে পারে এবং ঐ সকল চিন্তা কথায় প্রকাশ করিলেই বা কিরূপ দেখায় তাহাও অবগত হয় পরিশেষে তাহার বিজ্ঞতারও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নিজে একদিন ভাবিয়া যে বিজ্ঞতা লাভ না হইত এক দণ্ডের কথোপকথনে তাহাও সম্পন্ন হয়। "বাক্য বিস্তারিত চিত্রপট" থেমিষ্টক্লিসের এই বাক্য অতিশয় যুক্তিযুক্ত, বাক্যে সমুদয় মনের ভাব চিত্রস্থের ন্যায় হইয়া দাঁড়ায় কিন্তু উহা মনের মধ্যে থাকিলে কেবল পেটিকাস্থ বস্তু ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে সকল বন্ধু সদুপদেশ দিতে সক্ষম যদিও তাহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কিন্তু তাঁহাদের সহিত আলাপেই যে কেবল বুদ্ধি বিস্ফারিত হয় এমত নহে অন্যান্য বন্ধুদিগের সহিত আলাপেও লোকে নিজের বিষয় অনেক শিখিতে পারে তাহার মনোগত ভাবও পরিষ্কৃত হয় এবং বিবেচনা শক্তিও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। দেখ পাষাণ নিজে কাটিতে পারে না কিন্তু তদ্দ্বারা অস্ত্রাদি শাণিত হয় সেইরূপ অজ্ঞ মিত্রের সহিত আলাপেও বুদ্ধি শাণিত হইয়া থাকে।

অতএব মনের ভাব চাপিয়া রাখা অপেক্ষা পুত্তলিকা বা চিত্রপটের নিকট ব্যক্ত করাও ভাল। এক্ষণে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া মিত্রতার দ্বিতীয় ফলের বিষয় শেষ করা যাউক। উহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় এবং সাধারণ লোকের চক্ষুর বাহিরেও নহে উহা বন্ধুর অকপট উপদেশ।

হিরাপিটস্ তাঁহার একটি প্রহেলিকায় ইহা সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যথা "অশিশির ও পরিষ্কৃত আলোকই সর্ব্বদা ভাল লাগে" ইহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় যে যে আলোক অন্যের উপদেশ হইতে পাওয়া যায়, তাহাই বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার যাহা আপন বুদ্ধি হইতে পাওয়া যায় তাহা মলিন ও নিজ মনোগত ভাব দ্বারা কলুষিত। অতএব যেরূপ মিত্রের উপদেশ ও চাটুকারের উপদেশে পরস্পর ভেদ আছে সেইরূপ একজনার নিজের পরামর্শ ও মিত্রের পরামর্শে ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ আপনি আপনার যেরূপ চাটুকার সেরূপ আর কেহই নহে এবং মিত্রের স্বাধীন উপদেশ ব্যতীত উহার প্রকৃত ঔষধ আর কিছুই নাই। উপদেশ দুই প্রকার। প্রথম ব্যবহার বিষয়ক দ্বিতীয় কার্য্য বিষয়ক। ব্যবহার বিষয়ে বন্ধুদিগের উপদেশই মনকে সুস্থ রাখে আপনি আপনার দোষগুণ বিবেচনা করা অতিশয় তীক্ষ্ণ ঔষধ নীতিবিষয়ক উত্তম উত্তম গ্রন্থ অধ্যয়ন করাও কতকটা হীনবীর্য্য ঔষধ বলিতে হইবেক এবং অন্য ব্যক্তিতে নিজ দোষ দর্শন করাও অধিকারোক্ত ঔষধ নহে কিন্তু মিত্রের উপদেশই সর্ব্ব প্রধান সেবনীয় ঔষধ, ইহা সেবনের পক্ষেও ভাল এবং সবিশেষ ফলদায়কও হইয়া থাকে।

ইহা অধিক বিস্ময়ের বিষয় যে নানাবিধ অদ্ভুত ভ্রম ও অসঙ্গত কার্য্য প্রায় বড় লোকের অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকে। তাহাদের ভ্রম প্রমাদ দেখাইয়া দেয় এরূপ মিত্র নাই সুতরাং উহাতে তাহাদের যশ ও সৌভাগ্যের অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। মহর্ষি জেমস্ বলিয়াছেন "যেমন লোকে দর্পণে মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাতই আপন আকার ও মুখশ্রী ভুলিয়া যায় উহারাও সেইরূপ আপন দোষ গুণ দেখিয়াও কার্য্যকালে তাহা মনে রাখিয়া চলিতে পারে না।" কার্য্যের পক্ষে লোকে এরূপ বিবেচনা করিতে পারে যে দুই চক্ষুদ্বারাও একটি বস্তুকে একটি বই দুটি বলিয়া বোধ হয় না একজন জুয়াখেলয়ারও দর্শক হইতে অধিক দেখিতে পায় এবং এক ব্যক্তি ক্রোধের সময় পঞ্চাশৎ অক্ষর পাঠ না করিয়াও ক্রোধ শান্তি করিতে পারে এইরূপ নানাবিধ বৃথা কল্পনা কেবল আপনাকে অভ্রান্ত বিবেচনা করা মাত্র কিন্তু উৎকৃষ্ট উপদেশ দ্বারা কার্য্য সকল সুসংস্থুল ও সবল হইয়া দাঁড়ায়।

কেহ কেহ বিবেচনা করিতে পারেন এক জনের নিকট এক কার্য্যের ও অপরের নিকট অপর কার্য্যের উপদেশ

গ্রহণকরা ভাল। যদিও ইহা একবারে উপদেশ গ্রহণ না করা অপেক্ষা ভাল বটে কিন্তু ইহাতে দুই প্রকার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। প্রথম বিশ্বস্ত মিত্র ব্যতীত কেহই তাহা ক সরল ভাবে উপদেশ দিবেনা—অন্যে দিলেও তাহাতে তাহার গূঢ় অভিসন্ধি থাকিবে দ্বিতীয়তঃ যদিও সৎ অভিসন্ধি থাকে তিনি যে উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে কতক ভাল ও কতক মন্দ মিশ্রিত থাকিবে সুতরাং তাহাতে অনিষ্ট ঘটিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। দেখ একজন চিকিৎসক তোমার যে রোগ হইয়াছে তাহার চিকিৎসা উত্তম জানে কিন্তু তোমার শরীর কিরূপ ধাতুর তাহা অবগত নহে সে তোমাকে সে রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারে কিন্তু অন্য দিগে তোমার শরীরটিকে নষ্ট করিয়াও দিতে পারে। যিনি তোমার সকল বিষয়ই অবগত আছেন এমন একজন মিত্র তোমার বর্ত্তমান কর্য্যের সুবিধা করিতে গিয়া অন্যান্য যে সকল অসুবিধা ঘটিবে সে বিষয়ে তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতে পারেন সুতরাং বিচ্ছিন্ন উপদেশ গ্রহণ করিওনা তাহাতে তোমাকে কোন কার্য্যের সুবিধা না দেখাইয়া প্রত্যুত নানা প্রকার বিপদে ফেলিতে পারে।

মনের শান্তি ও বিবেচনার বৃদ্ধি মিত্রতার এই দুই মহৎ ফলের পরেই শেষ ফলের উদয় হয় সেটী দাড়িম্বী ফলের ন্যায় পরস্পর সম্বন্ধ নানা কোষ পরিপূরিত অর্থাৎ সকল কার্য্যেই তাহার উপকারিতা ও সবিশেষ সম্বন্ধ আছে। এক্ষণে, কতশত কার্য্য লোকে নিজে করিতে পারেনা ইহা বিবেচনা করিলেই মিত্রতার বিবিধ ফল প্রকৃত রূপে বর্ণিত হইবে এবং তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে যে "মিত্র দ্বিতীয় আপনি" প্রাচীন কালের এই কথা অতিশয় অলৌক্তিক কারণ মিত্র আপনা হইতেও অধিক বলিতে হইবেক। মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত এবং অনেক সময়ে যাহা অন্তঃকরণের সহিত ইচ্ছা করা যায় তাহা সম্পন্ন করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় যথা—পুত্রাদির বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি। লোকের প্রকৃত মিত্র থাকিলে সে মরিলেও ঐ সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান তাহার বন্ধু দ্বারাও সম্পন্ন হইতে পারে সুতরাং মানুষের অভিলষিত কার্য্য সাধন বিষয়ে দুইটা জীবন আছে বলিতে হইবে। মানুষের শরীর এক দেশনিয়ত সর্ব্বব্যাপী নহে; বন্ধু থাকিলে তোমার জীবনের সমুদয় কার্য্যের ভার তোমাকে ও তোমার প্রতিনিধিস্বরূপ তোমার মিত্রকে দেওয়া হইয়াছে তুমি তোমার বন্ধুদ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইতে পার। দেখ কত বিষয় লোকে ভাল করিয়া করিতে বা বলিতে পারে না। বাড়াইয়া বলা দূরে থাকুক আপনার গুণ আপনি ব্যক্ত করিতেও ধৃষ্টতা ও নিজের জন্য অন্যের নিকট প্রার্থনা করিতেও অপমান বোধ হয় কিন্তু যাহা নিজে বলিতে হইলে লজ্জা বোধ হয় এমন বিষয়ও বন্ধুর মুখে শুনিতে সুন্দর লাগে। লোকের কতকগুলি সম্বন্ধ আছে।

কার্য্যকালে সেই সকল সম্বন্ধানুসারে চলিতে হয় যেমন পুত্রের নিকট পিতার মত স্ত্রীর নিকট স্বামীর মত ও শত্রুর নিকট পণ বন্ধানুসারে চলিতে হয়। বন্ধু কার্য্যানুসারে চলিয়া থাকেন। তাহাকে সম্বন্ধের অনুরোধ রাখিতে হয় না মানুষে নিজে যে কর্ম্ম করিতে পারেনা তাহার সংখ্যা নাই আমি তাহার নিয়ম উদ্ভাবন করিয়া দিলাম। যে ব্যক্তির বন্ধু নাই যে অচ্ছন্দে সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে।

সংসার।

কালি যার যুক্তিশক্তি দিগন্ত পুরিল,
বিচার প্রণালী দেখি গোতম কাঁপিল।
ধন্য সেই সুক্ষ্মবুদ্ধি ধন্য তার ধার,
জটিল, দুর্মোচ্য শাস্ত্র-গ্রন্থি ছেদকর।
যাহার ভাষর প্রভা দেখি বিদ্যাদেবী,
ছিল যত গুপ্ত নিধি দিল পদ সেবি।
প্রকৃতি দাসীর মত মানস যোগালে,
ভরে উচ্চ গ্রহ, তারা মস্তক নোয়ালে;
বিজ্ঞতার অধীশ্বর; সভ্যতার পতি,
সদাচার প্রবর্ত্তক, শিষ্টতার গতি।
সে কেন পশুর হেন করে স্বেচ্ছাচার,
উলঙ্গ হইয়া পথে ভ্রমে দুরাচার।
লজ্জা, ভয়, ঘৃণা স্নেহ, সম্মান ভীকতা,
কোথা তার দয়া মোহ, শিষ্টতা, মমতা।
ভূগর্ভ, নীরধি-তল যথে যে দেখিল,
আপনা জানিতে আজি অক্ষম হইল।
বাক্য-পরিপাটী যার মোহিল মানস,
তার ভাবে কেন আজ উপজিল হাস।
দেহ মাত্র রাখি মন কাড়িয়া লইলি,
কি জানি কি অপরাধে এ দশা করিল।
আদর সুখদ নীরে ডুবিয়া যে ছিল,
নামমাত্রে ঘৃণা তার কেন উপজিল।
যার আলম্বন বিনা না চলিত কাজ,
সে এলে বিরক্তি হয়, দেখি হয় লাজ।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে উঠি ধায়,
কারে ডাকে কারে বলে কেবা শোনে তায়।
অনর্গল শাস্ত্র যেই দিল উপদেশ,
এক ভাবে দুটি কথা নাহি যোড়ে শেষ।
কাল্ যে মানব শিরে সমর্পিয়া পদ,
ভ্রমণ করিল দর্পে পেয়ে উচ্চ পদ।
মনোমদে উর্দ্ধে দৃষ্টি নিম্নে নাহি চায়,
দীনের প্রণতি, স্তুতি মাটিতে মিলায়।
দর্শন মানসে কত দর্পিত ভূপতি
দ্বারে পড়ি যাপে নিশা, অশেষ দুর্গতি।
কটাক্ষে বিরাজে ধ্বংশ, কটাক্ষে অভয়,
কুশল শঙ্কট যার কল্পনায় রয়।
যার দৃষ্টিমাত্রে আঁখি নিমেষ ভুলিয়া
চিত্রিত সমান রয় বিস্মিত হইয়া।
যার স্মৃতিমাত্রে মন সচকিত ভাবে
লাজে পলাইয়া হৃদে বসি কত ভাবে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায়ান্যায়, গুণ, অপরাধ,
যাহার ইচ্ছায় লভে নিজ নিজ বাদ।
সে কেন সামান্য হেন দেখিতে দেখিতে
বৃথা করে আর্ত্তনাদ পড়িয়া ভূমিতে?
অত্যুচ্চ প্রপাতেস্তার ভাঙ্গিয়াছে কায়,
মানস হয়েছে ভিন্ন, দেখি ক্ষিপ্ত প্রায়।
ভয়ে, লাজে উচ্চ শির হইয়াছে নত
নীচের আশ্রয় লাভে আকিঞ্চন কত।

ভ্রূভঙ্গি মাত্রেতে যার ভূপতি অস্থির,
মৃত্যু আর্ত্তনাদে তার ক্ষুদ্রও বধির।
রুধেছ নির্বৃতি পথ গৌরব হরেছ
তবে মাত্র মৃত্যু পথ বিষম করেছ।
চুপে চুপে যাবে সরে, যেতে নাহি দিবে,
ভাব কি সে দশা দেখি জনতা হাসিবে।
তুলিতে কে সেধেছিল অত্যুচ্চ সোপানে,
তাই কেন ধীরে ধীরে না থুলে স্বস্থানে।
তাহলেতো পাতধ্বনি বিপক্ষ শ্রবণ
ফাকি দিয়া তীক্ষ্ণতম, হইত মগন।
অন্যকি বলিব কাল মহিমা তোমার,
তোমার আজ্ঞায় ঈশ ধরেন আকার।
অঙ্গুলি চালিয়া যারে করাও প্রণাম,
সেই সে ঈশ্বর মোর না জিজ্ঞাসি নাম।
ধন্য ধন্য শক্তি তব ধন্য পরাক্রম
অধমে বলাও শ্রেষ্ট উৎকৃষ্টে অধম।
কখন পূজাও তৃণ, গুল্ম, লতা, শাখী,
পাষাণ, পর্ব্বত, ভূত, মীন, পশু, পাখী।
চারি, দশ, অষ্ট, শত, হস্ত অগণন,
প্রকৃতি পুরুষ কত অসংখ্য বদন।
কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, জুপিটার
চৈতন্য, গৌরাঙ্গ, রাম কত কব আর।
কুবীর, নানক, লামা, কত শত রায়
তোমার অনন্ত স্রোতে ভাষিয়া বেড়ায়।
অচিন্ত্য সামগ্রী সেই লুকায়ে অন্তরে,
খেলিছ হে কত খেলা ভুলাইয়া নরে।
আশ্চর্য্য কল্পনাবলে ডুবিয়া রেখেছ,
দেখিতে দেখিতে তারে লাঙ্গুল দিয়েছ।
কখন বিষাণ, কভু সুতীক্ষ্ণ নখর,
কখন ভীষণ ঘোণ; দন্ত ভয়ঙ্কর।
কখন সুদীর্ঘ চঞ্চু; অঙ্গে শল্ক ধরে;
দেখিয়া বিস্তৃত ফণা শরীর শিহরে।

কখন উলঙ্গ কভু রাজ রাজেশ্বর,
কখন শ্মশানে ফেরে অস্থিচীরধর।
ধন্য পরিবর্ত্ত তব দেখি ক্ষণে ক্ষণ,
কোথায় লুকালো সেই ভীষণ তপন।
যাহার প্রতাপে জীব পরিত্রাহি ডাকে,
পাইয়া তাপের তেজ পড়িয়া বিপাকে।
মেদিনী বিদীর্ণ হলো, শুষ্ক সরোবর,
জীবন অভাবে রখা জীবন দুষ্কর।
গোপাল গোপাল ফেলি তরুতলে ধায়,
ক্ষণবহে দীর্ঘশ্বাস কৃষক পলায়।
শাখী আলম্বিয়া পাখী চঞ্চু বিস্তারিয়া,
কাতরে নিভৃত রয় সুস্বর ভুলিয়া।
রথ্যায় পথিক পড়ি করে ধড় ফড়,
ছায়া দেখি ধায় জীব ব্যস্তে দড় বড়।
আহার বিহার চিন্তা দূরে পালায়েছে,
কেমনে জীবন পাই ব্যাকুল হয়েছে।
কেহ কারে নাহি দেখে ত্যজেছে বিরোধ,
তৃষ্ণায় জীবন দহে হলো কণ্ঠরোধ।
ক্ষণেক সুস্থির নয়, মন নহে স্থির,
ভয়ে নাহি হয় কেহ গৃহের বাহির।
মধ্যাহ্ন সময়ে রবি ভীম তেজ অতি,
ভয়ে রহে শুদ্ধ হয়ে উলঙ্গ প্রকৃতি।
ঘন গাত্রে বহে ঘর্ম্ম শরীর দুর্ব্বল,
ব্যজন চালনে বাহু হইল বিকল।
বসন নাহিক সয়; লজ্জা নাহি রয়,
থাকিয়ে থাকিয়ে বায়ু অগ্নি হেন বয়।
নিরন্তর করে নর উহু মরি রব,
কি হইবে কোথা যাব নষ্ট হলো সব।
থাকিয়া থাকিয়া দেখে গগণে চাহিয়া,
জীমূত দেখিয়া উঠে আনন্দে নাচিয়া।
মনুজের আশা হায়! নকল করিয়া,
দেখিতে নীরদ রাজি যায় মিলাইয়া।

কভু বিন্দুমাত্র বারি করিয়া বর্ষণ,
গোষ্পদ পূরিয়া দর্পে ভীষণ গর্জ্জন।
লাভ মাত্রে তৃষ্ণা বৃদ্ধি, ঔৎসুক্য উদয়,
প্রত্যাহত দেখি গ্রীষ্ম তাপে অতিশয়।
দিবস হইল ক্ষয় রবি অস্ত যায়,
আশ্চর্য্য! প্রতাপ সেই সমভাবে রয়।
গোলাব, মল্লিকা, যুই, বেল মনোহর,
অন্তর দহিছে কিসে হবে তৃপ্তিকর।
সে ভাব লুকালে কোথা, একি অপরূপ,
দেখিতে দেখিতে পূর্ণ নদ নদী কূপ।
নিরন্তর মেঘধ্বনি শ্রবণ বধির,
অবিশ্রান্ত বহে ধারা; বিরহী অস্থির।
নব নীর পেয়ে জীব হর্ষে মগ্ন সব,
ভেক মুখে তুলে দিল জয় জয় রব।
অন্ধকার চারি দিক দৃষ্টি নাহি চলে,
দিবা নিশা নাহি জানি ধরা ভাসে জলে।
দূরে গেল ক্লেদ, স্বেদ, পাইয়া বর্ষণ
চিক্কণ নির্ম্মল কান্তি ধরে তরুগণ।
পাইয়া নূতন রস ধরিত্রী ভিজিল
দেখিয়া কর্ষণ যোগ্য কৃষক ধাইল।
পর্ব্বত শিখরে নাচে আনন্দে ময়ূরী
নয়ন মগন দেখী কদম্ব মাধুরী।
সদা ঝর ঝর রব তর তর ধ্বনি;
পলালো তপন বুঝি মনে ভয় গণি।
লুকালো পূর্ণিমা শশি; নক্ষত্র পলালো,
সাদৃশ্য ধরিয়া বুঝি শঙ্কা উপজিল।
যেমন জলের তরে গিয়ে ছিল প্রাণ
তেমনি জলেতে বুঝি নষ্ট হয় প্রাণ।
পথ ঘাট নাহি দেখি একই আকার,
বুঝি ধরা লুকাইল সাগর ভিতর।
অথবা মাটীর তাল ভিজিয়া গলিল,
ভয়ে কায় থর থর মানস উড়িল।

অত্যুচ্চ বিটপী কত স্রোতে ভাসি যায়,
মহা কোপে তীব্রবেগে তরঙ্গিনী ধায়।
পর্ব্বত না সহে টান সঘনে কম্পিত,
আবাস ভাঙ্গিল জীব শঙ্কটে পতিত।
হেরি ধন্য দান শক্তি বরিষা তোমার,
গোষ্পাদ সাগর হলো একই আকার।
কর্দ্দমে দুশ্চল পন্থা; ফুরালো ভ্রমণ,
ঘরে বসি কাটো কাল আতুর যেমন।
আলস্য সন্তুষ্ট অতি; উদ্যোগ মলিন,
সতত উৎসুক কিসে কাটে কটা দিন।
আনন্দে মরাল ভাসে শব্দে মনোহর,
সুন্দর বলাকা রাজি ঘেরিল অম্বর।
চাতক চঞ্চল অতি; নূতন জীবন
পাইয়া সন্তুষ্ট করে তৃষিত জীবন।
আচম্বিতে চারিদিক প্রফুল্ল বদন
বিস্তারি সুখদ কর উদিত তপন।
হাসিতে হাসিতে শশী হইল বাহির
ঝাঁকে ঝাঁকে তারাগণ উচ্চ করে শির।
ক্রমে অপসৃত বারি, কর্দ্দম শুকালো,
আনন্দে মানব যত বাহির হইল।
তরঙ্গিনী স্থির হলো, সরসী নির্ম্মল।
সৌরভে জীবন তোষে প্রফুল্ল কমল।
নব নব দূর্ব্বাদল মেদিনী ব্যাপিল,
স্নিগ্ধবর্ণ শস্যক্ষেত্র নয়ন হরিল।
তাহে বায়ু মন্দ মন্দ, মন্দ দেয় দোল,
প্রশান্ত নীরধিনীরে উঠিল হিল্লোল।
কৃষক নাচিছে হর্ষে আশা ধরে ফুল;
মনের আনন্দে মাঠে ফিরে পাখীকুল।
প্রকৃতি সুন্দর অতি হরিত বসনে,
মনোহর তিলফুল—তিলক বদনে।
কুল কুল তর তর ঝর ঝর রব,
ক্রমে আর নাহি শুনি স্তব্ধ হলো সব।

হারা অধিকার পেতে দ্বুন পরাক্রম
প্রকাশিছে দিবাকর ; আশ্যান কর্দ্দম।
ভিজিয়া ভিজিয়া যেন নিলীম বরনী,
সুখদ রৌদ্রের তাপে ঘুমালো মেদিনী।
দর্পণ নির্ম্মল জলে শফরী ফর্ ফর্,
কুশলে পর্য্যাপ্তি পেলে ক্ষুদ্র ছত্রধর।
দেখিতে দেখিতে এলো হেমন্ত দুরন্ত,
দুদিন না হতে সুখ উপস্থিত অন্ত।
ঢাকিল নির্ম্মল শশি ঘন হিম রাশি,
মলিন হইল আসা ; মুখে নাই হাসি।
তেমন মোহন সন্ধ্যা বিচিত্র বরণ,
অসিত বসনে কেন কর আবরণ ?
নিশার কুন্তলশোভা উজ্বল তারক,
কি ভাবি তুলিয়া লও হয়ে বিবেচক।
নূতন অরুণ রাগ কোথা লুকাইলো ?
অসহ্য রবির তাপ সুখসেব্য হলো।
দুরন্ত হেমন্ত নাশে আশ্রিত শাদ্বলে,
নতশিরে কাঁদে শাখী হিমবিন্দু-ছলে।
শীতে তনু জড়সড় শকতি বিহীন।
পাণ্ডুবর্ণ বসুমতী, প্রকৃতি প্রবীণ।
হীনবল ভগ্নোৎসাহ শীত ঋতুরাজ।
বিড়ম্বনা মাত্র তব দণ্ডধর সাজ।
নিরন্তর বহে অতি শীতল পবন,
হিত শিখাইতে পত্র ফেলে তরুগণ।
যার বিন্দু মাত্র লাভে পরাণ ব্যাকুল,
সেই সে নির্ম্মল বায়ু হলো চক্ষুশূল।
বৃথা হাত তুলাইয়া ডাক চল দল
আপন উদার গুণে, পথিকের দল।
দুদিন আদর পেয়ে রোমাঞ্চিত কায়।
তপন সেবিছে তারা ফিরে নাহি চায়।
যানেনা সে তীব্রতেজা দিন দুই পর,
প্রখর হানিবে পদ মস্তক উপর।

ধরায় তরিল লক্ষ্মী আনন্দ বাড়িল।
হরষে কৃষক যত পূজা আরম্ভিল।
ভাল বিসম্বাদ কাল দেখালে হেথায়,
কেহ ধরে নব তনু কেহ ছাড়ে কায়।
পাণ্ডুর বরণ শস্য নমিয়া পড়িল,
দুরন্ত বার্দ্ধক্যে যেন শরীর ভাঙ্গিল।
আর দিকে দেখদেখ নব কিসলয়,
উদভিন্ন হইল, হলো বসন্ত উদয়।
সদনে মলয় বায়ু শরীর জুড়ায়,
সঙ্গমে ফুটিল কলি, লোভে অলি ধায়।
আবার প্রকৃতি সতী সহাস্য বদন,
নানা বর্ণে সুশোভিত বিচিত্র বসন।
মানস পূরিয়া পাখী হর্ষে করে গোল,
আবেশে প্রফুল্ল শাখী ঘন দেয় দোল।
আপনি আনন্দ আসি প্রবেশে হৃদয়,
বিমর্ষ পলালো কোথা, হেরি স্ফূর্ত্তিময়।
মৃদু মিষ্ট পরিমল চালিছে পবন।
ঘ্রাণে মৃত দেহ পুন পাইছে জীবন।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে বল, কার্য্যে অনুরাগ।
আলস্য জড়তা আর নাহি পায় ভাগ।
সুখসেব্য হলো বারি, শঙ্কা দূরে গেল,
প্রফুল্ল নয়ন শিশু দীর্ঘিকা ধাইল।
ভাসিছে নির্ম্মল নীরে কোমল শরীর
শত শত কমলে শোভিছে যেন নীর।
হর্ষে দেয় কর তালি শুনিতে মধুর,
ডোবাডুবি পারাপারি কৌতুক প্রচুর।
বালক তরুণ বৃদ্ধ প্রগল্ভা তরুণী,
সমান আমোদ যেন সেবিয়া বারুণী।
প্রণয় সময় পেয়ে বলবান অতি
সহজে কলহ ত্যজে যুবক যুবতী।
হরষে বিটপী নাচে বায়ুর হিল্লোলে
কোকিল পাগল করে কুহু কুহু বোলে।

বসন্তপ্রদোষ।

(জয়দেবানুকৃতি।)

(দেশবরাড়ী রাগ;—অষ্টক তাল।)

কিবে রঞ্জিত যত দিগন্ত দিনকান্ত করমালে!
হরষিত দিগঙ্গনা   মধুর মৃদু হাসিছে
ভাসিছে কুঙ্কুম মিশালে। ঞ্র।
নীল নিভ অম্বরে   সম্ভূত মনোহরে
জলদদল মণ্ডিত প্রবালে,
গঞ্জি বহু রঞ্জনে   তাপিল জনে জনে
নীল সিত হরিত হরিতালে;
নিরখি রজনীমুখে   মলিন নলিনী দুখে
মুদিত মুখ কম্পিত সনালে,
সুমুদিত কুমুদবতী   পবন পরশে সতী
নৃত্য করিছে সরস তালে;
চিকন কচ বন্ধনে   বিবিধ পট পিন্ধনে
যতন যুত নব যুবতি জালে,
নিন্দে অরুণ ইন্দু   সিন্দূরের বিন্দু
চারুতর চন্দন কপালে;
নব নব বধূগণে   বিপদ গণিছে মনে
হৃদয়পতি নিদয় * * কালে;
বিহগ কুল কলকণে   নিজ রবছলে বলে
মুঞ্চ ভয় মুঞ্চ ভয় বালে।

কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট ১৪৯ নং ভবনে নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত

অবোধ-বন্ধু।

" করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

৩য় ভাগ] ভাদ্র,—১২৭৬। [৫ম সংখ্যা।

এতদ্দেশের বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা।

এতদ্দেশে যে বয়সে কন্যা সন্তানের বিবাহ দিতে হয়, তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম প্রচলিত আছে।

১। দশম বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দেওয়া শ্রেয়ঃকল্প।

২। অধিকাংশ লোক অষ্টম বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বিবাহ দেয় না।

৩। কিন্তু ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে বিবাহ না দিলে নয়।

দশম বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পরে বিবাহ দিলে কন্যা দানের ফললাভ হয় না। আর ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে বিবাহ দিতে না পারিলে সেই কন্যার ও তদীয় পিতৃকুলের জাতি যায় এবং তাহাকে কেহ বিবাহ করে না। কিন্তু এই কথা কত দূর সত্য, আর কেবল প্রবাদমাত্র কি না, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না, কারণ কন্যার পুষ্পোৎসব পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকাই ঘটে না, ঘটিলেও প্রকাশ হয় না; সুতরাং তাহার ফলাফলের মীমাংসা করা দুষ্কর।

বিবাহ বিষয়ে প্রচলিত নিয়ম এইরূপ; কিন্তু অনেক সময়ে ঠিক এই মতে চলা হয় না।

১। পাত্রাভাবে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কন্যা-সন্তানের বিবাহ দিতে বিলম্ব হয়। কখন কখন তাঁহারা যাবজ্জীবন অনূঢ়াও থাকেন ব্রাহ্মণের যতগুলি কন্যা থাকে, বয়স বা সংখ্যা বিচার না করিয়া পাত্র উপস্থিত হইলে সকলগুলিকেই এক পাত্রে দান করা হয়। এরূপ শুনা গিয়াছে যে, বর অপেক্ষা কন্যার বয়স অধিক হইলেও কুলীনকন্যা দানের প্রতিবন্ধক হয় না।

ফলতঃ যাঁহারা এরূপ বয়োধিকা কন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এক প্রকার বিবাহ-ব্যবসায়ী। বিবাহের

সংখ্যার নিয়ম নাই, নিজের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত শ্বশুরমন্দিরেই বৎসরের অধিকাংশ অতিবাহিত করেন, কুলমর্য্যাদা না লইয়া উপবেশন, স্নান, আহার, অন্য কি, স্ত্রীর সহিত আলাপ পর্য্যন্তও হয়না। জামাতাকে এতাদৃশ সমাদর করণের প্রথা থাকিয়াও শুভদৃষ্টির পরে পতির সহিত অনেক কুলকামিনীর আর সাক্ষাৎ হয় না, তবে ইদানি এই জঘন্য ব্যবহার ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

অতএব কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা ঋতুমতী হইলে পিতাকে "এক ঘরে" হইতে হয় না, অথবা অন্য প্রকারেও তিনি অপদস্থ হন না। সেই কন্যাকে বিবাহ করিতেও কেহ কুণ্ঠিত হন না; বিবাহ করিলেও পতির মানহানি নাই। সুতরাং রজঃস্বলা নারীর পাণিপীড়ন সম্পর্কীয় জাতিপাতের নিয়মটি এস্থলে বলবৎ নহে। তথাচ কুলীনকন্যাগণ যাহাতে বিলম্বে রজঃস্বলা হয়, তদর্থে কেহ কেহ তাহাদিগকে অর্দ্ধাশনেও রাখিয়া থাকে।

২। যাঁহারা পণ লইয়া কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন, তাঁহারা কখন কখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ দিতে কালবিলম্ব করেন, কারণ বয়ঃক্রম অনুসারে পণের তারতম্য হইয়া থাকে। দেশ-বিদেশ-নিন্দিত এই ব্যবহার যে কত দূর জঘন্য, এবং ইহার প্রতি যে শাস্ত্রীয় নিষেধ ছিল, উহার মর্য্যাদা হ্রাস হওয়াতে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখের বিষয় হইতেছে, তৎসমুদায়ের আলোচনা করা আপাতত অভিপ্রেত নহে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরাই এ অপরাধের প্রধান অপরাধী।

এতদ্ব্যতীত এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ কুলীন পাত্রে কন্যা দান করিবার অভিলাষেও অগত্যা নিয়মিত বয়সের মধ্যে বিবাহ দিতে পারেন না।

বিবাহের পূর্ব্বে সেই সকল বালিকা ঋতুমতী হইলে সে কথা প্রকাশ হয় না, কিন্তু কোন কোন কন্যা সত্য সত্য যে ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

কায়স্থ জাতির মধ্যেও পাত্রাভাবে এবং পণ লোভে কন্যার বিবাহ দিতে কালবিলম্ব হইয়া থাকে। কিন্তু উপরের বর্ণিত বিবাহ ব্যবসায়, কিম্বা পতি জীবিত থাকিতে পত্নীর বৈধব্য যেরূপ কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার প্রথা কায়স্থদিগের মধ্যে দেখা যায় না। তথাচ উহারাও অর্দ্ধবৃদ্ধ ব্যক্তিকে সুকুমারবয়স্কা বালিকা দান করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। সুতরাং বলিতে হইবেক যে, ব্রাহ্মণ জাতি অপেক্ষা কিঞ্চিদংশে সুবোধ হইয়াও কায়স্থ জাতি সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষী নহে, যেহেতু তাহারা ইহা বুঝে না যে, 'আধাবয়িসি' বৃদ্ধের হস্তে এক সুকুমারী কুমারী সম্প্রদান করা আর উহার বিবাহ না দেওয়া, দুই একই কথা।

৩। কখন কখন পণের লোভ সম্বরণে অপারক হইলে কেহ কেহ নিয়মিত বয়সের অনেক পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে। কাল বিলম্ব করিলে পণ বৃদ্ধির যে প্রত্যাশা থাকে, ঈদৃশ হলে

কাজে কাজেই তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়।

৪। তদ্রূপ কেহ কেহ কন্যা প্রতিপালনে অপারক হইয়া নিয়মিত বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ দেয় এবং কেহ কেহ কোন ব্যক্তির আশ্রিত হইবার নিমিত্ত তাহাকে কন্যা দান করিয়া তাহার সহিত সম্পর্ক ঘটায়। এরূপ স্থলে কখন কখন অতি অল্প বয়সেই কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাও এক প্রকার পণ লওয়া বলিতে হইবেক।

৫। কলিকাতার সন্নিকট রাজপুর আদি গ্রামস্থ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটী অতি কদর্য্য ব্যবহার আছে। শাস্ত্রোক্ত বাগ্‌দান প্রথার পালন উপলক্ষে তাঁহারা সদ্যঃপ্রসূত কন্যারও বাগ্‌দান করিয়া থাকেন। এরূপ আচরণ পাত্রাভাব বশতই ঘটিয়া থাকে সন্দেহ নাই; কিন্তু ক্রমশঃ এমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, তাঁহাদিগের মধ্যে এখন কেহই আর এই প্রথা অমান্য করিতে পারেন না। ফলতঃ ইদানীং এক বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে বাগ্‌দান হয় নাই, এরূপ কন্যা প্রায় দৃষ্ট হয় না। এতদ্বিষয়ে বরের বয়স দুই এক দিবস অধিক হইলেই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। বিবাহ যথাসময়ে হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে বরের মৃত্যু হইলে কন্যা "অন্যপূর্ব্বা" নামক হীন শ্রেণীতে পতিত হয়েন এবং স্বসমকক্ষ কুলে তাঁহার বিবাহ হওয়া অসম্ভব। যে সম্প্রদায় ঈদৃশ কন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা একপ্রকার স্বতন্ত্র শ্রেণী এবং এতাদৃশ হেয় হইয়া আছেন যে বিবাহের পর পিতাও আপন কন্যার হস্তের অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না।

ইঁহাদিগের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে বরের মৃত্যু না হইয়া বর কন্যা উভয়ে জীবিত থাকিলেও বিবাহের পর কন্যা যখন যৌবনে উপনীত হয়, তখন স্বামীর সহিত প্রায় একই বয়স বলিয়া উহাকে যে দুঃসহ দশা ভোগ করিতে হয়, তাহার বর্ণনার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বালিকা বিবাহের অশুভকারিতার প্রতি সন্দেহ করেন, তাঁহারা রাজপুরের বৈদিক-বালাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, শাস্ত্রে বিবাহের বয়সের ন্যূন সীমা নির্দ্দিষ্ট না হইয়া কেবল ঊর্দ্ধ সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকাতে অন্যান্য অশেষ কারণের সহযোগে, স্বভাবতই দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের মধ্যে প্রচলিত পূর্ব্বোক্ত কুপ্রথা জন্মলাভ করিয়াছে।

যদি বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহার বরের সহিত অপর কন্যার সম্বন্ধ স্থির হয়। এইরূপ ঘটনাতে যদি বর কন্যার মধ্যে ৫।৭ বৎসর বয়ঃপ্রভেদ হইয়া যায়, তাহা হইলে এতদ্দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত ব্যবহারের সহিত কোন বিভিন্নতা থাকে না, সুতরাং বঙ্গসমাজে ঐ বিবাহ নিন্দনীয় হইতে পারে না। পরন্তু এতদ্দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমান বয়সের পাত্রে যে সকল কন্যার বাগ্‌দান হয়, তাহাদিগের মৃত্যু হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহার বিষয়

আমরা আর কি লিখিব, কেবল এই মাত্র বলাই যথেষ্ট যে, ইহার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ রাজপুত্রদিগের কন্যা-হত্যার কথা মনে উদয় হয়।

স্মৃতি শাস্ত্রের অগণনীয় বচন দৃষ্টে বোধ হইবেক যে, বালিকা বিবাহের প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতেই এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। অর্থাৎ এ কথা অবশ্যই বলিতে হইবেক যে, কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া বৈধ ছিল। কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণ ও অপরাপর ব্যক্তিদিগের যে সকল আচরণ ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইল, সেগুলি বালিকা বিবাহ নিয়মের অত্যাচার বলিতে হইবেক। আর কুলীন ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের বিবাহ-প্রথা এবং অন্যান্য লোকদিগের তাদৃশ আচরণকে নিয়মের বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া মানিতে হইবেক। পরন্তু এরূপ বিরুদ্ধ কর্ম্ম যে পূর্ব্বকালে ছিল না, তাহা বলা যায় না, কারণ—

প্রথমতঃ। শাস্ত্রে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা লিখিত আছে, তন্মধ্যে এক প্রকারের নাম "কানীন" অর্থাৎ অবিবাহিতা কন্যার গর্ভজাত সন্তান।

ইহাতে নিঃসন্দেহ মীমাংসা হইতেছে যে, পূর্ব্বকালে বিবাহ হইবার পূর্ব্বেও কন্যা পুত্রোৎপাদনের বয়স প্রাপ্ত হইত। আর উক্ত দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে "স্বৈরিণীজ" নামক আর এক প্রকার পুত্র গণ্য হওয়াতে উপরোক্ত পুত্রবতী কুমারী যে বেশ্যা শ্রেণীতে পরিগণিত হইত না, তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন নিম্ন লিখিত মনু বচনের প্রতি মনোযোগ করিলেও এই বিষয় সম্পূর্ণ রূপে সপ্রমাণ হইবেক।

যোন্মত্তায়া ন কুষ্ঠিন্যা নচ যা স্পৃষ্টমৈথুনা।
পূর্ব্বং দোষানভিখ্যাপ্য প্রদাতা দণ্ডমর্হতি॥

দ্বিতীয়ত। পূর্ব্বকালে স্বয়ম্বরা হইবার প্রথা ছিল। এই প্রকার বিবাহ স্মৃতিশাস্ত্রকারদিগের লিখিত অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে গণ্য কিনা সন্দেহ স্থল।* কিন্তু কোন সময়ে যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, বরং রাজকন্যাদিগের মধ্যে সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর ছিল, মহাভারত পাঠে তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকে না।

স্বয়ম্বরা হইবার সময় রাজদুহিতারা বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত বয়স অতিক্রম করিতেন। যদিও এ বিষয়ের কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, তথাচ বস্তু গতি বিবেচনায় সহজেই এইরূপ অনুমান সংগত বোধ হয়।

তৃতীয়তঃ। যাঁহারা গান্ধর্ব্ব বিধানে পতি বরণ করিতেন, তাঁহারাও বোধ হয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকিতেন না।

বালিকা বিবাহের সাধারণ নিয়ম এবং ইদানীন্তন ও প্রাচীন কালে সেই নিয়ম অতিক্রান্ত হইবার উদাহরণ প্রদানান্তর আমাদিগের উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত প্রথার সহিত অপর কতকগুলি সামাজিক রীতির সম্বন্ধ প্রদর্শন করিব। ইহাতে বালিকা বিবাহ প্রথা কি প্রকারে এতাদৃশ

* মনুর মিশ্রিত গান্ধর্ব্ব রাক্ষস বিবাহের সহিত স্বয়ম্বর প্রথার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য অনুমান করিতে পারা যায়।

উৎকট হইয়া উঠিয়াছে, কতক দূর পর্য্যন্ত তাহার হেতু নিরূপণ হইতে পারিবেক। পরন্তু শাস্ত্রোক্ত আচার ব্যবহার সমূহের মধ্যে কোন্ গুলি অভিনব, তাহা স্থির করা কঠিন, কারণ কোন গ্রন্থে তদুল্লিখিত বৃত্তান্ত বা নিয়মাদির সময়ের বিশেষ বিবরণ থাকে না। এবং থাকিলেও তাহা অত্যুক্তিতে এত পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয় যে, অগত্যা অগ্রাহ্য করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থ গুলির মধ্যেও অনেকের অগ্রপশ্চাদ্ভাব নিশ্চিত নাই। যথা—মহাভারতে যে সকল ঘটনার বৃত্তান্ত আছে, তাহা মনু এবং অপরাপর স্মৃতি কারদিগের অপেক্ষা পূর্ব্বতন কি না, সন্দেহ-স্থল। পুরাণসমূহের মধ্যে কোন্‌খানি কোন্ সময়ে প্রণীত, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় প্রাচীন প্রথার অনুসন্ধান করা অতীব দুরূহ ব্যাপ্যার।

আমরা এতাদৃশ বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করি না, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কতক গুলি ব্যবহারের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছি। এ উপলক্ষে আমরা যে বিষয়কে যে ব্যবহারের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিব, তাহাই যে উহার একমাত্র কারণ, এরূপ বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। বাস্তবিকও সমাজ মধ্যে প্রচলিত ব্যবহারসমূহের কারণ সকল অতি জটিল এবং পরস্পরের সহিত নিতান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। তথাপি চতুর্দ্দিক বিবেচনা করিলে কতগুলি ব্যবহারকে কতগুলি কারণের অসাধারণ প্রসব স্বরূপ বলিয়া ঝটিতি প্রতীতি হয়; সেই সমস্ত সুস্পষ্টলক্ষ্য কার্য্যকারণভাব প্রদর্শন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

আমাদিগের দেশে জাতিভেদের নিয়মটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মান্য এবং লোকের মনে অতিশয় বদ্ধমূল। এই নিয়মের দোষ গুণ বিচার করা আপাততঃ আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। পরন্তু যাহাতে জাতিভেদনিয়ম শিথিল হইয়া না যায়, যদি কোন সময়ে এরূপ কোন উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে বিভিন্ন জাতির পরস্পর বিবাহ নিষেধ করা আবশ্যক হইয়াছিল। জাতিভেদের প্রধান অবলম্বন বংশমর্য্যাদা এবং বৃত্তি-বিভাগ। মাতা হীনশ্রেণীস্থ হইলে সন্তান বংশ মর্য্যাদা বিষয়ে পিতা অপেক্ষা খর্ব্ব হয় এবং মাতা শ্রেষ্ঠবংশজা হইলে তাঁহার গৌরব সর্ব্বতোভাবে বিলুপ্ত না হইয়া অল্প পরিমাণে সন্তানে জাগরূক থাকে এই নিয়ম পৃথিবীর সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। পিতৃকুলে পুরুষানুক্রমে হীন শ্রেণিতে বিবাহ হইলে বংশগৌরব নিতান্ত খর্ব্ব হয়। আর উপর্য্যুপরি শ্রেষ্ঠ বংশোদ্ভূত কন্যা গ্রহণ করিলেও সন্ততি সর্ব্বতোভাবে পিতৃবংশদোষ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না। ইহার হেতু কিছুই বলা যাইতে পারে না, কারণ ইটি কেবল লোকের ধারণা মাত্র। ফলত ইহাতে নিগূঢ় যদিও কিছু থাকে, তাহার বিচার করা প্রকৃত-প্রস্তাবে অপ্রয়োজন। জাতি গৌরব ও কৌলীন্যমর্য্যাদা এতদ্বয়ের মধ্যে স্থূল ত্রুটি কার্য্য বিশেষ আস্থার বিষয় বলিয়া দৃষ্ট

হয়। এক, কন্যা দান সম্বন্ধীয়, অপর, কন্যা গ্রহণ সংক্রান্ত। কৌলীন্য ব্যবহারের প্রচলিত নিয়ম এই যে সমান কিম্বা কিঞ্চিৎ হীন বংশের কন্যাগ্রহণ প্রকৃষ্ট রূপে দূষণীয় নহে, কন্যা দান বিষয়ে এরূপ পাদস্খলন সাতিশয় নিন্দনীয়, আর তুল্য বংশে আদান প্রদান করাই সর্বোৎকৃষ্ট।

যাহা হউক, এতদ্দেশে কৌলীন্য ব্যবস্থা সাম্প্রতিক, আর জাতিভেদ পদ্ধতি তদপেক্ষা অনেক পুরাতন। যখন কৌলীন্য নিয়ম প্রচলিত হয় নাই, তখন বোধ হয় বর কন্যা কেবল এক জাতি হইলেই যথেষ্ট হইত, বংশ ভাল কি মন্দ সে বিচার করা হইত না, করিবার উপযোগী কোন ব্যবস্থাও স্থির হয় নাই। মনু ও অন্যান্য স্মৃতিকারেরা হীনবর্ণের কন্যা গ্রহণ বৈধ বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু হীন জাতীয় ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ নিতান্ত নিন্দনীয় গণ্য করিয়াছেন। অধুনা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ এককালীন নিষিদ্ধ। ইহা আলোচনা করিতে করিতে প্রতীত হইবেক যে, প্রাচীন জাতিভেদ পদ্ধতি আর ইদানীন্তন কৌলীন্য ব্যবস্থা এ অংশে একরূপ অর্থাৎ নারী হীনবংশজাত হইলে দোষ নাই, কিন্তু বর উৎকৃষ্ট বংশজাত হওয়া একান্ত পক্ষে আবশ্যক। অতএব জাতিভেদ নিয়ম এবং কৌলীন্য প্রথা পরস্পরের তুলনা করিলে বোধ হইবেক যে কালসহকারে যেমন বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে সেইরূপ আবার এক একটি জাতি কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়াছে, এবং পূর্ব্বকালে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ বিষয়ে যেরূপ নিয়ম ছিল, অধুনা কুলীন শ্রেণি সমূহ মধ্যে সেইরূপ নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। পরন্তু কুলীন মৌলিকদিগের মধ্যে বৃত্তিভেদ নাই। বোধ হয় এতদ্দেশে মুসলমান ও অন্যান্য অহিন্দুদিগের প্রাদুর্ভাব, যে সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল তদপেক্ষা কিছুকাল পরে হইলে কুলীন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রূপে পরিণত হইয়া উপরোক্ত বিষয়েও জাতিভেদ নিয়মের তুল্য হইয়া উঠিত।

যাহা হউক বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াতে এখন আর বর্ণসঙ্কর হয় না। কিন্তু ঐ নিষেধ এই উদ্দেশে প্রচারিত হইয়াছিল কি অন্য কারণে প্রচলিত হওয়াতে সহজেই বর্ণসঙ্কর নিবারিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। বর্ণসঙ্কর দুই প্রকার, এক উৎকৃষ্ট জাতির ঔরসে হীন বর্ণের গর্ভজাত, দ্বিতীয় তদ্বিপরীত। আবার যেমন মৌলিক চারিবর্ণের মধ্য হইতে বর্ণসঙ্কর হইতে পারে, সেইরূপ চারিবর্ণ হইতে উৎপন্ন বর্ণসঙ্কর হইতে দ্বিতীয় কল্পের বর্ণসঙ্কর হইতে পারে। এইপ্রকার সোপান বৃদ্ধি হইলে পরিশেষে জাতিভেদ বিলুপ্ত হওয়া অসম্ভাবিত নহে। কারণ বংশপ্রণালি অমিশ্র না থাকিলে ক্রমশঃ ব্যবসায়ের প্রভেদও অদৃশ্য হয়। মনুষ্য অনুকরণ-বৃত্তি অনুসারে স্বভাবতই পিতার ব্যবসা অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু বিভিন্নতা থাকিলে কখন কখন মাতামহের ব্যবসাও অবল-

স্থিত হইতে পারে; অতএব হীন জাতির কন্যা গ্রহণে যদি ব্যবসা-ব্যত্যয়ের কতক্ সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, হীন জাতির পতি বরণে অবশ্যই সেই সম্ভাবনা গাঢ়তর হইবেক। এবং মিশ্রজাতি সমূহের মধ্যে এইরূপ গোলযোগ উত্তরোত্তর অধিকতর হইবেক। অতএব বর্ণসঙ্করের বৃদ্ধি সহকারে বংশগৌরবের সহিত বৃত্তিভেদ লোপ পাওয়া সম্ভব। বিভিন্ন জাতির পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াতে সেই সম্ভাবনা দূরীকৃত হইয়াছে।

পরন্তু মনুষ্য কামান্ধ হইলে কখনই শাস্ত্রীয় বিধানের বিচার করে না। প্রণয়োন্মত্ত যুবক যুবতীর কখন জাতি বিচার থাকে না—অতএব যৌবনাবস্থার স্বভাবসিদ্ধ যথেচ্ছাচারিতা দমন করিবার উপায় না থাকিলে কেবল শাস্ত্রোক্তি দ্বারা ভিন্ন জাতির বিবাহ বন্ধ হয় না। কিন্তু যখন কার্য্যে দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়াছে, তখন অবশ্যই অনুমান করিতে হইবেক যে, ইহার প্রতি এমত কোন প্রবল কারণ বিদ্যমান আছে, যদ্দারা মনুষ্যের উক্ত প্রকার স্বেচ্ছাচার নিবৃত্ত হইয়া আছে।

এক্ষণকার প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে সেই স্বেচ্ছাচার নিম্ন লিখিত কারণে পরাহত হইয়া আছে যথা ———

১। বর ও কন্যা এ দুয়ের মধ্যে এক জন অর্থাৎ কন্যা স্বয়ং বিবাহ করিতে পারে না, পিতা কিম্বা অপর ব্যক্তি সম্প্রদান না করিলে কন্যার বিবাহ হয় না। সুতরাং পিতা যাহাকে দান করিবেন, তদ্ভিন্ন অন্য পতি বরণ করিতে কন্যার ক্ষমতা নাই।

২। কন্যার যে বয়সে বিবাহ হয়, তৎকালে পতিকামনা আদৌ মনোমধ্যে উদিত হইতে পারে না, সুতরাং অনুরাগ বশতঃ ভিন্ন জাতীয় পুরুষের পাণিগ্রহণ করা অসম্ভাবিত।

অতএব কন্যা সম্প্রদান করিবার নিয়ম আর নিতান্ত শৈশবাবস্থায় বিবাহ এই দুই প্রথা বলবৎ থাকাতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ ও নূতন বর্ণসঙ্কর উৎপত্তি রহিত হইয়াছে।

প্রাচীন কালে আমাদের দেশে নানা রূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল। মনু অষ্ট প্রকার পদ্ধতির কথা লিখিয়াছেন।

১ম। ব্রাহ্ম বিবাহ।

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বাচ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহুয়দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃপ্রকীর্ত্তিতঃ

বিদ্বান্ ও সচ্চরিত্র পাত্র দেখিয়া পরম সমাদরে তাঁহাকে আহ্বান পূর্ব্বক বস্ত্রাদি দান সহকারে কন্যা সম্প্রদান করিলে ব্রাহ্ম বিবাহ হয়।

২য়। দৈব বিবাহ।

যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে।।

যজ্ঞারম্ভ করিয়া সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত পুরোহিতকে বসন ভূষণাদি সমেত কন্যাদান করিলে দৈব বিবাহ হয়।

৩ য়। আর্ষ।

একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥

বরের নিকট এক বা দুই গো-মিথুন গ্রহণ পূর্ব্বক যথা বিধি কন্যা দান করিলে আর্ষ বিবাহ হয়।

৪ র্থ। প্রাজাপত্য বিবাহ।

সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য তু।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃস্মৃতঃ॥

ইঁহারা উভয়ে একত্র হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করুন এই কথা বলিয়া সমাদর পূর্ব্বক কন্যা দান করিলে প্রাজাপত্য বিবাহ হয়।

মনু বলিয়াছেন যে, এই চারি প্রকার বিবাহ জ্ঞানবান লোকের বিবেচনায় ব্রাহ্মণ দিগের পক্ষে প্রশস্ত। আর ইহাতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাঁহারও বিস্তর গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই চারি প্রকার বিবাহের এক প্রধান অঙ্গ কন্যা সম্প্রদান, পরন্তু ইহার মধ্যে দৈব ও আর্ষ বিবাহ গৃহী ব্যক্তির মধ্যে প্রচলিত থাকা সম্ভাবিত নহে, কারণ দৈব বিবাহের বিধি মধ্যে উল্লিখিত যজ্ঞা-নুষ্ঠান সাধারণ ব্যক্তিদিগের ক্ষমতা-সাধ্য নহে। আর্ষ বিবাহ যে কেবল ঋষিদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তাহা ঐ নামের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে।

অতএব সংসারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেবল প্রজাপত্য ও ব্রাহ্ম বিবাহই প্রচলিত থাকা অনুমিত হইতেছে। এতদ্-দ্বয়ের প্রক্রিয়ার পরস্পর বৈলক্ষণ্য আমরা সম্যক্ প্রকার অবগত নহি, সুতরাং তদ্বিষয়ে কেবল এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, উভয় বিবাহেই কন্যা সম্প্রদান করিতে হইত, অর্থাৎ কন্যা স্বেচ্ছামতে স্বাধীনভাবে পতি বরণ করিতে পারিত না। কিন্তু অন্য প্রকার বিবাহে এ বিষয়ে বিস্তর প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে।

৫ ম আসুর বিবাহ।

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণংদত্ত্বা কন্যায়ৈচৈবশক্তিতঃ।
কন্যা প্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে

ইহাতে কন্যা প্রদান করিতে হয় না, বর স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করেন। অধি-কিন্তু শুল্ক প্রদান করিতে হয়। সুতরাং এক দিকে দুর্জ্জয় বনিতারত্ন-লাভবাসনা,-অথবা ততোধিক অপকৃষ্ট প্রবৃত্তি, আর অন্য দিকে ধনলোভ, ইহাতে বিবাহকার্য্যে জাতিব্যবধান অথবা শাস্ত্র-নিষেধ কত ক্ষণ প্রবল থাকিতে পারে? বর্ত্তমান কালে কৌলীন্য মর্য্যাদা অনুসারে শুল্ক গ্রহণের প্রথা আছে। পূর্ব্বকালে কৌলীন্য-রীতি প্রচলিত থাকিবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, সুতরাং আপাততঃ ছিল নাই বিবেচনা করিতে হইবেক। অতএব বংশগৌরব অনুসারে শুল্ক গ্রহণ বিষয়ে কেবল এই মাত্র অনুমান করিতে পারা যায় যে, হয়তো অর্থ দিয়া উচ্চ বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিত। সুতরাং শুল্ক গ্রহণের অবশিষ্ট হেতু এই থাকে যে, লোকে রূপবতী কি গুণবতী কন্যা বিবাহ করিবার মানসে শুল্ক প্রদান করিত। কিন্তু শৈশবাবস্থায় কন্যার দোষ গুণ বিচার করা

বিড়ম্বনা মাত্র, অতএব আসুর বিবাহের স্থলে কন্যা যে বৈধ বয়স অতিক্রম করিত, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ শুল্কগ্রহণের রীতি প্রচলিত থাকিলে, ক্রমশঃ তৎসহকারে এই এক নিয়ম জন্মলাভ করে যে, কন্যার রূপ, গুণ ও যৌবন অনুসারে পণের বৃদ্ধি হয়, অতএব শুল্কগ্রহণস্থলে রজঃস্বলা হইবার পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দিলে কন্যাকর্ত্তার ক্ষতি বই লভ্য হইবার কথা নাই, সুতরাং লোকে লভ্য চেষ্টাই করিত এবং তদভিপ্রায়ে বয়ঃক্রম সম্পর্কীয় নিষেধ মানিত না, ইহাই সম্ভব বোধ হয়।

৬ ষ্ঠ গান্ধর্ব্ব বিবাহ।

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্যচ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥

ইহাতেও সম্প্রদানের সম্পর্ক নাই। বিশেষতঃ উভয়ের স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ স্থলে কন্যার বয়স দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন থাকা কদাচই সম্ভাবিত নহে। সুতরাং এরূপ বিবাহ বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহজেই হইতে পারে।

৭ ম রাক্ষস বিবাহ

হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥

এরূপ বিবাহেও জাতিবিচার থাকে না। তদ্ব্যতীত, আসুর ও রাক্ষস বিবাহ এ উভয়ে একটি প্রধান সৌসাদৃশ্য এই দৃষ্ট হইবেক যে, উভত্রই বলপ্রয়োগ হইত, কেবল একত্র অর্থবল, অন্যত্র বাহুবল এইমাত্র প্রভেদ।

৮ ম পৈশাচ বিবাহ।

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥

ইহাকেও বিবাহ বলা হইয়াছে! যাহা হউক, ইহাতে আর জাতিবিচার বা সম্প্রদান-প্রক্রিয়া বা বয়ঃক্রম-নিয়ম থাকিবার সম্ভাবনা কি? এই চারি প্রকার নিকৃষ্ট বিবাহে সম্প্রদানের সংস্রব দৃষ্ট হয় না এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ ও অধিক বয়সে কন্যার পরিণয় দুই সম্ভব বোধ হয়।

মনু লিখিয়াছেন যে আসুর এবং পৈশাচ বিবাহ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং বোধ হইতেছে যে, চারি প্রকার অপ্রশস্ত বিবাহের মধ্যে এ দুটি যার পর নাই হেয়।

যদি কেবল শুল্কগ্রহণ করিলেই আসুর বিবাহ বলিয়া ধর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে এ বিবাহ অদ্যাপি প্রচলিত আছে বলিতে হইবেক; কিন্তু আজি কালি পণ লইয়া যথাবিধি সম্প্রদানমন্ত্র পাঠ সহকারে যে বিবাহ হইয়া থাকে, তাহাকে বোধ হয় আসুর বিবাহ বলিত না। সম্প্রদানের সময় অগ্নি সাক্ষী করা হয় এবং হোম ইত্যাদি কার্য্য ও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তত্তাবৎ বোধ হয় আসুর বিবাহে হইত না। ইদানীন্তন কালে কন্যাকর্ত্তাকে যে পণ-দান করা হইয়া থাকে, তাহা প্রকৃতপক্ষে উৎকোচ অথবা

কন্যার যৌতুক বলিয়া ধর্ত্তব্য; যদি এ সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তবে পণগ্রাহী পিতা কন্যার ধন অপহরণ করেন বলিতে হইবেক।

এ স্থলে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে সম্প্রদান প্রথা শ্রেষ্ঠ বলিয়া, যে সকল বিবাহে তাহার বিধান ছিল না, তাহা কাল সহকারে রহিত হইয়া গিয়াছে; কেবল এই কথা সিদ্ধ করাই লেখকের অভিপ্রেত। আসুর বিবাহ নিকৃষ্ট, সুতরাং তৎসম্বন্ধে সম্প্রদানের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট না থাকাই স্বভাবতঃ অনুমিত হইয়াছে। পরন্তু আমাদিগের মতের বিরুদ্ধ কথা গুলিও পাঠকবর্গের গোচর করা আবশ্যক। কোলব্রুকের লিখিত 'হিন্দুশাস্ত্রের' ডাইজেস্ট নামক ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কৃত বিবাদভঙ্গার্ণব গ্রন্থের অনুবাদে তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের লিখিত টীকাতে লিখিত আছে যে "এক্ষণে ভদ্র ব্যক্তিরা ব্রাহ্ম বিধি অনুসারেই বিবাহ করিয়া থাকেন, কি অন্যে কখন কখন আসুর গান্ধর্ব এবং রাক্ষস বিধানেও বিবাহ করিয়া থাকেন।" কিন্তু তর্কপঞ্চানন কিসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন্ দেশ কোন্ সময় সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন, তাহা দৃষ্ট হয় না। তিনি ইংরাজী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। অতএব এই অল্পকাল পূর্ব্বে গান্ধর্ব্ব এবং রাক্ষস বিবাহ পর্য্যন্ত ও যে কিরূপে প্রচলিত ছিল, তাহার মর্ম্ম পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় না। স্ট্রেঞ্জ সাহেব লিখিয়াছেন যে "ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রদেশে আসুর মত ব্যতীত অন্য কোন বিধানে বিবাহ হয় কি না সন্দেহস্থল।" বোধ হইতেছে যে ইনি কেবল পণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই কথা লিখিয়াছেন। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবের এক স্থলে লিখিয়াছেন, "ইদানীং আমাদিগের দেশে দুই প্রকার মাত্র বিবাহ সচরাচর প্রচলিত আছে, ব্রাহ্ম ও আসুর অর্থাৎ কন্যাদান ও কন্যা বিক্রয়।" ইহারও প্রমাণ কিছুই প্রকাশ নাই। ফলতঃ, যে তিন জন বহুদর্শী পণ্ডিতের উক্তির উল্লেখ করা গেল, তাঁরা কেহই যে বিবাহের প্রক্রিয়ার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি করিয়া এই সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। এ স্থলে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতে লেখক নিতান্ত সঙ্কুচিত হইতেছেন। পরন্তু কেবল মনুর বচন ও নিম্ন লিখিত কএকটি কথার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এরূপ মত অবলম্বিত হইয়াছে। মহাভারতীয় আদি পর্ব্বের ১১২ অধ্যায়ে মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহের যে বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তাহাতে বোধ হয় যে, সেই বিবাহ আসুরমতে হইয়াছিল এবং ঐ বিবাহ শল্যের গৃহে না হইয়া হস্তিনাপুরীতে নির্ব্বাহ হওয়াতে সম্প্রদান ক্রিয়ার অভাব অনুমিত হইতেছে। আর ঐ পর্ব্বের ২২১ অধ্যায়ে লিখিত আছে, "অনন্তর বাসুদেব অর্থভূয়িষ্ঠ বাক্যে কহিলেন 'অর্জ্জুন আমাদিগের কুলের অবমাননা করেন নাই, এবং সমধিক সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে অর্থলুব্ধ মনে করেন না বলিয়াই অর্থ দ্বারা সুভদ্রাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। স্বয়ম্বরে কন্যালাভ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার এই জন্য তাহাতেও সম্মত হন নাই, এবং পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রদত্তা কন্যার পাণি গ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় নহে। অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় উক্ত দোষ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বলপূর্ব্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন।" ইত্যাদি।

পৈশাচ বিবাহ, কেবল মনু-নিষিদ্ধ নহে, এখনকার আইন অনুসারেও দণ্ড-

নীয় বটে[২]। রাক্ষস বিবাহ আসুর বিবাহাপেক্ষা মন্দ, এরূপ এখনকার শিষ্ট সমাজে বোধ হইবেক; তথাচ মনু আসুর বিবাহকে নিষিদ্ধ করিয়া উক্ত বিবাহকে যে বিহিত করিয়া গিয়াছেন, ইহার হেতু নির্দ্দেশ করা আমাদিগের অসাধ্য। পরন্তু রাক্ষস বিবাহও আইন মতে নিষিদ্ধ।[৩]

অতঃপর কেবল গান্ধর্ব্ব বিবাহ অবশিষ্ট থাকে। এ বিবাহের প্রতি শাস্ত্র কিম্বা আইন নিষেধ অসত্বেও ইহার ব্যবহার নাই। কিন্তু ইহা প্রচলিত ... কালে কখন কখন বিভিন্ন জাতির মধ্যে ... হইত সন্দেহ নাই। অতএব ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য বিধি মতে সম্প্রদান নিয়ম প্রবল হওয়াতেই বর্ণসঙ্কর নিবারিত হইয়াছে বলিতে হইবেক।

এ কালে সম্প্রদান-রীতি যার পর নাই প্রবল হইয়াছে। ইহার দুই অঙ্গ। এক, কন্যা কোন মতেই স্বয়ং বিবাহ করিতে পারেন না, কন্যা বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলেও দানের ব্যাঘাত হইতে পারে না। দ্বিতীয়, কন্যার অভিভাবকই তাহার বিবাহ দিবার দায়গ্রস্ত, এবং ঐ দায় হইতে তাঁহার অব্যাহতি পাইবার কোন উপায় নাই।

সত্য বটে যে, কন্যা ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে পিতা স্নেহবশতঃ অবশ্যই তাহার বিবেচনা করেন। কিন্তু এতদ্দ্বারা কন্যার আপন মত গ্রাহ্য করাইবার বিষয়ে কোন স্বত্ব জন্মে না। এবং পিতা কর্ত্তৃক বিরুদ্ধাচরণ হওয়াও অসম্ভাবিত নহে।

পূর্ব্বকালে সম্প্রদানের নিয়ম এতাদৃশ কঠিন ছিল না। শাস্ত্রে দেখা যায়,

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিং॥
অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ং।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি॥

রজস্বলা হইবার পর কন্যা তিন বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিবেক। তদনন্তর অনুরূপ বরে আত্মসমর্পণ করিবেক। কেহ সম্প্রদান না করিলে কন্যা যদি স্বয়ং স্বামী বরণ করে, তাহাতে তাহার নিজের কিম্বা পরিণেতার কোন প্রত্যবায় হয় না।

অতএব কন্যাকে সম্প্রদান না করিলে বিবাহ হইতে পারে না, একথা শাস্ত্রসম্মত নহে। বরং বালিকা-বিবাহ-নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবার ইচ্ছা করিলে এই বিধি অনুসারে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়, কারণ মনু ব্রাহ্ম বিবাহ এবং অপ্রাপ্ত বয়সে কন্যার বিবাহ উপলক্ষে গুণবান বরের শ্রেষ্ঠত্ব বিধান করিয়া গিয়াছেন। অনন্তর লিখিয়াছেন যে, যাবজ্জীবন ঋতুমতী হইয়া কন্যা গৃহে থাকিবেক, সেও বরং ভাল,

[বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ দৃষ্টি কর] ইহাতে প্রতিপন্ন হইবেক যে অর্থ দ্বারা কন্যা গ্রহণ করলে "প্রদত্তা কন্যার" পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হইত না। অতএব এইক্ষণে আসুর মত প্রচলিত নাই বলিয়াই সিদ্ধান্ত হইতেছে।

২। সন ১৮৬০ সালের ৪৫ আইন পিনেল কোড ৩৭৫ ধারা। দ্বিতীয় প্রকরণ।

৩। ঐ ঐ প্রথম ও তৃতীয় প্রকরণ।

তথাপি বিদ্যাদিগুণবিহীন পাত্রে কন্যা-দান কদাচ করিবে না।

কিন্তু বিশেষ বিচার করিলে সকল বরেই প্রায় কোন কোন গুণের হীনতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে মনোনীত পাত্র অভাবে কন্যার বিবাহদিতে বিলম্ব করিলে পিতার দোষ হইতে পারে না। পরিশেষে কন্যা বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে যতগুলি বর উপস্থিত থাকে, তৎসমুদায় তাহাকে প্রদর্শন করিয়া পিতা এই বলিতে পারেন যে " ইহাঁদিগের মধ্যে এই ব্যক্তির দোষ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, অতএব ইচ্ছা করিলে শাস্ত্রমতে তুমি স্বয়ং ইহার কিম্বা তোমার অভিলাষ অনুসারে অন্য কোন ব্যক্তির পাণিগ্রহণ করিতে পার।"

দুর্ভাগ্য বশতঃ দেশাচার মতে কুল ও আচারে শ্রেষ্ঠ হইলেই আমরা বরকে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি এবং তাহার শারীরিক ও মানসিক সহস্র দোষ থাকিলেও বিবাহ দিতে অসম্মত হই না। কুলজি দৃষ্টে যদি দোষ গুণের প্রকৃত মীমাংসা সম্ভব হয়, তাহা হইলে পতি মনোনীত করণের ভার কন্যার প্রতি অর্পণ করিবার প্রয়োজন থাকে না এবং পিতার সম্প্রদানভার গ্রহণের পক্ষেও কোন বাধা থাকে না, সুতরাং মনুর বচন কেবল পুঁথিতেই জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

ফলতঃ সম্প্রদাননিয়ম প্রবল করিবার বিষয়ে শাস্ত্রকারদিগের একটী নিগূঢ় অভিপ্রায় থাকা অসম্ভব নহে। বিবাহের ভার কন্যার নিজ হস্তে না থাকিয়া পিতা কিম্বা তদভাবে অপর গুরুজনের প্রতি সমর্পিত হওয়াতে আমাদিগের দেশে কন্যা সন্তান প্রায় অবিবাহিত থাকে না।

প্রাচীন গ্রীক জাতির মধ্যে কোন ঋষি তুল্য ব্যক্তি সম্বন্ধে একটী গল্প আছে যে, যৌবন কালে তাঁহার মাতা তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন " এখন আমার বয়স অল্প, এত অল্প বয়সে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। " পরে কএক বৎসর অতীত হইলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে পুনরায় ঐ বিষয়ের জন্য অনুরোধ করাতে বলিলেন " এখন আমার বয়স অধিক হইয়াছে, এত অধিক বয়সে বিবাহ করা উচিত নহে।" ফলতঃ যেমন নানা কারণে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়, সেইরূপ অনেক কারণে লোকের মনে বিবাহ করিতে অনিচ্ছাও হইয়া থাকে। অতএব অপরে চেষ্টা করিয়া বিবাহ না দিলে সময় বিশেষে লোকের বিবাহ হয়ই না, একথা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ নহে।

আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ কিছুদিন গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পুত্রোৎপাদন করা মনুষ্যের

৪। আমাদিগের দেশাচারের মধ্যে কতগুলি শাস্ত্রের কূটার্থ ধরিয়া বলবৎ হইয়াছে। অতএব তাহাদিগের সহিত তুলনায় আমাদিগের যুক্তি নিতান্ত হাস্যাস্পদ নহে।

অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অধুনা ইউ-রোপীয় পণ্ডিতগণ অতিরিক্ত প্রজাবৃদ্ধির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা বিষয়ে নানা প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু জগতের তরুণ বয়সে এপ্রকার কোন চিন্তার উদয় হয় নাই। পৃথিবীর শস্যোৎপাদিক শক্তি ও লোক সংখ্যার সামঞ্জস্য বিষয়ে কাহার মনে কোন প্রকার সন্দেহ জন্মে নাই। যাহাতে প্রজাবৃদ্ধি, অরণ্য পরিষ্কার এবং হিংস্র পশুর হ্রাস হয়, পুর্ব্বকালে তাবৎ লোকের কেবল সেই চেষ্টাই ছিল। ইহাতে বংশবৃদ্ধি হওয়া পৃথিবীর পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন লাভের বিষয় বলিয়াই লোকের বিশ্বাস ছিল।

আমাদিগের শাস্ত্র মতে পুত্রোৎপাদন না করিলে পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। মনু লিখিয়াছেন, পুত্র না হইলে পুং নামক নরকগামী হইতে হয়, এবং পুত্র পৌত্রাদির দ্বারা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। এই জন্যই বোধ হয় হিন্দু শাস্ত্রকারেরা বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন।

৫। পণ্ডিতবর শ্রীযুত উইলসন সাহেব লিখিয়াছেন যে পুর্ব্বকালে হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে বিদ্যাভ্যাস সমাপনান্তর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া একেবারে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা নিষিদ্ধ ছিল; পরে বৈরাগ্য ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অধিক বিবেচিত হওয়ায় ঐরূপ নিষেধ রহিত হইয়াছে। উইলসন সাহেবের পুস্তক উপস্থিত আমাদিগের হস্তগত না থাকাতে বালম ও পৃষ্ঠার উল্লেখ করিতে পারা গেল না।

অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত সকলেরই বিবাহ করা কর্ত্তব্য, অবিবাহিত থাকা পৃথিবীর অমঙ্গলের কারণ, আর অপরে বিবাহ না দিলে অনেক সময়ে বিবাহ করাই হয় না, একথা গুলি স্বীকার করিলে পিতার প্রতি কন্যার বিবাহ দিবার ভার অর্পণ করা শাস্ত্রকারদিগের পক্ষে নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া বোধ হইবেক না।

অতএব হিন্দুশাস্ত্রের উন্নতি সহকারে সম্প্রদানের নিয়ম প্রবল হইয়াছে, একথা সর্ব্বদিকেই সঙ্গত বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে সম্প্রদান না হইলেও বিবাহ হইতে পারিত, কিন্তু তাহা শাস্ত্রানুসারে প্রশংসনীয় ছিল না, এক্ষণে শাস্ত্রীয় বিধি প্রবল হইয়া সম্প্রদান ব্যতিরেকে বিবাহ অপ্রচলিত হইয়াছে; পূর্ব্বে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ হইয়া বর্ণসঙ্কর উৎপাদিত হইত, সম্প্রদানের নিয়ম প্রবল হওয়াতে তাহা রহিত হইয়াছে, এমন কি, জাতিভেদবিধানের দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ পদ্ধতির এক নূতন সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রদান-নিয়মের শ্রীবৃদ্ধিতে এতদ্দেশে কন্যা অবিবাহিত থাকিতে পারে না, এবং তদ্ধেতু প্রজাবৃদ্ধির সুবিধা হইয়াছে। অতএব সম্প্রদান-নিয়মকে এক্ষণকার বিবাহ-প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া অবশ্যই মানিতে হইবেক।

এতাদৃশ বিস্তারিত তর্কের দ্বারা সম্প্রদান-নিয়মের আবশ্যকতা স্থাপন চেষ্টার উদ্দেশ্য এই যে, ইহার সহিত বালিকা-বিবাহ প্রথাটী সর্ব্বতোভাবে সংসৃষ্ট আছে।

অধিক বয়সে বিবাহ দিবার রীতি থাকিলে কন্যা আপনার মনের ভাব বুঝিতে পারে এবং ভাবি সুখ দুঃখের বিচার করিয়া কোন ব্যক্তিকে মনোনীত এবং কাহাকেও আপনার অযোগ্য বলিয়া স্থির করিতে পারে. আর কন্যা স্বীয় অভিরুচি প্রকাশ করিলে পিতা কাজে কাজেই তাহার অনুমোদনে বাধ্য হয়েন। দেশাচার কিম্বা শাস্ত্রীয় বিধিতে কখনই মনুষ্যের মানসিক প্রবৃত্তির উচ্ছেদ হয় না, সহস্র চেষ্টাতেও মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ অপত্যস্নেহ বিলুপ্ত হইতে পারে না। "এই ব্যক্তিকে বিবাহ করিব না," কন্যা এ কথা বলিলে নিতান্ত পাষণ্ড না হইলে তাহার অন্যথা করিতে পারে না। অতএব নিতান্ত শিশু ভিন্ন বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যার প্রতি পিতা কদাচ সম্প্রদানের সম্পূর্ণ অধিকার পাইতে পারেন না। এতদ্দেশে বালিকাবিবাহ-প্রথা প্রচলিত না থাকিলে সম্প্রদানের নিয়ম কদাচই এতাদৃশ উৎকট হইতে পারিত না।

অন্যান্য দেশেও কন্যা দানের নিয়ম আছে। পিতা কিম্বা তাঁহার স্থানাভিষিক্ত অন্য কেহ গির্জাতে উপস্থিত থাকিয়া কন্যাদান না করিলে বিবাহ সমাধা হয় না। পূর্ব্বে ইউরোপে বড় বড় জমিদারদিগের মধ্যে বিবাহ উপলক্ষে পিতা কন্যাতে ঘোরতর বিসম্বাদ হইত। অনেক সময়ে পিতা বলপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুরূপ জামাতাকে কন্যাদান করিতেন, কন্যা অন্যের সহিত প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইলেও পিতৃ আজ্ঞা অবহেলনে সক্ষম হইতেন না। কিন্তু ইদানীং এরূপ ঘটনা অতিশয় বিরল হইয়াছে এবং সম্প্রদান কেবল প্রক্রিয়া মাত্র হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্দেশে অহিন্দু জাতিদিগের মধ্যে ষোল বৎসর এবং দেশ বিশেষে অন্য নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে, রক্ষকের অনুমতি ব্যতীত কেহ কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন না, এবং পিতাও উক্ত বয়সের মধ্যে কন্যার সম্মতি ব্যতীত কাহারও সহিত বিবাহ দিতে পারেন না, উক্ত বয়সের পরে কন্যা স্বেচ্ছানুরূপ পতি বরণ করিতে পারে, তৎকালে পিতার সম্মতির প্রয়োজন থাকে না, যে কেহ হউক, একজন উপস্থিত থাকিয়া কন্যা দান করিলেই কার্য্য সমাধা হয়।

এই প্রথার সহিত আমাদিগের দেশের নিয়মের তুলনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অধিক বয়সে বিবাহ দিবার রীতি থাকাতে সম্প্রদান বিষয়ে পিতার কর্ত্তৃত্ব হ্রাস হইয়াছে, আর এতদ্দেশে অল্প বয়সে বিবাহ দিবার রীতি থাকায় পিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে।

এতদ্বিষয়ে আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। বিবাহে কেবল কন্যাকেই দান করা শাস্ত্রীয় বিধি, তাহাতে কন্যা নিজ অভিলাষ প্রকাশ করিতে পারে না বটে; কিন্তু পুরুষের স্বয়ং বিবাহ করাই উদ্বাহ প্রক্রিয়া অনুসারে প্রচলিত আছে, তাহার ইচ্ছানুরূপ কন্যা প্রাপ্ত না হইলে বিবাহ করা নিতান্ত অসঙ্গত। কিন্তু অধুনা পুত্রের বিবাহ বিষয়েও পিতৃকর্ত্তৃত্বের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। বরের পিতাই সমস্ত

কর্ম্ম করেন, বর কেবল মন্ত্রপাঠ মাত্র করিয়াই সংসারী হয়েন। ইহার ফলই হউক বা কারণই হউক, একটী এই দৃষ্ট হইতেছে যে, এইক্ষণ পুরুষের বিবাহও অতি অল্প বয়সে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, ইহাতে পুত্র বিবাহ কালে ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে না এবং তাহার মনের অভিলাষ প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও থাকে না। ফলতঃ বিবাহ বিষয়ে মৌনাবলম্বন করাই এক্ষণে শীলতার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অতএব বিবাহ বিষয়ে পিতার যে কর্ত্তৃত্ব, পাত্র কন্যার বয়সের সহিত তাহার বিস্তর সম্বন্ধ, ইহা পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের দ্বারা সুসিদ্ধ হইতেছে। আর ইহা যুক্তিসঙ্গতও বটে। দশম বর্ষীয় বালিকা বিবাহ কাহাকে বলে তাহাই বুঝিতে পারে না, তাহাতে পিতার সহিত জেদ করিবার উপযুক্ত সাহস বা তেজ থাকিবার সম্ভাবনা কি? *

প্রাচীন কালে রোমান দিগের মধ্যে বিবাহ বিষয়ে তিন প্রকার বিধি ছিল। এক প্রকারে, বর কন্যাকে তাঁহার পিতা মাতার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইতেন, এবং পতিগৃহে প্রবেশ কালে কন্যার তিন খণ্ড তাম্রমুদ্রা দিতে হইত। দ্বিতীয় প্রকার,—পুরোহিতেরা দশ জন সাক্ষীর সম্মুখে দেবতাদিগকে কতকগুলি ফল নিবেদন করিয়া দিতেন এবং বর কন্যা উভয়ে একত্রে একখণ্ড মেষচর্ম্মের উপর উপবেশন করিয়া লবণ সংযুক্ত এক খানি তণ্ডুলের পিষ্টক (cake) ভক্ষণ করিতেন, তাহাতেই তাঁহাদিগের উভয়ের দেহ এবং আত্মা এক হইত। আর তৃতীয় বিধি এই ছিল যে, কোন পুরুষ কোন রমণীর সহিত একবৎসর কাল পর্য্যন্ত সহবাস করিলে তাঁহাকে স্ত্রীর ন্যায় অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু উহার প্রতিপ্রসব এই ছিল যে, ঐ স্ত্রী সেই এক বৎসরের মধ্যে তিন রাত্রি পুরুষের নিকট অসন্নিহিত থাকিলে তাঁহার উপর ঐ রূপ স্বত্ব জন্মিতে পারিত না।

পরন্তু বিবাহ বিষয়ে তদ্দেশীয় আইন-নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়া মতে বর ও কন্যার সম্মতি প্রকাশ করিতে হইত। বরের পিতা বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহার সম্মতি ব্যতিরেকে বর বিবাহ করিতে পারিতেন না। আর কন্যার পক্ষে, হয় পিতা নতুবা তদভাবে অন্য অভিভাবক না থাকিলে আইন বজায় হইত না। সুতরাং রোমীয় কন্যারাও বিবাহ বিষয়ে এতদ্দেশের স্ত্রীলোকদিগের মত কিছু কিছু পরাধীনা ছিলেন। রোমীয়দিগের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে বয়সের বিষয়ে এই নিয়ম ছিল যে, বর চতুর্দ্দশ বৎসর এবং কন্যা দ্বাদশ বৎসর বয়স অতিক্রম না করিলে কদাচ বিবাহ করিতে পারিত না। তাহাদিগের মধ্যে সন্তানের উপরে পিতার অসীম ক্ষমতা ছিল। পিতা আপন পুত্র বিক্রয় করিতে পারিতেন এবং কখন

---

* বিবাহ শব্দের অর্থ পতি পত্নী বোধক জ্ঞান; ইহাতে স্মৃতি শাস্ত্র বিশারদেরা এই তর্ক করিয়া থাকেন যে "আমি পতি, ইনি ভার্য্যা" এই জ্ঞান বুঝায়, নতুবা "আমি ভার্য্যা ইনি আমার পতি" এরূপ জ্ঞান না হইলেও বিবাহ শব্দের তাৎপর্য্য লোপ হয় না।

কখন নিজ ক্ষমতায় তাহার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্তও করিতে পারিতেন। তথাচ তাঁহাদিগের মধ্যে আমাদিগের ন্যায় কন্যা দান সম্বন্ধে এমত কোন নিয়ম ছিল না যে, তাহার বিবাহ না দিলে নয়। সুতরাং এ দেশের ন্যায় সম্প্রদানের নিয়ম উদয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষতঃ উভয় পক্ষের সম্মতি ও বয়সের বিষয়ে উপরি লিখিত নিয়ম থাকাতে রোমকন্যারা বিবাহ বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনা ছিল। এমন কি ক্রমশঃ তাহারা এতাদৃশ স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া উঠিয়াছিল যে. কার্থেজীয়দিগকে পরাভূত করণান্তর যখন রোমরাজ্য অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হয়, তখন অনেক স্ত্রীলোক তৃতীয় প্রকার বিবাহের প্রথা অবলম্বন করিত, এবং তিন রাত্রির নিয়মটীও যথাবিধি পালন করিত, আর সকল দিক বজায় রাখিবার জন্য তৎপূর্ব্বে পতির সহিত লেখা পড়াও করিয়া লইত।

রোমানদিগের মধ্যে পেট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান নামক দুই শ্রেণি ছিল, তন্মধ্যে প্রথমটি প্রধান ও দ্বিতীয়টি নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে গৌরবের যে বৈলক্ষণ্য ছিল, তাহা ঠিক ব্রাহ্মণ শূদ্রের ন্যায় নহে। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রগণকে যেরূপ হীন মনে করিতেন, পেট্রিসিয়ানেরাও প্লিবিয়ান দিগকে নীচকুলোদ্ভূত বলিয়া, সেইরূপ ঘৃণা করিতেন বটে, কিন্তু প্লিবিয়ানেরা স্বজাতীয়গণের অবস্থা উন্নত করণ বিষয়ে শূদ্রদিগের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ছিল না। রোমানদিগের আদিম অবস্থায় প্লিবিয়ান ও পেট্রিসিয়ান দিগের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। পেট্রিসিয়ানেরা এই নিষেধ প্রবল রাখিতে যত্নবান হইত, প্লিবিয়ান দিগের চেষ্টাতেই তাহা পরিশেষে রহিত হয়। পরন্তু ঐ নিয়ম রহিত হইবার পূর্ব্বেও পেট্রিসিয়ান পুত্রদিগের সহিত প্লিবিয়ান কন্যাগণের বিবাহ অপ্রচলিত ছিল না, কেবল তাহাতে এই মাত্র দোষ থাকিত যে, সন্ততি বর্গ মাতৃ শ্রেণী অনুসারে প্লিবিয়ানদিগের মধ্যে পরিগণিত হইত। ইহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হইবেক যে, পেট্রিসিয়ান পুরুষেরা কেবল পিতৃ বিয়োগের পর স্বাধীন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই প্লিবিয়ান্ কন্যা বিবাহ করিতে পারিত। কিন্তু পেট্রিসিয়ান কন্যারা কখনই স্বেচ্ছাচার অবলম্বনে সক্ষম হইত না, সুতরাং পেট্রিসিয়ান কন্যার গর্ব্ভে প্লিবিয়ান সন্তান জন্মিয়া কখনই পেট্রিসিয়ান শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারিত না।

আমাদিগের দেশে যে সময়ে সম্প্রদান নিয়ম উল্লঙ্ঘিত হইত, তখন উভয় প্রকার বর্ণসঙ্করই জন্মিত। সম্প্রদানের নিয়ম প্রবল হওয়াতে দুইই রহিত হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রকে কন্যা দান করা এবং শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণকে কন্যাদান উভয়ই তুল্যরূপে নিষিদ্ধ। অতএব রোমান ব্যবহারের সহিত আমাদিগের বিভিন্নতা এই যে, এতদ্দেশের বিবাহ দিবার ভার পিতার প্রতি অর্পিত হওয়াতে আর মিশ্রজাতি হইতে পারে না। রোমান

দিগের মধ্যে অভিভাবকের সম্মতি গ্রহণ বিষয়ক নিয়ম থাকাতে কেবল পেট্রিসিয়ান কন্যা আর প্লিবিয়ান পুরুষের মধ্যে বিবাহ হইতে পারিত না।

ডেন্মার্ক দেশস্থ প্রসিদ্ধ পুরাবৃত্তবেত্তা নিবুর লিখিয়াছেন যে, পেট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান দিগের মধ্যে আইন নিষিদ্ধ বিবাহে শেষোক্ত শ্রেণীস্থ ব্যক্তিরা আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিত বটে, তথাপি কোন চতুর প্লিবিয়ান ভাবিয়া দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিত যে এতদ্বারা পেট্রিসিয়ানেরা ক্রমশঃ হীনবল হইয়া উত্তরোত্তর প্লিবিয়ান দলেরই শ্রী বৃদ্ধি হইতেছিল।

হয়তো প্রাচীন কালে এতদ্দেশের কোন বিচক্ষণ ব্রাহ্মণও বুঝিয়াছিলেন যে, বর্ণসঙ্কর হইতে লাগিলে ক্রমশঃ তাঁহাদিগের সংখ্যা হ্রাস হইয়া নীচ জাতিদিগেরই উন্নতি হইবেক।

এতাবতা এই উপপত্তি হইতেছে যে,

১। অল্প বয়সে বিবাহ দিবার প্রথা হইতে কন্যা সম্প্রদানের নিয়ম বলবৎ হইয়াছে।

২। ঐ সঙ্গে সঙ্গে গান্ধর্ব্ব বিবাহ এবং স্বয়ম্বরা হইবার ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়াছে।

৩। এই সকল কারণে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ প্রথা রহিত হইবার অনেক সুবিধা হইয়াছে।

৪। ইহাতে বর্ণসঙ্কর নিবারিত হইয়াছে।

৫। তদ্দ্বারা জাতিভেদের নিয়ম দৃঢ়তর হইয়াছে। কারণ, বর্ণসঙ্কর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইলে বংশমর্য্যাদা এবং বৃত্তিভেদ স্থির থাকে না; আর মিশ্র জাতির বৃদ্ধি সহকারে বিবাহ ও ব্যবসায়ের নিয়মাদি উতপ্লুত হইয়া এবং আদি বর্ণের লোক সংখ্যা অল্প হইয়া ক্রমশঃ সমস্তই এক শ্রেণীভূক্ত হইতে পারে।

এই ঘটনা গুলির মধ্যে কোন্‌টি আদিম এবং কোন্‌ গুলি তদুত্তরকালীন তাহা নির্ণয় করা যায় না। যাহা হউক নিম্নলিখিত অনুমানদ্বয়ের মধ্যে অন্যতর অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

১। বালিকা বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে স্বভাবসিদ্ধ ঘটনা ক্রমেই উল্লিখিত ফলগুলি উৎপাদিত হইয়াছে। অথবা

২। বর্ণসঙ্কর নিবারণ ও জাতিভেদের উন্নতি সাধনেচ্ছাতে শাস্ত্রকারেরা কোন বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা সম্প্রদান ও বালিকা বিবাহের নিয়ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

প্রথম অনুমান স্বীকার করিলে এই কথা মানিতে হয় যে, শাস্ত্রকারেরা কেবল পূর্ব্বকালপ্রচলিত প্রথা সমগ্র লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদিগের কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না এবং তদুৎপাদিত ক্ষতি লভ্যের প্রশংসা বা নিন্দার ভাজন তাঁহারা নহেন, তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বিধি লঙ্ঘন করিলে তাঁহাদিগের প্রতি অবমাননা করা হয় না আর তদানুষঙ্গিক পারত্রিক দণ্ডের বিবরণ কেবল তৎকালের জনসমাজের বিশ্বাস মূলক ভিন্ন প্রাগুক্ত ঋষিগণের মনোগত কথা নহে।

আর দ্বিতীয় অনুমান গ্রহণ করিলে শাস্ত্রকারদিগের কার্য্য সম্বন্ধে কতক গুলি বিশেষ অভিপ্রায় নির্দ্দিষ্ট করা হয়, ইহাতে সেই অভিপ্রায় গুলি মঙ্গল জনক কি না এবং শাস্ত্রোক্ত উপায়ের দ্বারা তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে কি না, শাস্ত্রকারদিগকে এই প্রকার বিচারাধীন হইতে হয়। এতদ্দ্বারা অনেক স্থলে তাঁহারা আমাদিগের ভক্তিভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু স্থলবিশেষে কালভেদে অবস্থাপরিবর্ত্ত হওয়াতে তাঁহাদিগের প্রদর্শিত উপায় গুলি পরিত্যাগ করিবারও প্রয়োজন হইতে পারে।

যদি এমত মনে করা যায় যে, শাস্ত্রের কিয়দংশ প্রাচীন কালের প্রথার বৃত্তান্ত এবং কিয়দংশ শাস্ত্রকারদিগের অনুজ্ঞা মুলক, তাহা হইলেও যথাযোগ্য মতে পুর্ব্বোক্ত অনুমান দ্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন ফলগুলি একত্রে সন্নিবেশিত হইবেক।

এতদ্ভিন্ন অনুমান হয় যে, হিন্দু শাস্ত্রমতে বর ও কন্যার সম্পর্ক বিষয়ে যত দূর বাছাবাছি করিয়া বিবাহের যোগ্যাযোগ্যতা নির্ণয় করা আবশ্যক, তাহা তাহাদিগের স্ব স্ব সাধ্যাধীন নহে। সুতরাং কোন প্রবীণ ব্যক্তির যত্ন ও চেষ্টা ভিন্ন কর্ম্ম সিদ্ধ হওয়া দুষ্কর এবং কাজে কাজেই ইহাতে পিতার হস্তক্ষেপণ করিতে হয়।

পুর্ব্বকালে ইউরোপ খণ্ডে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে পোপ কর্ত্তৃক প্রচারিত 'কানন লা 'নামক নিয়মানুসারে আদি পুরুষ হইতে গণনা করিয়া সপ্তম পুরুষের মধ্যে কেহ কাহাকে বিবাহ করিতে পারিত না। কিন্তু বিবাহ বিষয়ে বরকন্যারা সম্যক্ প্রকারে স্বাধীন থাকাতে অনেক সময়ে এই নিয়ম অতিক্রান্ত হইত। পরে ইচ্ছা করিলে ডাইভোর্স নামক বিবাহ উচ্ছেদ করণ বিষয়ক আইন অনুসারে ঐ কারণে ধর্ম্মযাজকগণ কর্ত্তৃক পতি পত্নী সম্বন্ধ রহিত করাইয়া পুনরায় বিবাহ করিতে সক্ষম হইত।

ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে, বরকন্যার যোগ্যাযোগ্যতা স্থির করণ বিষয়ে এতাদৃশ নিয়ম থাকিলে ভবিষ্যতের গোলযোগ নিবারণ জন্য বিবাহ দিবার ভার একান্ত পক্ষে এক দিকে অভিভাবকের হস্তে অর্পিত হওয়া প্রয়োজন।

অতএব আমাদিগের মধ্যে সম্প্রদানের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবার ইচ্ছা করিলেও বোধ হয় উপরোক্ত কারণে তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে।

কোলব্রুক লিখিয়াছেন যে, পাত্র অন্বেষণে কাল হরণ হইবার আশঙ্কাতে বাল্যাবস্থায় কন্যার বিবাহ দিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা আমরা দেখিতে পাই না, কারণ শৈশবাবস্থায় বিবাহ দিবার আবশ্যকতা না মানিলে পাত্রান্বেষণ জন্য ব্যস্ত হইবার কোন হেতু দৃষ্ট হয় না।

বালিকাবিবাহ পদ্ধতির সহিত আর দুটী দেশাচারের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দৃষ্ট হইবেক, যথা

১। স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃপুরে নিবাস রীতি

২। উঁহাদিগের বিদ্যা শিক্ষা না দিবার প্রথা।

স্ত্রীলোকদিগকে জনসমাজে গতায়াত করিয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ এবং মনুষ্য চরিত্র স্বচক্ষে দেখিতে না দিলে তাহাদিগের পুস্তকাদি পাঠ কেবল শারিকার আবৃত্তির স্বরূপ হয়। পুরুষের বিদ্যা বুদ্ধির অধিকাংশ সংসর্গ গুণে সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং কতক, প্রত্যক্ষ দর্শন ও চিন্তা শক্তির সহযোগে উপার্জ্জিত হয়। পুস্তক পাঠে শেষোক্ত শক্তির চালনা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহার প্রধান লাভ এই যে, তদ্দ্বারা দর্শন ও শ্রবণের বিস্তর সাহায্য হইয়া থাকে। বিদ্বান ব্যক্তিদিগের সংসর্গে থাকিয়া যত লাভ হয়, চিরকাল গৃহ মধ্যে রুদ্ধ থাকিয়া কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া তাহার অল্পাংশ অর্জ্জন করাও দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অবগত হইলেই যে জীবন সার্থক হয় এমত নহে। মনুষ্যের দয়া, সাহস, তেজ, স্থির প্রতিজ্ঞা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, প্রভৃতি গুণ না থাকিলে মনুষ্যনাম ধারণের অযোগ্য হয়, কিন্তু এই সকল গুণ কেবল পুস্তকপাঠে জন্মে না। ইহার চালনা না হইলে এ সমুদায় কেবল মনের কল্পনা মাত্র থাকে। অতএব অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকাতে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা নিতান্ত অসম্পূর্ণ থাকে এবং বিদ্যালাভের দ্বারা যে সমস্ত মহৎগুণ বিকশিত হয়, তাহা বিকসিত না হইয়া মুকুলাবস্থাতেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু বিদ্যালাভ না হইলে বুদ্ধি পরিণত হয় না এবং কেবল লোভাদিরিপু চরিতার্থ করিতেই নিযুক্ত থাকিয়া সাতিশয় কুটিল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধি পরিপক না হইলে মনুষ্য অতি সদাশয় হইয়াও কার্য্য বিশেষের ফলাফল বুঝিবার ক্ষমতাবিরহে সহজে কুপথগামী হয়।

অতএব স্ত্রীলোক বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী ও কিছু সাহসবিশিষ্ট না হইলে সহসা কেহই পূর্ব্ব প্রথা অতিক্রম পূর্ব্বক তাহাদিগকে অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া অজ্ঞাতচরিত্র লোকের সহিত আলাপ করিতে দিতে সাহস করে না। সত্য বটে যে, অন্য জাতির অনেক মূর্খ স্ত্রীলোকও অনায়াসে জন সমাজে মিশ্রিত হইতেছে কিন্তু তাহাদিগের পঠিত বিদ্যা যত থাকুক বা না থাকুক, দেখিয়া শুনিয়া তাহাদের অনেক জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। সেই অভিজ্ঞতার অসদ্ভাবই আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের হীনতার প্রধান কারণ।

অতএব এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাভাবে অন্তঃপুরের বাহিরে যাইতে পারিতেছে না এবং অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইতে না পারাতে সম্যক প্রকারে বিদ্যালাভ করিতে পারিতেছে না। এই জলকুণ্ডল হইতে কি প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইতে হইবেক, তাহা আমাদিগের উপস্থিত বিবেচনা নহে।

কিন্তু এতদ্দ্বারা বালিকা বিবাহের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে।

মূর্খব্যক্তির প্রতি নানামত অত্যাচার করা যায়, তাহাতে কোন ব্যাঘাতের আশঙ্কা থাকে না। শুল্ক গ্রহণ করিয়া কন্যা বিক্রয়ই কর, অথবা তোমার নিজ

পুণ্যার্থে গৌরী দানেই প্রবৃত্ত হও, যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা অন্ধকূপ মধ্যে নিমগ্ন থাকিবে এবং তাহাদিগের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত না হইবেক, ততদিন ঐ সকল কার্য্যের কোন ব্যাঘাত নাই। যাঁহারা ইদানীন্তন বালিকাবিদ্যালয়সমূহের কার্য্যকারিত্বের প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে, নিতান্ত শিশু হইয়াও কন্যারা বিবাহের পূর্ব্বে আপনাদিগের ভাবী অবস্থার প্রতি মনোযোগ করিয়া থাকে। কেহ কেহ কথা কহিতে না পারিলেও আপনাদিগের মনের চাঞ্চল্য বশতঃ নিতান্ত ম্লান হইয়া যায় এবং তাহাদিগের চেহারা দেখিলে সংকল্পিত কোন বরের প্রতি অনিচ্ছা থাকা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রূপ আচরণ যে কেবল বিদ্যাশিক্ষা করিলেই হয় এমত নহে। অধুনা সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক এ সমস্ত বিষয়ের যে রূপ আলোচনা হইতেছে, পূর্ব্বে কস্মিনকালে এমত ছিল না, সুতরাং এই সকল কথা শ্রবণ করিলে এবং কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হইলে নিতান্ত বালিকাও আপনার ভাবি সুখ দুঃখের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বুঝিতে পারে। প্রবীণ ব্যক্তিরা বলেন যে, এক্ষণকার কন্যাগণ অতিশয় প্রগল্‌ভা, সেই জন্য গুরুজন সন্নিধানে লজ্জাশীলা না হইয়া অনায়াসে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলে। ইটি তাঁহাদিগের নিতান্ত ভ্রম, কালধর্ম্মসহকারে কন্যাগণ সম্প্রতি স্ব স্ব মনোবৃত্তি চালনা করিতে শিখিয়াছে। ক্রমশঃ প্রাচীন শাস্ত্রগুলি জন সমাজে অধিকতর অজ্ঞাত হইতেছে এবং ভিন্ন-দেশীয় আচার ব্যবহার দৃষ্টে আমাদিগের শ্রদ্ধা বিচলিত হইতেছে, ইহাতে কন্যাগণ পূর্ব্বকালীন প্রথা শৃঙ্খল হইতে কিয়-দংশে বিমুক্ত হইয়া মানবস্বভাবের বশ্যতা অনুসারে মনের ভাব প্রকাশ করিলে তাহাদিগকে প্রগল্‌ভতা দোষে দোষী করা অন্যায়। কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয় অতি সামান্য। দশম বর্ষীয় বালিকার জ্ঞান ও বুদ্ধি যত দূর, এরূপ কার্য্যে তাহার অসাধ্য কিছুই দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ স্ত্রীজাতির জ্ঞানবৃদ্ধি হইলে তাহারা বিল-ক্ষণ বুঝিতে পারিবে যে, কিছু অধিক বয়সে বিবাহ হইলে ভাল হইত। অতএব মূর্খতা বালিকাবিবাহের ফল স্বরূপ হই-য়াও উহাকে অদ্যাপি বলবৎ রাখিবার বিষয়ে সাহায্য করিতেছে। এবং অন্তঃ-পুরে রুদ্ধ থাকাতেও কন্যার পরাধীন ভাবের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। অন্ধ ব্যক্তিকে যেরূপ বুঝাইয়া দেও, তদনুসারেই কাহাকেও সুন্দর এবং কাহাকে কুৎসিত মনে করে। কন্যা ভাবি পতির দর্শন লাভ করিতে না পারিলে গুরুজনেরা তৎসম্বন্ধে যে প্রতিষ্ঠাপত্র দেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। সুতরাং স্বয়ং বুদ্ধি প্রয়োগ পূর্ব্বক পতি মনোনীত করিবার ইচ্ছাও জন্মে না।

বালিকাবস্থায় বিবাহ করিলে স্ত্রীকে কাজে কাজেই অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিতে হয়। কারণ মন প্রণয়ের সলিলে পবিত্র না হইলে সময় বিশেষে পতিভক্তি বিচলিত

হইলেও হইতে পারে। অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইতে দিলে রমণীদিগকে সেই সঙ্কটের হস্তে ন্যস্ত করা হয়, বাল্যকালে বিবাহ দিলে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষাও বৃথা ও অসুবিধাজনক হয়। মনুষ্য, সুখের আস্বাদ জানিতে পারিলে তাহাতে লোলুপ হয়, না পারিলে তাহার অভিলাষ থাকে না এবং জানিয়া প্রাপ্ত না হইলে নিতান্ত উত্যক্ত হয়। অতএব যখন স্ত্রীলোকদিগকে সাংসারিক সুখ হইতে বিবর্জ্জিত রাখাই কর্ত্তব্য হইল, তখন তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেওয়া অন্যায়।

অতএব বুঝা যাইতেছে স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃপুর বাস এবং বিদ্যানুশীলনের অসদ্ভাব বাল্যবিবাহেরই আনুষঙ্গিক। বালিকাবিবাহের নিয়মটিকে আমরা নিতান্ত কদর্য্য বলিয়া গণনা করিয়া থাকি। ইহা হইতে নানা অশুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে; তথাচ দৃষ্ট হইতেছে, যে এই প্রথা উঠাইয়া দিতে হইলে সেই সঙ্গে ইহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রথা উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক, এবং যাবৎ তদর্থে সসজ্জ না হই, তাবৎ কেবল ইহাকে গালি মন্দ দিলে রচনা পারিপাট্য প্রদর্শন হইতে পারে বটে, কিন্তু সমাজের পুনঃ সংস্কার কল্পে বিশেষ কিছু সাহায্য করা হয় কি না সন্দেহ।

সংসার।

অচল প্রভুতা কাল রোপেছ ভূতলে,
না দেখি সুসাধ্য কিছু নাহি তব বলে।
এই যে সামগ্রী মম প্রণয় হরিল,
ক্ষণ পরে তারে হেরি কোপ উপজিল!
যাহার অভাবে মোর যাইত জীবন,
তাহার সঙ্গমে মরি, এ আর কেমন।
রসনা হরিল যার অপূর্ব্ব মাধুরী,
সে কেন কাষায় তিক্ত না বুঝি চাতুরী।
মানস তুষিল যেই বচন প্রণালী,
এখন জ্বালায় কেন সাধ্য নাই বলি।
নন্দন জিনিয়া যেই মনে ছিল স্থান,
তপ্তাঙ্গার সম কেন দহিছে পরাণ?
যে ভাব ভাবিয়া কত তুষ্টি উপজিল,
বৈপরীত্যে কেন তায় প্রশংসা লভিল?

অন্য চিন্তা কায নাই; করি নমস্কার,
এথেন্স্ লুকালে কোথা দেখি একবার।
কোথা সে আদিম শোভা, সভ্যতা কুমারী,
নূতন সমাজ- রাগ; সভ্য শারি শারি।
সুখের বিশ্রাম স্থান, মর্ত্ত্য লোক কর্ত্রী,
ত্রিদিব জিনিল যারে ধরিয়া ধরিত্রী।
শিল্পের প্রসূতি, বিদ্যা অখিল জননী,
নরের নরত্ব দাত্রী, মানস নন্দিনী।
ভীষণ সাগর প্রান্তে নগর রোপিল,
অজ্ঞাত কান্তার যেই আয়ত্ত্ব করিল।
জড়ে দিল প্রাণ যেই, প্রস্তরে আকার,
ছিন্ন পটে দিব্য মূর্ত্তি বর্ণে সাধ্য কার।
অপূর্ব্ব শাসনরীতি, ব্যবস্থা নিপুণ,
ধন্য উপস্থিত মতি, সহিষ্ণুতা গুণ।
তেমন স্বদেশ প্রীতি, লুকালো কোথায়?
তেমন স্বাধীন ইচ্ছা না দেখি কোথায়।
কোথা সেই প্রাণপণ রাখিতে সম্মান?
মরিয়া না মরে তেজ সতত সমান।
দেখাও সোলন মোরে বিজ্ঞতার রাশি,
'নির্জ্জনে প্রণত হয়ে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসি।

দেখি রসো বসো দেখি দেখি মেরাথন,
ওই বুঝি দাঁড়াইয়ে পারস্য রাজন?
সাগর সমান ওই পারস্য বাহিনী,
যাহার দুঃসহ ভারে কাঁপিছে মেদিনী?
ও কে দুই দিব্য মূর্ত্তি, প্রশান্ত-বদন,
কর্ত্তব্য বিচার-শংসী, স্তিমিত নয়ন?
মেরু যেন নিজবলে নীরধি তরঙ্গে,
অকাতরে বারে বেগ অবিশ্রান্ত অঙ্গে?
দেখিতে দেখিতে ধন্য ; যেন তুল রাশি,
বায়ুতে বিকীর্ণ হলো সৈনিক পারসি!
কোথা লাকোনিয়া সেই বীরপ্রসবিনী,
বিপক্ষ দলনী ধন্যা বিপন্ন তারিণী?
কোথা সে মঙ্গলকর নিষ্ঠুর নিয়ম,
কোথা সে বিলাস দ্বেষ মানস বিষম?
সংগ্রামে বিখ্যাতি ভিন্ন নাহি অন্য আশা,
সংসারে সংসার সুখে নাহিক পিপাসা।
ক্ষীণতা ঔদ্ধত্য ভয়ে দূরে পলায়েছে,
অন্য কি রমণী জাতি—তাহাও ত্যজেছে।
জিজ্ঞাসি সুরতাপ্রীতি—মনে বড় আশ,
কেমনে সন্তান-স্নেহে করেছিলে নাশ।
বৃথা স্বর্ণ সৌম্য মূর্ত্তি করিলে প্রকাশ,
অপূর্ব্ব মানব তারা বীরতার দাস।
পাপ পুণ্য নাহি জানে সদগুণ সভ্যতা,
সতত একান্ত মনে সেবে স্বাধীনতা।
অসিত করাল অসি অঙ্গের ভূষণ,
কার্ম্মুক মন্দন ; কষ্ট-পোষক ভোজন।
সমর কৌশল বিদ্যা, শৌর্য্য সদাচার,
সমস্ত নগর যেন এক পরিবার।
আগুণের কণা যেন জোরাল হাওয়ায়,
নামের আগেতে জয় স্বন্ স্বন্ ধায়।
কোথা সেই ক্ষুদ্র ভূপ অনুপম বলী?
প্রাণ দিয়া উজ্জ্বল করিল থর্ম্মপলী।

যাহার চরণে নত পারস্য রাজন,
কশাঘাতে দ্বিধাকরে সাগর যে জন।
ধন্য অপমান-ভয় স্বজাতি গৌরব!
অপূর্ব্ব সাধিল কার্য্য জিনিয়া বাসব।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি মৃত্যু কোথাছিল তোর?
কোথা গো নীচাশা তোর কোথা ছিল জোর?
অবহেলে তুলরাশি দহে অগ্নি কণা,
পলায় মণ্ডুক কুল দেখি ফণীফণা।
ঝঞ্ঝায় কদলী যেন কাঁপিয়া আকুল,
নিমেষে হইল ছিন্ন বাহিনী তুমুল।
দেখরে দেখিয়া উঠে হৃদয় কাঁপিয়া,
এই কি দুর্দ্দান্ত এই সেই সে গ্রীগিয়া?
বিভব লুঠেছ তার, গৌরব হরেছ,
নাম মাত্র রাখি তারে বঞ্চনা করেছ।
দিগন্তে যাহার কীর্ত্তি না পেলে বিশ্রাম,
দিনান্তে এখন তার কেবা করে নাম।
যার উপদেশে ধরা পাইল মঙ্গল,
বিপদে রাখিল যেই হীনে দিল বল।
সে হলো অক্ষম কালে আপনা রক্ষণে,
ক্ষুদ্র এক দ্বীপ মাত্র তারে "হিত" ভনে।
কই সে তাহার পুত্র ভুবন বিখ্যাত
যে করিল মর্ত্ত্য দশা উপহাস-হত।
এখন দেখুক আসি আপন জননী
তাহে যদি রোধে বারি তবে শ্রেষ্ঠ মানি
দর্শন লুটিয়া তার হরেছ দর্শন,
কোথা প্লেটো সক্রেটিস করিব দর্শন।
কোথা সে বাণীর প্রিয় পুত্র মহাশয়?
তেমন বাক্যের ছটা আর নাকি হয়।
কোথা কবি-শিরোমণি হোমর পিণ্ডার
অপূর্ব্ব লেখনী সেই ভুল নাহি যার।

বেকনসন্দর্ভ।

১১।—সত্বরতা।

মিথ্যা চালাকি যত দূর হইতে পারে কাজের ক্ষতি করিয়া থাকে। চিকিৎসকেরা যাহাকে অকালপাক বা দ্রুতপাক বলিয়া থাকে, উহাতে যেরূপ শরীর কেবল অপক্ব ধাতুতে পরিপূর্ণ হয় এবং উহা যেরূপ নানা রোগের গূঢ় বীজস্বরূপ; ইহাও কাজ কর্ম্মের পক্ষে সেইরূপ। অতএব কাজে কত সময় লাগিল, ইহা ধরিয়া চালাকির পরিমাণ বুঝিও না। কাজ কতদূর অগ্রসর হইল, ইহাই ধরিয়া চালাকি মাপিয়া লও। দেখ, যেরূপ ঘোড় দৌড় প্রভৃতিতে সুদীর্ঘ লম্ফ বা উত্তুঙ্গ বলগন বেগের কারণ হয় না; সেই রূপ কাজ কর্ম্মে লাগাপড়া হইয়া থাকিলেই উহা সত্বর নিষ্পন্ন হইবে; একেবারে অধিক কাজ লইলে সেরূপ হইবে না।

এরূপ কতকগুলি লোক আছে, তাহাদের কেবল সময়ের দিকেই নজর, কাজের দিকে তত নাই এবং শীঘ্র শীঘ্র, এমন কি অর্দ্ধ সমাপ্ত করিয়াও, কাজ সারিতে পারিলেই হইল। বোধ হয়, তাহারা মনে করে, ইহাতেই যথেষ্ট সত্বরতা প্রকাশ হয়। কিন্তু কোন বস্তুকে চাপিয়া ছোট করা ও কাটিয়া ছোট করায় অনেক ভেদ। এবং এইরূপে বারংবার এক কাজ করায় উহা কখন অগ্রসর হয়, কখন বা পাচু হটিয়া যায়; সমভাবে চলিতে পারে না। আমি একজন বিজ্ঞলোককে জানিতাম, তিনি কোন ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি কোন কাজ সারিয়া লইতে ব্যস্ত দেখিলে প্রায়ই বলিতেন "একটু স্থির হও, আমাদিগকে শীঘ্র কাজ সারিয়া ফেলিতে হইবে।"

এদিকে যথার্থ সত্বরতা বহুমূল্য বস্তু। কারণ টাকা যেরূপ পণ্য দ্রব্যের পরিমাণ, সময়ও সেইরূপ কার্য্যের পরিমাণ স্বরূপ। এবং যেখানে সত্বরতা অল্প, কোন কাজ অতিশয় চড়াদরে কিনিতে হয়। স্পার্টান্ ও স্পানিয়ার্ডরা অতি অল্প সত্বর বলিয়া বিখ্যাত, এজন্য কেহ বলিয়াছেন, "আমার মৃত্যু স্পেন হইতে আসুক," তাহা হইলে তাহার আসিতে অনেক বিলম্ব হইবে।

যখন কেহ কাজ কর্ম্মের বিষয় প্রথম কোন কিছু বলিতেছে, তখন তাহার কথা অবহিত হইয়া শুন। এবং বলিবার সময় তাহাকে বারংবার বাধা দিও না; যাহা কিছু বলিতে হয়, অগ্রে বলিয়া রাখ। কারণ যখন কোন ব্যক্তিকে তাহার নিজের পথছাড়া করা হয়, তখন সে এক পা অগ্রসর হয় ও এক পা পাচু হটিয়া আসে, তাহার সকল বিষয় শীঘ্র শীঘ্র মনে পড়ে না, শ্রোতাদিগেরও বিরক্ত ধরে। কিন্তু সে আপন পথে চলিলে প্রায় এরূপ ঘটে না। কখন কখন পাঠক অপেক্ষা ধারকও অধিক বিরক্তজনক হইয়া উঠে

অনেক স্থলে এক কথা বারংবার বলা কেবল বৃথা সময় নষ্টকরা মাত্র। কিন্তু প্রধান বিষয় বারংবার বলিয়া যেরূপ সময় লাভ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। কারণ তাহা হইলে অনেক অসঙ্গত ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় সন্দর্ভ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেনা। যেরূপ বিস্তীর্ণ জামাযোড়া দ্রুত

গমনের পক্ষে উপযোগী, অতি বিস্তৃত বাগ্‌-বিতানও সম্বরতার পক্ষে সেইরূপ জানিবে।

অবতরণিকা বিষয়ান্তরোপন্যাস অনুনয়বাক্য প্রভৃতি (যাহার প্রকৃত কার্য্যের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল বক্তার সহিতই যাহা কিছু আছে) কেবল অনর্থক সময়াতিপাত মাত্র। যদিও আপাততঃ উহা বক্তার বিনয়ফল বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু আসলে উহা তাহার অহঙ্কারবিলসিত মাত্র। এ দিকে, যখন লোকে সহজে তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিবেনা, হঠাৎ এরূপ কোন কথার উত্থাপন বিষয়ে সাবধান হইও। সে সময়ে তুমি যাহা বলিবে, তদ্বিষয়ে লোকের মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে, সুতরাং অবতরণিকারও আবশ্যক হইবে। দেখ কোন তৈল শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইলে অগ্রে উহা উষ্ণ করিয়া লইলেই সুন্দর রূপে শরীরে প্রবেশ করিতে পারে।

সুশৃঙ্খলা, সংস্থানবিভাগ ও অবয়ব পরীক্ষাই সত্বরতার জীবন। কিন্তু তোমার বিভাগ যেন অতিসূক্ষ্ম না হয়। কারণ যে একেবারেই কার্য্যের বিভাগ না করে, সে কখনই কার্য্যের ভিতর সুন্দররূপে প্রবেশ করিতে পারেনা, কিন্তু যে অতিবিভাগ করে সেও পরিষ্কার করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না।

সময় বাছিয়া লওয়াই সময় বাঁচান। এবং অকালে আরম্ভ কেবল আকাশে মুষ্টিপ্রহার মাত্র।

কাজ তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম উদ্যোগ, দ্বিতীয় বিবেচনা, তৃতীয় সম্পাদন। যদি তুমি শীঘ্র কাজ সারিতে চাও, তবে দ্বিতীয় অংশের ভার অনেকের উপর ও প্রথম এবং তৃতীয় অংশের ভার কতিপয় ব্যক্তির উপর দাও।

তুমি যে রূপে কার্য্য করিবে, অগ্রে তাহা লিখিয়া রাখ। তাহা হইলেই প্রক্রমের স্থিরতা হইবে ও শীঘ্র শীঘ্র কাজ সমাধা হইবে। যদিও লিখিত ক্রম একেবারেই পরিত্যক্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই পরিত্যাগই তোমাকে আসলপথ দেখাইয়া দিবে। কিন্তু ক্রমের স্থিরতা না থাকিলে সেরূপ হইবে না। সুতরাং অস্থিরতা অপেক্ষা এরূপ অভাব পক্ষও অনেক ভাল। দেখ ধূলি রাশির অপেক্ষা ভস্ম রাশির উৎপাদকতা অধিক।

পিঞ্জর-বদ্ধ পক্ষীর আক্ষেপ।

(জাহ্নবী দেবী-বিরচিত।)

ছেড়ে দাও হে মানব ধরি তব পায়।
রেখনা রেখনা আর ধরিয়ে আমায়॥
দারুণ যাতনা প্রাণে সহা নাহি যায়।
দেখে এ যাতনা তব দয়া নাহি হয়?
দেবে বল কত দিন এ যাতনা আর।
খুলে দাও খুলে দাও পিঞ্জরের দ্বার॥
ছেড়ে দাও চলে যাই আপনার ঘরে।
জুড়াব তাপিত প্রাণ পরিজনে হেরে॥
কোন দোষে দুষি নই মোরা বুনো পাখী।
ফল ফুল খাই মোরা বন মাঝে থাকি॥
সন্তানের প্রতি স্নেহ তোমার যেমন।
আমার ছেলের প্রতি আমারো তেমন॥
তাহাতে আমার ছেলে অত্যন্ত বালক॥
দেখিয়ে এসেছি তার উঠেনি পালক।
না জানি সেখানে প্রিয়ে কেমন করিয়ে।
রহিয়াছ একাকিনী শাবকে লইয়ে॥
ভাবিতেছ প্রিয়তমে তুমি নিরন্তর।
নাহি জানি হইয়াছ কতই কাতর॥
কোমল নয়নে কত পড়িতেছে জল।
আমা হতে আরো তুমি হয়েছ বিকল॥
কত যে তোমার মনে হতেছে যাতনা।
হায় রে কে আছে আর করিবে সান্ত্বনা॥
চরিবারে দূর বনে যাইবে যখন।
কার কাছে সোঁপে তুমি যাবে শিশুগণ॥
ছাড়রে মানব বেঁধে রেখনাক আর!
খুলে দাও খুলে দাও পিঞ্জরের দ্বার!

কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট ১৪৯ নং নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।

অবোধ-বন্ধু

"করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

৩য় ভাগ] আশ্বিন,—১২৭৬। [ষষ্ঠ সংখ্যা

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

অতঃপর নেপোলিয়নের যে সকল লীলার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে, তাহার অধিকাংশ যুদ্ধের ব্যাপারে পরিপূর্ণ। পীড্‌মণ্ট্ দখল করিবার পর দেড় বৎসর কাল ধরিয়া ক্রমাগত তিনি অষ্ট্রিয়ার ইটালি-স্থিত রাজত্ব টুকু কাড়িয়া লইবার চেষ্টা পান; অষ্ট্রিয়ার রাজাও সাতিশয় অধ্যবসায় সহকারে তাহা রক্ষা করিতে উদ্যোগ ও যত্নের ক্রুটি করেন নাই। তিনি বনিদি বংশের রাজা ছিলেন, লোকবল ধনবল তাঁহার অপর্য্যাপ্ত ছিল; তাঁহার রাজকীয় ক্ষমতা জব্দ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত পার্লেমেণ্ট বা প্রতিনিধি-সমাজ কিছুই ছিল না, তাঁহাকে আপন রাজত্ব মধ্যে কাহাকেও প্রায় ভয় করিয়া চলিতে হইত না, যে সকল মন্ত্রীর পরামর্শ লইয়া তিনি নিজ সাম্রাজ্যের গুরুতর কার্য্য সমস্ত নির্ব্বাহ করিতেন, এবং যাহা 'অলিক্ কাউন্‌সিল' নামে বিখ্যাত হইয়া, অতি শক্ত অতি নির্দ্দয় এবং অতি পুরাতন নানা প্রকার মতের অনুযায়ী আইন সকল প্রচলিত করিতে ব্যস্ত থাকিত, সেই অলিক্ কাউন্‌সিলের সভ্যেরা সকলেই অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের মুখ চাহিয়া থাকিতেন। সুতরাং আর কাহারো কথা শুনিয়া যাঁহাকে কাজ করিতে হয়, তিনি যেমন হাত-পা-বাঁধার মত থাকেন, অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের তাদৃশ অসুবিধা কদাচ ভোগ করিতে হইত না। তিনি যথা ইচ্ছা সৈন্য প্রেরণ করিতেন, যত খুসী যোদ্ধা বরাদ্দ করিতে পারিতেন, যে প্রদেশের লোককে খুসী সেনার মধ্যে ভর্ত্তি করিয়া দিতেন, এবং যত টাকা দরকার প্রায় তদুপযুক্ত কর আদায় করিতেন। কেহই তাঁহার ইচ্ছার প্রতি-

বাদ করিত না, এবং কেহই তখন একটি কথাও বলিত না। সুতরাং ইচ্ছানুসারী নরপতি বলিয়া, যুদ্ধ চালাইবার বিষয়ে তাঁহার এক বিজাতীয় সৌকর্য্য বিদ্যমান ছিল।

বিশেষত ইটালির রাজত্ব টুকুর উপর তাঁহার একটা অসাধারণ মমতা ছিল। এই রাজত্বের চতুঃসীমা যথা, পশ্চিমে পীড্‌মণ্ডের পূর্ব্বসীমাভূত এক সামান্য নদী, দক্ষিণে পো নামক সুপ্রসিদ্ধ প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ নদ, পূর্ব্বে আ্যাডিজ্ নদী আর উত্তরে আল্‌প্‌স পর্ব্বতশ্রেণী। ঐ আল্‌প্‌স্ হইতে ভূরি ভূরি গিরিনদী দক্ষিণ-বাহিনী প্রবাহিত হইয়া মিলানীজ্ প্রদেশকে পরম রমণীয় ফলপুষ্পশস্যসম্পন্ন প্রভূতবারিলালিত এক উদ্যানের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে। মিলানীজের মত ফলবতী ভূমি পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এমন সুশোভন জলবায়ু, এমন মনোরম্য শীতাতপ অতি বিরল; কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতেই আকাশ অতি উজ্জ্বল গাঢ় নয়নতৃপ্তিকর এক নীলবর্ণে নিরন্তর সুশোভিত; সূর্য্যের আতপ না অত্যন্ত নিস্তেজ, না অত্যন্ত প্রখর, কিন্তু পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম এবং স্বাস্থ্যবিধায়ক; অগণিত ফল ফুলের আমোদে গন্ধবহ দিবানিশি পরিপূর্ণ; মাঠ পুষ্করিণী নদী পর্ব্বত সকলি ঈদৃশ এক চমৎকার সুরম্য ভঙ্গিতে অবস্থিত রহিয়াছে যে, চিত্ত যেন সর্ব্বদাই প্রসন্ন থাকে, জীবন যেন অভিনব মধুরতা ধারণ করে, রক্তের তেজ যেন কখন হীন হয় না, সর্ব্বদাই আমোদ উল্লাস প্রীতি তৃপ্তির নিমিত্ত হৃদয় যেন মুখিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত তথাকার লোকেও কৃষিপশুপাল্য বিষয়ে অতীব সুনিপুণ; প্রকৃতি দয়া করিয়া তাহাদিগের জন্মভূমির উপর যে সকল অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছেন, তাহারা উহার দর বুঝে এবং কখন নাহক নষ্ট করে না, বরং মানুষের যত্নে বসুমতীর সানুগ্রহভাবের যত উন্নতি হইতে পারে, মেহনতের জোরে তত দূরই করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা শরদের শস্যের নিমিত্ত গ্রীষ্মের জলধরের মুখ চাহিয়া থাকে না, আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে যে জলরাশি তাহাদিগের ক্ষেত্র সমূহের উপর ফলশালিতা বিতরণ করিয়াছে, এমনি পরিপাটী পূর্ব্বক সেই জল টুকু খিতাইয়া গুছাইয়া রাখে, এত বাঁধ এত ভেড়ী এত ছোট ছোট খাল এত পুষ্করিণীর সরবরাহ তাহারা করিয়া রাখিয়াছে, যে নদীমাতৃক দেশকে কিরূপে অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপাদক করিতে হয়, তাহারা সে বিষয়ের অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া আছে। নদীর জলে চাস করিতে গেলে কিরূপে কাজ চালাইতে হয়, তাহা শিখিতে হইলে মিলানীজে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

এমন লোভনীয় স্থান দখলে থাকিলে কোন রাজারই বা বাসনা না হয় যে, তাহা প্রাণপণ যত্নে রক্ষা করি। নেপোলিয়নেরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল যে, সেই প্রদেশ অপহরণ না করিলে আর অষ্ট্রিয়াকে বিধি মতে কাবু করা হইবেক

না। এই অভিপ্রায়ে তিনি পীড্‌মণ্ট-রাজের সহিত সন্ধি-বন্ধন-পত্র সম্পাদন কালে এক সর্ত্ত লিখিয়া লন যে,ভালেন্‌জা নামে যে এক নগর পো-নদীর তটে অবস্থিত আছে, এবং মীলানীজের প্রধান নগর মিলানে যাইবার সর্ব্বপ্রথম পথ যে নগর হইয়া গিয়াছে, সেই ভালেন্‌জা নগর তাঁহার হস্তে সমর্পণ করা হয়। এই ভালেন্‌জা পো-র দক্ষিণ তটে অবস্থাপিত, এবং তথায় ঐ নদী পার হইবার এক সুপ্রসিদ্ধ খেয়াঘাটও বিদ্যমান ছিল। নেপোলিয়ন পীড্‌মণ্টের ব্যাপার সমাধা করিবার পরই দু এক দল সেনা এই ভাবে ভালেন্‌জা অভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন যে, যেন ঐ স্থানই তাঁহার প্রকৃত লক্ষ্য, যেন সেই পথেই পো পার হইয়া মিলানের প্রতি ধাবমান হইবেন। কিন্তু ইটী ছলনা মাত্র এবং প্রাচীন বোয়ালোর বুদ্ধি এই সামান্য ছলনা দ্বারাই বিভ্রান্ত হইয়া গেল। ভালেন্‌জা পার হইয়া যে পথে পড়া যায়, বোয়ালো তাহার রক্ষাতেই শশব্যস্ত রহিলেন, এবং তদ্দ্বারাই মিলানের উপদ্রব নিবারণ হইল জ্ঞান করিলেন।

এদিকে নেপোলিয়ন ভালেন্‌জার খেয়াঘাটে পো পার হইবার নামও করিলেন না, স্বয়ং হাজার তিনেক যোদ্ধা সঙ্গে লইয়া পো-র দক্ষিণ তটের পথ দিয়া বরাবর নামিয়া গেলেন এবং দেড়দিনের মধ্যে বাইশ ক্রোশ রাস্তা উত্তীর্ণ হইয়া, নদীর দক্ষিণ তীরে সংস্থাপিত প্লাসেন্‌জা নামক দ্বিতীয় পারঘাটে দাখিল হইলেন। পথি মধ্যে যে খানে ডিঙ্গী বা বজ্‌রার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সব বেগার ধরিয়া আনেন। সেই সমস্ত নৌকা সহযোগে ভাসন্ত সেতু নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সত্বর নদীর বাম পারে অবতীর্ণ হইলেন, তখন ভালেন্‌জার দিকে যে সকল সৈন্যকে মিথ্যা ভুবকী দেখাইবার জন্যে পাঠান হয়, তাহাদিগকে শীঘ্র প্লাসেন্‌জায় পঁহুছিতে হুকুম হইল। তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া অবলীলাক্রমে নদী পার হইল, তাহাদিগের যে সকল সঙ্গী অগ্রে পার হইয়াছিল, উহারা বন্দুক সঙ্গিন হস্তে কাতার দিয়া বাম তটে দণ্ডায়মান থাকাতে নেপোলিয়নের সুবিপুল সৈন্যদল মিলানীজ জনপদের বক্ষস্থলে অকুতোভয়ে আরোহণ করিল। যে এক দল বিপক্ষ, নেপোলিয়নের তিন হাজার সৈন্যের নদীতটবর্ত্তী পথ দিয়া অবতরণ কালে, সঙ্গে সঙ্গে বামতট দিয়া চলিয়া আসিয়াছিল, তাহারা পূর্ব্বোক্ত তিন হাজারের পার গমন কালে কিঞ্চিৎ প্রতিবাদের উদ্যোগ করে বটে, কিন্তু ফরাশি সেনার দুর্দ্ধর্ষ সাহস দেখিয়া বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই, বরং অতিসামান্য রূপ দাঙ্গা মাত্র করিয়া পিছাইয়া পড়িল এবং সমগ্র ফরাশি সেনাকে নদী পার অক্লেশে হইতে দিল।

এই যৎসামান্য বুদ্ধিকৌশল দ্বারা ফরাশিদিগের এক কালে তিন চারি বাধার মস্তকে পদার্পণ করা হইল। প্রথমত নির্ব্বিরোধে পো-নদী পার হওয়া হইল; যদি ইহার পরিবর্ত্তে তাহার ভালেন্‌জা শহরেই পার হইবার চেষ্টা

করিত, তাহা হইলে সমগ্র অষ্ট্রিয় সেনার সম্মুখ দিয়া প্রকাণ্ড এক প্রবাহ উত্তীর্ণ হইবার দুরতিক্রম অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, এবং তদ্দ্বারা বিলক্ষণ নেস্তনাবুদ হইবার বিশিষ্ট সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠিত। দ্বিতীয়ত, মিলানীজ প্রদেশের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া টিসীনো নাম্নী আর এক যে নদী দক্ষিণবাহিনী হইয়া পো-তে অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহার অবস্থিতি পূর্ব্বোক্ত ভালেনৃজা ও প্লাসেনৃজার মধ্য স্থলে, এবং ভালেনৃজাতে পো পার হইয়া মিলানে যাইতে হইলে যে টিসীনো নদীকে পথিমধ্যে স্বতন্ত্র পার হইবার আবশ্যকতা থাকিত, নেপোলিয়ন্ সেই টিসীনোর মোহানা ছাড়াইয়া পো পার হওয়াতে টিসীনো অতিক্রম করিবার যন্ত্রণা আর ভোগ করিতে হইবেক না। তৃতীয়ত বোয়ালোকে পিছনে রাখিয়া মিলান শহরের পথের উপর দাখিল হওয়াতে, তিনি কোন্ দিক্ আটক করিবেন, এই ভাবনাতে তাঁহাকে পাতিত করিয়া তাঁহার বুদ্ধির ব্যামোহ উৎপাদন করিয়া দিলেন।

প্লাসেনৃজা পার হইয়াই মিলানে যাইবার অপর এক সদর রাস্তায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ইদানীন্তন যুদ্ধকার্য্য সমস্ত যেরূপ জটিল, কামান গোলা ইত্যাদি নানাবিধ ভারি ভারি উপকরণ ভাবে যেরূপ আক্রান্ত, তাহাতে বাঁধা রাস্তা না পাইলে সেনার চলা দুষ্কর হয়। একারণ দেশের রাস্তা ঘাট কোন দিকে, কি বৃত্তান্ত, তাহার সহিত সেনা চালনার বিশেষ সম্পর্ক থাকে, নতুবা যদি আচোট মাটির মাঠের উপর দিয়া সৈন্য লইয়া যাইবার সুবিধা থাকিত, তাহা হইলে বাঁধা রাস্তা অন্বেষণের এত প্রয়োজন হইত না, সুতরাং যোদ্ধাদিগের ইতস্তত গতিবিধির ব্যাপার পরিষ্কাররূপে বুঝিতে গেলে এমন এক খানি মানচিত্র পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি করা আবশ্যক হয়, যাহাতে রাস্তা ঘাট প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তান্তেরও নিরূপণ থাকে। বাঙ্গালাতে সেরূপ মানচিত্র দূরে থাকুক, সহজ প্রকারের কিঞ্চিৎ প্রসারিত মানচিত্রের পর্য্যন্ত অসদ্ভাব রহিয়াছে, তন্নিমিত্ত ইয়োরোপীয় লড়াই হঙ্গামের বিবরণ বলিতে গেলে পদে পদে সদর রাস্তা সকলের গতিস্থিতি প্রভৃতির কথা আনয়ন করিতে হয় এবং মানচিত্র নির্ম্মাতার ভার গ্রন্থকার আপন স্কন্ধে বহন করেন। আমরাও তদর্থে সঙ্কুচিত না হইয়া বরং গ্রন্থের বর্ণনার পরিষ্কারভাবের প্রতি দৃষ্টি দান পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে সেই সেই দেশের ভূমি বৃত্তান্ত বিবৃত করিবার উদ্দেশে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিব।

নেপোলিয়ন প্লাসেনৃজার সম্মুখবর্ত্তী সদর রাস্তায় সৈন্য অবতারিত করিয়াই শুনিলেন যে, বোয়ালোর যে সেনাদল তাঁহার তদারকের নিমিত্ত নদীর আড়পারে নামিয়া আসিয়াছিল, তাহারা হটিয়া ফম্বিয়ো নামক এক গ্রামের পার্শ্বে শিবির সংস্থাপন করিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে কালবিলম্ব করিলেন না, কারণ তিনি জানি-

তেন, যদি বোয়ালো নেপোলিয়নের নদী উত্তীর্ণ বার্ত্তা পাইয়া সমগ্র নিজ দল সমভিব্যাহারে তাঁহার সম্মুখে আগত হন, তাহা হইলে মহড়াতে শত্রু আর পিছনে দুস্তর নদী, এই সঙ্কটে পতিত হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ যদি সংশয়িত হয়, তবে তাঁহার অখণ্ড সেনা এককালে উচ্ছন্ন যাইবে। অতএব বোয়ালো আসিয়া যোগ দিবার অগ্রেই ফম্বিয়ো গ্রামে অবস্থিত বিপক্ষ দলকে ঘোরতর রূপে আক্রমণ করিলেন। তাহারা পরাভব হইল; পরে মিলানের দিকে পলায়ন না করিয়া পূর্ব্বমুখ করিয়া আড্ডা নামক আর এক দক্ষিণবাহিনী নদী পার হইবার চেষ্টায় পিজিঘিটোন্ নামক পারঘাটে উত্তীর্ণ হইল এবং তথাকার কেল্লার ভিতর যাইয়া আত্মরক্ষা করিল।

এই ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই বোয়ালো নেপোলিয়নের অসমসাহসিক চতুরতার খবর পাইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দেখা দিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার সৈন্যসংখ্যার অনেক লাঘব হইয়াছিল। ফম্বিয়ো গ্রামে যে দল পরাভব হয়, তাহাদের সহিত ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল, তদ্ব্যতীত মিলান শহরের রক্ষণাবেক্ষণার্থে আরো দুই দল সৈন্য স্বতন্ত্র করিয়া পাঠাইয়া দেওয়াতে নিজে সাতিশয় হীনবল হইয়া পড়েন, ফলে তাঁহার সঙ্গে বার হাজার পদাতি আর চারি হাজার সোয়ার বই লোক ছিল না, সুতরাং জয়ের উল্লাসে উল্লাসিত ফরাশি সেনার সমক্ষে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তিনিও পরাভব হইয়া নেপোলিয়নের আগে আগে হাঁটিতে লাগিলেন।

বোয়ালো যে পথে হাঁটিতে লাগিলেন, উহা ফম্বিয়োর সন্নিধান হইতে উত্তর-পূর্ব্ব মুখে প্রথমত আড্ডা নদী তটে অবস্থিত লোডী নামক এক ক্ষুদ্র শহরে পঁহুছিয়াছে। এই আড্ডা নদী মিলানীজ প্রদেশের আর এক প্রকাণ্ড খালের ন্যায় আল্প্স হইতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পো-র ভিতরে নিজ জলরাশি ঢালিয়া দেয়। আড্ডার এপার ওপার হইবার তরে তিন স্থানে তিন খেয়াঘাটা আছে। সর্ব্বের উত্তরবর্ত্তী ঘাটটী কাসানো নামক শহরে, তাহার দক্ষিণে লোডীর ঘাট এবং তথায় দৃঢ়নির্ম্মাণ এক কাষ্ঠসেতু বিদ্যমান আছে; আর সর্ব্বের দক্ষিণে পিজিঘিটোন্, যথায় ইতিপূর্ব্বে ফম্বিয়োর পলাতকেরা গিয়া লুকাইয়াছে। বোয়ালো যে দুই সেনাদলকে মিলানের রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধান করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন, কথা ছিল যে তাহারা মিলানের কেল্লা মধ্যে আবশ্যক মত ফৌজ রাখিয়া আপনারা কাসানো দ্বারে আড্ডা পার হইবেক এবং পরে আড্ডার বাম তটে যে প্রকাণ্ড বাঁধ আছে এবং যে বাঁধ ধরিয়া চলিয়া গেলে প্রথমত ব্রেসিয়া নগরে উপনীত হওয়া যায়, পরে ইটালি হইতে অষ্ট্রিয়া যাইবার দিগ্‌দিগন্তবিসারী সুদীর্ঘ রাজপথে গিয়া পড়িতে হয়, পূর্ব্বোক্ত পৃথককৃত দুই সেনাদল দুর্য্যোগ দেখিলে সেই দিকেরই শরণাপন্ন হইবেন। সুতরাং

যখন কর্ষিয়ো হইতে অষ্ট্রিয় যোদ্ধাদিগকে অপসারিত করা হয়, তখন নেপোলিয়নের সম্মুখে তিন জায়গায় তিন দল শত্রু আডডা নদ'র ভিন্ন ভিন্ন স্থলে সজ্জিত ছিল; তন্মধ্যে এক দল অর্থাৎ বোয়ালোর অধীনস্থ যোদ্ধারা ঠিক মিলানে যাইবার পথেই স্থান গ্রহণ করিয়া তাঁহার গন্তব্য স্থান আবরণ করিয়াছিল।

কিন্তু নেপোলিয়ন বোয়ালোর মতি গতি এই অল্পকালের পরিচয়েই বুঝিয়া লয়েন। অতএব তাঁহার এক প্রবল বাসনা মনোমধ্যে উদিত হইল যে, এখনও তিন দল শত্রুই আড্ডার ডানি তীরে রহিয়াছে, যদি তিনি স্বয়ং তাহাদের অগ্রে বাম পারে যাইতে পারেন, তাহা হইলে প্রত্যেক দলেরই বাড়ী যাইবার আশা ঘুচাইয়া দিবেন এবং ক্রমান্বয়ে আক্রমণ পূর্ব্বক বোয়ালোর প্রকাণ্ড সেনাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া নির্ব্বিঘ্নে মিলান গ্রহণ এবং ইটালির উত্তরাঞ্চল অপহরণ করিতে পারিবেন। এই উদ্দেশে বোয়ালোর পশ্চাৎ এ রূপ বেগে ধাবমান হইলেন যে, লোডী শহরে প্রায় অষ্ট্রিয় সৈন্যদিগের এক সঙ্গেই গিয়া পঁহুছিলেন। বোয়ালোর সেনার পশ্চাদ্ভাগ আর নেপোলিয়নের সেনার অগ্রভাগ, পুরপ্রবেশকালে এ উভয়ের এক প্রকার ঠকাঠকি হইয়া গেল, অষ্ট্রিয়েরা শহরে গিয়া কটক বন্ধ করিতে পারিল না, ফরাশিরা সেই কোলাহল নিবৃত্ত না হইতে হইতেই গোলমাল করিয়া শহরে সেঁধিয়া গেল, অষ্ট্রিয়েরা সত্বর কাষ্ঠসেতু পার হইয়া আড্ডার বাম পারে দাখিল হইল এবং তথায় পরিপাটী রূপে কুড়িটা কামান সাঁকোমুখ করিয়া এরূপ ভাবে বসাইয়া দিল যে, রাশি রাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলির বৃষ্টি যেন সমস্ত সেতু সেঁটাইতে লাগিল। আর সেতুর সম্মুখেই একটী ক্ষুদ্র উচ্চ স্থান ছিল, তাহার ও পাসে অষ্ট্রিয় সেনারা গিয়া উহারি আড়ালে বসিয়া রহিল; নেপোলিয়ন নিজ সৈন্য সমেত লোডী শহর দখল করিয়া লইলেন।

শহরে পঁহুছিবামাত্র তিনি আপন ফৌজকে নদীতীরবর্ত্তী অট্টালিকা সমূহের আড়ালে সারিবন্দি দাঁড় করাইয়া দিলেন, তদ্দ্বারা উল্লিখিত কুড়ি কামানের আগুন আসিয়া তাহাদের কিছুই করিতে পারিল না। পরে অষ্ট্রিয়েরা এখনও সাঁকো ভাঙ্গিয়া দেয় নাই দেখিয়া সাঁকোর নিম্নে আপনার পারে দু চারি কামান এমন জায়গায় বসাইয়া দিলেন যে, ওপার হইতে বিপক্ষের কেহ সাঁকো ভাঙ্গিবার চেষ্টা না করিতে পারে। তদনন্তর, লোডীর উজোন্ এক স্থানে হাঁটিয়া পার হইবার মত অল্প জল আছে, শুনিয়া অশ্বারোহি দলকে চুপে চুপে সেই স্থান দিয়া পারে যাইয়া অষ্ট্রিয় সেনার এক পার্শ্বে আবির্ভাব হইতে হুকুম দিলেন। এই সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইল যে, সেই বিশ কামানের মুখে সাঁকো পার হওয়াই শ্রেয়, ইহাতে যত সৈন্য মারা যায়, যাউক।

তিনি ক্রমাগত সারি সারি ফৌজ অট্টালিকার আড়ালে দাঁড় করাইয়া

দিলেন, তাহারা এক সুদীর্ঘ স্তম্ভের ন্যায় পাশাপাশি তিন চারি জন করিয়া অগ্র-পশ্চাদ্ভাবে প্রসারিত হইয়া রহিল। পরে উঁহাদিগের সাহস উত্তেজনার্থ স্বয়ং অশ্বা-রোহণ পূর্ব্বক মুহুর্মুহু অশেষবিধ প্রবোধ-বাক্য বলিয়া, পরিশেষে অবিচলিত অক্ষোভ্য যুদ্ধবাসনাতে তাবৎ ব্যক্তিকে নিমগ্ন করিয়া দিলেন। তাহারা যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রে সম্মু-খের দিকে বামভাগে সেই দুরন্ত অগ্নিবৃষ্টি-ময় সেতু দৃষ্ট হইতেছিল। যখন দেখিলেন, উপযুক্তমত অকুতোভয়তা তাহাদের হৃদয়ে সঞ্চার হইয়াছে, তখন প্রথমত সেনা-স্তম্ভকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে আজ্ঞা দিয়া স্তম্ভের মুখ আর সেতুর মুখ এক হইবা মাত্র উচ্চৈঃস্বরে এই হুকুম উচ্চারণ করি-লেন "বাঁয়ে।" এই "বাঁয়ে" রব উদিত হইবা মাত্র, যেন মন্ত্র বলে সঞ্চালিত এক প্রকাণ্ড প্রাণীর ন্যায়, সেই সতেজ সজীব সাহসভরে পরিপূর্ণ অনিবার্য্যবেগ সিপা-হীর দল একেবারে দৌড়কুচ ধরিয়া সেতুর গলির ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া দশ বার পা যাইবা মাত্র সম্মুখের যোদ্ধারা কাস্তের মুখে ধান্য রাশির ন্যায়, গড়া গড়া শুইয়া গেল; পশ্চাদ্বর্ত্তীরা প্রথমত স্তম্ভিত এবং পরে হঠিবার নিমিত্ত উদ্যত হইল। তখন নেপোলিয়ন নিজে পতাকা গ্রহণ পূর্ব্বক সম্মুখে গিয়া দাঁড়াই-লেন, তাঁহার দৃষ্টান্তে লানে নামক তাঁহার প্রিয়পাত্র এক কাপ্তেন তাঁহার সহচর হইলেন। বিপক্ষের কামান দাগিবার পর পুনর্ব্বার বারুদ-গুলি ভরিতে যতটুকু কাল ক্ষয় হয়, ততক্ষণ নিরুপদ্রব পাইয়া সৈন্যেরা সেতুপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। বার দুই সেই অতিসংক্ষিপ্ত অবসরের সুযোগ লইয়া এবং মহড়ার বীর-দিগকে বলিদান দিয়া পরিশেষে নেপো-লিয়ন ও লানে সর্ব্বাগ্রে সেতুর অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহার অব্যবহিত পশ্চাদ্ভাগে ব্যাঘ্রের ন্যায় গিয়া তাঁহার সিপাহীরা, বিপক্ষের কামান যাহারা দাগিতে ছিল, তাহাদিগকে তিলার্দ্ধ কাল মধ্যে সঙ্গিন সাৎ করিয়া রজ্জুৎঘর ঘুচা-ইয়া দিল। তখন তাহাদিগের জয় যাত্রার বাধা দিতে পারে, ভূভারতে এতাদৃশ ক্ষমতা দুর্লভ। তখন তাহারা সবেগে সেই পূর্ব্বোক্ত উচ্চস্থান টুকু পার হইয়া, দুর্নিবার বারিরাশির ন্যায় নিম্নবর্ত্তী বিপক্ষ দলের উপর নিপতিত হইয়া ভীত বিস্মিত চকিত অষ্ট্রিয়দিগকে পশুহত্যার মত বধ করিতে লাগিল; সেই হতবুদ্ধি সৈন্যদলের যেন জ্ঞান হইল যে, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারেন না, গোলা গুলি গায়ে ফুটে না, এমন কোন অলৌকিক শরীর সম্পন্ন দৈত্য দানবের দঙ্গল আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে, তাহারা আতঙ্কে ও বিস্ময়ে প্রায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল, সুতরাং ঈদৃশ নিরুৎসাহিত সৈন্যের বিপক্ষ হস্তে যাদৃশী দশা ঘটিবার সম্ভা-বনা, তাহাই অতি শীঘ্র ঘটিয়া উঠিল। সেই সময়ে আবার নেপোলিয়নের প্রেরিত অশ্বারোহি দল নদী পার হইয়া আসিয়া তাহাদিগের দক্ষিণ পার্শ্বের উপর চড়াও করাতে পলায়ন বা শত্রু হস্তে

আত্ম সমর্পণ ব্যতীত উঁহাদিগের উপায়ান্তর রহিল না। ফলতঃ সেতু পার হইবার পর, অতি সংক্ষেপ কাল মধ্যে বোয়ালোর সৈন্য বিধ্বস্তবিস্তত এবং অগণিত অষ্ট্রিয় যোদ্ধা বিপক্ষহস্তগত হইল।

লোডি। সেতু পার হইতে নেপোলিয়নের দুই শত সৈনিক ক্ষয় হয়; আর অষ্ট্রিয়দিগের পনর শ মারা যায়, দু হাজার গ্রেফ্‌তার হয়, তদ্ব্যতীত সমস্ত কামান ইত্যাদি সরঞ্জাম এবং বহুসংখ্যক নিশান শত্রুকে দিতে হয়।

সেই পূর্ব্বোক্ত গ্রেপ্তার-করা সৈন্যবর্গের মধ্যে হাঙ্গারি নিবাসী একজন প্রাচীন কাপ্তেন ছিল। যুদ্ধের পর রাত্রে যখন মাঠের মধ্যে বিনা পটমণ্ডপে অগ্নি জ্বালিয়া শীত কাটান হইতেছিল, নেপোলিয়ন পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত ইতস্তত বিচরণ করিতেছিলেন; সেই বৃদ্ধ হাঙ্গেরিয়ের সহিত দেখা হওয়াতে নেপোলিয়ন কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন তুমি কি বল, আজি কালি লড়াই চলিতেছে কিরূপ?" সে ব্যক্তি নেপোলিয়নকে কখন চাক্ষুষ দেখে নাই, সুতরাং চিনিতে পারিল না; আর সে ব্যক্তির নিয়মমত যুদ্ধ করা চিরকাল অভ্যাস ছিল; তাহার সিদ্ধান্ত স্থির ছিল যে, যুদ্ধের গ্রন্থমধ্যে যে সমস্ত নিয়ম নিবদ্ধ আছে, কার্য্যের সময় তদ্বিষয়ের এক চুল ব্যতিক্রম করা মূর্খতা ও অনভিজ্ঞতার চিহ্ন; যে সেনাপতি নিয়মের উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক জয় লাভও করেন, তাঁহাকে প্রশংসা করিতে নাই; বরং নিয়ম মতে হারিয়া যাওয়াও গৌরবের বিষয়। অথচ নেপোলিয়নের তাবৎ জয়লাভ, গ্রন্থে উল্লিখিত যুদ্ধের কায়দা সকল অমান্য করিয়াই সংঘটিত হইয়াছে। তিনি বিপক্ষের সমক্ষে নদী পার হন, তিনি বিনা সরঞ্জামে পাহাড়ে উঠিয়া শত্রুকে আক্রমণ করেন, ফলতঃ তাঁহার বিমল বুদ্ধি কার্য্যসিদ্ধির যে উপায়কে সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় বলিয়া দেখাইয়া দেয়, তিনি, বহি মাফিক চলা হইতেছে কি না, তাহা একবারও না ভাবিয়া সেই উপায়েরই অনুবর্ত্তী হয়েন। একারণ উল্লিখিত হাঙ্গেরিয় কাপ্তেন নেপোলিয়নকে অর্ব্বাচীন মূর্খ কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত নবীন যোদ্ধা বলিয়া বড়ই অবজ্ঞা করিত। অতএব নেপোলিয়নের পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর করিল "লড়ায়ের হিসাব ক্রমে বড়ই মন্দ হইতেছে, সকলই আক্কেলের বহির্ভূত। কোথাকার এক অর্ব্বাচীন সেনাপতির হাতে পড়িয়া আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত; সে কখন আমাদের সামনে থাকে, কখন আমাদের পিছনে যায়, আবার পর দিনই আমাদের পার্শ্বে দেখা দেয়; আমরা কোন দিক থেকে যে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব, বুঝিয়া উঠা ভার। ফলতঃ আমার ত আর এ রকম লড়াই বরদাস্ত হয় না; ইহাতে না আছে হিসাব, না আছে কায়দা, সকলি গোলমাল।"

লোডীর ব্যাপারের বার্ত্তা পাইবামাত্র মিলান হইতে অপসৃত হওয়াই তথাকার অষ্ট্রিয় শাসনকর্ত্তার শ্রেয়ঃ কল্প বোধ

হইল। বিদায় হইবার সময়, এমন সুন্দর আধিপত্য ত্যাগ করিতে হইল, বলিয়া তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইল। তিনি বহির্গত হইবার পরই ফরাশি সৈন্য পুরমধ্যে প্রবেশ করিল। পুরবাসীদিগের মধ্যে যত গণনীয় বর্দ্ধিষ্ণু ও নব্য সম্প্রদায় ছিলেন, ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের অনুরূপভাবে তাঁহারা সকলেই পরিপূর্ণ ছিলেন, তাঁহাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, জন্মভূমিতে স্বাধীনতা বৃক্ষ রোপণ করিবেন, কিন্তু অষ্ট্রিয়ার কঠিন শাসনের ভয়ে তাঁহারা এত দিন মুখ ফুটিতে পারেন নাই, এখন ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লব সংক্রান্ত প্রধান সেনাপতি নেপোলিয়নকে অষ্ট্রিয়ার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের মনে চিরজাগরূক স্বাতন্ত্র্য বাসনা প্রশ্রয় পাইল, তাঁহারা ভাবিলেন যে, নেপোলিয়নের আশ্রিত হইয়া আপনাদিগের সমীহিত সিদ্ধ করিবেন। তাঁহারা তদুপযোগী তাবৎ অনুষ্ঠান শেষ করিলেন। ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রথমারম্ভ সময়ে উহার সপক্ষ লোকে পরস্পর চিনিবার নিমিত্ত এক চিহ্ন বাহির করেন, সাদা, লাল ও সবুজ, এই তিন একত্র করিয়া উহাকেই সেই চিহ্ন স্বরূপ স্থির করা হয়। তাহারা টুপিতে ঐ তিন রঙের ফিতার থোপ্না পরিত, লড়ায়ের পতাকাতে ঐ তিন রঙ চিত্র করিত, এবং সর্ব্ব-প্রকারে ঐ তিন রঙকেই স্বসম্প্রদায়ের অসন্দিগ্ধ নিদর্শন স্বরূপ করিয়া তুলিয়া ছিল। সংপ্রতি মিলানের স্বাতন্ত্র্যবৎসল দেশহিতৈষী দল সেই তিন রঙ পরিগৃহীত করিয়া নেপোলিয়নের অভ্যর্থনা করিল। তিনি বিজয়োদ্ধত নিজ সেনা সম্বলিত হইয়া মিলান শহরে মহা সমারোহে প্রবেশ করিলেন।

১৭৯৬ খৃ অব্দের ১৫ই মে তারিখে অর্থাৎ স্বয়ং ইটালিতে আসিবার এক মাস মধ্যে নেপোলিয়ন মিলান পঁহুছেন। তিনি স্বাধীনতালিপ্সু পুরবাসীদিগকে কোন আশাভরসা প্রদান করিলেন না, কেবল আপনার সৈন্যের প্রয়োজনোপযোগী খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদির সরবরাহের নিমিত্ত উহাদিগের উপর কর সংস্থাপন করিলেন, এবং এ জন্য উহারা না চটিয়া যায়, তদর্থে গুটিকতক মধুময় মৌখিক উপদেশ প্রদান দ্বারা উহাদিগকে বাধ্য করিয়া রাখিলেন। তিনি কহিলেন, যাবৎ স্বদেশকে বৈদেশিকদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত না হয়, যাবৎ অষ্ট্রিয় যোদ্ধাদিগের সঙ্গিনের সামনে দাঁড়াইতে পারে এতাদৃশ সিপাহী দল ইটালিয়েরা স্বজাতি হইতে যোগাড় করিতে না পারে, তাবৎ স্বাধীনতার নিমিত্ত মত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, কারণ স্বাধীনতার প্রধান নির্ভর স্বদেশীয় ফৌজের উপর। ইহারি অসদ্ভাব বশত ইটালিকে চিরকাল উত্তর দেশের লোকদিগের নিকট নির্দয় দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া আসিতে হইতেছে, এবং অষ্ট্রিয়ার নিকট ইটালিয় জাতির দাসত্ব নির্মূল হয় নাই; অষ্ট্রিয় পতাকাকে অ্যাড্ডা নদীর আড় পারে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এখনও তথায় উহা বিরাজ করিতেছে, অতএব

যাবৎ ইটালির ত্রিসীমা হইতে উহাকে দূর করা না হয়, তাবৎ নেপোলিয়ন স্বাধীনতার কথা কি বলিবেন ? এই বিষয়ে মিলানীজ বাসীদিগের নিজেও উদ্যোগ করা আবশ্যক, বিশেষত সৈন্য প্রস্তুত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, কারণ যদিও রাষ্ট্রবিপ্লবের আরম্ভ অবধি ফরাশিরা ভূভারতে যথাসম্ভব স্বাধীনতার মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করিবার নিমিত্তই সজ্জিত হইয়াছে, এবং ইটালির স্বাধীনতার মঙ্গলের তরেই এখানে পদার্পণ করিয়াছে, তথাপি ইটালিয়দিগেরো কর্ত্তব্য যে, পর-নিরপেক্ষ হইয়া আপনাদের কার্য্য আপনারা বুঝিয়া লয়, তাহা হইলেই ফরাশিদিগের সহকারিতা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিবেক, তাহা হইলেই এই সকল প্রশংসনীয় চেষ্টার ফল স্থায়ী হইবেক ইত্যাদি।

মিলানের অধিবাসীরা গেঁটের কড়ি বাহির করিয়া নেপোলিয়নের এই সকল আশ্বাস বাক্য ক্রয় করিয়া বড় প্রফুল্ল হয় নাই ; তথাপি উপায়ান্তর না দেখিয়া কথঞ্চিৎ মৌখিক পরিতোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক উপস্থিত মতে রাজত্বভার নির্ব্বাহার্থ বিবিধ ব্যবস্থা করিল, স্বজাতীয় যোদ্ধাদিগের এক সর্ব্বদেশ-বিসারী সম্প্রদায়ও নিরূপণ করিল, এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক আয়োজনের বিষয়ে মনোযোগ দিতে লাগিল। তখনও মিলানের কেল্লা দখল করিয়া এক দল অষ্ট্রিয় সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে বেদখল করিবার জন্য নেপোলিয়ন কেল্লা অবরোধ করাইলেন ; তদ্ব্যতীত আপন সৈন্যদিগের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানার্থ পো নদীর ধারে ধারে বরাবর সব বৃহৎ বৃহৎ খাদ্য-সামগ্রী-ভাণ্ডার সংস্থাপিত করিলেন, পনর হাজার পীড়িত যোদ্ধার স্থান হয়, এতাদৃশ পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে হাঁসপাতাল বসাইলেন, এবং সেনাসম্পর্কীয় তাবৎ সিন্দুক ধনে পরিপূর্ণ করিলেন।

এই সকল যোগাড় সাঙ্গ করিয়া তিনি হতাবশিষ্ট বোয়ালোর দলের বিষয় একেবারে চুকাইবার নিমিত্ত অ্যাড্ডানদীর ওপারে যাত্রা করিবেন, এমন সময়ে ফরাশি রাজপুরুষদিগের নিকট হইতে তাঁহার উন্নতির পথের বিষম প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, তৎকালে পাঁচ জন ডিরেক্টরের উপর রাজকার্য্যের সর্ব্বপ্রধান ভার অর্পিত ছিল। তন্মধ্যে কার্নো নামক সুপ্রসিদ্ধ এক জন গণিত-শাস্ত্র-বেত্তা সংগ্রাম সম্পর্কীয় তাবৎ ব্যাপারের প্রধান রাজপুরুষ থাকেন। তাঁহার সহিত নেপোলিয়নের সরকারী কার্য্য উপলক্ষে যে সকল চিঠি-পত্র লেখালেখি হয়, তদ্দ্বারা কার্নোর এই প্রতীতি জন্মে যে, নেপোলিয়ন বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বটে ; কিন্তু বয়সের পরিপাক বিরহে আপনার ক্ষমতার উপর বড় বেশী ভরসা করেন। এমন কি, অঘটন ঘটনা চেষ্টা বিষয়েও বিমুখ নন, তাহাতে আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াই তেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিজয় সমস্ত লাভ করিয়া তাঁহার স্বভাবের সেই অসম্পূর্ণতা আরো প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। এই সংস্কার নিবন্ধন

কার্নো নেপোলিয়নের সকল কল্পনা গ্রাহ্য করিতে পারিতেন না, অতএব যখন ইটালির জয়লাভোদ্ধত নব্য সেনাপতি কার্নোকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি অষ্ট্রিয়ার সৈন্য দলকে ইটালি হইতে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অষ্ট্রিয়া পর্য্যন্ত অনুসরণ পূর্ব্বক ফ্রান্সের সেই আর এক বৃহৎ সেনাদলের সঙ্গে যোগ দিবেন, যাহারা তৎকালে ইটালির উত্তর পশ্চিমে রাইন নদীর সান্নিধ্যে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল। যখন এই অভিলাষ কার্নোকে জানাইলেন, তখন কার্নো কোন মতেই সম্মত হইলেন না; বরং ইহা অতীব অসাধ্য দুঃসাহসিক ব্যাপার মাত্র বলিয়া নেপোলিয়নকে সে চিন্তা হইতে নিরস্ত হইবার পরামর্শ দিলেন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য ডিরেক্টরেরা সকলেই কিছু নেপোলিয়নের অত শীঘ্র শীঘ্র জয়লাভ দেখিয়া ঐকান্তিক পরিতুষ্ট হন নাই। তাঁহাদের মনে ভয় ছিল, পাছে নেপোলিয়ন বিদেশে অসামান্য যুদ্ধনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া সৈন্যদিগের অসম্ভব প্রিয়পাত্র হন, পাছে তাহার পর রাজপুরুষদিগের কথা অমান্য করেন, এবং আপন অধীনস্থ যোদ্ধাদিগের মতিভ্রম উৎপাদন পূর্ব্বক দেশে আবার রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইয়া আপনি প্রধান হইবার চেষ্টা পান। এই সব আশঙ্কা আর কার্নোর পূর্ব্বোক্ত সংস্কার একত্র হওয়াতে রাজপুরুষেরা নেপোলিয়নকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ইটালির উত্তরাঞ্চলে যুদ্ধের ভার কেলারম্যান নামক আর এক জন সেনাপতির উপর ন্যস্ত হইল, আর নেপোলিয়ন কিয়দংশ সৈন্য লইয়া ইটালির দক্ষিণাঞ্চলের নরপতিদিগকে শাসিত করিতে যাইবেন।

সেই হুকুম আসিবা মাত্র নেপোলিয়ন অকুতোভয়ে উত্তর লিখিলেন যে, তিনি এ রূপ ব্যবস্থায় রাজী নন, তাহার কারণ কেলারম্যানের সঙ্গে সৈন্য বিভাগ করিয়া লড়াই করিতে তাঁহার বিজাতীয় অপমান বোধ হইবেক; যদি তাঁহার প্রতি সরকারের শ্রদ্ধা না থাকে, তিনি বরং কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবেন, তাঁহার এক দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, এক জায়গায় দুই জন উৎকৃষ্ট সেনাপতি পরস্পর লাঠালাঠি করা অপেক্ষা এক জন অযোগ্য সেনাপতি থাকাও ভাল, লড়ায়ের কর্ম্ম মতভেদ দ্বারা একেবারে বিগড়িয়া যায়। তা ছাড়া তাঁহার মতে অষ্ট্রিয়া সম্পূর্ণ রূপে জেরবার হইবার অগ্রে ইটালির দক্ষিণে যাত্রা করা অপরামর্শ, অতএব আপন মতের বিরুদ্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তাঁহার পোষাইবেক না। সুতরাং যদি সৈন্য বিভাগ করিয়া তাঁহাকে ইটালির দক্ষিণে পাঠান ডিরেক্টরদিগের একান্ত জেদ হয়, তো তিনি এই প্রস্তাবেই কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন।

ঈদৃশ প্রখর ব্যবহার দর্শনে কার্নো এবং আর আর ডিরেক্টরেরা স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহারা বুঝিতেন যে, নেপোলিয়নের মত কর্ম্মদক্ষ লোককে হস্তবহির্ভূত করিলে বিষম বিসংষ্ঠুল ঘটিবে, অতএব নিজ আজ্ঞা প্রত্যাহরণ পূর্ব্বক

নেপোলিয়নকে তাঁহাদের লিখিতে হইল যে, তোমার মতেই মত।

ইতিমধ্যে নেপোলিয়নের অধীনস্থ কাপ্তেনগণ অ্যাড্‌ডা পার হইয়া বরাবর অষ্ট্রিয়দিগকে অপসারিত করিতে করিতে মিন্‌সিয়ো নামক তৃতীয় আল্‌প্‌স্‌-পর্ব্বত-নির্গত দক্ষিণবাহিনী নদীর দক্ষিণ তটে উপস্থিত হইয়াছিল। অ্যাড্‌ডার পর পূর্ব্বদিকে যাইতে ইহাই সর্ব্ব প্রথম গণনীয় নদী, সুতরাং ইহারি অপর পারে বোয়ালো আবার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক পলাতক যোদ্ধা জমা করিয়া আপন সেনার চেহারা কথঞ্চিৎ চলনসই করিয়া তুলিয়াছিলেন, এই মিন্‌সিয়ো নদী পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া কিয়দ্দূর যাইবার পর পথিমধ্যে গার্ডা নামক এক সুবিস্তীর্ণ হ্রদের আকারে একবার ফ্যালাও হয়, তদনন্তর পুনরায় নদীভাব ধারণ পূর্ব্বক মান্টুয়া শহরের নিম্নভাগ ধৌত করত পোর গর্ভে মিশাইয়া যায়। সেই গার্ডা হ্রদ হইতে নদী যেখানে বহির্গত হয়, তথায় এক খেয়াঘাট আছে, তাহার নাম পেশ্‌চীরা, আরো ভাটি আসিলে আর এক যে পার হইবার স্থল দৃষ্ট হয়, তাহার নাম বর্ঘেটো। বোয়ালো এই বর্ঘেটো গ্রামে চারি হাজার পদাতি আর দু হাজার সওয়ার সংস্থাপিত করিয়া স্বয়ং সৈন্যের প্রধানাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক নদী পারে "ভ্যালে জিউ" শহরে উপস্থিত ছিলেন। আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদল নদীর উজান ভাটি পথে প্রেরণ করিয়া ফরাশি সৈন্যের নদী পার হইবার প্রতিবন্ধকতাচরণের উদ্যোগ করিয়া রাখিলেন।

নেপোলিয়ন পো পার হইবার সময় যে ফিকির খাটান, এস্থলেও তাহা ধরিলেন। তিনি "পেশ্‌চীরা" এবং আরো উত্তরে কয়েক দল ফৌজ প্রেরণপূর্ব্বক বোয়ালোর মনে দ্বিধা জন্মিয়া দিলেন যে, পাছে ফরাশি সেনা নদীর উত্তরাংশে পার হয়। তদনুসারে বোয়ালোকে আপন স্থান হইতে বিচলিত হইতে হইল। নেপোলিয়ন তদ্দর্শনে ঝটিতি নিজ অশেষ সৈন্য দল বর্ঘেটোর ঘাটে আনয়ন পূর্ব্বক সেই পূর্ব্বোক্ত ছ হাজার অষ্ট্রিয় যোদ্ধা আক্রমণ করাইলেন। এই অবসরে ফরাশিদিগের সওয়ারদল যাহা পূর্ব্বে অকর্ম্মণ্য প্রায় হইয়াছিল, তাহা এক পার্শ্বে পদাতিক সৈন্য অপর পার্শ্বে পল্‌টন এ উভয়ে বেষ্টিত হইয়া ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিল। অষ্ট্রিয়েরা পলায়ন পরায়ণ হইল, বর্ঘেটোর সাঁকো দিয়া মিন্‌সিয়ো পারে গেল এবং সাঁকোর একটা খিলান ভাঙ্গিয়া পর্য্যন্ত দিল। কিন্তু বাছা বাছা কয়েক জন ফরাশি বীর স্রোতে অবগাহন পূর্ব্বক বন্দুক উঁচু করিয়া ধরিয়া এরূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করিল যে, লোডীর কথা স্মরণ হওয়াতে অষ্ট্রিয়েরা বুকভাঙ্গা হইয়া গেল, সমগ্র সেতু ভগ্ন করা হইল না। সেই খিলানটী সত্বর মেরামত হইলে নেপোলিয়নও মিন্‌সিয়ো পার হইলেন, ভ্যালেজিও আক্রমণ করিলেন, এবং বোয়ালোর তাবৎ আশা নষ্ট করিয়া দিয়া উত্তরাঞ্চলের পর্ব্বতপথযোগে

তাঁহাকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। বোয়ালোর যুদ্ধ কার্য্য এই প্রকরণেই অবসান হইল। তাঁহার প্রভু পুনঃপুন তাঁহাকে বুদ্ধিভ্রমে পতিত হইতে দেখিয়া মহা উত্ত্যক্ত হন এবং তাঁহাকে বর্তরফ করিয়া উর্মসের্ নামক আর এক সেনা-পতিকে তৎপদে অধিরোপিত করেন। তৎকালে রাইন নদীর ধারে ফ্রান্সে ও অষ্ট্রিয়ায় যে বিপক্ষতা করিতেছিল, উর্মসের নিযুক্ত হইবার সময় সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকেন, সুতরাং তাঁহার ইটালি পঁহুছিতে কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব হয়, সেই সপ্তাহতিনেক কাল ইটালিতে অষ্ট্রিয়ার সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ স্থগিত থাকে, এবং নেপোলিয়ন অন্যান্য দু চারি আবশ্যক বিষয়ে মনোযোগ করিবার অবসর পান।

বঙ্গসুন্দরী

"दूरीकृता खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः

প্রথম সর্গ,—উপহার।

"गात्रेषुचन्दनरसो हृदि यादेन्दु
रानन্द एव हृदये।"

সর্ব্বদাই হুহু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন ;
চারিদিকে ঝালাপালা,
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।

২

লোক মাঝে দেঁতো-হাসি হাসি,
বিরলেতে অশ্রুজলে ভাসি ;
রজনী নিস্তব্ধ হ'লে,
মাঠে শুয়ে দুর্ব্বাদলে,
ডাক ছেড়ে কাঁদি ও নিশ্বাসি।

৩

শূন্যময় নির্জ্জন শ্মশান,
নিস্তব্ধ গম্ভীর গোরস্থান,
যখন যখন যাই,
একটু যেন তৃপ্তি পাই,
একটু যেন জুড়ায় পরাণ।

৪

সুদুর্ব্বর হৃদয় বহিয়ে,
কত যুগ রহিব বাঁচিয়ে!
অগ্নিভরা, বিষভরা,
রে রে স্বার্থভরা ধরা!
কত আরো থাকিবি ধরিয়ে?

৫

কভু ভাবি ত্যেজে এই দেশ,
যাই কোন এ হেন প্রদেশ,
যথায় নগর গ্রাম
নহে মানুষের ধাম,
প'ড়ে আছে ভগ্নঅবশেষ।

৬

গর্ব্বভরা অট্টালিকা যায়,
এবে সব গড়াগড়ি যায় ;
বৃক্ষ লতা অগণন
ঘেরে কোরে আছে বন,
উপরে বিষাদ বায়ু বায়।

৭

প্রবেশিতে যাহার ভিতরে,
ক্ষীণ প্রাণী নরে ডরে মরে ;
যথায় শ্বাপদ দল
করে ঘোর কোলাহল,
ঝিল্লী সব ঝিঁঝিঁ রব করে।

৮

তথা তার মাঝে বাস করি,
ঘুমাইব দিবা বিভাবরী ;
আর কারে করি ভয়,
ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়,
মানুষ জন্তুকে যত ডরি।

৯

কভু ভাবি কোন ঝরণার,
উপলে বন্ধুর যার ধার ;
প্রচণ্ড প্রপাতধ্বনি,
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দ্দিকে হতেছে বিস্তার ;

১০

গিয়ে তার তীরতরু তলে,
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে,
ডুবাইয়ে এ শরীর,
শব সম রব স্থির
কাণ দিয়ে জল-কলকলে।

১১

যে সময় কুরঙ্গিনীগণ,
সবিস্ময়ে ফেলিয়ে নয়ন,
আমার সে দশা দেখে,
কাছে এসে চেয়ে থেকে,
অশ্রুজল করিবে মোচন ;

১২

সে সময়ে আমি উঠে গিয়ে,
তাহাদের গলা জড়াইয়ে,
মৃত্যু কালে মিত্র এলে,
লোকে যেম্নি চক্ষু মেলে,
তেম্নি তর থাকিব চাহিয়ে।

১৩

কভু ভাবি সমুদ্রের ধারে,
যথা যেন গর্জ্জে একেবারে,
প্রলয়ের মেঘ সজ্ঞ ;
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভঙ্গ
আক্রমিছে গর্জ্জিয়া বেলারে।

১৪

সম্মুখেতে অসীম, অপার,
জলরাশি রয়েছে বিস্তার ;
উত্তাল তরঙ্গ সব,
ফেণপুঞ্জে ধবধব,
গণ্ডগোলে ছোটে অনিবার।

১৫

মহা বেগে বহিছে পবন,
যেন সিন্ধু সঙ্গে করে রণ ;
উভে উভ প্রতি ধায়,
শব্দে ব্যোম ফেটে যায়,
পরস্পরে তুমুল তাড়ন।

১৬

সেই মহা রণরঙ্গ স্থলে,
স্তব্ধ হয়ে বসিয়ে বিরলে,
(বাতাসের হুহু রবে,
কান বেস ঠাণ্ডা রবে ;)
দেখিগে, শুনিগে সে সকলে।

১৭

যে সময়ে পূর্ণ সুধাকর
ভূষিবেন নির্ম্মল অম্বর,
চন্দ্রিকা উজলি বেলা
বেড়াবেন ক'রে খেলা,
তরঙ্গের দোলার উপর ;

১৮

নিবেদিব তাঁহাদের কাছে,
মনে মোর যত খেদ আছে :
শুনি, নাকি মিত্রবরে,
দুখের যে অংশী করে,
হাঁপ্ ছেড়ে প্রাণ তার বাঁচে।

১৯

কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নাম ধাম সকল লুকাই ;
চাসীদের মাজে রয়ে,
চাসীদের মত হয়ে,
চাসীদের সঙ্গেতে বেড়াই।

২০

প্রাতঃকালে মাঠের উপর,
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝর্ ঝর্,
চারিদিক মনোরম,
আমোদে করিব শ্রম :
সুস্থ স্ফূর্ত্ত হবে কলেবর।

২১

বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী,
সদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি,
সরল চাসার সনে,
প্রমোদ-প্রফুল্ল মনে
কাটাইব আনন্দে সর্ব্বরী।

বরষার যে ঘোরা নিশায়,
বজ্রনাদে, বাবুরা হেথায়
বিবির আঁচল তলে
মাথা হয়ে মূত্র মলে
তেউড়ে গাম্ আড়ষ্টের প্রায় ;

২৩

সে নিশায় আমি ক্ষেত্র-তীরে,
নড়বোড়ে পাতার কুটীরে,
সচ্ছন্দে রাজার মত
ভূমে আছি নিদ্রাগত ;
প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে।

২৪

বৃথা হেন কত ভাবি মনে,
বিনোদিনী কল্পনার সনে ;
জুড়াইতে এ অনল,
মৃত্যু ভিন্ন অন্য জল
বুঝি আর নাই এ ভুবনে !

২৫

হায়রে সে মজার স্বপন,
কোথা উবে গিয়েছে এখন,
মোহিনী মায়ায় যার
সবে ছিল আপনার
যবে সবে-নূতন যৌবন !

২৬

ওহে যুবা সরল সুজন,
আছ বড় মজায় এখন ,
হয় হয় প্রায় ভোর,
ছোটে ছোটে ঘুমঘোর ;
উঠ এই করিতে ক্রন্দন !

২৭

কে তুমি ? কে তুমি ? কহ ! হে পুরুষবর,
বিনির্গত-লোলজিহ্ব, উলট-অধর,
চক্ষু দুই রক্ত পর্ণ,
কালিঢালা রক্ত বর্ণ,
গলে দড়ি, শূন্যে ঝোলো, মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর !

২৮

সদা যেন সঙ্গে সঙ্গে ফিরিছ আমার,
এই দেখি, এই নাই, দেখি পুনর্ব্বার ;
নিতে নিজ আলিঙ্গনে
কেন ডাক ক্ষণে ক্ষণে,
সম্মুখেতে দুই বাহু করিয়া বিস্তার।

২৯

প্রিয়তম সখা সহৃদয় !
প্রভাতের অরুণ উদয়,
হেরিলে তোমার পানে,
তৃপ্তি দীপ্তি আসে প্রাণে,
মনের তিমির দূর হয়।

৩০

আহা কিবে প্রসন্ন বদন!
তারা যেন জ্বলে দু নয়ন;
উদার হৃদয়াকাশে,
বুদ্ধি দিবাকর ভাসে,
স্পষ্ট যেন করি দরশন।

৩১

অমায়িক তোমার অন্তর,
সুগম্ভীর সুধার সাগর;
নির্ম্মল লহরীমালে,
প্রেমের প্রতিমা খেলে,
জলে যেন দোলে সুধাকর।

৩২

সুধাময় প্রণয় তোমার,
জুড়াবার স্থান হে আমার;
তব স্নিগ্ধ কলেবরে,
আলিঙ্গন দিলেপরে,
উলে যায় হৃদয়ের ভার।

৩৩

যখন তোমার কাছে যাই,
যেন ভাই স্বর্গ হাতে পাই;
অতুল আনন্দ ভরে
মুখে কত কথা সরে,
আমি যেন সেই আর নাই।

৩৪

নূতন রসেতে রসে মন,
দেখি ফের নূতন স্বপন;
পরিয়ে নূতন বেশ,
চরাচর সাজে বেশ,
সব হেরি মনের মতন।

৩৫

ফিরে আসে সেই ছেলেবেলা,
হেসে খুসে করি খেলাদেলা,
আহ্লাদের সীমা নাই,
কাড়াকাড়ি কোরে খাই,
ব্রজে যেন রাখালের মেলা।

৩৬

নিরিবিলে থাকিলে দুজন,
কেমন খুলিয়া যায় মন;
ভোর্ হয়ে ব'সে রই,
অন্তরের কথা কই,
কত রসে হই নিমগন।

৩৭

আ! আমার তুমি না থাকিলে,
হৃদয় জুড়ায়ে না রাখিলে,
বন্দুক বান্ধা ভাল,
নিবাতো প্রাণের আলো,
ফুরাত সকল এ অখিলে।

৩৮

তুমি ধাও আপনার ঝোঁকে,
সুদূর "দর্শন" সূর্য্যালোকে ;
যার দীপ্ত প্রতিভায়,
তিমির মিলায়ে যায়,
ভূত ভাগে যেমন আলোকে।

৩৯

পোড়ে যার প্রখর ঝলায়,
কত লোক ঝলসিয়া যায় ;
তুমি তায় মন সুখে,
বেড়াও প্রফুল্ল মুখে,
দেবলোকে দেবতার প্রায়।

৪০

আমি ভ্রমি কমল কাননে,
যথা বসি কমল আসনে,
সরস্বতী বীণা করে,
স্বর্গীয় অমিয় স্বরে,
গান গান সহাস আননে।

৪১

করি সে সংগীত সুধা পান,
পাগল হইয়ে গেছে প্রাণ ;
দৃষ্টি নাই আসে পাশে,
সম্মুখেতে স্বর্গ হাসে,
ভুলে আছে তাতেই নয়ান।

৪২

পরস্পর উল্টতর কাজে,
পরস্পরে বাধা নাহি বাজে,
চোকে যত দূরে আছি,
মনে তত কাছাকাছি,
ঈর্ষার আড়াল নাই মাজে।

৪৩

বুদ্ধি আর হৃদয়ে মিলন,
বড় সুশোভন, সুঘটন ;
বুদ্ধি বিদ্যুতের ছটা,
হৃদয় নীরদ ঘটা,
শোভা পায়, জুড়ায় দুজন।

৪৪

হেরি নাই কখন তোমার ;
পদের অসার অহঙ্কার ;
নিস্তেজ নচ্ছার যত,
পদ গর্ব্বে জ্ঞানহত,
ঠ্যাকারেতে হাসায় সোধার।

৪৫

খোসামোদ করিতে পারনা,
খোসামোদ ভালও বাসনা ;
নিজে তুমি তেজীয়ান্‌,
বোঝ তেজীয়ান-মান ;
সাধে মন করে কি মাননা ?

৪৬

দাঁড়াইলে হিমালয় পরে,
চতুর্দ্দিকে জাগে একস্তরে,
উদার পদার্থ সব,
শোভা মহা অভিনব,
জনমায় বিস্ময় অন্তরে ;

৪৭

প্রবেশিলে তোমার অন্তর,
মাণিকের খনির ভিতর,
চারিদিকে নানা স্থলে,
নানাবিধ মণি জ্বলে,
কি মহান্ শোভা মনোহর !

৪৮

শুনিলে তোমার গুণগান,
আনন্দে পূরিয়ে ওঠে প্রাণ ;
অঙ্গ পুলকিত হয়,
দুনয়নে ধারা বয়,
ভাসে তায় প্রফুল্ল বয়ান।

৪৯

ওহে সখা সরল সুজন !
করি আমি এই নিবেদন,
যে কদিন প্রাণ আছে,
থেকো তুমি মোর কাছে,
ফাঁকি দিয়ে ক'রনা গমন।

৫০

করে আজি অর্পিণু তোমার,
ধর মম ক্ষুদ্র উপহার ;
এ বঙ্গসুন্দরী মাঝে,
সাত জন নারী রাজে,
স্নেহ প্রেম করুণা আধার।

৫১

বঙ্গবালা চির পরাধিনী,
করুণাসুন্দরী, বিষাদিনী,
প্রিয়সখী, বিরহিণী,
প্রিয়তমা, অভাগিনী,
এই সপ্ত বঙ্গ-সীমন্তিনী।

৫২

চিত্রিতে এঁদের দেহ, মন,
যথাশক্তি পেয়েছি যতন ;
প্রতিষ্ঠা করিতে প্রাণ,
পেয়েছি একতান,
দেখদেখি হয়েছে কেমন !

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে* উপহার
নামক প্রথম সর্গ।

* এই কাব্যের কোন কোন অংশ ১২৭৪ সালের অবোধ-বন্ধুতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

বঙ্গসুন্দরী।

দ্বিতীয় সর্গ,—নারী বন্দনা।

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ"

জগতের তুমি জীবিত রূপিণী,
জগতের হিতে সতত রতা;
পুণ্য তপোবন সরলা হরিণী,
বিজন কানন কুসুম লতা।

২

পুরণিমা চারু চাঁদের কিরণ,
নিশার নীহার, ঊসার আলো;
প্রভাতের ধীর শীতল পবন,
গগণের নব নীরদ মাল।

৩

প্রেমের প্রতিমে, স্নেহের সাগর,
করুণা নিঝর, দয়ার নদী;
হ'ত মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি জগতে যদি।

৪

নাহি মণিময় যে রাজপ্রাসাদে,
তোমার প্রতিমা বিরাজমান্;
সে যেন মগন রয়েছে বিষাদে,
হাঁ হাঁ করে যেন শূন্য শ্মশান।

অধিষ্ঠান হ'লে কুঁড়ের ভিতরে,
কুঁড়েখানি তবু সাজেগো ভাল;
যেন ভগবতী কৈলাস শিখরে,
বসিয়ে আছেন করিয়ে আলো।

৬

নাহিক তেমন বসন ভূষণ,
বাকল বসনা দুখিনী বালা;
করে দুই গাচি ফুলের কাঁকণ,
গলে এক গাচি ফুলের মালা।

৭

কোলে শুয়ে শিশু ঘুমায়ে ঘুমায়ে,
আধ আধ কিবে মধুর হাসে!
স্নেহে তার পানে তাকায়ে তাকায়ে,
নয়নের জলে জননী ভাসে।

৮

যদি এই তব হৃদয়ের ধন,
আচম্বিতে আজি হারায়ে যায়;
ঘোর অন্ধকার হের ত্রিভুবন,
আকাশ ভাঙিয়ে পড়ে মাথায়।

৯

এলোকেশে ধাও পাগলিনী প্রায়,
চেয়ে পথে পথে বিহ্বল মনে;
খুঁজি পাতি পাতি না পেলে বাছায়,
কাঁদিয়ে বেড়াও গহন বনে।

১০

পুন যদি পাও বহু দিন পরে,
হারাণ রতন নয়ন তারা;
ভাস একেবারে সুখের সাগরে,
স্নেহ রস ভরে পাগলপারা।

করুণাময়ী গো আজি মা কেমন,
হরষ উদয় তোমার মনে !
নাহিক এমন পরম পাবন ;
অমরাবতীর বিনোদ বনে ।

১২

যেমন মধুর স্নেহে ভরপুর,
নারীর সরল উদার প্রাণ ;
এ দেব-দুর্লভ সুখ সুমধুর,
প্রকৃতি তেমতি করেছে দান ।

১৩

আমরা পুরুষ, পরুষ নিরস,
নহি অধিকারী এ হেন সুখে ;
কে দিবে ঢালিয়ে সুধার কলস,
অসুরের ঘোর বিকট মুখে ।

১৪

হৃদয় তোমার কুসুম কানন,
কত মনোহর কুসুম তায় ;
মরি চারিদিকে ফুটেছে কেমন,
কেমন পাবন সুবাস বায় !

১৫

নীরবে বহিছে সেই ফুলবনে,
কিবে নিরমল প্রেমের ধারা ;
তারক খচিত উজল গগনে,
অভাময় ছায়াপথের পারা !

১৬

আননে, লোচনে, কপোলে, অধরে,
সে হৃদি কানন কুসুম রাশি
আপনা আপনি আসি থরে থরে,
হইয়ে রয়েছে মধুর হাসি ।

অমায়িক দুটি সরল নয়ন,
প্রেমের কিরণ উজলে তায় ;
নিশান্তের শুক তারার মতন,
কেমন বিমল দীপতি পায় !

১৮

অয়ি ফুলময়ী প্রেমময়ী সতী,
সুকুমারী নারী, ত্রিলোক-শোভা ;
মানস কমল কানন ভারতী,
জগজন মন নয়ন লোভা !

১৯

তোমার মতন সুচারু চন্দ্রমা,
আলো ক'রে আছে আলয় যার,
সদা মনে জাগে উদার সুষমা,
রণে বনে যেতে কি ভয় তার ।

২০

করম ভূমিতে পুরুষ সকলে,
খাটিয়ে খাটিয়ে বিকল হয় ;
তব সুশীতল প্রেম তরু তলে,
আসিয়ে বসিয়ে জুড়ায়ে রয় ।

২১

তুমি গো তখন কতই যতনে,
ফল জল আনি সমুখে রাখ ;
চাহি মুখ পানে স্নেহের নয়নে,
সহাস আননে দাঁড়ায়ে থাক ।

২২

ননীর পুতুল শিশু সুকুমার,
খেলিয়ে বেড়ায় হরষে হেসে ;
কোন কিছু ভয় জনমিলে তার,
তোমারি কোলেতে লুকায় এসে ।

২৩

স্থবির স্থবিরা জনক জননী,
তুমি স্নেহময়ী তাঁদের প্রাণ ;
রাখ চোকে চোকে দিবস রজনী,
মুখে মুখে কর আহার দান।

২৪

নবীনা নন্দিনী কেশ এলাইয়ে,
রূপেতে উজলি বিজলী হেন ;
নয়নের পথে ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে,
সোনার প্রতিমে বেড়ায় যেন।

২৫

রোগীর আগার, বিষাদে আঁধার,
বিকার বিহ্বল রোগীর কাছে,
পাখাখানি হাতে করি অনিবার,
দয়াময়ী দেবী বসিয়ে আছে।

২৬

নাই আগামূল কত বকে ভুল,
শুনে উড়ে যায় তরাসে প্রাণ ;
হেরি হুলুস্থূল হৃদয় ব্যাকুল,
নয়নের নীরে ভাসে বয়ান।

২৭

সতত যতন, সদা ধ্যান জ্ঞান,
কি রূপে সে জন হইবে ভাল ;
বিপদের নিশি হবে অবসান,
প্রকাশ পাইবে তরুণ আলো।

২৮

দুখির বালক ধূলায় ধূসর,
ক্ষুধায় আতুর, মলিন মুখ ;
ডাকিয়া বসাও কোলের উপর,
আঁচলে মুচাও আনন বুক।

২৯

পরম করুণ জননীর মত,
ক্ষীর সর ছানা নবনী আনি,
মুখে তুলে দাও আদরিয়ে কত;
গায়েতে বুলাও কোমল পাণি

৩০

স্নেহ রসে তার গ'লে যায় প্রাণ,
অচলা ভকতি জনমে চিতে ;
ভেসে ভেসে আসে জলে দুনয়ান,
পদধূলি চায় মাথায় দিতে।

৩১

আহা কৃপাময়ী, এ জগতী তলে,
তুমিই পরমা পাবনী দেবী ;
প্রাণীরা সকলে রয়েছে কুশলে,
তোমার অপার করুণা সেবি !

৩২

তুমি যারে বাম, সে'ই হতভাগা ;
দুনিয়ায় তার কিছুই নাই ;
একা ভেকা হয়ে বেড়ায় অভাগা,
ঘুরে ঘুরে মরে সকল ঠাঁই।

৩৩

হিমালয়ে আসি করি যোগাসন,
প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা ;
ধেয়ান তোমারি কমল চরণ,
ভাবে গদ গদ মানস খোলা।

৩৪

নিশীথ সময়ে আজো ব্রজবনে,
মদনমোহন বেড়ান আসি ;
কালিন্দীর কূলে দাঁড়ায়ে, সঘনে,
রাধা রাধা ব'লে বাজান বাঁশী।

৩৫

শুনিয়ে কানুর বেণুর সে রব,
দিগঙ্গনাগণ চকিত হয় ;
ফল ফুলে সাজে তরু লতা সব,
যমুনার জল উজান বয়।

৩৬

কোকিল কুহরে ভ্রমর গুঞ্জরে,
সুধীর মলয় সমীর বায় ;
যেন পাগলিনী গোপিনী নিকরে,
শ্যাম কালশশী হেরিতে ধায়।

৩৭

না হেরি সেথায় সে নীল কমলে,
নেহারে সকলে বিকল মনে,
চরণ প্রতিমা রয়েছে ভূতলে,
বাজিছে নুপুর সুদূর বনে।

৩৮

আহা অবলায় কি মধুরিমায়,
প্রকৃতি সাজায় বলিতে নারি !
মনের প্রভায়, মাধুরী মালায়,
কেমন মানায় তোমায় নারী !

৩৯

মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার সরল মন ;
মধুর তোমার চরিত উদার,
মধুর তোমার প্রণয় ধন।

৪০

সে মধুর ধন বরে যেই জনে,
অতি সুমধুর কপাল তার ;
ঘরে বসি, করে পায় ত্রিভুবনে,
কিছুরি অভাব থাকেনা আর !

৪১

অয়ি মধুরিমে, লোচন পূর্ণিমে !
সমুখে আমার উদয় হও ;
আঁকি সাত খানি তোমার প্রতিমে,
স্থির হয়ে তুমি দাঁড়ায়ে রও।

৪২

মনের, দেহের চেহারা তোমার,
ভেবে ভেবে আজ হইব ভোর ;
আচম্বিতে এক আসিবে আমার,
আধ ঘুম্ ঘুম্ নেশার ঘোর।

৪৩

ঢুলু ঢুলু সেই নেশার নয়নে,
যেমতি মুরতি স্ফূরতি পাবে,
আপনা আপনি হৃদি দরপণে,
তেমতি আদরা পড়িয়া যাবে।

৪৪

টানিব তখনি খাড়া হয়ে উঠে,
আদরা মাফিক দুচারি রেখা ;
সাজাইয়ে রঙ্ ত্রিভুবন ঘুঁটে ;
দেখিব কেমন হইল লেখা।

৪৫

বাঁচিতে প্রার্থনা নাহিক আমার,
যে কদিন বাঁচি তবুগো নারী !
উদার মধুর মুরতি তোমার,
যেন প্রাণভোরে আঁকিতে পারি !

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে নারী-বন্দনা
নামক দ্বিতীয় সর্গ।

সংসার ।

কই সে দেখিব আমি কই নব রোম,
নাম মাত্রে সম্ভ্রমে চকিত হলো রোম ।
সপ্ত সে প্রত্যন্ত শৈল, ধন্য তব বলে,
সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত নীর, জিনে অবহেলে ।
পাপশীল, পরিত্যক্ত মনুজসন্তান,
উৎপন্ন করিল দেব সমান সন্তান !
রাজ্যের উৎপাত যারা শৃঙ্খলার ভয়,
বিস্মিত রাজত্ব হেরি, নিয়ম নিচয় ।
কোমল মনেতে যেন বাড়ে পাপলেশ,
দেখিতে রোমের বল ব্যাপ্ত করে দেশ ।
বর্ষার নিমেষে যেন বাড়ে দুর্ব্বাদল,
দেখিতে দেখিতে বাড়ে জ্ঞান বুদ্ধি বল ।
দিগন্ত পুরিল নাম, মেদিনী কম্পিত,
দুর্দ্দান্ত প্রশান্ত হয়, তপস্বী, কুরীত ।
আজ্ঞামাত্রে খসে পড়ে উন্নত মুকুট—
নৃপতি সেবিতে ধায় করি করপুট ।
বাত্যায় প্রণত যেন দর্পিত কান্তার,
ধরায় উন্নত শির না রাখিল আর,
সতত তোরণ দ্বারে শুনি রক্ষ রক্ষ ;
বন্দীগণ আর্ত্তনাদে ঘন কাঁপে বক্ষ ।
অভয়, আশ্রয়, জ্ঞান, ধন, প্রাণ, মান ;
দেহি, দেহি, ডাকে লোক ; মুখে গুণগান ।
অনুমতি বিনা ধরা পদ নাহি চলে,
পাছে হয় অপরাধ ব্যাকুল সকলে ।
অজ্ঞাত সাগর প্রান্তে রোমের পতাকা
যথায় তথায় দেখি লাগে ভেবাচাকা ।
দুঃসহ দর্পিত অতি রোমক বাহিনী,
বরিষার নদী যেন দিগন্ত গামিনী ।
দুর্দ্ধর্ষ সৈনিক কত, কত চমূপতি,
জিনিয়া গাঙ্গেয়, বর্ণ, দ্রোণ, কৃষ্ণাপতি ।
সিজার, সিপিয়ো, সিলা, পম্পি, মেরিয়স
মেরূলিয়স, এণ্টনি, খ্যাত, বীর ক্যামিলস
অসাধ্য সাধিল কার্য্য বিস্মিত বাসব ।
বীরতা দেখিয়া লাজে আকুল রাঘব ।
কোথা সে স্ত্রিবীরচেষ্টা লভিতে সমতা,
কোথাসে অলীক দ্বেষ, বিপদে একতা ।
ধন্য রোম দেখাইলে অপূর্ব্ব মানব,
ধন্য আধিপত্য, ধন্য অতুল বিভব ।
ধন্য উপস্থিত মতি ; উৎপাদন শক্তি ;
শৃঙ্খলায় ধন্য আস্থা ; ধন্য গুণ ভক্তি ।
অভাব নোয়ালো শির আশ্চর্য্য যতনে,
সফলতা ভয়ে আসি লোটালে চরণে ।
বিজয় দাসের মত পাছু পাছু ধায়,
কোপের ভাজন হলে রক্ষা করা দায় ।
গুণাগুণ নাহি জানি, না ভাবি ক্ষমতা ;
না মানি, গৌরব, পদ, স্বভাব, বীরতা ;
রোমের সন্তান মাত্র বুঝে যদি মন,
অমনি তুলিয়া লই মস্তকে চরণ ।
তেমন সাধিতে কার্য্য, কেহ নাকি পারে,
রোপিল সভ্যতা কত অজ্ঞাত কান্তারে ।
পশুরে নরত্ব দিল, ঐহিক কুশল,
হরিয়া শরীর বল, মনে দিল বল ।
সঙ্গমে সুখ সমৃদ্ধি, খ্যাতি করে দান ;
আশ্চর্য্য ! ধ্বংসের মুখে বিলায় সম্মান ।
পোপের তনুজ রোম, দেখে জ্ঞানহত ;
ধর্ম্ম যাচে বসুমতী অর্দ্ধাঙ্গে প্রণত ।
সেই সে অমরাবতী জিনি রাজধানী
নিমেষে লুকালে কোথা ; নাহি সরে বাণী ।
দর্পিত ভূপতি কত পড়ি রাজপথে,
বৃথা করে আর্ত্তনাদ বন্দী জয়ী রথে,
সহিতে আরক্ত অক্ষি দেবতা অক্ষম,
শেষে কি তাহার দশা করিলি অধম ।
হৃদয় দহিলি তার, ভাঙ্গিলি শরীর,
আন্তরিক পীড়া বশে ক্ষণ নহে স্থির ।
তেমন সময় কাল,—একি আচরণ ।—
অসভ্য নীচের হাতে করিলি অর্পণ ।
সহজে অসভ্য জাতি ব্যবহার নিষ্ঠুর,
বুঝেনা গৌরব তার, দেহ করে চূর ।
ছিন্ন করে সুখফুল প্রবোধ মানে না ;
দলিল নন্দন যেন দানবের সেনা ।
অর্থিত সতত, রোম, অর্থী নও কভু,
সুদীর্ঘ কাটিলে কাল, পৃথিবীর প্রভু ।
তেমন প্রতাপরবি কোথায় লুকালো ;
আইল দুখের সন্ধ্যা কমল মুদিলো !
কেনহে নীচের দ্বারে হইয়া কাতর
অভয় যাচিছ কেন, কেন হাসে নর ?

অবোধ-বন্ধু

"করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

৩য় ভাগ] কার্ত্তিক,—১২৭৬। [সপ্তম সংখ্যা

পাঠ পরিবর্ত্তন।

গত আশ্বিন মাসের অবোধবন্ধুতে বঙ্গসুন্দরী কাব্যের প্রথম সর্গে ২২-এর কবিতায় যাহা আছে, তাহার পরিবর্ত্তে এইরূপ হইবে।

যথা—

২২

বরষার যে ঘোরা নিশায়,
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায়;
ভীষণ বজ্রের নাদ,
ভেঙে যেন পড়ে ছাদ,
বাবু সব কাঁপেন কোঠায়;

মেরায়স্।

(স্থান,—কার্থেজের ভগ্নাবশেষ।)

ধরণীর শিরোমণি, বীরের জননী,
মানবের কীর্ত্তিস্তম্ভ, জ্ঞানরত্ন খনি,
লক্ষ্মীর বিলাস ধাম, শিল্পের আকর,
কবির বীণার রবে পূর্ণ নিরন্তর,
বাণিজ্যের বাসস্থান, সুখের ভবন;
দর্পে রাজগণ পদ করিত সেবন,
সমাদরে বসুমতী হৃদয়ে ধরিয়া
যোগাইত উপহার যতনে আনিয়া;
এই কি কার্থেজ সেই ভুবনমোহিনী,
এলকেশে ছিন্নবেশে লোটায় ধরণী?
কোথা সেই অট্টালিকা স্বর্ণ রাজপুরী
প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ শোভে সারি সারি?
গিয়াছে স্বর্গের পুরী মাটিতে মিলায়ে,
আছে মাত্র স্তম্ভ শ্রেণী অদূরে দাঁড়ায়ে।

করিন্থ দেশের নক্সা সাজিছে মাথায়,
অর্দ্ধ অঙ্গ ভঙ্গ কেহ পড়িয়া ধরায়।
প্রকাণ্ড শৈলের প্রায় ভিত্তি কোন খানে,
মস্তকে লৌহের কড়ি এখানে সেখানে,
কোথাও কেবল মাত্র অদ্ভুত নির্ম্মাণ,
দাঁড়াইয়া আছে দ্বার মস্তকে খিলান।
আহা, কি শিল্পের ছটা নির্ম্মাণ চাতুরী,
এখনো এ ভগ্নদেহে বিরাজে মাধুরী!
জিনিয়া অমরাবতী যে রাজভবন
খচিত বিবিধ রত্নে নয়ন রঞ্জন,
বীরগণ পদভরে হইত কম্পিত;
মধুর বীণার রবে হইত ধ্বনিত;
রমণীর মধুমাখা কণ্ঠের সুস্বর
শুনিয়া, উল্লাসে মুগ্ধ হইত অন্তর;
চারিদিকে পরিপূর্ণ সৌরভ নির্ম্মল,
যার ঘ্রাণে মন প্রাণ হইত শীতল;
কোথা সেই শোভা! হায় নাহি হেরি আর,
কালের দশনাঘাতে হয়েছে চূর্ম্মার!
চিত্রকর, কারুকর, স্বীয় বুদ্ধি বলে
করেছিল যাহা, খসে পড়িছে ভূতলে।
বীরগণ পদভরে হইত কম্পিত,
এখন শৃগাল তাহে ফিরিছে নিয়ত।
কোথা সে সঙ্গীত ধ্বনি নাহি শুনি আর,
বধির করিছে কর্ণ পেচক চীৎকার।
সৌরভেতে আমোদিত থাকিত যে স্থান,
দুর্গন্ধে এখন তাহে বাহিরায় প্রাণ।
যে প্রাসাদ শিখরেতে উড্ডিত পতাকা,
উজ্জ্বল সুবর্ণাক্ষরে জাতি-চিহ্ন আঁকা;
কোথা সেই গৌরবের নিশান এখন!
বাতাসে অশ্বত্থ শাখা হইছে চালন।
কোথা সে মন্ত্রণাগার মন্ত্রী শত শত,
কেমনে দলিয়া কাল করিলিরে হত।

সদর্পে মস্তকে তোর করে পদাঘাত,
বাহুবলে বিপক্ষেরে করেছে নিপাত;
তরিয়া জলধি সীমা অসীম সাহসে,
পুরেছে ভাণ্ডার নিজ মনের হরষে;
কেন কেন, আজি কেন তার হেন দশা,
বুনো পশু তারে নিয়ে করিছে তামাসা।
হায়রে যে স্বর্ণপুরী ছিল এককালে,
দেবতার বাস যোগ্য ধরণী মণ্ডলে।
রোমের কঠোর আজ্ঞা কুলিশের প্রায়,
দলিয়া সুন্দর দেহ ফেলেছে ধরায়।
তবুও স্থানের শোভা পারেনি হ'রতে,
প্রকৃতি উলঙ্গ হয়ে নাচে চারিভিতে।
ছিন্ন দেহ আর্থেজেরে হৃদয়ে ধরিয়া,
পাগলের মত ধনী রয়েছে চাহিয়া।
অসীম বালুকা রাশি, দেখহে নয়নে,
উলঙ্গ সাহারা মরু বিরাজে দক্ষিণে।
যতদূর চলে দৃষ্টি, ধবল আকার,
নিস্তব্ধ জলধি সম রয়েছে বিস্তার।
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ প্রায়, রবির কিরণে,
ঝক্ ঝক্ করিতেছে এখানে সেখানে।
অস্থির পবন সদা বহিয়া তথায়
লইয়া সে অগ্নিকণা খেলিয়া বেড়ায়।
অদ্ভুত বালুকা রাশি ঘূর্ণ সমীরণে
প্রকাণ্ড স্তম্ভের সম উঠিছে গগনে!
মাঝে মাঝে সবুজ রঙ্গের চিহ্ন প্রায়
মনোহর ওয়েসিস্ দূরে শোভা পায়।
ক্রমে বহু দূরে আর চলে না নয়ন
অনন্ত বালুকা রাশি ঠেকেছে গগন।
ফের ফের! পশ্চিমেতে জলদের মত,
দাঁড়াইয়া অভ্রভেদী আট্‌লাস্ পর্ব্বত।
প্রকাণ্ড শিখর শ্রেণী জুড়িয়া আকাশ,
ভীষণ রাক্ষস যেন বিস্তারিয়া গ্রাস।

আহা, কি অপূর্ব্ব শোভা নয়ন রঞ্জন,
সাজিছে ধরণী হৃদে অপূর্ব্ব রতন।
দেখ দেখ আর দিকে দুরন্ত জলধি;
উত্তাল তরঙ্গ মালা খেলে নিরবধি।
উন্মত্ত মাতঙ্গ সম করিয়া গর্জ্জন,
দ্রুতবেগে কিনারায় হইছে পতন।
ধবল ফেনার রাশি তুলার মতন
তরঙ্গের শিরোভাগে সাজিছে কেমন!
নীলবর্ণ জলরাশি অনন্ত শয্যায়,
অনন্ত কালের তরে সুখে নিদ্রা যায়।
আহা, এ অপূর্ব্ব শোভা আর কোথা আছে
ধরণী মোহিনী বেশে দাঁড়াইয়া কাছে।
কার্থেজ! নয়ন মেলি দেখনা চাহিয়া,
তোমার দুখের দুখী রয়েছে বসিয়া।
এস এস, দুইজনে করিব ক্রন্দন,
উভয়ের মনোদুঃখ করিব বর্ণন।
তোমার মতন দুঃখী আছে যেই জনা,
বলিলে মনের ভাব কমিবে যাতনা।
কিন্তু হায়! এ যাতনা নির্ব্বাণ কি হবে,
নয়ন সলিলে কিহে দাবাগ্নি নিবিবে?
যত দিন রক্ত স্রোতে রোম না ভাসিবে,
রক্তবর্ণ টাইবরের জল না হইবে,
সল্লার মস্তক নাহি ভূমে গড়াইবে,
শৃগাল শকুনিগণে আনন্দে খাইবে,
চরণে ধরিয়া রোমবাসীরা কান্দিবে,
তত দিন মন জ্বালা মনেতে রহিবে।
যদি নাহি হয় এই প্রতিজ্ঞা পূরণ
নিবিবে এ ক্রোধানল লইয়া জীবন।
হতভাগ্য ত্যজ্য দেহ, নিজের মতন,
ত্যজ্য ভূমে মনসুখে মুদিবে নয়ন।
এস গো কার্থেজ এস আলিঙ্গন করি,
তুমি মাত্র মোর সাথে রহিলে সুন্দরী।

অয়ি রোম! জন্ম ভূমি কি বলিব আর,
তোমার কৃপায় দেখিয়াছি এ সংসার।
জননী অধিক মোরা ভাবি গো তোমারে,
সুধিতে তোমার ধার বল কেবা পারে।
'রোমান' বলিয়া মোরা খ্যাত তোমা হতে,
প্রাণ দিয়া তব যশ রাখিব জগতে।
কিন্তু মাতঃ! ভাবিতেছি বলিব কেমনে,
গৌরবের হানি হয় বড় ভয় মনে।
যাহোক না বলে স্থির পারিনা হইতে,
ক্রোধে বিদরিছে বুক পারি না সহিতে;
হেথায় যদ্যপি এসে দেখ একবার,
বুঝিবে কিসের লাগি করিগো চীৎকার;
কাহার পাষাণ প্রাণ কঠিন এমন,
এদশা হেরিয়া শোকে করেনা রোদন?
ধরিগো কঠিন প্রাণ তোমার সন্তান,
বধিয়া সহস্র প্রাণী করি তৃণ জ্ঞান,
ত্যজিয়াছি দয়ামায়া তোমারে সেবিতে,
দিতে পারি ছার প্রাণ গৌরব রাখিতে,
তবু কার্থেজের দশা করিয়া দর্শন,
পারিনা-গো অশ্রুপাত করিতে বারণ।
দেখ দেখ তাকাইয়া, মুদনা নয়ন,
কোথা সে স্বর্গীয় শোভা, কোথায় এখন
নহে কি এ কীর্ত্তিস্তম্ভ তোমার নির্ম্মাণ,
লভেনি কি যশোরাশি তোমার সন্তান?
হায় হায় পাগলিনী ফিরিয়া দেখনা,
আপনার ভাবী দশা মনেও ভাবনা।
সিপিয়ো কোথায় তুমি, কোথায় রয়েছ?
রাখিতে আপন কীর্ত্তি সাধাসি সেধেছ।
কিন্তু হে কালের গতি পারনি বুঝিতে,
কার্থেজ গিয়েছে যেথা গেছ সেই পথে।
উড়াইতে আপনার যশের নিশান,
ভাঙ্গিয়াছ জগতের সুখের সোপান।

ওই দেখ! এখনো এ ভগ্ন দেহ রাশি,
কাঁপিছে আমায় দেখে ব'লে রোমবাসী।
জানে না আমার দশা আমি কোন জন,
কি লাগিয়ে মরুভূমে করিছে ভ্রমণ।
ছিন্ন বস্ত্রে অনাহারে বসিয়া হেথায়,
দারুণ মনের জ্বালা মনেতে মিলায়!
প্রচণ্ড বাহুর বলে শাসিয়া ধরণী,
সহর্ষে শুনিয়া কর্ণে নিজ জয়ধ্বনি,
বিপক্ষের কাল সম, দেশের কুশল,
সভয়ে সেবিত পদ মানব মণ্ডল,
এখন পেচক প্রায় বায়সের ভয়ে,
লুকায়ে রয়েছি এসে নির্জ্জন আলয়ে;
চমকিয়া উঠিতেছি শুনি পদধ্বনি,
ত্যজিয়া সুখের দিবা যাচিছে রজনী।
ওই শুন ওই শুন পশুর চীৎকার।
জগতে আমার দুঃখ করিছে প্রচার।
কার্থেজ! জাননা বোন্ মম সমাচার,
কিলাগি একাকী হেথা ভ্রমি অনিবার।
কেন পাগলের মত বসিয়া নির্জ্জনে,
দর দর শোক ধারা বহিছে নয়নে।
কেন কেন থেকে থেকে আগুনের মত,
প্রবলনিশ্বাস বেগে হইছে নির্গত!
জাননা কেমন দশা করেছে এমন;
কেন বা ভগিনী ব'লে করি সম্বোধন?
কেন গো তোমারে হেরে মনের আগুন,
জ্বলিয়া উঠিছে হৃদে হইয়া দ্বিগুণ?
রে পাপিষ্ঠ নরাধম রোমের সন্তান,
কাজের উচিত ফল করিলি প্রদান!
একবার পেছু ফিরে দেখিলিনা চেয়ে,
সহিয়াছি কত ক্লেশ তোদের লাগিয়ে।
কোথা নিউমিডিয়া রাজ, জুগর্থা ভূপতি,
দেখ তব বিপক্ষের কেমন দুর্গতি।
কৃতঘ্ন রোমানগণ, পাইয়া সময়,
সাধিছে মনের সাধ; এও কিহে সয়?
ধন্য ধন্য বাহুবল, ধন্য বীরগণ;
অনাসে দেশের তরে দিয়েছ জীবন;
গিয়াছ যশের রাশি ভুবনে রাখিয়া,
দুরাচার রোমানের হাত ছাড়াইয়া।
পড়ে নাকি রোমবাসী! পড়ে নাকি মনে,
সিম্ব্রাই টিউটন আদি ঘোর শত্রুগণে?
সাধিতে তোদের কাজ ক'রে প্রাণপণ,
লক্ষ লক্ষ মানবের বধেছি জীবন;
ভাসায়েছি বসুমতী শোণিতের ধারে,
জন্মভূমি জননীর মান রাখিবারে।
এই কি তাহার শোধ অরে দুরাচার,
ভাল ভাল উপকারে দিলি পুরস্কার।
সল্লার কুহকে প'ড়ে, ভুলিলিরে সব,
মাতিলা উঠিলি পেয়ে নূতন উৎসব।
কি দোষ তোদের এ-ত মূর্খতার দোষ,
পুরাণ ফেলিয়া হয় নূতনে সন্তোষ।
করেছিস যেই কাজ সহর্ষ অন্তরে,
পাইবি তাহার ফল দিন দুই পরে।
দেখিব কেমনে সেই পাপ দুষ্টমতি,
নিবারিতে পারে মম অসির শকতি।
কার্থেজ! তোমারে তুষ্ট করিব সত্বরে,
লইব দুখের শোধ যে আছে অন্তরে।
কিন্তু নাহি পারিব গো করিতে কখন,
জননীর ভগ্ন দশা তোমার মতন।
রোমের তনয় মোরা জানে জগজন,
বিপক্ষে দলিতে পদে করি প্রাণপণ;
কিন্তু গো রোমের ক্লেশ পারি না সহিতে,
নশ্বর দেহের মাঝে জীবন থাকিতে।
সিপিয়ো! বীরের মত হয়নি ব্যাভার,
করেছ কার্থেজ প্রতি অন্যায় আচার।

জগতের লক্ষ্মীরূপা, বীরের প্রসূতি,
কেমনে আগুনে তারে দিয়েছ আহুতি?
নহে ত অসভ্য জাতি রোমবাসিগণ,
গুণের মর্য্যাদা তারা জানে বিলক্ষণ!
শিল্পের আদর ভাল জানেত হে সবে,
বিখ্যাত ভুবন মাঝে যাহার গৌরবে;
তবে এ অসভ্য চিন্তা জানিনা কেমনে,
অনাসে উদয় আসি হ'ল তব মনে।
চাহিয়া না দেখিলে হে বীরগণ পানে,
যাদের অনন্ত যশ জগতে বাখানে।
অজ্ঞান অন্ধের মত না পেয়ে আস্বাদ,
ভেঙ্গেছ শিল্পের কীর্ত্তি স্বর্ণের প্রাসাদ।
কোথায় দেখেছ হেন শুনেছ কোথায়,
বীরাঙ্গনা রমণীর বীরত্ব ধরায়?
কেশ, রমণীর প্রিয় অঙ্গের ভূষণ
অনাসে দেশের তরে করেছে অর্পণ।
স্বচক্ষে হে বীরবর করেছ দর্শন,
কার্থেজ অনল সাথ করিলে যখন;
প্রাণান্তে শরণাগত হয় নাই কেহ,
যুঝিয়া সম্মুখ রণে ত্যজিয়াছে দেহ।
শুননি কি হাজড্রুবাল-পত্নীর বচন,
স্বামীর ভীরুতা যবে করিল দর্শন।
"দোষি না সিপিয়ো আমি দোষিনা তোমারে
"যুঝেছ শত্রুর সনে সম্মুখ সমরে!
"কিন্তু ঐ হাজড্রুবাল কৃতঘ্ন পামর,
"স্ত্রী পুত্র দেশের যেই শত্রু ভয়ঙ্কর,
"দেখহ সিপিয়ো আর দেবতা সকল,
"পায় যেন নরাধম তার প্রতিফল।"
দেখে শুনে বীরবর বল কেমনে,
অনাসে কার্থেজে শেষে দিলে হুতাশনে।
সত্যবটে কার্থেজের সে দশা দর্শনে,
হয়েছিল অশ্রুপাত তোমার নয়নে,

কিন্তু হে স্বহস্তে ধরা ভাসায়ে শোণিতে,
কি লাগিয়ে অশ্রুপাত পারিনা বুঝিতে।
হায় সে অসীম দুঃখ দাবাগ্নি সমান,
এক বিন্দু অশ্রুপাতে করিলে নির্ব্বাণ!
কোথায় সে মহামতি বীর চূড়ামণি!
ঘুষিল জগৎ যার জয় জয় ধ্বনি।
শঙ্কায় আকুল রোম কাঁপিয়া উঠিল;
দুর্গম আল্পস্ ভয়ে পথ ছেড়ে দিল;
চূর্ণ হল বীর দাপ, কৌশল বিফল,
ত্যজিয়া সম্মুখ রণ, গণিল মঙ্গল,
সভয়ে সেনানীগণ নোয়াইল শির,
শুনিয়া বীরের নাম সকলে অস্থির।
ধন্য ধন্য হানিবল, ধন্য বীরপনা,
ভূমণ্ডলে আর কোথা তোমার তুলনা?
এখন গিয়েছ তুমি কালের উদরে,
রাখিয়া যশের রবি নির্ম্মল অম্বরে।
রোমানের হাত নাই নাশিতে তাহারে,
সমভাবে চিরদিন দেখিবে সংসারে।
কিন্তু তব জন্মভূমি কার্থেজ সুন্দরী,
ছিন্ন ভিন্ন, ভূমে প'ড়ে যায় গড়াগড়ি।
হায়রে পাষাণ প্রাণ রোমের সন্তান,
নাশিয়া কার্থেজে ভাল সভেছ সম্মান!
চলিলে এ ধরাধাম ত্যজি দিনমণি,
চলিলে আপন বাসে, আসিবে রজনী,
চারিদিক এখনি ঘেরিবে অন্ধকারে;
ঘোর চিন্তা-মেঘ আসি হৃদয় মাঝারে
পশিবে, করিবে দগ্ধ এ পোড়া জীবন,
হবে না বিষম জ্বালা, হবে না বারণ।
তাই বলি দিননাথ কর অবধান,
স্থির চিত্তে ক্ষণকাল কর অবধান।
বলিব মনের ভাব প্রকাশি তোমায়,
এই মোর শেষ দুঃখ; যদি হে ধরায়

পাইতাম তব সম তেজস্বী কাহারে,
এখনি হৃদয় খুলে দিতাম তাহারে!
দেখিত সে মহামতি, অনায়াসে দেখিত
দিব্য চক্ষে, কি আগুনে দহে মোর চিত।
কিন্তু হে, নাহিক দেখি খুঁজিয়া সংসার
কোন জনে, বুঝিবে যে বেদনা আমার।
তাই বলি দিননাথ সম্বরিয়া গতি,
ক্ষণকাল শুন মম বিষাদ ভারতী।
তোমার এ দশা দেখি, পড়িল হে মনে
পূর্ব্বের সকল কথা; তোমার সদনে,
তাই হে বলিতে মম হইছে বাসনা,
জঘন্য মানব ব'লে করোনা হে ঘৃণা।
এই মাত্র পূর্ব্বদিকে হেরিনু তোমারে,
হেরিয়া আরক্ত আঁখি পলাইল ডরে
ভীষণ তমস-রাশি, ছাড়িয়া ধরণী;
ঘুষিল জগৎ তব জয় জয় ধ্বনি।
ক্ষণপরে দেখি উচ্চ গগন উপরে,
উজলিল দশদিক ময়ূখজ্বল করে;
প্রচণ্ড তোমার মূর্ত্তি দেখি ভয়ঙ্কর,
শঙ্কায় আকুল হয়ে কাঁপে চরাচর।
একি একি, কেন দেব, কেন হে এখন,
ত্যজি উচ্চ সিংহাসন কর পলায়ন?
জগতের তেজ তুমি, হইয়া শঙ্কিত,
কেন হে জলধি নীরে হও লুকায়িত?
যে তোমার উগ্র মূর্ত্তি হেরিয়া প্রভাতে
করেছিল পলায়ন, এখন পশ্চাতে
ধাইছে প্রবল বেগে করিয়া গর্জ্জন,
পারিলে না নিবারিতে তাহারে এখন?
ঐ দেখ চারিদিক হইল আঁধার,
পলাইলে দিননাথ, ছাড়িয়া সংসার।
হায় আশা! চিরদিন হৃদয় মাঝারে
রাখিয়া, পালিয়া ছিনু যতনে তোমারে,
তুমিও যতনে তুলে দিয়েছিলে হাতে
মধুমাখা ফল তার; কিন্তু হে পশ্চাতে
পূরিল সে সুখ ফল বিষম গরলে,
দহিছে জীবন এবে সেই হলাহলে।
দিননাথ, জনমিয়া প্রিবীয়ের কুলে,
পেয়েছিনু উচ্চপদ; স্বীয় বাহু বলে
দলেছি বিপক্ষগণে; লভেছি সম্মান;
গাইত সকল লোক মম যশ গান;
কাঁপিত আমার নামে মানব সকল,
জানিত রোমানগণ আমারে কেবল;
বসিতাম সভাস্থলে উন্নত আসনে,
সেবিত আমায় লোকে কতই সম্মানে।
কিন্তু নাথ! কোথা এবে সেই উচ্চ স্থান,
কোথা সেই যশোরাশি কোথায় সম্মান!
নাহি পাই ত্রিসংসারে খুজিয়া এখন,
কোন ঠাঁই; এড়াইতে শত্রুর নয়ন।
সেই আমি, এবে ক্ষুদ্র মানবের ভয়ে,
জন শূন্য মরুভূমে রয়েছি লুকায়ে।
এ ঘোর যাতনা প্রাণে নাহি সহে আর।
এখন মৃত্যুরে আমি ডাকি বার বার।
কিন্তু হে তথাপি সাধ হয় না মরণে,
নিস্তেজ ভীরুর মত নির্জ্জন কাননে।
সয়েছে অনেক দেহে, যতনে সহিবে,
যত দিন মনোবাঞ্ছা নাহিক মিটিবে।
নিস্তেজ বলিয়া লোকে করিবে হে ঘৃণা,
দারুণ সে বাক্য, প্রাণে কখন সবে না।
যাও দেব, যাও তুমি আপনার স্থানে,
মেরায়স্ মন দুখে রহিবে এখানে॥

পরকে আপন ভাবা।

মানুষ স্বার্থপর বটে, সে যে কোন কাজ করে, আপনার সুখ উদ্দেশ করিয়াই করিয়া থাকে। কিন্তু তথাপি তাহার স্বভাবের মধ্যে এমন দু একটী গুণ আছে যে, তদ্দ্বারা তাহাকে পরের বিষয়ে একেবারে উদাসীন হইতে দেয় না। দয়া সেই এক গুণ। সংস্কৃত শাস্ত্রকারেরা কহেন, পর দুঃখ নিবারণেচ্ছার নাম দয়া, সেই ইচ্ছা কখনই উদয় হইত না, পরের ক্লেশ দেখিয়া তাহা মোচন করিবার নিমিত্ত একটা আগ্রহ কখনই হইতে পারিত না, যদি না সেই সঙ্গে আমাদের কিঞ্চিৎ ক্লেশ বোধ হইত। ফলে ইহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত বোধ হয়, বাগাড়ম্বর বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ প্রয়োজন হইবেক না যে, আমরা সময় বিশেষে পরের সুখকে আপন জ্ঞান করিয়া থাকি, তজ্জন্যে কায়মনোবাক্যে সচেষ্টিতও হই, অথচ পরের সেই সুখ দর্শন জনিত যে আনন্দ আমাদের সঞ্চার হয়, তাহা ব্যতীত অন্য কোন স্বার্থের সম্পর্ক সে স্থলে নাই। সেই রূপ যখন পরের কোনরূপ ক্লেশ আমরা স্বচক্ষে দর্শন করি, কিম্বা সে বিষয়ের কোন সতেজ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়মধ্যে উহার সুস্পষ্ট ছবি অঙ্কিত হয়, তখন সহজেই মনে যন্ত্রণা-মিশ্রিত এক ভাবের আবির্ভাব হয়। এ বিষয়ের প্রমাণ প্রত্যেক ব্যক্তির আচরণেই লক্ষিত হইবেক। ইহা ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম ক্রোধ প্রভৃতি নৈসর্গিক প্রবৃত্তি সমূহের মত সকল মানুষেই বর্ত্তে, তবে যাঁহারা ভদ্র শিষ্ট সুসভ্য ও ধর্ম্মজ্ঞানী, তাঁহাদের ইহা সমধিক প্রবল বটে। যিনি যত বড়ই কেন বদমাইশ হউন না, লোকস্থিতির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া করিয়া যাহার চরিত্র নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে, সে পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে দয়াবৃত্তির বশ্যতা স্বীকার করিবেক।

পরের ক্লেশে যে ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকি, ইহার হেতু কি? আমরাত তাহার অবস্থায় পতিত হই নাই, সুতরাং তাহার তৎকালীন অবস্থা তাহার নিজের কেমন জ্ঞান হইতেছে, ইহা আমরা কিরূপে বুঝিয়া লই? এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে বসিলে স্থির হইবেক যে, শুদ্ধ ভাবনা শক্তির প্রভাবে ইহা ঘটে। আমরা আপনাদিগকে যন্ত্রণা-গ্রস্ত ব্যক্তির স্থানস্থ জ্ঞান করি আমরা মনে মনে বুঝিয়া দেখিতে থাকি, যদি এই রূপ অবস্থা আমার ঘটিত, তাহা হইলে আমার কিরূপ অনুভব পরম্পরা উপস্থিত হইত। যখন আমার সমক্ষে কোন ব্যক্তির বুকে বাঁশ ডলিতেছে কি নখের নীচে প্রেক মারিতেছে, তখন আমার গা যে রিরি করিয়া উঠে, তাহা শুদ্ধ ঐ ভাবনার প্রভাবে। আমার তৎক্ষণাৎ জ্ঞান হয় যে, আমিই যেন উহা ভোগ করিতেছি, আমারই বুকে বাঁশ ডলিতেছে, আমারি নখে প্রেক পুঁতিতেছে। ঈদৃশ অবস্থায় আমার নিজের কিরূপ দুর্বিবহ যাতনা হইত, তাহা আমি স্মরণ করিয়া থাকি। স্বয়ং কখন এ

যন্ত্রণা অনুভব করা না থাকিলেও সচ্ছন্দে উঁহার আভাস পাওয়া কঠিন নহে। আমার শরীরের উপর ঠিক সেই সকল অত্যাচার না হউক, তাদৃশ অত্যাচার কখন না কখন হইয়াছিল; কখন না কখন আমার গায়ে ছুঁচ ফুটিয়া থাকিবেক। সুতরাং আমার নিজের তৎকালীন অবস্থা স্মৃতিপথের পথিক হইয়া এবং তদপেক্ষা অনেক গুণে অধিক এক যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ দেখিয়া আমি ব্যাকুল হইয়া পড়ি। আমরা যেন সেই ব্যক্তির শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হই, যেন তাহার সঙ্গে একাত্মা হইয়া যাই, এবং তত প্রকটরূপে না হউক, তাহারি মত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়া থাকি। এই রূপে যখন সেই অপর ব্যক্তির নিদারুণ যন্ত্রণা আমাদিগের দ্বারা আত্মসাৎ করা হয়, যখন ভাবনা প্রভাবে আমাদিগের অনুভব ক্ষেত্রে উহা সুস্পষ্ট রূপ প্রতিভাত হয়, তখন তদ্বিষয়িণী চিন্তা দ্বারা আমাদিগের নিজেরও অস্থিরতা এবং হৃৎকম্প হইতে থাকে, কেননা মানব-স্বভাব-সিদ্ধ একটী ধর্ম্ম আছে যে, যে ক্লেশ ও যাতনা সত্য সত্য অনুভব করিবার সময় দুঃখ বোধ হয়, সেই ক্লেশ ও সেই যাতনার চিন্তা পর্য্যন্ত কিয়দংশে অস্বস্তিকর; তাহা যেন ভুগিতেছি ইহা ভাবিলেও আমরা শোকে ও দুঃখে আক্রান্ত হইয়া উঠি। তবে বটে, যাহার ভাবনা শক্তি যত তেজস্বিনী ভাবনা-জনিত দুঃখ তাহার তত প্রখর রূপে প্রতিভাত হয়, সকলকার সমান নহে।

পরের দুঃখে দুঃখী হইবার প্রধান কারণ এই আমরা আপনাদিগকে মনে মনে তাহার স্থলাভিষিক্ত বলিয়া ভাবিতে থাকি সে অবস্থায় পতিত হইলে নিজে কি করিতাম আলোচনা করিতে থাকি, তাহার ক্লেশের চিত্র আপন আপন চিত্ত পটে আঁকিতে থাকি; এই সকল চিন্তা দুঃখ-মিশ্রিত চিন্তা বলিয়া আমাদিগের মনে দুঃখের উদয় করে। ইহারই নাম অনুকম্পা। সুতরাং প্রতীত হইতেছে যে, অনুকম্পিত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত আপনাদিগকে জ্ঞান না করিলে অনুকম্পার সঞ্চার হয় না। একথা যদি স্বতঃসিদ্ধ বোধ না হয়, তাহা হইলে সর্ব্ব জনের গোচর নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। যখন আর কোন ব্যক্তির হাতে বা পায়ে কেহ আঘাত করিতে যাইতেছে দেখি, তখন তৎক্ষণাৎ আমরা আপনার হাত পা সরাইয়া লই, আমাদিগের গা কুঁকড়িয়া আসে; আর সেই চোট্ অপর ব্যক্তির শরীরে লাগিবা মাত্র আমাদিগেরো কিঞ্চিৎ বেদনা বোধ হয়। বাঁশবাজী দেখিবার সময় যখন বাজীকরকে দড়ির উপরে চলিয়া যাইতে দেখে, তখন পুরোবর্ত্তী দর্শকবর্গ বাজীকরের সঙ্গে সঙ্গে হাত এদিক্ ওদিক্ করিতে থাকে, বাজীকরের শরীর যেমন দড়ির উপর বজায় থাকিবার নিমিত্ত নানা মুদ্রা প্রদর্শন করে, একবার দড়ির এপাশে হেলে, একবার আর পাশে হেলে, দেখা দেখি দর্শকের শরীরও তদনুরূপ ভঙ্গি অবলম্বন করিতে থাকে। দর্শকের মুখও বিকট

হইয়া আসে; সেও আপনার গা দোলাইতে থাকে এবং দর্শকের মুখের ভাব অবলোকন করিলে বোধ হইবেক, যেন সে নিজে দড়ির উপরে দাঁড়াইয়া আছে, এবং কষ্টে সৃষ্টে আপনাকে বাঁচাইতেছে। যাহাদের শরীর তেমন সুস্থ নহে, প্রকৃতি দুর্ব্বল ও সুকুমার, ঈদৃশ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, পথের ভিখারীদিগের মধ্যে কাহারো বিকট বিশ্রী বেআকার কোন ঘা দেখিলে তাহাদিগের প্রাণ কেমন করিয়া উঠে; তাহাদিগের নিজ দেহের সেই স্থান বরাবর যেন চুলকাইতেছে, যেন বাজিতেছে বোধ হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকার ক্ষতরোগাক্রান্ত হতভাগাদিগের দশা দর্শনে সুকুমার প্রকৃতি লোকের এমনি আতঙ্ক জন্মে যে, তিনি ঝটিতি আপনাকে তদবস্থাপন্ন বলিয়া ভাবিয়া ফেলেন, তাঁহারো যেন সেই স্থানে ঘা হইয়াছে জ্ঞান হয়। এই ভাবনা এরূপ সতেজ যে, উহারি প্রভাবে সত্য সত্য শরীরের তত্তৎ অংশে যাতনা অনুভব হয়। খুব শক্ত সমর্থ পুরুষেরাও কবুল করেন, পরের চোক্ উঠিয়াছে, দেখিলে তাঁহাদিগের চক্ষে কিঞ্চিৎ অসুস্থতা অনুভব হয়। তাহার কারণ চক্ষু সকলকারি অতি কোমল অবয়ব, সুতরাং শারীরিক সামর্থ গুণে যাঁহার অন্যান্য অবয়ব অনুকম্পা জনিত যন্ত্রণাবিবেরে অগম্য তাঁহার চক্ষুর সে বিষয়ে অব্যাহতি নাই।

অধিকন্তু পরের দুঃখ বা যাতনাই কেবল আমরা দেখাদেখি ভোগ করিয়া থাকি এরূপ নহে; পরের অন্যান্য মনোবৃত্তিও দেখাদেখি সংক্রামক হয়। যে যে ব্যক্তির বিষয় আমি আলোচনা করিতেছি, তাঁহার যে কারণে যেরূপ মনোবৃত্তির উদয় হইতে পারে, মনোযোগী হইয়া ভাবিলে আমারও তদনুরূপ সর্ব্বপ্রকার মনোবৃত্তি আসিয়া জুটিবেক। রামায়ণ পাঠকালে রামের সীতা বিয়োগকালীন দুর্ব্বিষহ মনঃপীড়া আমাদিগের যেমন আস্বাদন হয়, সীতাপ্রাপ্তির সময়ে আহ্লাদও আমাদের তেমনি উথলে হয়। কাব্যনাটকের নায়কেরা বিপদে পতিত হইলে আমরা যেমন কষ্ট পাই, তাঁহাদিগের সেই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে দেখিলে তেমনি আনন্দ লাভ করি। যে সকল বিশ্বাসী বন্ধু সঙ্কটের সময় তাঁহাদের সঙ্গী হইয়াছিল, এবং প্রাণপণে সাহায্য করিয়াছিল আমাদিগের চিত্ত তাহাদিগের প্রতি অনির্ব্বচনীয় কৃতজ্ঞভাব ধারণ করে। আবার যে সকল পামর নরাধম বিশ্বাসঘাতক দুরাত্মা তাঁহাদিগের অনিষ্ট করিয়াছিল, অসময়ে পরিত্যাগ করিয়াছিল, অথবা প্রতারণা করিয়া সর্ব্বনাশের পথে আরোপিত করিয়াছিল, হৃদয় তাহাদিগের প্রতি কষায়িত হয়, এবং তাঁহারা সেই দুর্ব্বৃত্তদিগকে ঘৃণা ও দ্বেষ করিতেন, আমরাও উঁহার সঙ্গী হই। ফলত, মানবের চিত্তক্ষেত্রে যত প্রকার মনোবৃত্তির বীজ বপন হইয়া আছে তত প্রকার মনোবৃত্তিই দর্শককে আসিয়া আক্রমণ করিবেক, যখনি তিনি দেখিবেন কিম্বা আলোচনা করিবেন যে, কোন ব্যক্তি সেই সকল মনোবৃত্তির অন্যতর

কোন একটী মনোবৃত্তি সঞ্চারিত করিবার উপযুক্ত অবস্থাতে অবস্থিত আছেন।

পরের দুঃখ দেখিয়া তৎসঙ্গে আমাদের নিজের যে তদনুরূপ মনোবৃত্তি সঞ্চার হয়, উহাকে দয়া করুণা ইত্যাদি নামে আহ্বান করিয়া থাকে। 'অনুকম্পা' এই শব্দের প্রাথমিক অর্থও তাহাই হইবেক এবং সংস্কৃত ভাষায় অনুকম্পা আর দয়া এ দুই পর্য্যায় শব্দ। কিন্তু অনুকম্পা শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিলে স্থির হয় যে, পরের যে কোন মনোবৃত্তির দেখাদেখি আমাদের আপন মনে যখন উহার সংক্রমণ হয়, তখন সেই যাবতীয় সংক্রান্ত মনোবৃত্তিকে 'অনুকম্পা' নাম দিলে ক্ষতি নাই; কারণ 'অনু' বলিতে "সঙ্গে সঙ্গে" অর্থাৎ "পরের দেখিয়া"—আর 'কম্প' বলিতে 'বিচলিত হওয়া' 'কোন কিছু মনোবৃত্তির আবির্ভাবে পূর্ব্ববৎ ভাবের ব্যত্যয় হওয়া।'

কখন কখন কারণজ্ঞান ব্যতিরেকেও শুদ্ধ দেখাদেখি শোকানন্দাদির সংক্রমণ হয়। যে ব্যক্তিকে দেখিয়া আমাকে অনুকম্পা ধরিল, তিনি কি কারণে তৎকালীন মনোবৃত্তি বিশেষের বশীভূত হইয়াছেন, তাহা জানিনা, অথচ তাঁহার মূর্ত্তি অবলোকন মাত্র আমার হৃদয় অনুকম্পা রসে অভিষিক্ত হয়। এরূপ স্থলে মনোবৃত্তি সংক্রমণ হইতে কালবিলম্ব হয় না, তাড়িত্ অনুভবের ন্যায় উহা ঝটিতি এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে স্থানান্তরিত হয়। শোক বা আনন্দ যখন অতীব প্রকটরূপে কাহারো আকার প্রকারে প্রকাশ পায়, যখন তাহার দৃষ্টিপাত বা তাহার অঙ্গভঙ্গী সুস্পষ্টরূপে তাহার আন্তরিক সুখ দুঃখ নিবেদন করিতে থাকে, তখন উদাসীন ব্যক্তি কিঞ্চিদংশে সেই সুখ বা সেই দুঃখ দ্বারা আক্রান্ত না হইয়া যায় না। হাসি মুখ দেখিলে কাহার মন প্রফুল্ল না হয়? বিষণ্ণ মূর্ত্তি কাহার বিষাদ উপস্থিত না করে?

পরন্তু, তাবৎ মনোবৃত্তির পক্ষে একথা খাটে না। কারণজ্ঞান ব্যতিরেকে পরের সকল প্রকার মনোবৃত্তির সহিত আমরা একতান হইতে পারি না, বরং অনেক সময়ে তাহার প্রতি বিরূপ হই এবং তাহাকে দেখিতে ভাল লাগে না। যখন কেহ প্রচণ্ড ক্রোধভরে লম্পঝম্প করিতে থাকে, তখন যত ক্ষণ না জানিতে পারি তাহার কোপের কারণ কি, ততক্ষণ বরং কুপিত ব্যক্তির প্রতিই বিরাগ জন্মে। তাহার করালভাবের নিমিত্ত অবগত না হইলে তাহার তৎকালীন অবস্থা পরিপাটীরূপে বুঝা যায় না, আমরাও যে সেই অবস্থায় রাগত হইতাম, তাহা মনে আসে না, সুতরাং তাহার ক্রোধের অনুরূপ কোন মনোবৃত্তি আমরা তখন অনুভব করি না। প্রত্যুত সে যাহার উপর রাগ করিয়াছে, তাহারি অবস্থার প্রতি অনুকম্পা হয়। না জানি সেই ক্রোধের পাত্রের উপর কি দুরন্ত অত্যাপাত ঘটাইবেক, এই চিন্তায় হয় আমাদের ভয় হইতে থাকে, নয় দুষ্ট দমনের অভিলাষ জন্মে, এত বড় দস্যুর দৌরাত্ম্য নিবারণ করা যাউক এই বাসনাই প্রথমত আবির্ভাব হয়। শোক বা আন-

দের সময় কেনই যে দোখবা মাত্র অনু-কম্পা আসে, আর রাগের সময়ে কেনই সেরূপ হয় না, ইহার কারণ নিরূপণ করিতে বসিলে দৃষ্ট হইবেক যে, সুখী বা দুঃখী ব্যক্তির একজন প্রতিপক্ষ কেহ নাই। তাহার সুখ বা তাহার দুঃখ তাহার আপনাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে, তদ্দ্বারা অন্যের কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে বলিয়া অবধারিত নাই। সুতরাং শোকার্ত্ত বা আনন্দিত ব্যক্তির বিষয় আলোচনা কালে আমরা নিরুদ্বেগে তাহাকেই ভাবিতে থাকি। কিন্তু কুপিত ব্যক্তিকে সেরূপ নিরুদ্বেগে ভাবিবার যো নাই। তাঁহার প্রতি অনুকম্পা সঞ্চার হইতে গিয়াই তাঁহার কোপের পাত্রভূত ব্যক্তিদিগের বিষয় স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। সুতরাং অনুকম্পা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। কিন্তু মনোবৃত্তি মাত্রেরি ধর্ম্ম এই যে, একতান হইতে না পারিলে এবং এক বিষয়ের প্রতি প্রেরিত না হইলে উহার সেরূপ প্রখরতা বা সতেজভাব হয় না। যাহারা সকল বিষয়ে পরমেশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয়ত ভাবিবেন যে, ক্রোধ নাকি অপকৃষ্ট প্রবৃত্তি, ইহার অনিষ্ট কারিতাগুণ অতি প্রবল, ইহার দ্বারা জনসমাজের অশেষ বিশৃঙ্খলা ও অনর্থ আবির্ভাবিত হয়, অতএব ইহার প্রতি আর পাঁচ জনের অনুকম্পা প্রবর্ত্তিত হইলে ইহার বেগ অনিবার্য্য এবং ইহার অনুভবকারিত্ব বিস্তারিত হইত, পক্ষান্তরে পর দুঃখে দুঃখানুভব অতি সৎপ্রবৃত্তি, ইহাতে করিয়া ধরাধামের অনেক অমঙ্গল নষ্টই হইতে পারে এবং অনেক হিত সাধন হইতে পারে। এ নিমিত্ত দুঃখবিষয়ক অনুকম্পা যেন মুখিয়া থাকে, সুযোগ পাইলেই উদয় হয় এবং দুঃখিত ব্যক্তির দুর্দ্দশার যেখানে অবসান করা অসাধ্যও হয়, সেখানে সুমধুর সান্ত্বনা দ্বারা সে জনের দুঃখভারের লাঘব অন্তত সমাহিত হইয়া থাকে।

কিন্তু তা বলিয়া এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, কারণ জ্ঞান ব্যতিরেকে দুঃখ বিষয়ক অনুকম্পাও তেমন প্রবল বেগে বহিতে পারে। বরং যতক্ষণ না জানি যে কি কারণে দুঃখিত, ততক্ষণ অনুকম্পা অতি যৎসামান্য রূপেই সঞ্চার হয়। যখন কেহ সামান্যাকারে বিলাপ পরিতাপ করিতে থাকে এবং তদ্দ্বারা তাহার বিলাপ পরিতাপের উপলক্ষ কি তাহা প্রকাশ না পায়, তখন স্পষ্টরূপ অনুকম্পা ঠিক হয় না, পরন্তু তাহার দশার বিষয়ে অনুসন্ধান করণের নিমিত্ত কৌতূহল জন্মে এবং অনুকম্পা প্রদর্শনার্থ মন কিঞ্চিৎ সসজ্জ হয়। আমরা সর্ব্ব প্রথম তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাই, তোমার হইয়াছে কি? ইহার উত্তর যতক্ষণ না পাই, ততক্ষণ, না জানি ইহার কি ঘটিয়াছে, এই ভাবিয়া কিছু কষ্ট হইতে থাকে, কিন্তু সে কষ্টের আর এক বিশিষ্ট কারণ সংশয়াত্মিকা চিত্তবৃত্তি। ইহার কি হইয়াছে, এ বিষয়ে পাঁচখানা আন্দাজ করিতে থাকি, অথচ কিছুই ঠিক পাই না, এরূপ অনিশ্চয় ও সন্দেহের অবস্থা জনের পক্ষে নাকি কিছু কিছু ক্লেশ কর এ কারণ কৌতূহল

আর তাদৃশ অনিশ্চয়াবস্থা এ উভয় মিশ্রিত হইয়া কিঞ্চিৎ অস্থিরতা জন্মাইয়া দেয়। নতুবা প্রকৃত অনুকম্পা ভাগ তন্মধ্যে অতি স্বল্প। এ মতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পরের মনোবৃত্তি বিশেষের স্ফূর্ত্তি দর্শনে অনুকম্পা সঞ্চার সত সম্ভাবিত না হউক, পরের অবস্থা বিশেষ দর্শন দ্বারাই উহার অব্যভিচরিত রূপে সঞ্চার হয়। এ নিমিত্ত কখন কখন এমন ঘটে যে সে নিজে কিছুই অনুভব করিতেছে না, তাহার আপন দশার প্রতি তাহার মনোযোগ নাই উহা তাহার চক্ষের অগোচর রহিয়াছে, সুতরাং সে নিজে সেই দশার উপযুক্ত মনোবৃত্তি ভোগ করে না ইহা জানিয়াও আমাদিগের সে মনোবৃত্তি আবির্ভূত হয়। যেমন ভদ্রলোক মণ্ডলীতে যদি কোন অসভ্য অশিষ্ট ব্যক্তি অতি লজ্জাকর কোন কথা মুখে আনে, অভ্যাসদোষে সে অপ্রতিভ না হইলেও আমরা লজ্জিত হই, আমাদের গা জড়সড় হইয়া যায় এবং 'লোকটা বলিলে কি' ভাবিয়া বড়ই সঙ্কুচিত হইয়া যাই। তদ্রূপ মূর্খতা দোষে কাহারো কোন আচরণ-বৈগুণ্য অথবা অভদ্রতা ঘটিলে সে নিজে বিলক্ষণ নিরুৎসুক ও উদাসীন থাকে, তাহার লজ্জা বা ঘৃণা হয় না, অথচ আমরা সরমে মরিয়া যাই এবং বড়ই অপ্রস্তুত অধোবদন ও মলিন হই। ইহার হেতু আর কিছু নহে। আমরা মনে মনে আপনাদিগকে তৎস্থলাভিষিক্ত জ্ঞান করি। সত্য সত্য তৎস্থলাভিষিক্ত হইলে আমাদের যে লজ্জা ঘৃণা ও মালিন্য উপস্থিত হইত, কাল্পনিক তৎস্থলাভিষিক্ত হইয়াও সেইরূপ হয়, অথচ যাহার দ্বারা সেই আচরণ-বৈগুণ্য অনুষ্ঠিত হইল, সে সচ্ছন্দে বসিয়া আছে, তাহার নিজের লজ্জার লেশ মাত্র নাই। অতএব বলিতে হইবেক যে পরের মনের ভাবের দেখাদেখি সেইরূপ মনের ভাব আমার সর্ব্বত্র না ঘটুক, সেইরূপ ভাব আবির্ভাব করিবার উপযুক্ত অবস্থাতে পরকে অবস্থিত দেখিলে অবশ্য অবশ্য আমার সেইরূপ ভাব হয়।

এ কথার আরও দুএক বিশিষ্ট প্রমাণ উল্লেখ করা যাইতেছে। নরলোকের পক্ষে অপরিহার্য্য যে সকল দুর্গতি ধরাধামের অনর্থ স্বরূপ হইয়াছে, উন্মাদ রোগের বাড়া শোকাবহ অবস্থা দ্বিতীয় নাই। বুদ্ধির বিকার অপেক্ষা দুর্ঘটনা আর কি আছে? এ কারণ যাঁহার মনে এক কণা করুণাও বিদ্যমান আছে, তিনি উন্মত্ত ব্যক্তির দশা দর্শনে যেরূপ বিগলিত ও অনুকম্পান্বিত হইবেন, তেমন আর কিছুতে নহে। কিন্তু উন্মত্ত ব্যক্তি নিজে আপন অবস্থা কিছুই বুঝে না, সে হাসে, নৃত্য করে, ক্রীড়া বিহারে প্রবৃত্ত হয় এবং সর্ব্ব প্রকার লক্ষণ দ্বারা জানাইয়া দেয় যে, আর যেই কেন ক্লেশ পাউক না, সে নিজে সদানন্দ। অতএব এ স্থলে বলিতে হইবেক যে, শুদ্ধ পরকে ক্লেশ অনুভব করিতে দেখিলেই অনুকম্পা হয়, এরূপ নহে; পরন্তু পরের মত অবস্থাতে পতিত হওয়া আমার পক্ষে বড় ক্লেশের বিষয়

হইবেক এই ভাবনা দ্বারাই অনুকম্পা জন্মে। আমরা যেন উন্মত্ত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হইয়াছি এরূপ জ্ঞান করি; সেই উন্মাদাবস্থা আর বর্ত্তমান ক্লেশানুভব শক্তি এ উভয় একত্র হইলে যে নিদারুণ যন্ত্রণা ঘটিত, তাহার চিন্তাতে আমাদিগকে অধীর করিয়া ফেলে। কিন্তু ক্লেশ যেমন এক প্রকার মনোবৃত্তি তেমনি শোক অহঙ্কার দয়া লোভ লজ্জা ইত্যাদি অন্যান্য মনোবৃত্তিও আছে। সুতরাং বাস্তবিক তাহাদের একটী উদয় হইয়াছে ইহা না দেখিলেও যদি আমরা বুঝি যে, তাহারা যে অবস্থায় পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদের হইত, তাহা হইলেই আমরা সেই সেই মনোবৃত্তি সম্পর্কীয় অনুকম্পার গম্য হইয়া

দ্বিতীয় প্রমাণ, অক্রবাণ শিশুর শারীরিক ক্লেশ দর্শনে জননীর যে কষ্ট হয়। সেই শিশু আপন যন্ত্রণা স্পষ্টরূপে জানাইতে পারিতেছে না, হাত পা বাঁধার মত ক্রমাগত সহ্য করিয়া যাইতেছে. আহা তাহার মত অশরণ নিরুপায় জীব আর নাই, না জানি কতই ক্লেশ উহার হইতেছে। এ সমস্ত চিন্তা জননীরত হয়ই; কিন্তু তৎসহকারে শিশুর নিজের অপ্রাপ্য অনেক চিন্তা আসিয়া জুটে। শিশুর তখন ভবিষ্যচ্চিন্তা নাই, সে কেবল তত্তৎক্ষণকালীন উপস্থিত অসুখ মাত্র ভোগ করিতেছে, সে অসুখ তত অধিকও নহে। ভবিষ্যতের বিষয়ে তাহার কোন ঝঞ্ঝাট নাই; তাহার সেই বেহোঁশ অবস্থা; তাহার তৎকালীন অপরিণামদর্শিতাই তাহার ভবিষ্যদ্বিষয়ক উদ্বেগ ও আশঙ্কার অব্যর্থ মহৌষধ স্বরূপ হইয়া আছে; আর বাস্তবিকও সে যখন বড় হইবে, তখন হাজার জ্ঞানী হাজার সুবিবেচক হইলেও সেই সকল উদ্বেগ সেই সকল অশুভাকাঙ্খাই তাহার অতি বিষম যন্ত্রণা স্বরূপ হইয়া উঠিবেক। অতএব শৈশবে যখন তাহা নাই, তখন তাহার দুঃখের অনেক লাঘব বলিতে হইবেক। জননীর কিছু তাহা স্মরণ নাই। তিনি ভবিষ্যচ্চিন্তাকে আপন অনুকম্পা হইতে স্বতন্ত্র করিতে জানেন না। উপস্থিত উপদ্রবের পরিণামে না জানি কি আছে এই চিন্তা আর শিশুর নিরুপায়ভাব বিষয়ক চিন্তা এ উভয় একত্র হইয়া তাঁহার অনুকম্পা উজ্বল করিয়া তুলে। তখন তাঁহার চক্ষে বিষাদ ও যাতনার যে ছবি দেখা দেয়, তাহার মত ঘোরতর করাল ছবি আর নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে যে, পরের ক্লেশে ক্লেশ বোধ যে করা হয়, তাহা পরের ক্লেশের প্রকৃত মাত্রা অনুসারে নহে; কিন্তু তদবস্থাপন্ন হইলে আমরা যাহা ভুগিতাম সেই মাত্রা ধরিয়া।

এই স্বভাবের সর্ব্বাপেক্ষা অসন্দিগ্ধ প্রমাণ মৃত ব্যক্তির অবস্থাতে অনুকম্পা প্রদর্শন। সে অনুকম্পা কেবল উহার পারত্রিকের বিষয় ভাবিয়া নহে। প্রত্যুত তাহার তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে যে সকল বিষয় আমাদিগের বড় লাগে, অথচ যাহার দ্বারা তাহার নিজের কিছুই আসে যায় না, তদ্ভাবৎ ভাবিয়াও ব্যাকুল হই। আহা বেচারাকে শকুনি শৃগাল সমাকীর্ণ

শ্মশানে শয়ন করাইয়াছে, অবিলম্বে কঠিন কাষ্ঠ শাখাতে তাহাকে শোয়াইবে, তাহার গায়ে আগুণ লাগাইয়া দিবে, তাহাকে একাকী ফেলিয়া যাইবে, ইহা ভাবিতে ভাবিতে শোক দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। অচির-কাল পরে তাহার নামও কেহ করিবেক না, তাহার তরে কেহই ভাবিবেক না, তাহার চিহ্ন ভূভারত হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবেক, ইহা কি সামান্য আক্ষেপ, সামান্য পরিতাপ? আহা, তাহার দুর্দ্দশাতে অনুকম্পা না হইবেক, ত আর কিসে হইবেক! সকলেই তাহাকে বিস্মৃত হইতে চলিল, তখন কি আমার উচিত নয় যে আমি জপমালার মত অহরহ তাহার নাম লই? এইরূপ তাহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধ শান্তি করিয়া আমরা কথঞ্চিৎ তাহার নাম বজায় রাখিবার চেষ্টা পাই। তাহাকে একেবারে খরচ লিখিতে মায়া করে। এ সকল উপায়ে তাহাকে যে আর বাঁচাইতে পারিব না, তাহার দুর্দ্দশার অবসান হই-বেক না, ইহা আরো পরিতাপের বিষয়। আমাদিগের আর্ত্তনাদ বিলাপপরিতাপ দ্বারা তাহার অবস্থার কিছুই আসান নাই, কিছুই সচ্ছন্দ নাই, ইহাতে করিয়া তাহার দুরবস্থা বিষয়িণী চিন্তা আরো গাঢ়তর হইয়া উঠে। কিন্তু ইহা কেনা জানে যে, মৃত ব্যক্তির সুখ দুঃখের সহিত এ সকলের কোন সম্পর্ক নাই। তাহার অনন্ত নিদ্রার প্রগাঢ় নিস্তব্ধভাব এ সকল চিন্তা দ্বারা অনুমাত্র অন্যথাভূত হইবেক না। কল্পনা বলে মৃত ব্যক্তির তৎকালীন দশাকে আমরা যে দুর্ব্বিষহ বিষাদময় বলিয়া জ্ঞান করি, তাহার কারণ শুদ্ধ মৃত ব্যক্তির অব-স্থার সহিত আপনাদিগের অনুভব শক্তিকে সংযোজিত করা। আমরা যেন তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি যে আমরা ঈদৃশ দশায় কি ভাবিতাম। আমাদিগের জীয়ন্ত অন্তরাত্মা যেন তাহা-দিগের শবশরীরের অভ্যন্তরে স্থান গ্রহণ করে, অথচ উহার শবভাব নিরস্ত হয় না। এই ভ্রান্তিই শ্মশান-বৈরাগ্যের অদ্বিতীয় কারণ; ইহারি প্রভাবে মৃত্যু এত বিকট সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রাণভয় মানুষের মনের এত প্রবল এক প্রবৃত্তি হইয়া আছে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত তিন নিদর্শন অর্থাৎ উন্মত্ত ব্যক্তির অবস্থা অক্রবাণ শিশুর দশা আর মৃত ব্যক্তির দুর্গতি এই তিন বৃত্তান্ত হইতে বুঝিয়া লইতে হইবেক যে, পরের মনোবৃত্তি দর্শনে যে তদনু-রূপ মনোবৃত্তি উদয় হয়, উহা আপনা-দিগকে তৎস্থলাভিষিক্ত জ্ঞান করিয়া; দ্বিতীয়ত অনেক স্থলে পরের মনোবৃত্তি দর্শন অপেক্ষা করে না, উহার অবস্থা দর্শনই যথেষ্ট হয়; তৃতীয়ত ভ্রান্তিই উৎকট অনুকম্পার প্রধান কারণ।

বঙ্গসুন্দরী।

তৃতীয় সর্গ,—চির পরাধীনী বঙ্গবালা।

"ভবাদৃশেষু প্রমদাজনোদিত-
ম্ভবত্যধিক্ষেপ ইবানুশাসনম্।
তথাপি বক্তুং ব্যবসায়যন্তি মা-
ন্নিরস্তনারীসময়া দুরাধয়ঃ ॥"

ভারবি।

কেন কেন আজি সদাই আমার,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে উঠিছে প্রাণ;
হেন আলোময় এ সুখ সংসার,
যেন তমোময় হইছে জ্ঞান!

আহা বহি গুলি চারিদিকে মম,
ছড়িয়ে পড়িয়ে রয়েছে আজ;
অতি দুখিনীর বালিকার সম,
ধলায় ধসর মলিন সাজ!

আগেকার মত স্নেহেতে তুলিয়ে,
গুছায়ে রাখিতে যতন নাই;
আগেকার মত হৃদয়ে লইয়ে,
খুলিয়ে পড়িয়ে সুখ না পাই।

অয়ি সরস্বতী! এস বুকে এস,
বড় আদরের ধন আমার;
অযতনে হায় হেন ম্লান বেশ,
করিয়ে রেখেছি আমি তোমার!

৫

তুমি না থাকিলে কি হ'ত জানিনি,
এত দিনে পোড়া কপালে মোর;
হয় তো পাগল হয়ে অভাগিনী,
ঝুলিতো গলায় বাঁধিয়ে ডোর।

৬

হায় গৌরবিণী, জাননা গো তুমি,
চোক্ ফুটাইয়ে দিয়েছ কার;
কাপুরুষময়ী এই বঙ্গভূমি,
আমি পরাধিনী তনয়া তাঁর।

অন্দর মহল অন্ধ কারাগার,
বাঁধা আছি সদা ইহার মাঝে,
দাসীদের মত খাটি অনিবার,
গুরু জন মন মতন কাজে।

পান থেকে চুন্ খশিলে হটাৎ,
একেবারে আর রক্ষে নাই;
হয়ে গেছে যেন কত ইন্দ্রপাত,
কোণে বোসে কুণো গুঁতুনি খাই।

অনায়াসে দাসী ছেড়ে চোলে যায়,
খামকা গঞ্জনা সহিতে নারি;
অভাগীর নাই কিছুই উপায়'
কেনা দাসী আমি কুলের নারী।

১০

এক হাত কোরে ঘোমটা টানিয়ে,
চুপ্ কোরে মোরে দাঁড়াতে হয় ;
তাঁরা যা কবেন, যাইব শুনিয়ে.
মুখফোটা তাহে উচিত নয়।

১১

হাঁপায়ে হাঁপায়ে ঘোমটা ভিতরে,
যদিও পচিয়ে মরিয়ে যাই ;
তবুও উঠিয়ে ছাতের উপরে,
সমীর সেবিয়ে বেড়াতে নাই।

১২

যদি কেহ দেখে, যাবে কুলমান,
হবে অপযশ দশের মাজে ;
ছাতের উপরে বেড়িয়ে বেড়ান,
কুলবতীদের নাহিক সাজে।

১৩

শুনেছি পুরাণে রাজা ভগীরথ,
অনেক কঠোর তপের বলে,
পুরায়ে ছিলেন নিজ মনোরথ
গঙ্গারে আনিয়ে এ মহীতলে।

১৪

সেই ভাগিরথী পতিতপাবনী,
দুয়ারের কাছে বলিলে হয় ;
শুনি ঘরে থেকে দিবস রজনী,
কুলুকুলু ধ্বনি করিয়ে বয়।

১৫

তাঁহার পাবন দরশ পরশ,
কপালে আমার ঘটেনি কভু ;
স্নান করিবারে চাহি যে দিবস,
ধম্‌কায়ে মানা করেন প্রভু।

১৬

প্রভাত না হ'তে লোক-কোলাহলে,
গগণ পবন পুরিয়ে যায়,
যেন আসে বান্ তরঙ্গিনী জলে,
কলকল কোরে ঘুরে বেড়ায়।

১৭

রজনী আইলে লুকায় মিহির,
ধরণী আবৃত তিমির বাসে ;
ক্রমে যত হয় যামিনী গভীর,
তত কলরব নিবিয়ে আসে।

১৮

যায় আসে এই রূপে দিন রাত,
মানুষের কোলাহলের সনে ;
যেন দেখি আমি এই গতায়াত,
বসে একাকিনী বিজন বনে।

১৯

আমার সহিতে সেই জনতার,
যেন কোন কিছু সুবাদ নাই ;
যেন কোন ধার ধারিনে তাহার,
থাকি প্রভু-ঘরে প্রভুরি খাই।

২০

বই নিয়ে বোসে বিষম বিপদ,
বুঝিতে পারিনে উপমা তার ;
বুঝি বা কেমনে শুনিয়ে শবদ,
হেরি নাই কভু স্বরূপ যার।

২১

বন, উপবন, ভূধর, সাগর,
তরল লহরী নদীর বুকে :
গ্রাম, উপগ্রাম, নিকুঞ্জ, নিঝর,
শু'নেছেম্ শুদু লোকেরি মুখে !

২২

কারার বাহিরে না জানি কেমন,
হাট, বাট, ঘাট কতই আছে;
সে সকল যেন মেরুর মতন,
অজানা রয়েছে আমার কাছে।

২৩

যেমন দেশের পুরুষ সকলে,
দেশ ছাড়া কিছু দেখেন নাই;
তেমনি আমরা অন্দর মহলে,
অন্দর মহল দেখি সদাই।

২৪

বাহিরে ইঁহারা সহিয়ে সহিয়ে,
ম্লেচ্ছ পদাঘাতে পিষিত হন;
রাগে ফুলে ফুলে ঘরেতে আসিয়ে,
যত খুসি ঝাল ঝাড়িয়ে লন।

২৫

হায়রে কপাল! পুরুষ সকল,
বাহিরে খাইয়ে পরের বাড়ি,
অমন করিয়ে কি হইবে বল,
ঠ্যাঙায়ে ভাঙিলে ঘরের হাঁড়ি?

২৬

গারদে রেখেছ দুখিনী সকলে,
অধীনতা বেড়ি পরায়ে পায়;
জাননাক হায় সতীশাপানলে,
পুরুষের সুখ জ্বলিয়ে যায়।

২৭

বেড়ি খুলে নাও, প্রাণে যাই মারা;
তোমাদের মন সুখেতে থাক্;
আমাদের শাপে ম্লেচ্ছ দুরাত্মারা,
উড়ে পুড়ে দেশে চলিয়া যাক্।

২৮

প্রথম যে দিন বহিগুলি আনি,
প্রিয় পতি মম দিলেন হাতে;
ভাবিলাম বুঝি কতই না জানি,
অগাধ আনন্দ রয়েছে তাতে।

২৯

বলিলেন তিনি "এ এক আরসি,
স্থির হয়ে যত চাহিয়ে রবে,
ততই ইহার ভিতরে প্রেয়সী!
প্রকৃতি রূপসী উদয় হবে।

৩০

হবে আবিষ্কৃত সমুখে তোমার,
আলোময় এক সুখের পথ;
ঘুচে যাবে সব ভ্রম অন্ধকার,
নব নব সুখ পাইবে কত।"

৩১

অয়ি নাথ! আহা যাহা বোলেছিলে,
একটীও কথা বিফল নয়;
গ্রন্থ আলোচনা যতনে করিলে,
উদার জ্ঞানের উদয় হয়।

৩২

কিন্তু হে জাননা অভাগা কপালে,
যত ভাল, সব উলটে যায়;
বাঁচিবার তরে ডাঙায় দাঁড়ালে,
ভুঁই কুঁড়ে এসে কুমীরে খায়।

৩৩

অতি অভাগিনী আমি বঙ্গবালা,
শাস্ত্র সুধা পান যতই করি;
তত আরো হায় বেড়ে যায় জ্বালা,
ছট্ ফট্ কোরে পরাণে মরি।

৩৪

আগে এই মন ছিল এতটুকু,
ছিল তমোময় জগত জাল;
নিয়ে আপনার এটুকু ওটুকু,
হেসে খুসে বেস কাটিতো কাল।

৩৫

এবে এই মন আর সেই নয়;
তিমিরা রজনী হয়েছে ভোর;
প্রাচীতে তরুণ অরুণ উদয়,
ভাঙিয়ে গিয়েছে ঘুমের ঘোর।

৩৬

এমন সময়ে খাঁচার ভিতরে,
আর বাঁধা বল কেমনে থাকি;
দেখ এসে নাথ তোমার পিঞ্জরে,
কাতর হইয়ে কাঁদিছে পাকি।

৩৭

আহা তুমি ওকে ছেড়ে দাও দাও,
বাতাসে বেড়াক্ আপন মনে;
তোমরা যেমন বাতাসে বেড়াও,
আপনার মনে দশের সনে।

৩৮

যদিহে আমরা তোমাদের ঘোরে,
অবরোধে পুরে বাঁধিয়ে রাখি,
তোমরাও কাঁদ অম্বিতর কোরে,
যেমন পিঞ্জরে কাঁদিছে পাখী।

৩৯

হায় হায় হায় বৃথা গেল দিন!
কিছুই করিতে নারিনু ভবে;
ক্রমেই আমার বাড়িতেছে ঋণ,
নাহি জানি শেষে কি দশা হবে

৪০

জনম অবধি খাইয়ে পরিয়ে,
ভবের ভাণ্ডার করেছি ক্ষয়,
সেই মহা ক্ষতি পূরায়ে না দিয়ে,
কার্ বল সুখে নিদ্রা হয়?

৪১

এখনো ইহারা কেন গো আমারে,
আঁধারে ফেলিয়ে রাখিছে আর,
কোন্ কাপুরুষ মানব সংসারে,
শুধিবে আমার নিজের ধার?

৪২

করম ভূমিতে করিবারে কিছু,
বড়ই আমার উঠেছে মন;
আজ কথনই হটিবনা পিছু,
সাধন অথবা হবে পতন!

৪৩

হা নাথ, হইল দিবা অবসান,
এত দেরি হেরি কিসের তরে;
তিমিরে ধরণী ঢাকিল বয়ান,
এখনও তুমি এলে না ঘরে!

৪৪

আহা! ঘরে আসি আজি প্রিয়তম,
কৈও কৈও দুটো নরম কথা;
যেন হে হটাৎ হইয়ে গরম,
ব্যথার উপরে দিওনা ব্যথা।

৪৫

আপনা ভুলিয়ে তোমায় লইয়ে,
রাজি আছি আজো ধরিতে প্রাণ;
অপমান করা তুমি তেয়াগিয়ে,
অধিনীর যদি রাখ হে মান।

৪৬

শ্বশুর শাশুড়ী বুড়ো সুড়ো লোক,
বোকুন্ ঝোকুন্ ভরিনে কাণে;
যে জন পেয়েছে জ্ঞানের আলোক,
তার কড়া কথা বাজেহে প্রাণে।

৪৭

হায় মায়া আশা! কেন মিছে আর,
কাণে কাণে গাও কুহক গান;
বাজায়ে বাঁশরী ব্যাধ দুরাচার,
হরিণীর বুকে হানে গো বাণ!

৪৮

প্রাণের ভিতর উদাস, নিরাশ,
ক্রমেই হুতাশ বাড়িছে মোর;
ওঠোওঠো-প্রায় প্রলয় বাতাস,
অভাগীর বাজী হয়েছে ভোর!

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে বঙ্গবালা নামক
তৃতীয় সর্গ। *

* এই সর্গে আমরা যে মনস্বিনীর মনোগত ভাব চিত্র করিতে যত্ন পাইয়াছি তাঁহার স্বরচিত বঙ্গকন্যা নামক পদ্য সন্দর্ভের সর্ব্ব শেষে পতির প্রতি উক্তি নামে যে বার পঁক্তি পয়ার আছে, তাহা সমাদর পূর্ব্বক এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।
"শুন ওহে প্রাণনাথ নিবেদন করি!
দারুণ যাতনা আর সহিতে না পারি॥
আমাদের সম দুখি দেখিতে না পাই।
তোমার নিকটে তাই এ কষ্ট জানাই॥
পাখি পক্ষী তারা সুখী আমাদের চেয়ে।
অধীনতা বেড়ি নাই তাহাদের পায়ে॥
বন জন্তু হরিণের বোধাবোধ নাই,
স্বাধীনা হরিণী, তার মনে কষ্ট নাই,
নাই তার কোন ভয় ভোলা খোলা মনে,
স্বভাবের শোভা হেরে বেড়ায় কাননে॥
দুর্ল্লভ মানব জন্ম পাইয়ে ধরায়
পশুদেরো হ'তে নীচ হতে হ'ল হায়!
"বঙ্গকন্যা" সন্দর্ভ ১২৭৪ সালের অবোধবন্ধুর দশম সংখ্যায় এবং আমার। "পরাধীনা" অষ্টম সংখ্যায় আছে।

গণক ঠাকুর।

যোনকসা কড়িকসা যখনি বলিবা মাত্র মুখে মুখে কসিতে পারিতেন, বাল্যকালে তাঁহাকে বড় এক জন ছোট খাট লোক বলিয়া বোধ হইত না। বাজার করিতে গিয়া দোকানে এরূপ একজনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে লজ্জায় ও ভয়ে জড়শড় হইতে হইত, এবং লোকটার দেব দেবতার সহিত কুটুম্বিতা আছে বলিয়াই স্থির করিয়া ফিরিয়া আসিতাম। গুরু-মহাশয়ের কৃপায় ও শুভঙ্করী মন্ত্রদীক্ষার ক্রমে সে ঘোরটা অতি অল্প দিনেই ভাঙ্গিয়া গেল। ভাবিলাম বাঁচা গেল। কিন্তু আর একটা উচ্চদরের খট্‌কা ভাগ্যক্রমে বয়সের সঙ্গেই মনে খট্ খট্ করে চল্‌তে লাগিল। অদ্যাবধিও দুই একবার খচ্ খচ্ করে। তবে সম্প্রতি ঘুচাবার কিছু সুযোগ হাত করা গেছ্‌লো তাহাতে অনেক কায হয়েছে। খুলে দিলে অনেকের আরাম দেবে এই ভরসায় বলা গেল।

যে খট্‌কার কথা উল্লেখ করা হচ্ছিলো সেটা আমাদের দেশের গণৎকার। চির-কাল শুনিয়া আসিতে ছিলাম এঁরা নাকি মনের কথা ফড়্‌ফড়্ বলিয়া দেন। ভূত ভবিষ্যৎ এঁদের দেখ্‌লে মাতা নোয়ায়। সুতরাং শাস্ত্রটির প্রতি প্রগাঢ় একটা ভক্তি ছিল। এবং তাহার কথা মনে হইলেই অন্তঃকরণ বিস্ময় রসে প্লাবিত হইত। বিশেষ শুনিতাম যে যে দে

কাছে হইলেই ধুনার গন্ধে মনসার ন্যায় শাস্ত্রটীর বল দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। গণনা মাগীদের মনের আটাকাটী, পালান নায়কের শিক্‌রে; ও গর্ভাধানের অষ্টাবক্র আশীর্ব্বাদ। নিমরাজি কর্ত্তাদিগের বশীকরণ বিষয়ে ইনি নাকি কাঁচা ডেলে আদা ছেঁচা। পলিত মস্তক মৃত্যুভীত পুরুষদিগকে ও নাকি ইনি ফেলেন না; বরং বিশেষ, অন্ততঃ তুল্য কৃপাই করিয়া থাকেন। তবে কেবল যুবা পুরুষদিগের প্রতিই নাকি কিছু গররাজি। বিশেষতঃ কৃতবিদ্য হইলে, জলৌকার লবণের ন্যায়, এই সকল হতভাগ্যেরা তাঁহার আন্তরিক পীড়া উৎপাদন করে। তাহাতে আমার বিশেষই দুঃখিত ছিলাম।

কারণ যুবকেরাই সমাজের উন্নতি ও মনুষ্যের হিত ও সুখ সাধনে যথার্থ সক্ষম। অতএব সংসারে যত কিছু মঙ্গলকর বস্তু আছে তাহাদিগের সহিত সর্ব্বাগ্রে পরিচিত হওয়া উচিত। সুতরাং গণকদিগের ও গণনা শাস্ত্রের সহিত তাঁহাদিগের বিশেষ সদ্‌ভাব আবশ্যক। কারণ এরূপ সাহায্যে পৃথিবীকে স্বর্গেও মানবদিগকে অমরে পরিণত করিতে বড় অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। পৃথিবীতে এমন কি সুখ আছে যে, ঋষিবর্ণিত স্বর্গসুখ পরিত্যাগ করিয়া সংসারের বেটো হইয়া থাকি। সুতরাং যাহাতে বিবাদটা চুকিয়া যায় এই চিন্তায়ই অহরহঃ ফিরিয়া বেড়াই।

এই অবস্থায় কিছু কাল গত হয়। কার্য্য বশে এক দিন বৈচী যাইতে প্রয়োজন হইল। বৈচী ইষ্টইণ্ডিয়া রেইলওয়ের শক্তিঘর ষ্টেসন হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ। আমি কলিকাতা হইতে ১১।০ টার গাড়িতে চাপিয়া বেলা প্রায় ২॥০ টার সময় শক্তিঘরে অবরোহণ করিলাম। মাসটা চৈত্র। দিবাকর পূর্ণ পরাক্রমে কর হানিতেছেন। পৃথিবী দাপটে ফাটিয়া ফুটা হইয়া আছেন। মাঠে তৃণ গাছটী নাই। গোষ্পদ খণ্ডিত কর্দ্দমখণ্ড শুকাইয়া ক্ষুরের ধার ধারণ করিয়াছে; লাগিবা মাত্র রক্তপাত করে। শুষ্ক-সলিল সুবিস্তৃত তড়াগ সকল হৃতসার ধনিকের ন্যায় বিরসভাবে পড়িয়া হাঁ হাঁ করিতেছে। জীবমাত্রের সহিত সাক্ষাৎ হয় না। মধ্যে মধ্যে গলিতপত্র অশ্বত্থশাখায় বসিয়া দুই একটা ঘুঘু করুণস্বরে মন উড়াইয়া লইতেছে। বিঘা দুই যাইতেই সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মে ভিজিয়া উঠিল। রৌদ্রে কণ্ঠশোষ উপস্থিত; তাহাতে সম্মুখবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র গ্রামের দুই চারি খানি কুটীরের নূতনখড়েছাওয়া সুচারু মটকার টানে প্রাণ আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িল। মন অলৌকিক ক্ষিপ্রগতির অধিকারী বলিয়া অগ্রেই দৌড়িয়া উপস্থিত হইল; পদ অসার বৈকল্য মাত্রে নির্ভর করিয়া ছুটাছুটী করত দুই চারিটা চোটও খাইল। যাহা হউক তাড়া ছিল; প্রতিহত না হইয়া অনতিবিলম্বে গ্রামে পৌছাইল। পৌছিয়া দুই চারি খানি দোচালা বেঁশোঘর ছাড়াইয়া এক খানি প্রাচীর বন্দী বাটী দেখিতে পাইলাম।

ঘুরিয়া দরজার দিকে উপস্থিত হইলাম। দরজার দুই দিকে দুইটা পরি-

স্কার নিকান দাওয়া এক খানি এক চালায় ঢাকা। চারিটী আলকাতরা মাথান কাল চুকচুকে নিমের খুটী তলা ও গলায় অতি নৈপুণ্যের সহিত পদ্মকাটা। দরজার সম্মুখটী দুর্গার চালের মত। বাজুর দুই পাশে দুইটী বিট; তাহার পাশে দুইটী আদেঙ্গা গা থাম। দরজার প্রাচীরটী রাঙ্গামাটীতে টক্ টক্ করিতেছে। দেখিয়া বাটীর কর্ত্তা সঙ্গতিপন্ন ও ভদ্র লোক বলিয়া প্রতীত হইল। অগ্রসর হইয়া দুই চারিটা পেটমোটা মরাই দেখিয়া একবারে নিঃসন্দেহ হইলাম। বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম একখানি পীড়ার উপর একটী ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মণটী দীর্ঘাকার ও যথার্থ শ্যামবর্ণ। কৃশ; মস্তকে টিকী লম্বিত। গলায় ধপধপে পৈতার গোছা। কপালে, কাণের ও কণ্ঠের নিম্নে গুটিকত শ্বেত চন্দনের ফোটা। চেহারাটী দেখিয়া পঞ্জিকার সক্রান্তি মনে পড়িল এবং যেরূপ শুনা ছিল মিল করিয়া তাঁহাকে গণৎকার বলিয়া সন্দেহ হইল। ক্রমে দুই চারিটী আধাবয়সী বিধবা ও কএক জন বড় গিন্নী আসিয়া চারে দেখা দিলেন; অমনি সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল। কারণ সচরাচর দেখিতে পাই ষষ্ঠী, মাকাল, পেঁচো, পঞ্চানন্দ, নিরাশ্রয় মোহান্ত ও পাণ্ডার প্রতিপালন এঁরাই করিয়া থাকেন। যাহা ভাবিয়া ছিলাম শুনিলাম ও তাই। আমাকে দেখিয়া মহামায়ারা প্রথমে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলেন। কিন্তু আমি পথিক; বিশ্রামের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইয়াছি শুনিয়া আর কোন উৎপাত রহিল না। আমি দৈবক্রমে বাঞ্ছিতসংঘটনায় পরম সন্তুষ্ট ও উৎসুক হইয়া এবং স্ত্রীদিগের উপেক্ষায় সাহসী হইয়া দুষ্টে নিকট ঘেঁসিয়া বসিলাম। মনে ভক্তি থাকায় গণকের প্রত্যেক ক্রিয়াই বিস্ময়ের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম! আমার বয়স গণকঠাকুরের প্রথমে কিছু সন্দেহ ও চাঞ্চল্য উৎপাদন করিল কিন্তু আমার প্রত্যয় মাখা মুখ দেখিয়া হস্তস্থ পঞ্জিকা খানীর দড়ি খুলিতে আরম্ভ করিলেন। খুলিতে খুলিতে কতগুলি পয়ার ও দুই একটী সংস্কৃত কবিতাও অতি জলদ্ স্বরে ও অর্দ্ধস্ফুট অর্দ্ধশ্রাব্য রূপে আওড়াইতে লাগিলেন। শাস্ত্রের প্রতি আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস থাকাতে পুথী খানীর দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলাম। কিন্তু গণক ঠাকুরের দৃষ্টি অধিকাংশই স্ত্রীলোক দিগের মুখভঙ্গি ও নয়ন চালনের এবং মন তাঁহাদিগের কথোপকথনের দিকেই ছিল, পুঁথি খানি সম্মুখে খোলা মাত্র ছিল। দেখিয়া প্রথম হইতেই মনে কিছু গোল লাগিল। কিছু বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক চুপ করিয়া রহিলাম।

ইতিমধ্যে বাটীর ভিতর হইতে একজন ছেলে কোলে ভট্টাচার্য্য-পালিকা বহির্গত হইয়া বলিল" কইলো বড় গিন্নি তোর কি হলো! সেখো সব"—বলিতে বলিতে গণকঠাকুর ও আমাকে দেখিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিলেন এবং উপস্থিতের মধ্যে একজন মৃদুস্বরে "চুপ করলে, বলিসনে গণকঠাকুরকে ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করছি" —বলাতে চুপ করিয়া বসিলেন। অব্যবহিত পরেই বড়গিন্নী বলিলেন "গণকঠাকুর বল দেখি আমি কি মনে করেছি ও সেটা ঘটবে কি না"। গণকঠাকুর কিচির মিচির স্বরে "তাল নারিকেল, নারিকেল তাল দেখে নাহি ঘটে জঞ্জাল; চাঁপার ডালে ভ্রমরছান), ঐ মাগীটে বড় সেয়ানা" এবং অন্যান্য নানাবিধ অর্থ-হীন ও অর্দ্ধশ্রাব্য শ্লোক উচ্চারণ করিয়া কহিলেন "আপনি তীর্থ দর্শনে মন করিয়াছেন। আপাততঃ প্রথমে ৺জগন্নাথ ধাম গমনেরই উদ্যোগ করিতেছেন।" গিন্নীর গালপোরা হাসি। কিন্তু উত্তরটা আমার ঝুঁট্ দেখে এঁড়ে

ঠাওরাণোর মত হইল। একে বড়গিন্নীর বয়স বড় তাহাতে আবার সেখোর কথায় তীর্থ যাত্রায় মনন টা নিজেই ছুটিয়া আসিল; হাত ও বাড়াইতে হইল না। তবে কাশী বৃন্দাবন প্রয়াগাদির মধ্যে শ্রীক্ষেত্রটাই কিরূপে উপস্থিত হইল ভাবিয়া প্রথমতঃ, কিছু আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। কিন্তু অব্যবহিত পরেই সে বৎসর রথটা আষাঢ়ের সকাল সকাল পড়িয়াছিল মনে পড়িয়া সে ভুরটা ভাঙ্গিয়া গেল। মন চিরাচরিত খট খটানীর বহুল নিবৃত্তি হেতুক আনন্দে উথলিয়া উঠিল, এবং স্বভাব সিদ্ধ শান্তি অবলম্বন করিয়া স্থিরভাবে কার্য্য কারণ চিন্তায় নিযুক্ত হইল। তখন দেখিতে পাইলাম কৃত বিদ্য যুবকেরা ইঁহাদিগের শত্রুতা ন্যায়পূর্ব্বকই করিয়া থাকেন। ভ্রম নিরাকরণ করিয়া সুখপথ দেখাইয়া দেওয়াই বিদ্যার প্রধান চেষ্টা। অন্ধকার দূরীকরণ করাই তপনের এক মাত্র উপযোগিতা। বাগ্-দেবী যুক্তি ও কারণজ্ঞান-বিরহিত নৈবেদ্য আদ্যন্তই গ্রহণ করেন না। অসম্ভব ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেও জ্ঞান ইন্দ্রজালের প্রভাব ভিন্ন সে বিষয়ে আর কিছুই অনুমান করেন না। গণনা অপেক্ষা পৃথিবীতে অসম্ভব ও কারণ-শূন্য বিষয় আর কি আছে। জগতে অজ্ঞাত ও অজ্ঞাতব্য বিষয় যত কিছু আছে প্রাণীর হৃদয় সকলের প্রধান। সহস্র যোজন দূরস্থ খদ্যোত-লক্ষ্য গ্রহ নক্ষত্রাদির আকৃতি, প্রকৃতি, ও আধেয় সকল নখ-দর্পণে দেখান গিয়াছে। কিন্তু অঙ্কস্থিত প্রাণীর অনুপরিমিত—হৃদয়ের অভি-প্রায় নিরূপণ করিবার উপায় অদ্যাবধি উদ্ভাবিত হয় নাই। তদ্গত ভাবাদির কথা দূরে থাকুক মন নিজে কি বস্তু ও দেহের কোন ভাগে অবস্থিত তদ্বিষয়েই পণ্ডিতদিগের বিষম বিসম্বাদ। বহুকাল নিগূঢ় চিন্তা করতঃ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অনেকে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে অস্বীকার করিয়াছেন। যেরূপ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহাতে দেবতারাই সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জানা আছে। মনুষ্যের জ্ঞান প্রত্যক্ষের ক্ষুদ্র সীমায় পরিচ্ছিন্ন। এবং মনুষ্য চিরকালই মনুষ্য। কেহ শঠতা করিয়া দেবত্ব ভাণ করিলে তাঁহাকে যথোচিত শাস্তি দেওয়া ও ঘৃণা করাই মানবাধিকৃত যুক্তি ও জ্ঞানের যথোচিত ব্যবহার। কিন্তু কি আশ্চর্য্য প্রতিবাদ ও প্রতিবিধান চেষ্টা দূরে থাকুক মনুষ্য জ্ঞানপূর্ব্বক আপন হৃদ্গতভাব নিজে না বলিয়া ইঙ্গিত বা মুখভঙ্গিদ্বারা তদ্বিষয় অন্যকে জ্ঞাত করত তাহার মুখ দ্বারা বলাইতেছে আবার তাহাকেই দেবাংশ বা দেবের উকীল বলিয়া অত্যন্ত গুরু হইলেও মস্তকে তুলিয়া চিরকাল দুঃসহ ভার বহন করিতেছে।

মর্ত্তমানের কান্দির উপর এক গাছ বাসনা মাত্র ঝুলিলেও বান্দরেরা অনেক ক্ষণ উঁকি ঝুঁকি মারিয়া থাকে। শিকলের তো শব্দও শুনেনা। কাপড়ের মোট্‌টা পৃষ্ঠে তুলিয়া দিবার পূর্ব্বে গর্দ্দভটা অন্ততঃ তিন বার শুইয়া পড়ে। বিলক্ষণ প্রহার দ্বারা অবশ্যবাহ্য বোধ না হইলে উঠে না। কিন্তু মানুষ-যিনি পশুর উপর আধিপত্য দাওয়া করিয়া থাকেন—স্বেচ্ছায়ই উঠাইয়া লন।

তবে দেবতার অলক্ষ্যনির্দ্দেশশক্তির অনুকরণ বিষয়ে মনুষ্যের অনুমান নামক একটী জ্ঞান হাত করা আছে। তাহাতে পটুতা থাকিলে অনেকে অনেক স্থলে বাহাদুরী দেখাইতে পারেন। কিন্তু আবার অনেক স্থলে মোড় দেখিয়াই পাঁটা আঁচিয়া বসেন। অন্তর্নিহিত সূর্য্যকান্তের আভায় স্বচ্ছ সলিলের ন্যায় আভ্যন্তরিক ভাবে প্রাণীর বদন ও নয়ন অনেক সময়েই মুদ্রিত থাকে। চিরকাল বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিলে চক্ষের পাল্‌টে ও মুখের কোঁচকানী দেখিয়া মনের ভাব অনেক সময়ে টানিয়া বাহির করা যায়।

তাহাতে বড় অধিক দেবত্ব অপেক্ষা করে না। ঘাইয়ের ভিন্ন ভিন্ন অতি সূক্ষ্ম বৈশাদৃশ্য—যাহা অন্যে সাতিশয় অবহিত হইয়াও বুঝিতে পারে না—দেখিয়া জালুকেরা রোহিত কি কাতলা কি শোল কি চেলা চানাইয়া গেল অনায়াসেই বলিয়া দেয়। চাঁদকুড়ো ডানিকোনাও এড়ায় না। ভাবিয়া দেখিলে নয়ন বা মুখ ভঙ্গিদ্বারা মন ধরা অপেক্ষা ইহাতে অধিক বিস্ময় উৎপাদন করে। কিন্তু কই ইহাদের প্রতি তো কাহারও অনুমাত্র দেবত্ব-জ্ঞান নাই। বরং ঘৃণাই আছে। গণক ঠাকুরের মান রাখিতে ও তাঁহার চাতুরীর পুরস্কার করিতে লক্ষীর হাঁড়ি হইতেও চাউল এবং জামাতার বাটা ঝাড়িয়াও সুপারি আসিয়া জুটে কিন্তু কেউটেবাছা রাত্রির ঘুনিঝাড়া চুনো দিয়া এক মুষ্টি চাউলের জন্য মেছুনীমাগী অন্ততঃ দুই হাট ফিরিয়া যায়। কারণ তৎকালীন কিছু উদ্‌ভাবন করিতে পারিলাম না। তবে একটা কথা মনে পড়িল যে গণক ঠাকুরেরা ব্রাহ্মণও শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া এত আদর ও দেব তুল্য সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞতা বিষয়ে প্রমাদটা যেমন হ'লো অমনি ম'লো। গণক ঠাকুরের কথা বার্ত্তাও সংস্কৃত উচ্চারণ শুনিয়া তাঁহাকে সরস্বতীর বাঘাতেতুল বলিয়া এক প্রকার নিশ্চয়ই বোধ হইল। তবে ব্রাহ্মণত্বে সন্দেহ উপস্থিত হইবার কোন কারণই ছিল না কেবল দুই চারিটা চোয়াড়ে টান ভিন্ন। ব্রাহ্মণজাতিবত্তা-মাত্রকে এরূপ সমাদরের কারণ ধরিলে ব্রাহ্মণ মিঠাইকরের অসম্ভাব প্রতিপন্ন হয় বলিয়া কিছু ফাঁপরে পড়িলাম। শেষে কারণটা মূঢ়তা, অযৌক্তিক বিশ্বাস ও কুসংস্কার বলিয়াই স্থির করিলাম। কিন্তু এক দৃষ্টান্তেই—প্রসবান্তে স্ত্রীমাত্রেরই মাতায় টাক পড়ে-অনুমান করার ন্যায় একবারে এত দূর করিয়া তোলা নিতান্ত অসঙ্গত ও যুক্তিবিরুদ্ধ ভাবিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও আপনাআপনি লজ্জিত হইয়া পুনরায় গণক ঠাকুরের প্রতি মন প্রেরণ করিলাম। অমনি শুনিলাম এক জন বলিয়া উঠিলেন "ঠাকুরঝি ঐ বামনদের কুমুদ এসেছে; আহা: আয় মা কুমুদ তোর কপালটা গণাইয়া লই," বলিবা মাত্র স্তোকবেশা মলিনবসনা অনুপম-কান্তি ষোড়শী ললনা অতি দীন ভাবে বাহির হইলেন। দেখিবা মাত্র বোধ হইল যেন তুষারাবৃত প্রদোষের নিবাড় মেঘমালায় অস্ফুটপ্রভা চিত্তসঞ্জীবনী বিদ্যুল্লতা অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল। গণকঠাকুর দৃষ্টিমাত্রেই বলিয়া ফেলিলেন স্ত্রীলোকটী অন্তঃকরণে কিছু দুঃখ ভোগ করিতেছেন। অমনি এক জন বলিয়া উঠিলেন "আহা ঠাকুর তার আবার কথা গা, একটু কেন ওর যা হচ্চে তা ঐ জানে; বয়েসকাল" এই মাত্র বলিয়াই চুপ করিলেন। তখন ঠাকুরের প্রতি আমার যথার্থই ঘৃণা উপস্থিত হইল। তাঁহার মনের খিন্ন অবস্থা অনুমান করিতে কোন দেবশক্তিরই আবশ্যক নাই। তাঁহার উৎতপ্ত ছিন্নকিসলয় সদৃশ দুর্লক্ষ্যমধুর আস্যরুচি ও নিম্নদৃষ্টি বিকল নয়ন আপনারাই পারিপাট্যের সহিত অতিশয় স্পষ্টরূপে বলিয়া বেড়াইতেছে। আর এবার টা ঠাকুর মহাশয়ের বুজরুকীর মুখোসটা ও কিছু শ্লথ হইয়া পড়িল। তিনি যুবতীর আন্তরিক দুঃখের কারণটা সহজই ভাবিয়া ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত মাগীর "বয়স কাল" কথাটাও তাঁহাকে দুই একটা পাক দিয়া আনিল। জানিতেন না যে ললনা কুলীনদুহিতা। নির্ব্বোধ বলিয়া বসিল ইহাঁর স্বামী বহুদিন দেশ ছাড়া তা সেই"—বলিবা মাত্র মা লক্ষীরা পরস্পর মুখ চাওয়া চায়ি করিতে লাগিলেন। এবং হতভাগ্যা কামিনীর নয়ন দুটি জলে টব্ টব্ করিতে ও বক্ষঃস্থল স্ফীত-হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস বহিতে লাগিল। দলের মধ্যে একজন বলিয়া

উঠিলেন, "বল কি ঠাকুর পোড়াকপালী যে কুলীনের মেয়ে; ওর যে মূলে বে ই হয় নি, আহা আশীর্ব্বাদ কর তাই হোক্"। ঠাকুর লবণের জলে কেঁচোর মত মুখ গুড়াইয়া "এঁ-এঁ তবে-তবে-রাশি টা রাশিটা" বলিয়া মহা অপ্রস্তুত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমার ক্রমে আনন্দ-উপস্থিত হইল। ভাবিলাম কার্য্যের যথার্থ দণ্ডই হইতেছে।

যাহা হউক ক্ষণ পরেই সে গোলযোগ টা, মিটমাট হইয়া গেল। বাহির হইল যে চৈত্র মাস গত হইয়া বৈশাখের প্রারম্ভেই কুমুদের বিবাহ সম্পন্ন হইবে বলিয়া এক প্রকার স্থির করাই ছিল। ক্রমে আরও শুনা গেল যে বর গ্রামেরই। এবং কুমুদ ও তাঁহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তদভিন্ন অন্য কাহাকেও পাণি সমর্পণ করিবেন না বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; এমন কি এক প্রকার প্রতিজ্ঞাই করিয়াছিলেন।

এক্ষণে গণৎকার যে কিবল প্রকৃতিস্থ হইলেন এমন নয়; তাঁহার মুখে দুই একটা আবার বিস্কুড়ি ও ভাসিয়া উঠিল। ক্রমে আমার হাসি চাপিয়া রাখিবার অবস্থা উপস্থিত হইতে লাগিল।

পরে আরও একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়া উঠিল। একজন অর্দ্ধ বয়স্ক পুরুষ আসিয়া জুটিলেন। লোকটার বয়স হইয়াছিল কিন্তু বিলক্ষণ শক্ত সমর্থ ছিলেন। তিনি গণকঠাকুরকে দেখিয়া পুলকিত হইয়া বলিলেন ঠাকুর দেখ দেখি পোড়া বিধাতা আমার ভাগ্যে কি আঁচড়াইয়াছেন। ঠাকুর নাম, রাশি মিলন করিয়া গণনা করত বলিলেন আপনার সন্তান ভাগ্যটা নাই। বলিবা মাত্র তিনি ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বালাই আর কি আমার রাজীব, কমল বেঁচে থাক্, তুমি এত বড় কথা বল যে আমার সন্তান ভাগ্য নাই" বলিয়া প্রায় প্রহারে উদ্যত হইলেন। আমি আশায় পুলকিত হইয়া উঠিলাম। ভাবিলাম কাষের মত উত্তম মধ্যম গোটাকত হয়ে গেলে ভাল হয়। ঠাকুর একবার ঠকিয়া কথঞ্চিৎ পার পাইয়াছেন আবার বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এবারে নিজের চাতুরীতেই রক্ষা পাইলেন। তিনি পুনর্ব্বার গণনা করত বলিলেন "আপনি কোপ করিলে কি হয় মহাশয় যাহা গণনা করিয়াছি মিথ্যা হবার নয়। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন রাজীব, কমল আপনার ঔরসজাত না হইবে"। লোকটী কিছু বলিতে না পারিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। এ কথার উত্তর হয় না। "স্ত্রিয় শ্চরিত্রং দেবা ন জানন্তি কুতোমনুষ্যাঃ" জানা থাকায় কিছু চিন্তান্বিত ও হইলেন। ঠাকুর জো পাইয়া বলিতে লাগিলেন "মহাশয় ভাবিলে কি হবে আমি পুনরায় অতি শীঘ্রই আসিব। আপনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন আমার গণনা সত্য কি মিথ্যা। আর ও বলিয়া দি; শীঘ্রই আপনার তীর্থ দর্শন লিখিতেছে"। এখানে উদোর বোঝাটী বিলক্ষণ রূপে বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন। পাঠকগণ নাবাইতে পারো তো চেষ্টা দেখ। না হইলে বেচারা বিনা দোষে মারা যায়।

আমি ফিরিয়া আসিবার সময় এ বিষয়ের তথ্য জানিবার ঔৎসুক্য থাকায় গ্রাম দিয়াই আসিলাম, শুনিলাম গণকের পূর্ব্ব গণনাটী কই প্রতিপন্ন হয় নাই। কিন্তু উক্ত মহাপুরুষ সন্দেহ ক্রমে পরিবার ত্যাগ করত কাশীধাম গমন করায় শেষোক্ত টী ঠিক মিলিয়া গেছে।

অশুদ্ধ শোধন।

১৪৪ পৃষ্ঠা ২ য় স্তম্ভ ১৯ পংক্তি "পোপের" পরিবর্ত্তে "পাপের" হইবে।

কলিকাতা,—সিমুলিয়া—মানিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত

অবোধ-বন্ধু

'করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥'

৩য় ভাগ] অগ্রহায়ণ,—১২৭৬। [৮ম সংখ্যা।

ডুয়েল্।

যখন দুই ব্যক্তির অতি বিকট কোন মর্ম্মান্তিক উপস্থিত হয়, তখন উভয়ের সম্মতিক্রমে পরস্পরে যে অপ্রকাশ্য দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়, ইয়োরোপের ভাষাতে তাহাকে 'ডুয়েল' কহে। ইয়োরোপের উত্তর পশ্চিমের লোকদিগের প্রজ্বলিত সাহস হইতে এই প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে আর নিস্তেজ পুরুষদিগের বিনতি, দর্শনকারদিগের যুক্তি এবং সভ্যতার উন্নতি-সহকৃত সৌকুমার্য্যের উন্নতি, এই তিন কারণে ইহার লোপ হইতেছে। কিন্তু পৃথিবীর তেমন সুন্দর এক জাতি মানবের মধ্যে ইহা এতকাল বলবৎ ছিল, অতএব ইহার গুণাগুণ সমস্ত একেবারে পরীক্ষার অযোগ্য নহে।

অদ্যাপি আইন এত সর্ব্বসংগ্রাহী হয় নাই যে, অন্য জনের উপর এক জন যত অত্যাচার করিতে পারে, সকলেরি প্রতিকার আদালত হইতে সমাধা হইবেক। টাকা ধার দিলে শোধ দেওয়া, অন্যায় করিয়া জমী দখল করা, সম্পত্তি অপহরণ করা, মার-ধোর করা এ সকল ব্যাপারের আইন সভ্য জাতি মাত্রের বিধি সংহিতাতে উল্লিখিত আছে। কিন্তু সেই সকল বিধি সংহিতাতে উল্লিখিত ব্যতীত অনেক অত্যাচার ঘটিতে পারে, আইনের পক্ষে সেগুলির খবর লওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার, অথচ আইন খবর লইতে পারেন না বলিয়া যে তদ্দারা অত্যাচরিত ব্যক্তির মনে ক্লেশ হইবেক না, ইহাও সম্ভব নহে। অতএব সে স্থলে কি হয়, এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত 'ডুয়েলের' সৃষ্টি হইয়াছিল। 'ডুয়েল' নামক ব্যবহার কিছু কোন ব্যক্তির মতলব হইতে উদয় হয় নাই, মনুষ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত অন্যান্য ব্যবহারের ন্যায় সমাজের প্রয়োজন হওয়াতেই ইহার আবির্ভাব হয়; কিন্তু

সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবেক যে, সে প্রয়োজন উহাই, অর্থাৎ আইনে সর্ব্ব প্রকার অত্যাচার সামাই খায় না, তাই যেগুলি সামাই খায় না, সেগুলির নিষ্পত্তি যথা কথঞ্চিৎ করিবার নিমিত্ত ডুয়েলের দরকার হইয়া উঠে, নচেৎ তুমি আমার পুকুরের মাছ ধরিয়া নিলে আমি আদালতে জানাই কেন, আর তুমি আমাকে লাথি মারিলে, যদি আমাতে কিছু মাত্র পুরুষত্ব থাকে, ত তোমার রক্ত দর্শন করিবার লালসা জন্মে কেন, এ প্রশ্নের উত্তর করা সহজ নহে। আর এক কথা আছে যে, তেজীয়ান পুরুষ কাহারো কর্ত্তৃক অপকৃত হইলে পর-সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া সে অপকারের দাদ তুলিতে যেমন ভাল বাসেন, তাহাতে তাঁহার যেমন দুর্জ্জয় আমোদ হয়, আদালত সম্পর্কীয় হঙ্গাম হুজ্জত অবলম্বন পূর্ব্বক অপকারীর চৈতন্য জন্মাইতে গেলে তাঁহার বৈর-নির্য্যাতন লালসা তেমন তৃপ্তি লাভ করে না। কিন্তু এ বিষয়েও অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবেক যে, যে সকল অপকার আইনের মধ্যে আসে না, তাহাদিগের সম্বন্ধেই এ বাসনা বলবতী ; নচেৎ টাকা ধার করিয়া শোধ না দিলে অধমর্ণের সঙ্গে লাঠালাঠি করিবার প্রবৃত্তি সুশৃঙ্খলাপ্রাপ্ত প্রায় তাবৎ জনপদ হইতেই উঠিয়া গিয়াছে।

যে সকল অপকার সংগৃহীত করা আইনের পক্ষে অতীব দুরূহ, তন্মধ্যে এক জন আর এক জনকে অপমান করার অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। যে যে দেশের লোকে সভ্যতামধ্যে এত দূর আরোহণ করিয়াছে যে, উদরান্নের জন্য ব্যস্ত নয় এরূপ সক্ষম অনেক পুরুষ একমত হইয়াছেন এবং আপনাদিগের ধন প্রাণ রক্ষার উপযোগী এক প্রকার বন্দোবস্ত স্থির করিয়া বসিয়াছেন, অপমান হইবার ক্লেশ যে বিশেষ একটা ক্লেশ বটে, এ বোধেরো তথায় বিকাশ হইয়াছে। এই অপমান বোধ নানা হেতুতে জাগরিত হইতে পারে, কাহারো স্ত্রীকে ভ্রষ্ট করা, কাহারো নামে পাঁচ জনের নিকট চুকলী করিয়া বেড়ান, কাহারো আত্মসাৎকৃত-প্রায় প্রণয়িনীকে হস্তগত করিবার চেষ্টা, কাহারো কাণত্ব খঞ্জত্ব কুব্জত্ব প্রভৃতি স্বাভাবিক বিরূপতার উপহাস করা, মর্ম্মান্তিক পরিহাস করা, গৃহছিদ্র উদ্‌ঘাটন করিয়া দেওয়া, গোপনীয় মর্ম্মভেদকর কোন বিষয় জানিবার নিমিত্ত জেদ করা, বিপদে বা দুর্গতিতে আহ্লাদ প্রকাশ করা, ইত্যাদি অশেষবিধ আচরণের দ্বারা এক জন অন্য জনের হৃদয় মধ্যে বিলক্ষণ দুঃসহ যন্ত্রণা ঘটাইয়া দিতে পারে। সে যন্ত্রণার শোধ ওঠা আদালত হইতে অসাধ্য। আদালত ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার নিমিত্ত বসিয়া আছেন বটে এবং অন্যায়াচরণের দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া লোকে ভবিষ্যতে অন্যের অসুখকর হইতে বিরত ও সংকুচিত হয়, ইহাই আদালতের অভিপ্রায় বটে ; কিন্তু আদালত কিছু দেবতা নহেন, তথাকার বিচারকেরা কিছু সর্ব্বজ্ঞ নহেন, সুতরাং ন্যায়ের রাজত্বের প্রত্যেক

প্রদেশকে যে তাঁহারা এককালে ভূচিত্রিত করিয়া বসিয়া আছেন, অথবা ন্যায় রাজত্বের সর্ব্ব স্থান রক্ষা করিবার উপযোগী সকল বিধানই আগে থাকিতে করিয়া বসিয়াছেন, ইহা সুদূরপরাহত। ন্যায়ান্যায় বিষয়ক বিজ্ঞতা সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে ক্রমেই বিস্তারিত হইতেছে। সুতরাং যে সময়ে সেই বিজ্ঞতা জন সমাজে যত দূর উন্নতি লাভ করে, আদালত হদ্দ ততটুকু আত্মসাৎ করিতে পারেন; অনেক সময়ে আদালতের বিজ্ঞতা জন সমাজের অন্তর্ভূত দুএক জন অসাধারণধীশক্তি সম্পন্ন চিন্তয়িতার বিজ্ঞতা অপেক্ষা অনেক ন্যূন, যেহেতু আদালত আইননির্ম্মাণকর্ত্তাদিগের দাস আর আইননির্ম্মাণকর্ত্তারা অসাধারণধীশক্তি সম্পন্ন চিন্তয়িতাদিগের নূতন উদ্ভাবিত কথা বার্ত্তা ঝটিতি বুঝিতে পারক নহেন।

এমতে সাব্যস্ত হইতেছে যে, আদালত হইতে সকল অন্যায়ের প্রতীকার প্রার্থনা করা দুরাশা মাত্র। 'ন্যায়' কাহাকে বলে, ইহা আজিও পরিষ্কার রূপে স্থির হয় নাই; আজও ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিশেষের মতের উপর, ধন মানাদি ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদিগের অভিরুচির উপর, ন্যায়ের মাহাত্ম্য নির্ভর করে। তাঁহারা যাহাকে ন্যায় বলেন, তাহাই ন্যায় হয়; যাহাকে নয় বলেন, তাহা অন্যায় হয়। কিন্তু কোন এক সমাজের পক্ষে "ন্যায় কি" "অন্যায় কি" পূর্ব্বোক্ত রূপে নির্দ্ধারিত থাকিলে সমাজ সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, কারণ 'সমাজ' বলিতে "তদন্তঃপাতী প্রবল পরাক্রান্ত পুরুষ বর্গ" ব্যতীত অন্য অর্থ প্রায় কোথাও বুঝায় না। সুতরাং তাঁহারা আপনাদিগের শুভ সংবর্দ্ধন কিম্বা অশুভ নিরাকরণের নিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের নিজের বেশ চলিয়া যায়। কিন্তু প্রত্যেক চিন্তাশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তির সর্ব্বদা তাহাতে চলে কিনা সন্দেহ স্থল। তাঁহারা হয়ত সমাজের প্রবল পরাক্রান্ত দলের অন্তর্ভূত নহেন; তাঁহাদের হয়ত না আছে যশ, না আছে মান, না আছে অর্থ, না আছে ভূমিসম্পত্তি, না আছে পাঁচ জনের মন যোগাইয়া যশ মান উপার্জ্জন করিবার সামর্থ; তাঁহাদিগের পুঁজির মধ্যে সুতীক্ষ্ণ এবং উৎকট রোগের মত দুর্নিবার অচিকিৎসনীয় চিন্তাশীলতা। সেই চিন্তাশীলতা দোষে তাঁহারা হয়ত পরকৃত অত্যাচার বা পরকর্ত্তৃক প্রযুক্ত অপমান এত বিষবৎ বোধ করেন যে, তদ্দ্বারা তাহাদের মস্তকের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া যান, তাঁহাদের কাজ কর্ম্ম করিবার সামর্থ থাকে না, তাঁহাদের উদরান্ন জীর্ণ হয় না, তাঁহাদের জীবন ভারবৎ, সংসার মরুপ্রায়, জন সমাজ দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে। অথচ আদালতের কাছে যদি তাঁহারা দাখিল হয়েন, তাহা হইলে কোন্ আইনের তলে আনিয়া যে আদালত তাঁহাদিগের ক্লেশের প্রতিকার করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারেন না। ঈদৃশ স্থলে কি কর্ত্তব্য? তাঁহারা কি সেই ক্লেশ সহ্য করিয়া যাই-

বেন? সমাজ কি তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত কেবল এই কথা মাত্র বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন যে "তোমার এ ক্লেশ মোচন করিতে আমি অপারক, এ ক্লেশ অন্যান্য অনিবার্য্য ক্লেশের শ্রেণীভুক্ত। পুত্রশোকের যাতনা প্রেমাস্পদ দয়িত জনের নিকট প্রত্যাখ্যান পাইবার যাতনা প্রভৃতি মরণান্ত যাতনা সমূহের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত পরাবমাননা জনিত যাতনার অন্দরে পতিত হইলে মৌনী থাকাই বিধি। নচেৎ 'ধেই ধেই' ক'রে নেচে বেড়ালে শুদ্ধ মনুষ্য নামের সম্ভ্রম নষ্ট করা হয় মাত্র?"

পরকৃত অপমানের যন্ত্রণা দ্বারা কাতরীভূত ভদ্র লোককে যখন সমাজ এ বই অন্য কোন সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিতে জানেন না, যখন আদালত আপনার অসামর্থ্য স্পষ্টাক্ষরে উদ্‌ঘোষণ করিতেছে, যখন 'ন্যায়ের' তত্ত্ব সংকুচিত হইয়া যাইতেছে, তখন ইয়োরোপীয় নীতিশাস্ত্রকারেরা এবং দেখাদেখি মধ্যবিধ দর্শনকারেরা যে কি ভাবিয়া 'ডুয়েল' পদ্ধতির প্রতি এত জাতক্রোধ হইয়াছেন তাহা বলা ভার। তাঁহাদিগের সকলকেই স্বীকার করিতে হইবেক যে, যে সামাজিক অনর্থের চিকিৎসা উদ্দেশে 'ডুয়েল' পদ্ধতি জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা একটী প্রকৃত বাস্তবিক ও পারমার্থিক অনর্থ বটে। তাহা কিছু বিড়ম্বতেজস্বী পুরুষগণের কপোলকল্পনা মাত্র নহে, তাহা কিছু নরহিংসাপরায়ণ ক্রূরস্বভাব মমতাশূন্য প্রচণ্ডপ্রকৃতি ব্যক্তিদিগের উত্তেজনা দ্বারা রচনা করা হয় নাই। চক্ষুরুন্মীলন করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, আদালতে প্রতীকার হয় না ঈদৃশ নানাবিধ রীতি দ্বারা এক জন আর এক জনের জীবনকে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিতে পারে এবং বোধ হয় অত্যাচরিত ব্যক্তি যত সরেস উপাদানে নির্ম্মিত হইবেন, পরের তুচ্ছ মাৎসর্য্য দ্বারা তাঁহার তত ক্ষত বিক্ষত হইবার সম্ভাবনা, কারণ মানহানি পরিপাক হয় এরূপ দীপ্ত অগ্নি থাকা বড় তারিফের কথা নয়। অতএব কেবল পাঁচ জনে ডুয়েলের বিরুদ্ধে "রা" তুলিয়াছে বলিয়া সেই সঙ্গে চীৎকার করিবার অগ্রে নীতিশাস্ত্রকারদিগের উচিত ছিল যে, ডুয়েলের শুভাশুভকারিত্ব সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করা, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা কেবল "অনর্থক রক্তপাত" "অন্যায় হত্যা" "বে-খ্রীষ্টান আচরণ" ইত্যাদি কত গুলি দীর্ঘচ্ছন্দের শব্দাড়ম্বর প্রদর্শন পূর্ব্বক বাজী ফতে করেন। আমরা সেই দৃষ্টান্তের অনুসারী না হইয়া ডুয়েলের সাপক্ষে বিপক্ষে কি কি বলা যায়, পরস্পর সম্মুখীন ভাবে সে উভয়কে ব্যূহবদ্ধ করিয়া পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত স্থির করিব।

ডুয়েলের বিপক্ষে।

ডুয়েলের অভিপ্রায় এই যে, অত্যাচারের প্রতীকার হইবেক। তুমি আমার প্রতি 'অন্যায় করিয়াছ; তোমাতে আমাতে সাংঘাতিক যুদ্ধ করিব; তদ্দ্বারা আমাদের উভয়ের একের যা হয়, একটা হেস্তনেস্ত হইবেক। কিন্তু এ অভি-

প্রায় প্রকৃত নহে; ডুয়েলের নিগূঢ় অভিপ্রায় এই যে, যখন তুমি আমার প্রতি অত্যাচার কর, তখন আমার পাঁচ জনকে দেখান আবশ্যক যে, আমি অত্যাচার বর্দাস্ত করিবার লোক নহি; বরং আপন প্রাণ সংশয়াপন্ন করিতে পারি, তথাপি চুপে চুপে অপমান হজম করিতে পারি না। অতএব "অত্যাচারের" প্রতীকার, মৌখিক এই উদ্দেশে ডুয়েল আরম্ভ হইয়া পরিশেষে পুরুষকার প্রদর্শন রূপে পর্য্যবসিত হয়; আপনার তেজ দেখান ইহাই ডুয়েলের এক মাত্র তাৎপর্য্য হইয়া উঠিয়াছে। অতএব যে পদ্ধতি এক উদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়া অন্য উদ্দেশে পর্য্যবসিত হইয়াছে, যাহাতে এক করিতে গিয়া আর হইয়া বসে, সে পদ্ধতি কখন যুক্তিসংগত হইতে পারে না, 'ডুয়েল' পদ্ধতি সেইরূপে লক্ষ্যভ্রষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে, অতএব পরকৃত অত্যাচারের প্রতিকারার্থ উপায় স্বরূপ ডুয়েলকে পরিগৃহীত করিলে যুক্তিমার্গ অতিক্রম করা হয়।

দ্বিতীয়ত, 'ডুয়েল' প্রচলিত থাকিলে অত্যাচারের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা, তুমি আমার অপমান করিলে, অপমান বর্দাস্ত করিলে আমি কাপুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন হই, অতএব তেজ দেখাইবার তরে কাজে কাজেই আমাকে ডুয়েলের প্রস্তাব করিতে হইবেক, ইহাতে হ'ল এই যে, শুদ্ধ অপমানের ক্লেশ সহ্য না করিয়া আমাকে প্রাণভয়ের যন্ত্রণা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইল, যে অবধি হেস্তনেস্ত না হয়, সে অবধি দিবানিশি আমি উভয়ের সেই নিদারুণ সাক্ষাৎকারের বিষয় চিন্তা করিব, এবং ডুয়েলের প্রস্তাব আর উহার সংঘটনে এ দুই ব্যাপারের মধ্যবর্ত্তী কয়েক দিন ধরিয়া আমার পুঁটিমাছের প্রাণ কিরূপ ঢুকপুক করিবেক তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। অতএব যে অনিষ্ট নিবারণ করিতে ডুয়েল অভিপ্রেত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সক্ষম হউক আর না হউক, তাহার উপর এক নূতন অনর্থ উপস্থিত করে। সুতরাং যে পদ্ধতি এরূপ "ভাল করিতে পারিব না, মন্দ করিব" এই লৌকিক প্রবাদের প্রকট দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইতেছে, তাহা কিরূপে উপাদেয় হইতে পারে।

তৃতীয়ত, ডুয়েল পদ্ধতি দ্বারা বৈরনির্যাতন লালসাকে বিস্তর উৎসাহ দেওয়া হয়, শান্তশীল সৌম্যমূর্ত্তি হইয়া পরের ধর্ষণ সহ্য করিবার প্রবৃত্তি মনোমধ্যে জাগরূক না হইয়া ইহা দ্বারা "দাদতোলাই পুরুষকার" এই এক সংস্কার বদ্ধমূল হয়। আর যাহারা স্বভাবত তীক্ষ্ণস্বভাব ও অক্ষমাশীল, তাহারা অত্যাচারের প্রতীকার প্রার্থনার ভাণ করিয়া আন্তরিক বৈরনির্যাতন লালসাকে চরিতার্থ করিতে যায়। অতএব যে পদ্ধতিতে লোকের কুপ্রবৃত্তি উৎসাহিত করে, তাহা কিরূপে ভদ্রলোকের আদরণীয় হইতে পারে।

চতুর্থত, অকস্মাৎ সংসারধাম হইতে হকুনাহক্ অপসারিত হইবার বাড়া আক্ষেপের বিষয় কি আছে? তোমার

পরিবার অন্নের নিমিত্ত লালায়িত হইবে; তোমার পিতামাতার পক্ষে তুমি অন্ধের যষ্টি স্বরূপ হইতে সে আশা কর্ত্তন হইবে, তোমার সন্তানসন্ততি অসময়ে অনাথ নিরুপায় হইয়া পড়িবে; তোমার আত্মীয় বর্গ তোমার সহবাস সুখে বঞ্চিত হইবে, ইহাই কি তোমার কর্ম্ম? ডুয়েল এই হৃদয়বিদীর্ণকারী অশুভ ব্যাপারের দ্বার হইবার সম্ভাবনা, অতএব ইহা উচ্ছন্ন যাওয়াই সমাজের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প।

ডুয়েলের সাপক্ষে।

অত্যাচারের প্রতীকার করা ডুয়েলের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা ডুয়েল প্রথা রহিত করিতে নারাজ, তাঁহারা এত নির্ব্বোধ নহেন যে, মনে করিবেন, ডুয়েলের দ্বারা অত্যাচারীরই সকল স্থলে দণ্ড হইয়া থাকে। তাঁহারা শত সহস্র স্থলে সে বিষয়ের প্রত্যুদাহরণ দর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও জানেন যে, ডুয়েল প্রচলিত থাকিলে অনেক সময়ে 'গুণ্ডা' পাষণ্ড নষ্ট লোকের সুবিধা হইতে পারে; কারণ মনে কর, তুমি তেজীয়ান্ বট, কিন্তু শিষ্ট শান্ত নির্ব্বিরোধী লোক, অস্ত্রাদি ধারণ করা তোমার প্রায় অভ্যাস নাই; একজন অকুতোভয় মহাকুষ্মাণ্ড 'গুণ্ডা' তোমাকে অপমান করিল; তুমি তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে, অস্ত্রশস্ত্র তাহার চিরকাল ধরিয়া বিলক্ষণ সাধ্য আছে; তুমি ক্ষণমাত্রে তাহার অস্ত্র শিক্ষা দ্বারা পরাজিত হইয়া হয়ত প্রাণ হারাইলে, ইহাতে তোমার "পেয়াজ পয়জার" দুই হইল, অগ্রে মানহানি, পরে প্রাণহানি। কখন কখন বা এমনিও হয় যে, তুমি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির অক্ষিশূল হইয়া উঠিয়াছ; তাঁহার কোন উৎকট রহস্য দৈববশাৎ জানিয়া ফেলিয়াছ; তাঁহার প্রেয়সী তোমাকে মধুর দৃষ্টিদান করিয়াছে; তিনি তোমাকে কোন ঘোরতর প্রকারের সাহায্য করিতে কহিলে সম্মত না হইয়া বরং তেরিয়ার মত উত্তর করিয়াছ, বলিয়াছ যে, তাঁহার "কোটনাম' করিবার কথা তোমার কোষ্ঠীতে লেখা নাই; এরূপ স্থলে যদি তিনি রাগী পুরুষ হন, তা হ'লে চাই কি তিনি তোমাকে তাবত লোকের চোকের আড় করিয়া দিতেও বাসনা করিতে পারেন। কিন্তু নিজে সুকুমার লোক, পায়ে ব্যথা বাজিলে বড় কাতর হন, সে স্থলে অর্থব্যয় পূর্ব্বক এক জন ব্যবসায়ী 'গুণ্ডা' ভেজিয়ে দিয়ে তাহার দ্বারা তোমাকে অপমান করাইয়া তোমা দ্বারা ডুয়েলের প্রস্তাব করাইয়া অক্লেশে তিনি তোমার অপসারণরূপ মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু এগুলি ডুয়েল পদ্ধতির অপকৃষ্ট উপযোগ মাত্র। উহার প্রকৃত গুণাগুণ এ সমস্ত বিষয়ের আন্দোলন দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইবেক না। ডুয়েলের প্রকৃত উপযোগ এই।

বারুদের আবিষ্ক্রিয়া হইতে আর বাকী নাই। লড়াই হঙ্গামের বৃদ্ধি উপলক্ষ করিয়া যিনিই কেন ইহাকে যত গালাগালি দিন না, ইহা দ্বারা মনুষ্য

সমাজের যে এক বিজাতীয় মহোপকার সাধন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ এখন একমত। সেই মহোপকারের তদন্ত কি, তাহা যদি পারা যায়, ত আমরা অন্য এক প্রস্তাবে অবতীর্ণ করিব। তবে সে বিষয়ের বীজমন্ত্র সংক্ষেপে এই রূপে উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে যে, যেমন বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা মনুষ্যের মেহনত করিবার আবশ্যকতা ঐকান্তিক বিলয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, যেমন তাড়িত বার্ত্তাবহ দ্বারা খবরাখবরের পক্ষে "দূর নিকট" এ সকল কথা কথা মাত্র হইয়াছে, তেমনি বারুদের আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা দুর্ব্বল আর প্রবল এই দুই শব্দ লোপ পাইলেও পাইতে পারে। অতএব যখন পিস্তল বন্দুকের প্রচার একবার হইয়া উঠিয়াছে; তখন যিনি যত বড় কেন গুণ্ডা হউন না, যত বড় কেন আপন প্রাণে মমতাশূন্য হউন না, যতবড় কেন শারীরিক বলবীর্য্য সম্পন্ন হউন না, যত বড় কেন শিক্ষিতাস্ত্র হউন না, সম্মুখে আর এক জন অত্যাচরিত কুপিত এবং প্রাণ পণে তেজের মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে উদ্যত ব্যক্তি পিস্তলহস্তে দণ্ডায়মান আছে, ইহাতে প্রাণের ভিতর চমকিয়া না যায়, এতাদৃশ লোক অবশ্যই বিরল। এখন ডুয়েলের উদ্দেশ্য এই যে, যখন তুমি নিজ ইচ্ছাক্রমে অন্য কোন ব্যক্তির মর্ম্মান্তিক করিতে যাইবে, তখন তোমাকে একবার অবশ্যই ঠাহরাইয়া দেখিতে হইবেক যে, এই যে অকৌশল বাধাইতেছি, ইহা না বাধাইলে ভাল, কি অনর্থক এ ব্যক্তির রোষ উদ্দীপন করিয়া ইহার পিস্তলের পথে আপনাকে সংস্থাপন করি। ইহা ভাবিয়াও যদি অন্যকে অপমানিত করিবার মজা অধিক বোধ হয়, তবে নাচার। এরূপ স্থলে যে, নিরপরাধী ব্যক্তিও সেই সঙ্গে প্রাণসংশয়াপন্ন হইতেছেন, তাহা এক অপ্রতী কার্য্য আক্ষেপ বটে। সে স্থলে না হয় ডুয়েল পদ্ধতি অপারক হইলেন। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি তত পাষণ্ড নয়, পরকে অপমান করিবার আমোদ যাহাদের তত প্রার্থনীয় বোধ হয় না, যাহারা আপন প্রাণকে নিরাপদে রাখা অপেক্ষা প্রতিবেশীর মনে ব্যথা দেওয়াকে সমধিক উপাদেয় জ্ঞান না করে, ডুয়েল পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলে অন্ততঃ সেই সকল ব্যক্তি দমন থাকিতে পারে। মানিলাম যে, পরের মনে ব্যথা দিতে সময়ে সময়ে কম আমোদ বোধ হয় না; সেই আমোদ যদি কিঞ্চিৎ সঙ্কটাবহ হয়, যদি তাহাতে আপনার গায়ের চামড়ার উপর কোন ঝুঁকি আসে, তাহা হইলে আমোদের লাঘব হয়, তাহা হইলেই পরের মনে ব্যথা দিতে লোকের প্রবৃত্তি তত থাকেনা, তাহা হইলেই কিঞ্চিৎ সমঝিয়া চলিবার অভ্যাস হয়, তাহা হইলেই তোমার আপনার মত অন্তরাত্মা সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রকেই তোমার কিছু কিছু সমীহ করিয়া চলিতে হয়। অতএব ডুয়েল সর্ব্ববিধায়ে শ্রেয়স্কর নহে বলিয়া, উহার আংশিক শ্রেয়স্করতা বিষয়ে অন্ধ হওয়া সংসারী ব্যক্তির কর্ম্ম নহে; যেহেতু সংসারের কোন আচরণ,

কোন কার্য্য, কোন ব্যবস্থাই নিরবচ্ছিন্ন ও সার্ব্বত্রিক নির্দ্দোষ নহে, সকলেরি দোষগুণ দুই পাল্লায় ওজন করিয়া হেয়তা বা উপাদেয়তা অবধারিত করিতে হয়। অতএব স্থির হইতেছে যে, যখন ডুয়েলের প্রথা প্রবল থাকিলে অমুৎকট মধ্যবিধ মাৎসর্য্য রোগাক্রান্ত নীচাশয় ব্যক্তিরা দমন থাকিতে পারে, আর যখন জনসমাজে সেই প্রকার লোকই অধিক, অতি উৎকট পরহিংসাদোষে দূষিত স্বভাবের লোক যখন তত বেসী নয়, তখন ডুয়েল একেবারে নিষ্প্রয়োজন কিরূপে হইতে পারে? আপনার তেজ দেখান অথবা সাহসী পুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার নিমিত্ত পরস্পরের অপ্রকাশ্য যুদ্ধ সংস্থাপিত করা নহে, পরন্তু ব্যক্তি মাত্রেরি প্রতি কিঞ্চিৎ সমীহ করিয়া না চলিলে অপ্রকাশ্য যুদ্ধে আহূত হইয়া বিপদে পতিত হইব, লোকের মনে এই ভয় জাগরূক রাখিয়া তাহাদিগকে সমধিক ভব্য ও শিষ্ট করিয়া তুলাই ইহার প্রকৃত অভিপ্রায়। এ অভিপ্রায় বস্তুগত্যা ডুয়েলের দ্বারা কিয়দংশে সিদ্ধ হইয়াছে কি না, ইয়োরোপ ও আসিয়ার লোকদিগের আপনাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যচার দর্শনে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতে পারে। যদিও ইয়োরোপের লোকদিগের স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য অনেক অধিক, রক্তের তেজ অতি তীক্ষ্ণ, ভাবভঙ্গি অতি রুক্ষ, তথাপি শিষ্টতার প্রণালী তথায় যেরূপ বিকাসলাভ করিয়াছে, এ অঞ্চলে সেরূপ নহে। পরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তথায় এক প্রকার অপ্রসিদ্ধ, উপকার করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করা ত "ছকড়া নকড়া" হইয়া উঠিয়াছে এবং পরস্পরের সঙ্গে এক প্রকার মৌখিক ভব্যতা রক্ষা করিয়া বলিবার অভ্যাস প্রায় পান আহারাদির মত আপামর সাধারণ ব্যবহার। প্রত্যেক মানুষকেই যে মানুষ জ্ঞান করিয়া চলিতে হইবেক, এ কথা অন্তত আপনাদিগের সমান শরীরবর্ণবিশিষ্ট তাবৎ ব্যক্তির পক্ষে তাহারা স্বীকার করে এবং সেইরূপ চলিয়াও থাকে। যিনি ইয়োরোপের প্রাচীন ও আধুনিক আচার ব্যবহারের সমন্বয় করিয়া দেখিয়াছেন, তিনি "শিভ্যালরি" নামক সুপ্রসিদ্ধ পুরাতন পদ্ধতি হইতে যে আধুনিক অনেক আচার ব্যবহারের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন। কিন্তু সেই "শিভ্যালরি" প্রথা মধ্যে অতি তুচ্ছ কারণে পরস্পর ডুয়েলে প্রবৃত্ত হইবার প্রবৃত্তি পদে পদে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে ইয়োরোপে যে মনুষ্য নামের মাহাত্ম্য এত দূর বৃদ্ধি হইয়াছে, ছোটই হউক আর বড়ই হউক, মানুষকে মানুষ বলিয়া কিঞ্চিৎ সমীহ করিতে হইবেক, এই যে এক বোধের বিকাশ হইয়াছে, সূক্ষ্ম অনুধাবন করিয়া দেখিলে 'ডুয়েল'কেই তাহার মূল কারণ বলিয়া জ্ঞান হইবেক।

আর এক কথা যে, ডুয়েলের প্রতিপক্ষেরা বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ ইহাতে বৈরনির্য্যাতনের প্রবৃত্তি বড়ই বলবতী হয়,

তাহাও অকিঞ্চিৎকর । নূতন নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করা যাঁহাদিগের উদ্দেশ্য, তাঁহারা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে উপদেশ দিতে পারেন যে, “দক্ষিণ কপোলে দংশন করিলে বাম কপোল বাড়াইয়া দিবে।” ইত্যাদি। কিন্তু সে সকল কথাতে ঐকান্তিক কর্ণপাত করিলে সংসারী ব্যক্তির সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করাই সর্ব্ব প্রথম আবশ্যক হইয়া উঠে। ধর্ম্ম সংস্থাপন কর্ত্তাদিগের এক ‘হুজুগ’ আছে যে, স্বভাবত মানুষের যে যে বৃত্তি প্রবল, সাধ্যমতে তাহার দমনে নিযুক্ত থাকাই তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম ; রাগ মানুষের স্বভাবত প্রচণ্ড, অতএব যেরূপে হউক রাগের প্রভাব খর্ব্ব করা একান্ত কর্ত্তব্য, সুতরাং যে সকল দেশাচার দ্বারা রাগের খর্ব্বতা না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, সে সকল দেশাচার নির্ম্মূল কর। কিন্তু এরূপ বচনচাতুরী অতি অসার ও অসম্বদ্ধ। মানুষের কোন বৃত্তিকেই একেবারে দমন করিতে হইবেক না, কাম ক্রোধ লোভ মোহ কিছু একেবারে দমন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত করিতে হইবেক না। বালক এবং বালকের মত নির্ব্বোধ ইতর লোকদিগকে সময়ে সময়ে সে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক হইলেও হইতে পারে বটে, কারণ ফলাফল আলোচনা পূর্ব্বক চলিবার অভ্যাস তাহাদিগের নাই, সুতরাং তাহাদিগকে এক একটা ‘সিদ্ধান্তআঁটা’ কথা শিখাইয়া দিতে হয়, নচেৎ তাহারা কাজের সময় কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে পারে না, এ কথা গ্রাহ্য বটে। কিন্তু তা ব’লে সেই সকল সিদ্ধান্তআঁটা উপদেশকে নিরবচ্ছিন্ন তত্ত্ব বলিয়া জ্ঞান করা দর্শনশাস্ত্রসম্মত নহে। সময় বিশেষে সেই সকল সিদ্ধান্তের সঙ্কোচ করা আবশ্যক, ইহা যেন দর্শনকার মাত্রেরি মনোমধ্যে অহর্নিশি জাগরূক থাকে নচেৎ সকল উপদেশ বাক্যই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া উঠে, সকল উপদেশই “ত্রয়োদশীতে বেগুন খাইতে নাই” ইত্যাকার পরামর্শের মত ভাবাপন্ন হয়। অতএব ধর্ম্ম সংস্থাপন কর্ত্তারা ইতর লোকদিগকে সংগ্রহ করিবার আশয়ে যে সমস্ত অসাংসারিক নিরবচ্ছিন্ন দেশকালপাত্র-বিবেচনা-বিবর্জ্জিত পরামর্শ-বাক্য প্রচারিত করিয়াছিলেন, সে গুলি তাঁহাদিগেরি সাজে। কিন্তু যাঁহারা মনুষ্যের আচরণের ফলাফল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিবেন, তাঁহারা একবাক্য হইয়া সংসারের বর্ত্তমান অবস্থাতে বৈরনির্য্যাতনকে যে এককালে উঠাইয়া দিতে চাহেন, ইহা কোন দিশী কথা? যাবৎ ‘বৈর’ বলিয়া এক পদার্থ জগতীতলে বিদ্যমান আছে, যাবৎ এক জনের ক্লেশ আর এক জনের সুখ হয়, এক জনের লাঞ্ছনায় আর এক জনের হৃদয় উল্লাসিত হয়, একজনকে খাটো করিলে আর এক জনের লাভ বোধ হয়, পৃথিবীর এ ভাব থাকিবেক ; যাবৎ পরস্পর রেশারেশি, শত্রুতা, এ সকল কাণ্ড ধরাধাম হইতে তিরোহিত না হয়, তাবৎ বৈরনির্য্যাতনও অবশ্যকর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত করিতে হইবেক। ডুয়েল সেই বৈরনির্য্যাতন ব্যাপার সমাধা করিবার উপায় বিশেষ,

বলিয়া ইহাকে হতমান না করিয়া, বরং ইহা দ্বারা সুশৃঙ্খলে উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, এতদর্থে ইহার প্রশংসা করা আবশ্যক। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দুইজনে দেখা হইল, একটা যা হয় শেষ হইয়া গেল, অত্যাচারীই হউন আর অত্যাচরিতই হউন, যিনি বাঁচিয়া গেলেন, তিনি নিরুপদ্রব হইলেন, তাঁহার মনের ঝাল মিটিয়া গেল, তিনি অনেকটা শুধরিয়া গেলেন, ইহা ভাল ? কি দুই জনে ভিতরে ভিতরে "আদায় কাঁচকলায়" হয়ে রহিলেন, ইনি উঁহার ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, উভয়েরি বন্ধু বান্ধব দুজনের জ্বালায় অস্থির হইতে লাগিল, ইঁহার সুখ্যাতি উহাঁর অসহ্য, বিধিমতে উহাঁর মন্দ করিতে ইহার চেষ্টা, এইরূপ হওয়া ভাল ? তবে একজনের প্রাণ যাইতেছে এই এক কথা বটে, কিন্তু তাহাতে আর কি করা যাইবেক। প্রাণ নানা প্রকারে গিয়া থাকে, দেয়াল মাতায় পড়িলে প্রাণ যায়, চারি দণ্ডের ওলাউঠাতে প্রাণ যায়, গঙ্গাটুকু পার হইতে কত প্রাণ যায়, নিত্য নিত্য রেলরোডে কাজ করিতে কত গরীব বেচারার প্রাণ যায়। ঈদৃশ শত সহস্র প্রাণসংশয়াবহ ঘটনা পরিপূর্ণ সংসার মধ্যে আপনার সম্ভ্রম রক্ষা করিতে প্রাণ গেল, ইহা কি বড়ই ক্ষোভের বিষয় ? ফলত প্রাণের প্রতি এতাদৃশ ঘোরতর মমতা যত কম হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

বিশেষত, ডুয়েল কিছু লোককে জোর করিয়া করায় না। অন্য ব্যক্তিকে ডুয়েলের প্রস্তাব করা, কিম্বা অন্য ব্যক্তির সেই প্রস্তাবে সম্মত হওয়া তোমার আপনার হাত, তুমি পরকৃত অত্যাচার পরিপাক করিতে পার, বহুদাচ্ছা। পরের প্রতি অত্যাচার করিয়া তাহার ডুয়েলের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পার, তাহাও ভাল। সমাজ তোমাকে পরামর্শও দিবে না, নিবৃত্তও রাখিবে না। তবে তোমার আচরণে সমাজ ভাল বলিবে, কি মন্দ বলিবে, তাহা সমাজের হাত বটে। এমন এমন অবসর আছে যে, তুমি যদি তোমার অপমানকর্ত্তাকে ডুয়েলের প্রস্তাব না কর, তাহা হইলে সমাজের মধ্য হইতে এত ধিৎকার উঠিবে যে, তোমার মুখ দেখান ভার ; এমন এমন অবসর আছে যে, তুমি যদি অত্যাচার করিয়া অত্যাচরিত ব্যক্তির ডুয়েলের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া ঘরে দরজা দিয়া বসিয়া থাক, ত তোমার ধোপা নাপিত পর্য্যন্ত বন্ধ হইবে। কিন্তু সে স্থলে তোমার যাহা স্বেচ্ছা, চাই তুমি এত বড় বীরপুরুষ হইতে পার যে, কিছুতেই তোমার রক্ত গরম হয় না ; চাই তুমি এত নিরুৎসুক ও 'খাতিরনদারৎ' হইতে পার যে, রাস্তার লোকে গায়ে ধুলো দিলেও অম্লান বদনে ঝাড়িয়া ফেল এবং আপনার চিরজাগরিত-স্মিত-বিকশিত বদন-মণ্ডল সকলকেই অবলোকন করাইতে পার, কিছুতেই তোমার মুখশ্রী মলিন হয় না, দন্তের কান্তি আচ্ছাদন হয় না ; সাক্ষাৎ লজ্জাদেবী তোমার ললাটে পদার্পণ করিতে লজ্জাবোধ করেন। এ সব ত তোমারি হাত। তবে সমাজকে এই

ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয় যে, যদি উভয়ের সম্মতিক্রমে অপ্রকাশ্য যুদ্ধ সংঘটন হয়, তাহা হইলে তদুপলক্ষে একের মৃত্যু হইলে অন্য ব্যক্তি যেন হত্যা অপরাধে অপরাধী না হয়েন, অর্থাৎ 'পি-ন্যাল কোডের' হত্যাপরাধ বিষয়ক প্রকরণের দুএকটী কথা বদল করিয়া দিলেই যথেষ্ট।

ডুয়েলের প্রতি প্রধান আপত্তি এই যে, যাহার তাগ্ ভাল, ইহা দ্বারা তাহারি 'একাদশ বৃহস্পতি' হয়। সে সচ্ছন্দে নির্ব্বিরোধী লোকের অপমান করিয়া নিরুপদ্রবে মানুষ খুন করিয়া বেড়াইতে পারে। কিন্তু এ কথার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া গিয়াছে; অর্থাৎ যতই কেন তাগ্ ভাল হউক না, যে কাজ করিলে আর এক ব্যক্তির পিস্তলের মুখে দাঁড়াইতে হয়, সে রূপ আচরণে কথায় কথায় হকনাহক্ প্রবৃত্ত হইতে অনেকেরি মন সরিবেক না। তবে যদি দু একজন এমন উদ্ধত পুরুষ থাকেন, যে তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া পরের মনে ক্লেশ দিতে প্রতিজ্ঞারূঢ়, তাঁহাদিগের বিষয়ে নাচার। এক্ষণে অত্যাচার প্রতীকার করিবার যে সকল উপায় বলবৎ আছে, অর্থাৎ আদালতে নালিস করা প্রভৃতি; তাহার একটিও উঠাইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। ডুয়েল কেবল অতিরিক্ত উপায় স্বরূপ প্রবর্ত্তিত হইবেক এবং যে যে স্থলে আদালতের অগ্রসর হইবার যো নাই, যো থাকিলেও বা অগ্রসর হওয়া অকিঞ্চিৎকর হয়, সেই সকল স্থলে ডুয়েল চলিবেক। তবে অনেক সময়ে অভদ্র দ্বারা ভদ্রের খুন হইবেক বটে; কিন্তু কি করা যায়, এখন যেমন অনেক সময়ে অভদ্রের নিকট ভদ্রকে লাঞ্ছিত হইতে হইতেছে, অথচ সমাজ তাহার কিছুই করিতে পারেন না, সেইরূপ খুন হইলেও সমাজকে নিঃশব্দে রোদন করিতে হইবেক। খুন আর লাঞ্ছনা ইহার মধ্যে কোন্‌টী গুরুতর, তাহার বিনিগমনা সকলের পক্ষে একরূপ নহে। কেহ কেহ অশেষ প্রকার লাঞ্ছনার মধ্যবর্ত্তী হইয়াও নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সমাধা করা এবং আহার সামগ্রী পরিপাকের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া কালযাপন করাকেও উপাদেয় জ্ঞান করে, সে না হয়, ডুয়েলকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিবেক। কেহ বা অন্যের কঠোর দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইলে প্রাণত্যাগ তদপেক্ষা শ্লাঘনীয় জ্ঞান করে। সে যখন উৎকট অত্যাচারের পাত্র হইবেক, তখন যদি সমাজ তাহার অত্যাচার প্রতীকার করিতে অসমর্থ হন, তবে সে হয় অত্যাচারীকে ক্ষমা প্রার্থনা করাইবেক, নয় খুন করিবেক, না হয় আপনি খুন হইবেক। ইহাতে সমাজের বিশেষ ক্ষতি নাই। তেজীয়ান্ ব্যক্তির মানহানি হইলে সে যদি প্রতীকার করিতে না পায়, তাহা হইলে প্রায় সে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, সেই অবধি সে যেন স্বভাবচ্যুত হইয়া যায়, এবং তাহার যাবতীয় সার সত্ত্ব উৎসাহ পুরুষকার প্রভৃতি গুণগ্রাম নষ্ট হয়। এরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া দিনপাত করিতে বাধিত করা অপেক্ষা বরং তাহাকে অপমানের প্রতীকার প্রার্থনা উপলক্ষে খুন্ হইতে দেওয়াও সমাজের পক্ষে নিতান্ত অপরামর্শ নহে।

বঙ্গসুন্দরী।

চতুর্থ সর্গ,—করুণাসুন্দরী।

' Ah ! may'st thou ever be what now thou art,
Nor unbeseem the promise of thy spring,
As fair in form, as warm yet pure in heart,
Love's image earth without his wing,
And guileless b nd Hope's imagining !
And surely sh o now so fondly rears
Thy youth, in th , thus hourly brightening,
Beholds the ra w of her future years,
Before whose hea ly hues all sorrow dis-
appears.

লর্ড বায়রন্।

ওই গো আগুন লেগেছে হোথায় !
লক লক শিখা উঠিছে কেঁপে,
দাউ দপ্ দপ্ ধুধু ধোরে যায়,
দেখিতে দেখিতে পড়িল ব্যেপে।

২

" জল্ জল্ জল্ " ঘোর কোলাহল,
ফট ফট ফট ফাটিছে বাঁশ ;
ধুঁয়ায় উশায় ভরিল সকল,
লাল হয়ে গেল নীল আকাশ।

ছুটেছে বাতাস হলক হলক,
ঝলসিছে সব, লাগিছে যাতে,
তবুও এখন চারিদিকে লোক,
তামাসা দেখিতে উঠেছে ছাতে।

" কারো সর্ব্বনাশ, কারো পোষ মাস "
পরের বিপদে কেহ না নড়ে,
আপনার ঘরে ধরিলে হুতাশ,
মাথায় আকাশ ভাঙিয়ে পড়ে !

কোথা এ বাড়ীর ছেলে মেয়ে যত,
ঘরের ভিতরে কেহ যে নাই ;
আগুন দেখিতে উহাদের মত,
উপরে উঠেছে বুঝি সবাই !

৬

কেন গেল ছাতে, একি সর্ব্বনাশ !
কে আছে আগুনে ওদের কাছে ;
অনল মাখিয়ে বহিছে বাতাস,
ছাতে এ সময় দাঁড়াতে আছে !

৭

যাই যাই আমি ওখানে এখন,
যেথা কুঁড়ে গুলি জ্বলিয়া যায় ;
দেখি বেয়ে চেয়ে করি প্রাণপণ,
বাঁচাবার যদি থাকে উপায়।

৮

এই যে দাঁড়ায়ে করুণাসুন্দরী,
উপর চাতালে থামের কাছে ;
মুখ খানি আহা চুনপানা করি,
অনলের পানে চাহিয়ে আছে !

চুল গুলি সব উড়িয়ে ছড়িয়ে,
পড়িছে ঢাকিয়ে মুখ কমল ;
কচি কচি দুটি কপোল বহিয়ে,
গড়িয়ে আসিছে নয়ন-জল।

যেন মৃগশিশু সজল নয়নে,
দাঁড়ায়ে গিরির শিখর পরি,
ত্রাসে দাবানল দ্যাখে দূরবনে,
স্বজাতি জীবের বিপদ স্মরি !

১১

হে সুরবালিকে, শুভদরশনে,
সুবর্ণপ্রতিমে কেন গো কেন,
সরল উজ্জল কমল নয়নে,
আজি অশ্রুবারি বহিছে হেন!

১২

দুখীদের দুখে হইয়াছ দুখী,
উদাস হইয়ে দাঁড়ায়ে তাই,
শুকায়েছে মুখ, আহা শশিমুখী,
লইয়ে বালাই মরিয়ে যাই!

১৩

যেমন তোমার অপরূপ রূপ,
সরল মধুর উদার মন,
এ নয়ননীর তার অনুরূপ,
মরি আজি সাজিয়াছে কেমন!

১৪

যেন দেববালা হেরিয়ে শিখায়,
কৃপায় নামিয়ে অবনীতলে;
চেয়ে চারিদিকে না পেয়ে উপায়,
ভাসিছেন সুদু নয়ন-জলে!

১৫

তোমার মতন, ভুবন-ভূষণ,
অমুল রতন নাই গো আর!
সাধনের ধন এ নব রতন,
হৃদি আলো করি রহিবে কার।

১৬

তুমি যার গলে দিবে বরমালা,
সে যেন তোমার মতন হয়;
দেখো বিধি এই সুকুমারী বালা,
চিরদিন যেন সুখেতে রয়!

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে করুণাসুন্দরী
নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ—বিষাদিনী।

"শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্ব্বিপাকম্
বিষদ্রুমম্।"
ভবভূতি।

১

ছাতের উপরে চাঁদের কিরণে,
ষোড়শী রূপসী ললিত বালা,
ভ্রমিছে মরাল অলস গমনে;
রূপে দশ দিশ করেছে আলা।

২

বরণ উজ্জ্বল তপন্ত কাঞ্চন,
চমক চন্দ্রিকা নিরখি ছটা;
খুয়ে গেছে যেন তপন আপন
এ মূরতিমতী মরীচি ঘটা।

৩

সুঠাম শরীর পেলব লতিকা,
আনত সুষমা কুসুম ভরে,
চাঁচর চিকুর নীরদ মালিকা
লুটায়ে পড়েছে ধরণী পরে।

৪

হরিণী গঞ্জন চটুল নয়ন,
কভু কভু যেন তারকা জ্বলে;
কভু যেন লাজে নমিতলোকন,
পলক পড়ে না শতেক পলে;

৫

কভু কভু যেন চমকিয়ে ওঠে,
ফুল ফুটে যেন ছড়িয়ে যায়,
মধুকর কুল পাছু পাছু ছোটে,
বুঝি পরিমল লোভেই ধায়;

কখন বা যেন হয়েছে তাহায়
স্বধার প্রবাহ প্রবহমান,
যেথা দিয়ে যায়, অমৃত বিলায়,
জুড়ায় জগত জনের প্রাণ।

৭

আপনার রূপে আপনি বিহ্বল,
হেসে চারিদিকে চাহিয়ে দেখে ;
কে যেন তাহারি প্রতিমা সকল
জগত জুড়িয়ে রেখেছে এঁকে।

৮

আচম্বিতে যেন ভেঙে যায় ভুল,
অমনি লাজের উদয় হয় ;
দেহ থর থর, হৃদয় আকুল,
আনত আননে দাঁড়ায়ে রয়।

৯

আধ ঢুলু ঢুলু লাজুক নয়ন,
আধই অধরে মধুর হাসি ;
আধ ফোটো ফোটো হয়েছে কেমন
কপোল-গোলাপ-মুকুলরাশি !

১০

আননের পানে সরমবতীর,
স্থির হয়ে চাঁদ চাহিয়ে আছে ;
আসি ধীরে ধীরে শীতল সমীর,
ব্যজন করিয়ে ফিরিছে কাছে।

১১

এস গো সকল ত্রিলোকসুন্দরী,
এখানে তোমরা এস গো আজি ;
চিকণ চিকণ বেশ ভুষা পরি
আপন মনের মতন সাজি !

১২

ঘেরি ঘেরি এই সোণার পুতলী,
দাঁড়াও সকলে সহাস মুখে ;
কমল কানন বিলোচন তুলি,
চেয়ে দেখ রূপ মনেরি সুখে।

১৩

এমন সরেস নিখুঁত আনন,
বিধি বুঝি কভু গড়েনি কারো ;
এমন সজীব তেজাল নয়ন—
—মদির— মধুর— নাহিক আর।

১৪

আমরা পুরুষ নব রূপ বশ,
যাহা খুশি বটে বলিতে পারি ;
পান করি আজি নব রূপ রস,
নারীর রূপেতে ভুলিল নারী।

১৫

মরি মরি ! কারো কথা নাই মুখে,
অনিমিখে শুদ্ধ চাহিয়ে আছে ;
কি যেন বিজলী বিলসে সমুখে,
কি যেন উদয় হয়েছে কাছে !

১৬

একি একি কেন রূপের প্রতিমা,
সহসা মলিন হইয়ে এল ;
দেখিতে দেখিতে চাঁদের চন্দ্রিমা
নিবিড় নীরদে ঢাকিয়ে গেল।

১৭

কেশ মেঘ জালে সীমন্ত সিন্দুর
প্রকাশে তরুণ অরুণ রেখা,
মরি, তারি নীচে সেই সুমধুর
মুখখানি কেন বিষাদে মাখা !

১৮

মাঝে মাঝে আসি বিলসিছে তায়
দিবা-দীপশিখা খেদের হাসি,
তড়িতের প্রায় চকিতে মিলায়,
বাড়াইয়ে দেয় তমসরাশি।

১৯

আহা দেখ সেই জ্যোতির নয়নে,
বিমল মুকুতা বরষে এবে,
এমন পাষাণ কে আছে ভুবনে,
এ হেন রতনে বেদনা দেবে!

২০

ত্রিলোক আলোক যে সুররূপসী,
আলো নাই মনে কেন রে তার!
ভুবন ভূষিয়ে বিরাজে যে শশী,
কেন তারি হৃদে কালিমা ভার!

২১

হা বিধি! এ বিধি বুঝিতে পারিনি,
কোমল কুসুমে কীটের বাস;
বিপাকে বধিতে সরলা হরিণী
শবরে পাতিয়ে রেখেছে পাশ।

২২

বুঝি এই পোড়া বিধির বিধিতে
পিতামাতা তব ধরিয়ে করে,
করেছেন দান সে কাল নিশিতে
ধাওড়া ভাওড়া বেদড়া বরে!

২৩

জনক জননী কি করেছ হায়,
তোমরা দুজনে মোহের ঘুমে,
কোন্ প্রাণে আহা এ ফুলমালায়
ফেলিয়ে দিয়েছ শ্মশান ভূমে!

২৪

পতি সুখে সতী হয়েছে নিরাশ,
হৃদয়ে জ্বলেছে বিষম জ্বালা;
শরীর বাতাস, হৃদয় উদাস,
কেমনে পরাণে বাঁচিবে বালা!

২৫

কোথা ওগো কুল-দেবতা সকল,
অনুকূল হও ইহার প্রতি;
বরষিয়ে শিরে সুধা শান্তিজল,
ফিরাও সতীর পতির মতি!

২৬

যেন সেই জন পাইয়ে চেতন,
পশুভাব ত্যেজে মানুষ হয়;
আমোদে প্রমোদে দম্পতী দুজন
ছেলে পুলে লয়ে সুখেতে রয়!

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে বিষাদিনী
নামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ,—প্রিয়সখী।

"আনন্দজীবিতসমঃ সখিরেব মে।"
ভবভূতি।

অয়ি অয়ি সখী! জগতের জ্বালা
জ্বালায়ে আমায় করেছে খুন,
যুঝে যুঝে মাঝে হইয়াছি আলা,
চারিদিগে ঘেরা বেড়াআগুন।

যেমন পথিক রোদে পুড়ে পুড়ে
যদি দূরে ছায়া দেখিতে পায়,
জনমে ভরসা তার বুক যুড়ে,
অনুরাগ ভরে ছুটিয়া যায় ;

৩

তেমনি আমার মন তোমা পানে
জুড়াবার তরে সতত ধায়,
সাগর-প্রবাহ সদা একটানে
একি দিক পানে গড়ায়ে যায়।

৪

তুমি যেই স্থানে কর বসবাস,
সেই স্থান কোন মোহন লোক ;
তোমার মধুর মুখ হাসহাস,
প্রকাশে সে লোকে অরুণালোক।

৫

স্থির ঊষা প্রায় তুমি দেবী তার,
হৃদয়ে রয়েছ বিরাজমান ;
নাহি অতি তাপ, নাহিক আঁধার,
কি সরেস সেই সুখেরি স্থান !

৬

সদা সেই লোকে দিগঙ্গনাগণে
মনোহর বেশে সাজিয়ে রয়,
মৃদুল অনিল তার ফুলবনে
মানস মোহিয়ে সতত বয়।

৭

যখন তোমার সুললিত তনু
কুসুম কাননে প্রকাশ পায়,
দশ দিকে দশ ওঠে ইন্দ্রধনু,
আদরে তোমার পানেতে চায়।

ভ্রমর নিকর ত্যেজি ফুলকুল,
গুণ্ গুণ্ স্বরে ধরিয়ে তান ;
চারি দিকে তব হইয়ে আকুল,
উড়িয়ে বেড়ায় করিয়ে গান

দোলে দূবে দূরে তরু লতাগণ,
দোলে থোলো থোলো কুসুম তায়
যেন তারা আজি হরষে মগন,
সাধনের ধন পেয়ে তোমায়।

১০

ভ্রম তুমি সেই সুখ ফুলবনে,
চেয়ে চারিদিকে সহাস মুখে ;
হরিণী যেমন গিরি তপোবনে
বেড়িয়ে বেড়ায় প্রাণের সুখে।

১১

প্রকৃতির চারু শোভা দরশনে,
ক্রমে হয়ে যাও বিহ্বল হেন ;
দাঁড়াইয়ে থাক মগন নয়নে,
হীরক-প্রতিমা দাঁড়ায়ে যেন।

১২

মরি সে নয়ন কেমন সরেস,
যেন কোন রসে রয়েছে ভোর ;
যেন আছে আধ আলস আবেশ,
ভাঙে নাই পুরো ঘুমের ঘোর !

১৩

হে সুরসুন্দরী ! ত্যেজে সুরলোক,
এ লোকে এসেছ কিসের তরে ;
তব অনুকূল নহে এ ভূলোক,
অসুখ এখানে বসতি করে।

১৪

ঐ জগতে এই ফুটে আছে ফুল,
এই দেখি ফের শুকায়ে যায় ;
ঐই গাছে গাছে ধরেছে মুকুল,
না ফুটিতে কীটে কুরিয়ে খায় ।

১৫

ঐই দেখি হাসে চাঁদিনী যামিনী,
পোহাইয়ে যায় তাহার পর ;
ঐই মেঘমালে নলকে দামিনী,
পলক ফেলিতে সহেনা ভর ।

১৬

আহা যেন এই অপরূপ রূপ,
চির দিন এক ভাবেতে থাকে ;
যেন নাহি আসি বিষাদ বিরূপ,
রাহুর মতন গ্রাসিয়ে রাখে !

১৭

যখন আমার প্রাণের ভিতর
ভেবে ভেবে হয় উদাস প্রায়,
ভাল নাহি লাগে দিনকর কর,
আঁধারে পলাতে মানস চায় ;

১৮

এই মনোহর বিনোদ ভুবন
বিষণ্ণ মলিন মুরতি ধরে,
বোধ হয় যেন জনম মতন
ফুরায়েছে সুখ আমার তরে ;

১৯

সহিতে সহিতে সহেনা যখন,
পারিনে বহিতে হৃদয়-ভার,
মরম বেদনে গোঙরায় মন,
দেহেতে পরাণ রহেনা আর,

অমনি উদয় সমুখে আসিয়ে,
তোমার ললিত প্রতিমা খানি,
স্নেহের নয়নে সুধা বরষিয়ে,
জুড়ায় আমার তাপিত প্রাণী ।

২১

আচম্বিতে হয় আলোক উদয়,
কভু হেরি নাই তাহার মত ;
নহে দিবাকর তত তেজোময়,
সুধাকর নয় মধুর তত ।

২২

চারি দিকে এক পরিমল বায়,
'ভর্' ক'রে দেয় মগজ ঘ্রাণ ;
কেহ যেন দূরে বাঁশরী বাজায়,
সুরেতে মাতায় হৃদয় প্রাণ ।

২৩

যেন আমি কোন অপরূপ লোকে,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে চলিয়ে যাই ;
বেড়ায়ে বেড়ায়ে চাঁদের আলোকে,
সহসা তোমাকে দেখিতে পাই ।

২৪

আহা সে তোমার সরল আদর,
সরল সহাস শুভ বয়ান ;
আলো ক'রে আছে মনের ভিতর,
নারিব ভুলিতে গেলেও ...

২৫

তোমার উজল রূপ দরপণে
সরল তেজাল মনের ছবি,
প্রভাতের নীল বিমল গগনে
শোভা পায় যেন নূতন রবি ।

২৬

কিবে অমায়িক ভোলা খোলা ভাব,
পাবন প্রণয়ে হৃদয় তোর ;
সদা হাসিখুসি উদার স্বভাব,
চারি দিকে নাই সুখের ওর !

২৭

কাননে কুসুম হেরিলে যেমন,
ভালবাসে মন আপনি তারে ;
তেমনি তোমায় করি দরশন,
না ভালবেসে কি থাকিতে পারে !

২৮

সুধাকর শোভে আকাশ উপরে,
পরাণ জুড়ায় হেরিলে তায় ;
আর কিছু নয়, শুদ্ধ তারি তরে
তৃষিত নয়নে চকোর চায়।

২৯

সরেস গাহনা শুনিলে যেমন,
কাণে লেগে থাকে তাহার তান ;
তোমার উদার প্রণয় তেমন
ভরিয়ে রেখেছে আমার প্রাণ।

৩০

যেমন পরম ভকত সকলে
আরাধনা করে সাধন ধনে,
তেমনি তোমায় হৃদয় কমলে
ভাবি আমি ব'সে মগন মনে ;

৩১

ভাবিতে ভাবিতে উথলে অন্তর,
প্রেম রস ভরে বিহ্বল প্রাণ ;
অয়ি, তুমি মম সুখের সাগর,
জুড়াবার প্রিয় প্রধান স্থান !

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে প্রিয়সখী
নামক ষষ্ঠ সর্গ।

উপদেবতা।

বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া কিম্বা সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়া, গুজব বা অজ্ঞের কথায় বিশ্বাস করা আর হাতুড়ের ঔষধ সেবন করা উভয়ই সমান। যেমন হাতুড়ের দ্বারা চিকিৎসা করাইলে হয় একেবারে মৃত্যু না হয় কদর্য্য ঔষধের বিষময় গুণে শরীর চিরকালের নিমিত্ত ভগ্ন হইয়া যায়, সেইরূপ হঠাৎ কোন অমূলক কথায় বিশ্বাস করিয়া কাজ করিতে গেলে, হয় একেবারে ভয়ানক বিপদে পড়িতে হয় না হয় চিরকালের জন্য মন কুসংস্কারাপন্ন হইয়া থাকে। ক্রমে সেই সকল কুসংস্কার এতদূর বদ্ধ-মূল হইয়া উঠে, যে তাহাদের অসত্যতার বিষয় স্পষ্ট প্রতীত হইলেও কিছুতেই মনের খটকা মেটে না। ছেলেবেলায় মেয়েদের মুখে জুজু, ভত, জটের মা প্রভৃতির নাম শুনিলে অমনি মায়ের কোলের ভিতর কুঁকড়ি শুঁকড়ি হয়ে বস্‌তাম, ভাব্‌তাম, যে আমাকে দেখ্‌তে পেলিই বুঝি অমনি হা করে খেয়ে ফেল্‌বে। বয়ঃক্রম যত বেশী হ'তে লাগিল, ডাইন প্রভৃতি নানাবিধ জানোয়ারের কথা শুনিতে লাগিলাম ; পূর্ব্বে ভূত ও জুজুর বিষয় শুনে শুনে তাহাতে এতদূর বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, যে নূতন জানোয়ার গুলির নাম শ্রবণ মাত্র একেবারে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। একটু জ্ঞান হয়ে অবধি, ভূতেরা দিনের বেলায় কিছু উৎপাত করে না বলে যে

বিশ্বাস ছিল, সেই জোরে দিনমান খুব ধুমধাম করে বেড়াতাম; সন্ধ্যা হতে না হতে অমনি ঘরে ঢুক্‌তে হতো, প্রাণান্তেও রাত্রে বাহিরে যেতে সাহস হতো না, এখন আবার "গোদের উপর বিষফোড়," দিন-রাত্ত সমান হয়ে উঠ্‌লো, মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌লো, আর দিনেও বেরোনোর যো নাই; খেলাধুলো সব বন্ধ হয়ে গেল, এমন কি মানুষের দিকে ভাল করে তাকাতেও পারতাম না। পথে ঘাটে যদি হঠাৎ কোন বুড়ার সঙ্গে দেখা হত অমনি মুখ পাংশু হয়ে যেত, কথা বেরুত না, ভাব্‌তাম বুঝি এইবার ডাইনে খেয়ে ফেল্‌লে; বিশেষতঃ ভিক্ষার ঝুলি কান্ধে বুড়িকে দেখলে আর রক্ষা নাই, মাথায় যেন বজ্রপাত হলো! দণ্ডে দণ্ডে নূতন নূতন খবর পাওয়া যেত, এই "জেলেদের ছেলেকে ডাইনে খেয়েছে." "বামুনদের ছোট বৌ ঘাটে নাইতে গিয়েছিল তাকে ভূতে পেয়েছে" এই রকম যত নানা প্রকার কথা শুন্‌তে লাগলাম ততই ভয় বাড়তে লাগ্‌ল; ভূতে পাওয়া ও ডাইনে খাওয়া, যে ভাল-কর্‌তে পার্‌ত, তাকে দেখ্‌লে এক জন সিদ্ধ পুরুষ অথবা দেবতা বলে বোধ হত। শুনিতাম যে মন্ত্রের গুণে ওরারা না কর্‌তে পারে এমন কাজই নেই, তাদের সঙ্গে সঙ্গে নাকি সর্ব্বদাই দুই চারিটি ভূত ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের বিপদ হলে তারাই রক্ষে করে। উঃ কি আশ্চর্য্য বিশ্বাস! কি ভয়ানক সংস্কার! এর চেয়ে পূর্ব্ব-কালের "কাঠবিড়ালিতে সাগর বান্ধে" প্রভৃতি যে সকল প্রবাদ আছে তাহাও বিশ্বাস করা ভাল। ভাইরা কেন? যে দেশের লোকের হনুমানের সাগর ডিঙ্গান, বানরদের মানুষকে সাহায্য করার জন্য যুদ্ধ করা, অঙ্গুলের অগ্রভাগে পর্ব্বত-ধারণ, সর্পের মস্তকে পৃথিবীর স্থিতি, মানুষের ও অন্যান্য জন্তুর দশহাজার হাত, পঞ্চাশ লাখ পা, দুশ চারশ মাথা, সাড়ে ষোলগণ্ডা ল্যাজ ও মাসি পিসির গল্পের মত যা শোনে কিম্বা পড়ে তাতেই বিশ্বাস, তারা যে ভূত, ডাইন, জুজু বিশ্বাস করিবে তার আর আশ্চর্য্য কি! বিশ্বাস তোমার ধন্য বাহাদুরী! এত লোককে কি করে ভুলিয়ে রেখেছ তা ভাবতে গেলে মন চমকে উঠে, তোমার ক্ষমতার অন্ত পাওয়া যায় না। যাহোক্‌, ক্রমে বয়ঃক্রম বেড়ে উঠলো, ঘটনা গুলিকে, পাছে ফেলে কাল বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত-বেগে এগিয়ে পড়্‌ল, যেটিকে কোন সময়ে পরে আসবে বল্‌তাম এখন তা ফুরিয়ে গিয়েছে, হয়ত আমাদের মনথেকে চিরকালের জন্য চলে গিয়েছে, আর আস্‌বে না। দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠলাম, বহুদর্শিতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বৃদ্ধি হতে লাগলো, ক্রমে ক্রমে অনেক গুলি কুসংস্কারও মনথেকে পালিয়ে গেল, জ্ঞানের আলোকে তিমিরাবৃত মন অনেক ফরসা হয়ে উঠলো; ভূত, পেত্নী, ডাইন আর বিশ্বাস হয় না, তবুও অন্ধকার রাত্রে বেরুতে ভয় হয়, একটু শব্দ শুন্‌লেই অমনি চমকে উঠি, অথচ লোকের কাছে বলি যে ভূত মানি না, সুতরাং ভূত মানিয়া থাকে।

হয়ত অনেক সময়ে গোঁড়া হিন্দুদের বিদ্বেষ ভাজন হইয়াও ভূত থাকা না থাকার বিষয় তর্ক হইলে শেষের পক্ষ সমর্থন করিয়াছি ও না থাকার নানারূপ কারণ দেখাইয়া লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা পাইয়াছি; কিন্তু অরণ্যে রোদন, সংস্কারের পায়ে নমস্কার; অগ্নি-কুণ্ডে কুশাগ্র পরিমিত জলের ন্যায় আমার কথায় যত ফল হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য; লাভের মধ্যে কেবল সংক্রান্তি মহাশয়দের বিষ দৃষ্টি ও উপদেবতাগণের কোপ। পাছে আমাকেই আবার ভূতের হাতে পড়িতে হয় এই এক নূতন ভাবনা আসিয়া জুটিল। রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইবার যো নাই, কোন্ সময়ে উপদেবতা মহাশয়েরা ইট, হাড়, মল মূত্র প্রভৃতি নিক্ষেপ করেন কিম্বা দোর জানালা গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

এরূপ উৎপাত প্রায় অনেক স্থানেই হইয়া থাকে। কি কি কারণে ইহা ঘটে তাহা শুনিলে সকলেই জানিতে পারিবেন যে ভূত কাহাকে বলে এবং আমাদের দেশে তাঁহাদের দলেরও অভাব নাই। কিন্তু এইরূপ দলের লোকেরা যে ভূত মানেন না এমন নয়; তাঁহারা লোকের উপর যেমন উৎপাত করিয়া থাকেন সেরূপ ঘটনা হয়ত তাঁহাদের বাড়ীতেও হইয়া থাকিবেক, অথচ সে গুলি যথার্থ ভূতের কার্য্য বলিয়াই বিশ্বাস করেন। তাঁহারা জানেন যে তাঁহারাই বুঝি ভূতের অনুকরণ করিয়া লোককে জব্দ করেন ও তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু কখন ভাবেন না যে তাঁহাদের মত ভূত অনেক আছে ও তাহারাও তাঁদের মত মতলব সিদ্ধির জন্যই সেরূপ করিয়া থাকে। হা নির্ব্বোধ! নিজে চোর হইয়াও চোরের কৌশল বুঝিতে পার না! বিশ্বাস তোমার মনে এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছে যে এখন্ আর কিছুতেই তাহার হাত ছাড়াইতে পার না।

বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইলে ভূতের উৎপাতের অনেক কারণ পাওয়া যায় তাহার কতক গুলি এই,—

প্রথম, গৃহস্থকে ভয় দেখাইয়া চুরী করার সুবিধা করিয়া লওয়া; দ্বিতীয় কোন স্ত্রীলোকের সহিত প্রসক্তি থাকিলে তাহা অনায়াসে সিদ্ধকরা, তৃতীয়, শত্রুতা থাকিলে ভয় প্রদর্শন দ্বারা জব্দ করা, চতুর্থ, যে ভূত মানেন, তাহাকে কৌশল করিয়া মানান ইত্যাদি নানা প্রকার কারণ হইতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয়টী কেবল কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য, এরূপ লোকের সংখ্যা কত তাহা সকলেই জানেন ও তাহারা পশু হইতে কত দূর তফাৎ তাহাও বলিবার কিছুই দরকার নাই। তৃতীয় কারণটী বিদ্বেষ মূলক; ইহার কর্ত্তারা বাহিরে শত্রুর কিছু করিতে না পারিয়া অন্য উপায় দ্বারা তাহাকে জব্দ করিতে চেষ্টা করে, কাজে কাজেই সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন ইহাদের কেমন স্বভাব ও কত দূর নীচপ্রকৃতি; এরূপ নিস্তেজ ভীরুদিগকে যেমন ভাবে দেখা উচিত সকলে তাহাই দেখিবেন। চতুর্থ কারণটী—অমূলক বিশ্বাস জন্মাইয়া

দিবার চেষ্টা। এরূপ লোক আমাদের দেশে এখনও অনেক পাওয়া যায়। মিথ্যা গল্প রচনা করিয়া লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করা, আর এই চতুর্থ কারণটী, উভয়ই সমান; অনেকে এরূপ মিথ্যা কথাকে পাপ বলিয়া ধরে না ও তাহারা মিথ্যার প্রতি এত আসক্ত যে মিথ্যা না কহিয়া থাকিতে পারে না। এই সকল লোককে ঘৃণা না করিয়া বরং তাহাদের মূর্খতার জন্য কৃপা করা উচিত। পাঠকগণ! আমার কথা শুনিয়া হাসিবেন না, আমি এরূপ ভূত অনেক দেখিয়াছি; শুদ্ধ আমি কেন, বোধ হয় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন; তবে যদি ইহা ছাড়া অন্য রকম ভূত থাকে তাতেও আমার কিছু ক্ষতি নাই। সেগুলিকে 'ইত্যাদির' মধ্যে ধরিয়া লইবেন।

এই সকল ভূত ছাড়া পেতনী আলেয়া প্রভৃতি যে সকল নিশাচর জানোয়ার আছে তাহাদের কথা কিছু বলা আবশ্যক। তাহাদিগের বিষয় শুনিলে বোধ হয় সকলেই আমার কথায় প্রত্যয় করিবেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, ঘোর অন্ধকার, কাল মেঘে চারিদিক ঘেরিয়া আছে, মাঝে মাঝে এক একবার বিদ্যুৎ হানিতেছে, কিন্তু মেঘের ডাক নাই, পৃথিবী একেবারে নিস্তব্ধ, পবন যেন সকলের দেখাদেখি আপনার ঘরে গিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়িতেছে না। আমি নিস্তব্ধে গ্রামের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছি, কোন শব্দ নাই, কেবল দূরস্থিত কলুদের ঘানির ডাক কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে, শুনিবা মাত্র বোধ হয় যে গরুটী অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে আর চলিতে পারে না। সম্মুখে ভয়ানক ময়দান তাহার অপর পার্শ্বে যে গ্রাম আছে তাহাও বোধ হয় না। এমন সময় কিঞ্চিৎ দূরে একটী আলো দেখিতে পাইলাম; পাঠক! সে আলোটী কিসের? তাহা দেখিয়া কি তোমার ভয় হয়, না আমোদ বোধ হয়? আমার ত ভয় হয়; ছেলেবেলার সংস্কার মনে এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাহাতে ভয় ব্যতীত আমোদ কিছুতেই হয় না, তবে ভূতের প্রতি বিশ্বাস নাই বলিয়া যে কিছু ঔৎসুক্য জন্মায় মাত্র। সে আলোটী-কিসের? এই প্রশ্নের উত্তর হয় আলেয়া, নয় যাকে আমাদের দেশের লোকে পেতনী কহে। আলেয়া কাহাকে কহে তাহা বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন, তাহা হইতেই সেটী ভূত কিনা তাহা বুঝিয়া লইবেন। আর আমাদের বাঙ্গালি ভায়াদের কেমন বিশ্বাস তাহাও বুঝিয়া লইবেন; এ বিষয়ে আমার অধিক বলার আবশ্যক নাই। তবে যদি সেটীকে আলেয়া না বলিয়া পেতনী বলা যায় তাহা হইলেই তাহার বিষয় কিছু বলা দরকার হইতেছে।

পেতনী অর্থাৎ স্ত্রীলোক মরিয়া যে ভূত হয়; এই ভূতটী আমাদের দেশে প্রায় সর্ব্বদাই সর্ব্ব স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বিশেষ কারণও আছে। ব্যভিচার দোষ সকল দেশেই আছে, পুরুষেরা ও স্ত্রীলোকেরা এ বিষয়ে কেহই কম নহে; তবে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের

স্বাধীনতা না থাকাতে তাহারা পুরুষদের মত স্পষ্টরূপে কোন কাজ করিতে পারে না, অন্য দেশে সেরূপ নহে। আপনার প্রিয় ব্যক্তিকে লইয়া অন্য দেশের স্ত্রীলোকেরা যেরূপ আমোদ প্রমোদ করিতে সুবিধা পায় আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা সেরূপ পায় না; অপর দেশে ও আমাদের দেশে এই মাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে। এবং এই কারণেই তাহারা নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই সকল উপায় যত কেন কষ্টসাধ্য হউক না, তাহাদের দুষ্প্রবৃত্তি এত প্রবল, যে সমুদায় বিপদই উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই বৃত্তি চরিতার্থ করিতে ধাবমান হয় এবং পেতনীরূপও ধারণ করিয়া থাকে। তাহাকেই আমাদের বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালিরা পেতনী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন এবং তাহারই ভয়ে রাত্রে কেহ সেওড়া তলায় যাইতে পারে না ও ছোট লোকেরা আড়া হইতে মাছ আনিতে পারে না। আমি যে আলেয়া অথবা পেতনীর কথা বলিতেছি সে পেতনীও এইরূপ।

যে সকল ব্যভিচারিণী পতি-গৃহে থাকিয়া নিজের কুপ্রবৃত্তি সাধন করিতে সুবিধা না পায় অথচ সেই কুপ্রবৃত্তি সাধন করাও চাই, এমত স্থলে স্বামীর হাত ছাড়াইয়া অন্যস্থানে যাওয়াই নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া তাহাই করিয়া থাকে। পলায়নের উত্তম সময় অন্ধকার রাত্রি; আবার অন্ধকারে আলো নইলেও চলে না, কাজে কাজেই সঙ্গে আলোও লইয়া থাকে। আলো লইয়া রাস্তা চলিতে হইলে প্রকাশ পাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা এই জন্য দুই প্রহর রাত্রে মাঠের মধ্যস্থল দিয়া গমন করে, অজ্ঞ লোকেরা তাহাকে পেতনী বলিয়া সে যে দিক দিয়া যায় তাহার কাছেও যায় না, তাহারও বিলক্ষণ সুবিধা হয় এবং সে অনায়াসে আপনার অভিলষিত স্থানে যাইতে পারে। সেইরূপ যাহাদের গ্রামেই সঙ্কেত স্থান, অন্য স্থানে যাইবার দরকার নাই, তাহারা ফরসা কাপড় পরিয়া, ঝোপেঝাঁপে সেই স্থানে যাইয়া থাকে, কেহ দেখিতে পাইলে তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য নানা প্রকার অদ্ভুত লীলা দেখায়। দর্শক মহাশয়ও তাহাতেই দমে যান ও ভয়ে জড়সড় হইয়া হতবুদ্ধি হইয়া পলাইতে পথ পান না। ব্যভিচারিণীরও বড় সুবিধা, নিরুদ্বেগে সঙ্কেত স্থানে গিয়া উপস্থিত হয়। পর দিবস দেশে পেতনীর কথা ছড়াইয়া পড়ে, ভয়ে কেহই আর রাত্রে বাহির হয় না; পথ দিব্য পরিষ্কার, আর কোন উপদ্রব নাই। পাঠক! এই আমার পেতনীর বিবরণ। এটী সত্য কি মিথ্যা তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া লইবেন।

ডাইন অর্থাৎ যাহারা মন্ত্র বলে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে ও তাহার জ্ঞান হরণ করিয়া পাগলের মত করিয়া ফেলে। রোগী নানা প্রকার প্রলাপ কহিতে থাকে ও সময়ে সময়ে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। ভূতে পাওয়ারও এইরূপ লক্ষণ হয় বটে, কিন্তু বালকের এইরূপ হইলেই সচরাচর তাহাকে ডাইনেখাওয়া কহে এবং যুবার কি বৃদ্ধের হইলেই ভূতে পাওয়া

কহে। এটী বায়ুরোগ; ইহার নানা প্রকার লক্ষণভেদে চিকিৎসকেরা ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞ মহাশয়েরা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের যাঁহারা এখনও সরস্বতীর পাছতলায় পড়ে আছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁরা কিছু উঠেছেন, তাঁরাও বটতলা ছাড়াতে পারেন নাই, তাহার নানা প্রকার মূর্ত্তি দিয়াছেন। তাঁহাদের জ্বালায় দরিদ্র বৃদ্ধ স্ত্রীলোকদের ভিক্ষার জন্য বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করার যো নাই, তাহাদের দেখিলেই ইঁহারা একেবারে জ্বলিয়া উঠেন, পাছে তাঁহাদের ছেলে খাইয়া ফেলে। আবার মনে মনে বিলক্ষণ ভয় আছে, দুর্ব্বাক্যও বলিতে সাহস হয় না, এইরূপ গোলযোগে পড়িয়া শেষে তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিতে হয়। ইঁহারা আবার ডাইনের একটী ল্যাজ আছে বলিয়া থাকেন সে 'মই' পার হইয়া যাইতে পারে না ও আহারীয় দ্রব্যে লবণ দিলে তাহাতে তাহার কোন মন্ত্র খাটে না, এইরূপ কত কথা বলিয়া থাকেন। কি বুদ্ধি! বিদ্যা দেখিয়া সরস্বতী ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন। কাজে কাজেই; যে দেশে দিনের বেলায় ডাইন, রাত্রে ভূত পেতনী প্রভৃতি নানাবিধ উপদেবতার আবির্ভাব, সে দেশে নির্ভয়ে স্থির থাকিতে পারা বড় সোজা কথা নয়। কোথায় শুইব, কোথায় খাইব, পাছে কোন বিগ্রহের কোপে পড়তে হয় এই ভাবনাতেই মানুষ অস্থির, তাতে আবার যদি উৎপাত ঘটে তাহলে কি আর রক্ষা আছে? বাহবা দেশ! তোমার উদরেই যত ভূত পেতনীর জন্ম! আচ্ছা তাই যেন হলো, কই তোমার ভূত পেতনীর ক্ষমতা ত কিছুই বুঝতে পারিনে, যেরূপ উৎপাত আমাদের উপর করিয়া থাকে, বিদেশীয় লোকের উপর ত তাহার কিছুই নাই, তাহাদের মুখ দেখে বুঝি ভূত পেঁচিয়েছে। হা নির্বোধ লোক! এত দেখিয়া শুনিয়াও কি তোমাদের চৈতন্য হয় না।

পাঠকগণ! উপসংহার কালে আর একটী কথা মনে পড়লো, না বলে থাকতে পারিলাম না, কাজে কাজেই প্রকাশ কর্‌তে হচ্চে। এখনকার কৃতবিদ্য মহাশয়েরা অনেকে ভূত পেতনী মানেন না বটে, কিন্তু আমার মত রাত্রেও বেরুতে পারেন না, অথচ মুখে খুব ধুমধাম করে থাকেন। সে যাহোক এঁদের আবার এক নূতন ভয় হয়েছে; কখন কখন মার্কিন ভূত এঁদের ঘাড়ে চাপে, সাত স্বর্গের লোক এসে এঁদের কাছে দেখা দেয়, কখন বা দুষ্ট ভূতও আসিয়া থাকে। এই সকল ভূত আপন আপন জীবন বৃত্তান্ত বলে ও কত অদ্ভুত কাণ্ড দেখায়। এইরূপ কত মত ভূত আমাদের দেশে দেখা দিচ্চে, ছেড়েও ছাড়ে না; ওঝা মহাশয়েরা বসে বসে কি কর্‌চেন বলা যায় না, আর কত দিন ঘুমিয়ে থাক্‌বেন?

সংসার।

ঐ যে সাগর গর্ভে ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড,
দিগন্ত পূরেছে নামে বিখ্যাত ইংলণ্ড!

ক্রীড়াবশে ক্ষুদ্র কীট নির্ম্মাইল যবে,
কে জানিত তব বলে ক্ষিতীশ্বর হবে ।
পশু সহবাসী নর, পশু ব্যবহার,
চারচর্ম্ম পরিধান, ভীষণ আকার !
অজ্ঞ, হীন, নীচাশয়, ম্লেচ্ছ বনেচর,
কে জানিত হবে নর ক্ষিতি শোভাকর ।
বুদ্ধির জড়তা দেখি মনে নাহি ভাবি,
নিউটন, বেকন্, ধন্য মিলটন কবি ।
হিউম, হেমিলটন, রিড, মিল্ পিল
অসংখ্য, ব্যাপিয়া নাম সংসার অখিল ।
পশুর চীৎকার সম কঠোর কুস্বর ।
শুনিয়া কে ভেবেছিল সেক্সপিয়র ।
পর্ণের কুটির দেখি, কৃপা উপজিল,
অপূর্ব্ব প্রাসাদ, সৌধ কার মনে ছিল ।
সমাজের বশীভূত, উপেক্ষাভাজন ;
কে জানে হইবে কালে সমাজ-জীবন ।
গৌরব, সম্মান, ঋদ্ধি, খ্যাতি, নমস্কার,
এক'স্ত বাঞ্ছিত কিছু বাকি নাহি আর ।
সৌর্য্য বীর্য্য বলে ধরা অমূল্য রতন,
যেখানে বঞ্চিত ছিল করিল অর্পণ ।
ধন্য, ধন্য বুদ্ধিবল অতুল উদযোগ ;
শর্ম্মপে দেখায় মেরু জানে গূঢযোগ ।
দুর্দ্দম ভীষণ ভূত করিয়াছে বশ,
পৃথিবী করিবে স্বর্গ, করেছে মানস ।
ধন্যরে সাহস বল, ধন্যরে সাহস,
অসাধ্য নাহিক কিছু হইলে মানস ।
যথায় তথায় ফিরি সাগরে কান্তারে,
ভূগর্ভে আকাশ মার্গে উচ্চমেরু শিরে,
নগরে, প্রান্তরে, মেরু কন্দর ভীষণে,
কীর্ত্তি-হেরি স্তব্ধ রই বিস্মিত লোচনে ।
"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" প্রাচীন বচন,
এমতে প্রমাণ সত্য হয়েছে এখন ।
নির্ভয়ে ইংরাজ পোত চারিদিকে ধায়
বুকে করি নীরনিধি সভয়ে পৌঁছায় ।
একিরে বাণিজ্য সৃষ্টি, সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড,
পৃথিবীর ধনাগার হয়েছে ইংলণ্ড ।
কোথা হতে কত মত আসে যায় জন,
ধরার আদর্শভূত হয়েছে লণ্ডন ।

দিগম্বর ফিরে ছিল সদা বনে বন,
কে জানিত তারে ধরা যাচিবে বসন ।
গৃহ পরিবার যার মনে নাহি ছিল,
গার্হস্থ্য ধর্ম্মের গুরু সে কেমনে হ'ল ।
ম্লেচ্ছ বলি করেছিনু যারে অবজ্ঞান,
এখন হইল সদাচার উপমান ।
তাহার আশ্রয় না পাইলে মূঢ়মতি,
চরণ চলেনা আর নাহি অন্য গতি ।
অবিদ্যা বিশ্রাম স্থান, মোহ অধিকার,
কে জানে দুয়ারে জ্ঞান বন্দী রবে তার ।
নানারূপে সরস্বতী কণ্ঠপ্রণয়িনী—
চরণ সেবিছে সদা কমলবাসিনী ।
অজ্ঞাত সাগর প্রান্তে নিশ্চিন্ত আছিল,
সময়ে সবল হয়ে বাহির হইল ।
সেই সে পশুর দল, একি বিপরীত,—
মানবে শিখায়, শাস্তি, হিত, রীত, নীত ।
রাজ্যের শৃঙ্খলা চারু, নিয়ম মঙ্গল—
কর্ত্তব্য সুখের পথ, সময় কৌশল ।
জড়তা নিবৃত্তি যার ছিল উপাদান,
ঐহিক বস্তুতে তার তৃপ্ত নহে প্রাণ,
মানুষে শ্বাপদ বলি করে অবহেলা,
সম্রাট মুকুট-লয়ে শিশু করে খেলা ।
মর্ত্তে থাকি স্বর্গবাসী-সম ব্যবহার,
নির্ণয় করেছে যত গ্রহের আকার ।
কোন্ গ্রহে কত জল, কতখানি স্থল,
কতটা পতিত, কত জন্মায় ফসল ।
কাতে কটা আছে গিরি, কত উচ্চ তারা
কিরূপ বসতি কাতে কাব কটা দারা ।
কি খায়, কেমন পরে, শঠ কি সরল,
সুস্থ দেহে ঠিকঠাক বলিছে সকল ।
শুনিয়া আশ্চর্য্য কথা হেন মনে হয়,
বেড়াতে এসেছে যেন, হেথাকার নয় ।
সাগর মেপেছে : তাব প্রবেশি উদর,
খুঁজিয়া হরেছে যত রত্ন চামীকর ।
তাড়া খেয়ে ধুম ধামে, বাঁচাতে পরাণ,
লক্ষ্মীলয়ে হৃষীকেশ করেছে প্রস্থান ।
দুঃসহ প্রতাপ রবি উঠিয়াছে ভবে,
ভাবিছ বসিয়া ফুঁয়ে নিবাইবে কবে ।

কলিকাতা,—সম্বলিয়া—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত ।

অবোধ-বন্ধু

"করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

৩য় ভাগ] পৌষ,--১২৭৬। ৯ম সংখ্যা

মাংসভোজন।

বাঙ্গালিদিগের অবস্থা উন্নত করিতে যাঁহারা বড়ই শশব্যস্ত আছেন, এবং কখন স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা, কখন পৌত্তলিকতা অপনয়ন, কখন সুশিক্ষা প্রদান প্রভৃতি অশেষপ্রকার উপায়ের প্রতি হাত বাড়াইতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই বাঙ্গালির শারীরিক বলবীর্য্য উন্নতির অনুকূল কোন চেষ্টায় মনোনিবেশ করেন না। নানাবিধ প্রকরণ আলোচনা পূর্ব্বক আমাদিগের নিঃসংশয় প্রতীতি হইয়াছে যে, উপযুক্তরূপ পুষ্টিকর আহারের অনভ্যাস এ দেশের লোকের সর্ব্ব প্রকার হীনতার আদি কারণ; এই গুরুতর তত্ত্বের নিরুপম উপাদেয়তা মুহুর্মুহু লোকের চক্ষে উপনীত করা আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেক।

যাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতে হয়, এমন কোন ডাক্তারই আজি কালি বলিবেন না যে, মাংসের যেরূপ শরীর পুষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে, কোনরূপ উদ্ভিজ্জ পদার্থের সে প্রকার থাকিতে পারে। কিছু দিন পূর্ব্বে কামাইলাল ডাক্তার এক খানি ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কোন আহারের মধ্যে কি পরিমাণে ধাতু পুষ্টি করিবার উপযুক্ত সার পদার্থ থাকে, ইহা সেই ফর্দ্দে নিরূপিত ছিল। এখন হাতের মাতায় সে ফর্দ্দ খানি নাই, নচেৎ আদ্যোপান্ত তুলিয়া দিলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যত দূর মনে আছে, তাহাতে বেশ বলিতে পারি যে, মাংসের মত বা ততোধিক সারবান্ দ্রব্য দুটি কি একটির নাম তাহাতে লেখা ছিল। তন্মধ্যে মুশুরির ডা'ল মাংস অপেক্ষা অধিক সারবান্। কিন্তু তথাপি উহা মাংস অপেক্ষা বা মাংসের মত গ্রাহ্য হইতে পারে না। তাহার কারণ এই।

ইহা শারীরবিধান শাস্ত্রের এক অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত যে, যা কিছু খাও, উহা প্রথমত রক্তরূপে পরিণত হয় অথবা রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। পরে যখন সেই রক্ত হৃদয়যন্ত্র হইতে প্রেরিত হইয়া শরীরের ভিন্ন ভিন্ন নাড়ীতে দৌড়াইয়া বেড়ায়, সেই অবসরে শরীরের যেখানে যা অপচয় হইয়াছিল, পূরণ হইতে থাকে, রক্তের সার অর্থাৎ দরকারী ভাগগুলি তত কম হইতে থাকে; পরিশেষে যখন নাড়ী সাঙ্গ করিয়া নীল শিরার ভিতরে রক্ত আসে, তখন উহা প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে এবং হৃদয়ে গিয়া তাজা রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত না হইলে কার্য্যোপযোগী হয় না। এই পর্য্যন্ত ভালরূপ জানা আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও স্থির আছে যে, পাকস্থলীতে মাংস যত শীঘ্র হজম হয় অর্থাৎ রক্তরূপে পরিণত হয়, এত আর কোন পদার্থ নহে। হ'তে পারে যে, মুশুরির ডা'লে ধাতুপুষ্টিকর সামগ্রী বেশী আছে, কিন্তু সেই সামগ্রী উহা হইতে বাহির করিয়া লইবার নিমিত্ত পাকযন্ত্রকে এত খাটিতে হয় এবং এত সময় লাগে যে তদ্দ্বারা বিশেষ কাজ দেখে না, কারণ শরীরের কোন অবয়ব যদি কোন বিষয়ে খাটিতে থাকে, তাহা হইলে উহার কিঞ্চিৎ পরিমাণে ধাতু ক্ষয় হয় এবং পুনর্ব্বার আহার দ্বারা সেই ক্ষতি টুকু পূরণ করিয়া লইতে হয়। এমতে বোধ হইবেক যে, মুশুরির ডা'লে সার বেশী থাকিলে কি হয়, তদ্দ্বারা পাকযন্ত্রের মেহনত পোষায় না, শরীর যে পরিমাণে আয়াসিত হয়, সে পরিমাণে আহার মুশুরির ডা'লের নিকট পায় না। একারণ মুশুরির ডা'ল মাংসের মত উপাদেয় নহে।

মাংস এক প্রকার 'তৈয়ারি মালের' মত। যেমন কাঁচা ময়দা খাওয়া অপেক্ষা কোন রূপ পাক করিয়া খাওয়া ভাল, তেমনি মাংস যেন পাক করা উদ্ভিজ্জ পদার্থ। শরীরধাতুর মধ্যে প্রধানত অক্সিজেন, হাইড্রজেন্, নাইট্রজেন্ ও নাইকার্বন্ এই চারি ছাড়া জিনিস নাই। যাবতীয় উদ্ভিজ্জও এই চারি জিনিশের ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তরে নির্ম্মাণ হইয়াছে। কিন্তু যখন সেই উদ্ভিজ্জ ভেড়া কি ছাগলের পাকযন্ত্র দ্বারা উহাদিগের মাংস রূপে পরিণত হয়, তখন উহা আমাদিগের শরীরের আরো কাছাকাছি সামগ্রী হইয়া উঠিল। সেই মাংসের প্রকৃতি আর আমাদের শরীরের প্রকৃতি প্রায় একই, সুতরাং উহা হজম অর্থাৎ রক্তরূপে পরিণত করিতে পাকযন্ত্রে বড় একটা ক্লেশ পাইতে হয় না, দিতে দিতে রক্ত হইয়া উঠে, এ বিষয়ে অল্প মাত্র বল ব্যয় করিয়া অধিক পরিমাণের সার শরীরস্থ হয়, সুতরাং শরীর পুষ্টি প্রাপ্ত যে বিশেষ রূপে হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

শরীরের বিষয়ে আর এক সিদ্ধান্ত এই আছে যে, যখন উহার কোন অবয়ব কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তখন উহার অন্য অবয়ব পূর্ণ মাত্রায় জোর দিয়া অন্য কার্য্য করিতে পারে না। যেমন মনে কর, গুরুতর আহারের পরই মস্তিষ্কচালনা

সজোরে করা যায় না, তখন বুদ্ধি তেমন পরিষ্কার রূপে খেলিতে পারে না। কিন্তু যে সামগ্রী হজম করিতে দেরি লাগে, তাহা আহার করিলে অনেক ক্ষণ সেই রূপ ভেরবার থাকিতে হয়, অন্য কর্ম্মে পা বয় না, অঙ্গ ক্লান্ত বোধ হয়, শুইতে ইচ্ছ করে, বুদ্ধি জড় হইয়া থাকে ইত্যাদি। সুতরাং দৃষ্ট হইতেছে যে, বহু বিলম্বে পরিপাকযোগ্য আহারসামগ্রী ব্যবহার করিলে অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয়।

আহার অতি সামান্য বিষয়। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ইহা পশুদিগের সঙ্গে সাধারণ; কিন্তু এক্ষণকার বিজ্ঞান শাস্ত্র আরো অগ্রসর হইয়া কহে যে, ইহা উদ্ভিজ্জদিগের সঙ্গেও সাধারণ। ফলত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় উদরসাৎ করিয়া উহার পরিপাকের নিমিত্ত দুদণ্ড যখন 'ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ' করা গিয়া থাকে, তখন আমাদিগেরো যে অবস্থা, আর বৃক্ষেরা অহর্নিশি যে অবস্থায় অবস্থিত আছে, দুই একই প্রকার। কিন্তু বৃক্ষদের অপেক্ষা আমাদের অন্যান্য অনেক গুণ আছে। আমরা এমন অনেক কাজ করিয়া থাকি, যাহা বৃক্ষেরা করে না। তাহারা খালি মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিয়া শাখা পল্লবের অপচয় নিরাস করিতেছে, আমরা ত সে কাজ করিয়াই থাকি; কিন্তু তা ছাড়া, আমাদের অনেক কর্ম্ম আছে, আমাদের ভালবাসা আছে, দ্বেষ আছে, মহাবাসনা আছে, পরোপকারের ইচ্ছা আছে, সাহস দেখাইবার অভিলাষ আছে, চিন্তা আছে, বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা আছে, যশ উপার্জ্জনের ইচ্ছা আছে ইত্যাদি। অতএব সে সব ধান্দা দেখিবার তরে যত সময় পাই, যত বেশী সুবিধা করিতে পারি, ততই ভাল। কিন্তু কেবল শরীরের অপচয় রক্ষার নিমিত্তই যদি অনেক সময় এবং অনেক জোর ব্যয় হইয়া গেল, তাহা হইলে উল্লিখিত অভিলাষ সমস্ত সেই পরিমাণে কুণ্ঠিত রাখিতে হইবে। এখন উদ্ভিজ্জ আহারের অভ্যাস সেই অমঙ্গলকর অবস্থার প্রধান হেতু স্বরূপ হইয়া আছে।

উদ্ভিজ্জ আহারের পরিপাকার্থ শরীরের বেশী বলক্ষয় হয়, অথচ পর্য্যাপ্তরূপ পুষ্টি উহা হইতে লাভ হয় না। একারণ উদ্ভিজ্জ আহারীরা মানুষের মাংস-আহারীদিগের অপেক্ষা হীন হইয়া আছেন। সেই সকল গুণ একে একে বেশ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মনে কর, তেজ যাহাকে বলে। প্রাচীন শাস্ত্রকারে ইহার এই লক্ষণ কহেন যে,

অধিক্ষেপাপমানাদেঃ প্রযুক্তস্য পরেণ যৎ।
প্রাণাত্যয়েঽপ্যসহনং তত্তেজঃ সমুদাহৃতম্॥

কথায় কি কাজে আর কেহ অপমান করিলে প্রাণান্তেও যে সহিতে না পারি, তাহাকে বলে তেজ।

কিন্তু এই তেজ উদ্ভিজ্জ-আহারী জাতিদিগের কত কম! এত কম যে ইহার অর্থ পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম হওয়া ভার। ইহার অপ্রতুলের নিমিত্ত বাঙ্গালিরা দিগ্‌দিগন্তবিখ্যাত হইয়াছে। ইহার অপ্রতুলের নিমিত্ত বাঙ্গালির ঐকান্তিক হিতৈষী ও

স্নেহবান্ বন্ধুরা পর্য্যন্ত বাঙ্গালিকে "শান্ত শিষ্ট সুশীল অবলা" বই অন্য কোন প্রশংসার কথা বলিতে পারেন না। ইহারি অভাবে, এত কাল যুদ্ধ ইত্যাদির অনুষ্ঠান চলিতেছে, প্রকৃত যুদ্ধের ব্যাপারে এক জন বাঙ্গালিও অদ্যাপি লিপ্ত হইতে পারেন নাই। কিন্তু যাহাদের এই তেজ থাকে, তাহাদিগের মূর্ত্তি এক বার দেখ। এক্ষণকার ইয়োরোপীয়েরা সেই তেজের অতি রমণীয় দৃষ্টান্তস্থল। তাহাদিগের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, তাহাদিগের কীর্ত্তিসমস্ত নিরীক্ষণ করিলে কি আশ্চর্য্যই না হইতে হয়। যেমন অগ্নিসংযোগে জল ফুটিতে থাকে, তাহাদিগের তেজ তেমনি তাহাদিগের শরীরে ধরে না, যেন উন্মাদি ও অস্থির করিয়া দিতেছে, যেন তাহারা কোন কিছু না করিলে থাকিতে পারে না। কোথাও কিছু নাই, বসিয়া বসিয়া এক জন স্থির করিল, আফ্রিকার প্রকাণ্ড মরুভূমির মধ্যস্থল অবলোকন করিয়া আসা যাউক; আর একজন ভাবিল যে, উত্তর মেরুর বরফের মধ্য দিয়া কোন পথ পাওয়া যায়, দেখা যাউক; আর এক জন স্থির করিল, সুয়েজ যোজক ছেদ করিয়া না দিলে আর চলে না; চতুর্থ ব্যক্তি কল্পনা করিলেন, প্রাচীন 'বাবিলন্' ও 'নিনিভে' পুরী যেখানে মাটীর মধ্যে পোঁতা আছে, সেই স্থান খনন করিয়া পুরাকালের বৃত্তান্ত উদ্ধার করা যাউক। ফলত আমরা যাহাকে "সুখে থাকিতে ভূতে কিলোয়" বলিয়া থাকি, এরূপ কাজ, এত অকাতরে ইয়োরোপীয়েরা করিতে প্রবৃত্ত হয় যে, আমাদিগের মত স্বভাবাপন্ন জীবেরা সে গুলি বাতুলের কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই জ্ঞান করিতে পারে না। কিন্তু যাহাকে ইয়োরোপীয়দিগের সভ্যতা কহে, যে যে উপাদানে উহা নির্ম্মাণ হইয়াছে, সেই তেজ যে তন্মধ্যে এক প্রধান উপাদান, বুঝিয়া দেখিলে তাহা স্পষ্টরূপ বোধগম্য হইবেক।

বাঙ্গালিরা ইহাকেই সুখের পরা কাষ্ঠা বলিয়া জানে যে, দুবেলা আঁচাইতে পাইতেছি, স্ত্রীপুত্র পরিবার বেষ্টন করিয়া আছে, চোর ডাকাইতের ভয় নাই, জমীদারের উৎপাত নাই, মধ্যে মধ্যে রক্ষাকালীপূজা ও যাত্রা নাচ ইত্যাদি হয়, ফলারেরও ঘটা সময়ে সময়ে হইয়া থাকে, ইহাতেই যথেষ্ট, আর বড় কিছু প্রয়োজন করে না। বটে, অন্যান্য দেশের সাধারণ লোকদিগেরো এ সকল আমোদ প্রমোদের অনুরূপ আমোদ প্রমোদ আছে; কিন্তু তদ্ব্যতীত আরো কত কি যে আছে, ইহাই বৈলক্ষণ্য। ইয়োরোপীয়দিগের দেশে শুদ্ধ ধান চা'লের সুবিধার নিমিত্তই কেবল সেই সকল অশেষ ব্যবহার ও কাজ কর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় না; সেই সকল কাজ কর্ম্ম যেন তাহাদিগের স্বভাবত প্রয়োজনীয়; যেমন ধান চা'ল না হইলে আমাদের চলে না, সে গুলি নহিলে তেমনি তাহাদের অচল হয়। এই যে বৈলক্ষণ্য, আমাদের ত বোধ হয়, তেজের বৈলক্ষণ্য ইহার এক সন্নিকৃষ্ট কারণ। সেই সঙ্গে আমাদের আরো বোধ হয় যে, উপযুক্তরূপ আহারের অনভ্যাস-

জনিত শারীরিক দুর্ব্বলতাই সেই তেজের হীনতা ঘটাইয়াছে।

ঈদৃশ বহু দূরবিস্তারী এত নূতন মত প্রচার করিতে গেলে অনেকেই যে ইহার প্রতিবাদ করিবেন, তাহা আমরা বিলক্ষণ প্রত্যাশা করিতেছি। কিন্তু যেমন কোন কোন সম্প্রদায় আজি কালি কোন কোন ধর্ম্মের সংস্থাপনের সহিত এতদ্দেশের সর্ব্ব প্রকার উন্নতির সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, যেমন তাঁহারা সেই ধর্ম্মে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিয়া থাকেন, আমরাও মাংস ভোজনের পক্ষে তদ্রূপ হইয়াছি। আমাদের দৃঢ়তর প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, এ দেশে ধান্য অপর্য্যাপ্ত জন্মে এবং তদ্দ্বারা ক্ষুধার জ্বালা এক প্রকার নিবৃত্ত হয় বলিয়া এ দেশের লোকে অন্ন আহারের বিজাতীয় পক্ষপাতী হইয়াছে। তদ্ব্যতীত, উষ্ণদেশে মাংস ভোজন করিতে গেলে কিঞ্চিৎ বিবেচনা পূর্ব্বক যে চলিতে হয়, সেই বিবেচনার অপ্রতুল বশত তাহারা অতি তুচ্ছ কারণে স্থির করে, উষ্ণদেশে মাংসভোজন অনাবশ্যক। এই উপেক্ষা, এই তাচ্ছল্য, এই অপরিণামদর্শিতাই যে এ দেশের স্থিরতর উন্নতির প্রস্রবণ রোধ করিতেছে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কণামাত্র সন্দেহ নাই। এই কণ্টক শোধন না হইলে অর্থাৎ এ আচরণ পরিত্যাগ না হইলে সকল কাজই যে তাহারা বাঙ্গালির মত করিবে, তাহাও আমরা বেশ বুঝিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্মই শিক্ষা দাও, বিধবাবিবাহই প্রচলিত কর, স্ত্রীজাতিকেই লেখাপড়া শিখাও, তদ্দ্বারা আপাতত উপরে কিঞ্চিৎ "চিকনচাকন" মাত্র হইবেক, অন্তঃসারের কিছুই উন্নতি হইবেক না, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে অবধারিত করিয়াছি। যিনি যিনি সবিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত বাঙ্গালির অবস্থার উন্নতিকল্পে গুরুতর বিবিধ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, তিনিই, মনে মনে জানেন যে, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। এখানকার 'নামজাদা' দেশহিতৈষী মাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া এস, দু এক জন অবহুদর্শী নবীন পুরুষ ব্যতীত সকলের মুখেই শুনিয়া আসিবে যে, এ দেশের ভবিষ্যতের বিষয়ে তাঁহারা সকলে নিরাশ। তাঁহারা বাঙ্গালির উপেক্ষা ও খাতিরনদারত্ ভঙ্গি দেখিয়া মরমে ম্রিয়মাণ হইয়া আছেন। তাঁহারা যৌবনের অবধিতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রদীপ্ত আগ্রহের সহিত দেশের উন্নতিসাধনের অনুকূল বিবিধ অনুষ্ঠানের প্রতি ধাবমান হয়েন এবং তাহার সমাধানের নিমিত্ত যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ ও আয়াস স্বীকার করিতেছেন, তাহা বর্ণনাতীত। কেহ বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত অপযশ, কলঙ্ক ও সর্ব্বস্বান্ত পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করিয়া পরিশেষে আপনার তাবৎ আশা ভস্মসাৎ অবলোকন করিতেছেন, কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কেবল 'সত্যের জয় হইবেক' এই ভরসাতেই বুক বাঁধিয়া আছেন, ভবিষ্যতের বিষয়ে কোন সুলক্ষণ দেখিতে পান না; কেহ ইয়োরোপীয় মহার্ঘ তত্ত্বকথা গুলি এ দেশের লোকের গোচর করিবার জন্য আপনার মস্তক এত দূর চালনা করি-

য়াছেন যে, তাঁহার স্বাস্থ্য চির জীবনের তরে ভগ্ন ও দেহ ভারবৎ হইয়া উঠিয়াছে, এতদ্ভিন্ন দু এক জন এমনও আছেন, যাঁহারা আপনাদের যৎসামান্য আয় সমস্তই বিদ্যালয়সংস্থাপন প্রভৃতিতে নিঃশেষ করিয়া অশেষ প্রকার সাংসারিক অসুবিধার ভার আপন স্কন্ধে বহন করিয়া যাইতেছেন। এক বিধায় এ সকলই সুলক্ষণ বটে; ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে, বাঙ্গালি জাতি যে মশলাতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা অনেক অংশে অতি চমৎকার। যশোবাসনানামক যে এক অভিলাষ আছে, এবং যে অভিলাষ প্রখর থাকা নিতান্ত পাষণ্ড পামর অভদ্র ব্যক্তির মনে কখন সম্ভবে না, বাঙ্গালিদিগের সেই যশোবাসনা যে প্রচুর আছে, ঐ সকল অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়। তদ্ব্যতীত, ইহাদিগের পরের দুঃখে দুঃখী হইবার মত মনের ভাবও সামান্য পরিমাণে নাই উল্লিখিত অনুষ্ঠান সকলের গোড়াতে সেই সাত্ত্বিকতাও অনেকটা আছে, সন্দেহ নাই। বাঙ্গালিদিগের তৃতীয় যে আর এক বিশ্ববিখ্যাত অসাধারণ গুণ আছে, অর্থাৎ অনুচিকীর্ষা, তাহাও যথেষ্ট প্রদর্শিত হইতেছে। বাঙ্গালির বুদ্ধি মন্দ নয় এক রকম বেশ তীক্ষ্ণ, দেখিয়া শিখিতে ইহারা অতীব সুপটু; প্রাধান্য করিতে তেমন না পারুক, পরের অনুবর্ত্তী হইয়া সুচারু রূপে কাজ চালাইবার উপযুক্ত, নীচ অঙ্গের নিপুণতা, ইহাদের বিলক্ষণ আছে। সেই অনুচিকীর্ষা বলেও পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান সমস্ত সংঘটন বিষয়ে অনেকটা সুবিধা জন্মিতেছে। আমরা যে প্রবলপ্রতাপ দিগ্বিজয়ী জাতির সঙ্গে লিপ্ত হইয়াছি, এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র যাহাদের নিরুপম কার্য্যদক্ষতার দেদীপ্যমান প্রমাণ সমস্ত ক্রমেই বিস্তারিত হইতেছে, সেই ইংরেজ জাতির সহবাসে অনেক বিষয়ে আমাদের চোক্ কান ফুটিতেছে, অনেক ভাল জিনিশের সহিত পরিচয় হইতেছে; পরিচয় হইবা মাত্র আমরা স্বভাবসিদ্ধ অনুচিকীর্ষা গুণে সেই সকল ভাল জিনিশের বীজ এ দেশে বপন করিতে চেষ্টা পাই। যদিও সেই চেষ্টা অনেক স্থলে, ময়ূরের নৃত্য দর্শনে কাকের নৃত্য করিবার অভিলাষের মত, উপহাসাস্পদ ও অকর্ম্মণ্য হউক, তথাপি ইহাও এক সুলক্ষণ বটে। কিন্তু ইহা কিরূপ সুলক্ষণ, তাহা ভাল রূপে বুঝা উচিত। ক্রমাগত এই অবস্থা চলিলে উত্তরোত্তর আপনা হইতেই যে আমরা 'ভাল জাতি' হইবার পদবীতে পদার্পণ করিব, ইহা তেমন লক্ষণ নহে। বরং আমাদিগের অধোগতির প্রধান কারণ অপনীত না হইলে ইহা কেবল চাকচিক্য মাত্রই হইয়া থাকিবে। আমরা ক্রমাগত হাতড়াইতেই থাকিব; 'রোগের ঔষধ পাইলাম' বলিয়া উল্লাসে চীৎকার করিব কি, পর ক্ষণেই নূতন এক উপদ্রব ঘটিয়া আমাদের হর্ষ বিষাদে পরিণত করিবে।

এই প্রস্তাবের লেখক ত এক প্রকার সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন যে, সেই ঔষধ তিনি পাইয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার বর্দ্ধমানাদের মত জন্মিয়াছে। যেমন

ধর্ম্মোন্মাদে উন্মত্ত ব্যক্তিরা অটল বিশ্বাসের সহিত আপন ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত থাকে, আমিষ ভক্ষণের অত্যাবশ্যকতা বিষয়ে আমাদিগের সেইরূপ এক বিজাতীয় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; তবে বেদলের কোন কথাতে কর্ণপাত করিব না বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসি নাই। ইহার সাপক্ষে বিপক্ষে যত প্রামাণিক কথা যেখানে আছে. ইহার তদাদি তদন্ত পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদের দৃঢ়তর সংকল্প বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদিগের এই সমস্যা পূরণ করিতে হইবেক যে, আমরা যে দেশে বাস করি, তাহা বিষুব রেখা হইতে বাইশ অংশ উত্তরে আরম্ভ হইয়া অংশ পাঁচেক ভূমিতল অধিকার করিয়া আছে; ইহাতে যে প্রকার শীতাতপ বুঝায়, বাঙ্গালা ভূমি সেই শীতাতপ ভোগ করিয়া থাকে; তা ছাড়া ইহাতে প্রকৃত পর্ব্বত প্রায় নাই; গঙ্গার পশ্চিম তীরের ভূমি অল্প মাত্রায় ক্রমশ কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া গিয়াছে; উত্তরাংশে দেদার সটান্ ক্ষেত্রমণ্ডল; পূর্ব্বদিকে প্রায় সকলই জলা, এবং বর্ষাকালে একার্ণব হইয়া যায়; দক্ষিণে যে ধরাতল আছে, তাহা সমুদ্রের সঙ্গে এক-সা বলিলেই হয়, সেখানকার মাটিও অত্যন্ত নরম, বালুকাকীর্ণ এবং উদ্ভিজ্জ অবয়বের পরিণামে উৎপন্ন। এই বঙ্গ ভূমিতে বায়ু ছয় মাস উত্তর হইতে, ছয় মাস দক্ষিণ হইতে সমুদ্রের লবণে পরিপূর্ণ হইয়া, বহিয়া থাকে; মধ্যে মধ্যে কখন পূর্ব্বের কখন পশ্চিমের বাতাস বহে বটে, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। এই দেশে ঝরনার জল প্রায় নাই, সুতরাং শরীরের স্বাস্থ্যকর বাস্তবিক পানযোগ্য বিশুদ্ধ বারি এখানে নিতান্তই অপ্রতুল। এই সকল অবস্থা সম্পন্ন দেশে যে জাতি বাস করে, ইহাদের প্রাচীন আচার বিহারাদি প্রায়ই অজ্ঞাত; কিন্তু ইহা প্রায় অবধারিত যে, সেই জাতি বলবীর্য্য প্রকাশের নিমিত্ত কোন কালেই বিখ্যাত হয় নাই। অক্ষয়কুমার দত্ত রঘুবংশের যে শ্লোকের ঘোরতর নিগূঢ় অর্থ এক বার দেখাইয়া দিয়া ছিলেন, অর্থাৎ আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্। ইত্যাদি

[তাহারা প্রথমে পরাজিত পশ্চাৎ স্ব স্ব পদে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত হইয়া রঘুর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া আপনাদের অশেষ সমৃদ্ধি প্রদান করে।]

সেই লজ্জাকর ব্যাপার আবার বক্তিয়ার খিলিজীর এতদ্দেশে প্রবেশকালে অভিনীত হইয়াছিল। এখনও যথায় তিন কোটি লোক আছে এরূপ প্রসিদ্ধি, তত বড় প্রকাণ্ড এক দেশ সতর জন সোয়ার মাত্র আসিয়া দখল করিল, ইহার বাড়া কলঙ্ক আর কিছু নাই বটে। কিন্তু সেই সতর জন সোয়ার যে ভরসা করিয়া আসিতে পারিয়াছিল, অর্থাৎ মুসলমানেরা তখনও এতদ্দেশীয় লোকের অকর্ম্মণ্যতা বিষয়ে এত দূর নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছিল, ইহা আবার তারে বাড়া অকীর্ত্তির কথা, ইহার বিরুদ্ধে কেবল কৃষ্ণনগরের 'গ'ড়ো গয়লা' বীরভূম অঞ্চলের 'চাসারা' প্রতাপ আদিত্যের কিঞ্চিৎ নাম যশ এই

মাত্র উল্লেখ করিয়া একালের বাঙ্গালিরা মনকে প্রবোধ দেন যে 'আমাদেরো বলবীর্য্যের বিষয়ে বলিবার কথা কিছু আছে।' কিন্তু বিবেচক লোকে সেই প্রবোধের বিষয় ভাবিয়াও আরো কাতর হন; তাঁহারা মনে করেন যে, বলিবার কথা যদি ইহা বই না থাকে, তবেত আমাদিগের আশা বড়ই কম।

দেশের ভাবভঙ্গী ও অধিবাসীদিগের চালি চলন এই দুই বিষয় স্মরণ পূর্ব্বক স্থির করিতে হইবেক যে, এই দুরপনেয় কলঙ্ক আর এই দুঃসহ অবস্থা ঘুচাইবার কিছু যো আছে কি না, এবং দেশীয় লোকের আহারের ব্যবস্থা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বদল করিলে সেই যো পাওয়া যায় কি না, ইহাই আমাদিগের সমস্যা।

দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার।

জিব্‌সন্ নামে এক জন ইংরেজ সৈন্য কেল্লার বারিকে থাকিত; এরূপ বন্দোবস্ত যে, বারিকের দোতলাতে সাহেব সৈনিক পুরুষেরা থাকে, আর নীচের তলায় এ দেশীয়েরা। একদা তিন জন মুশলমান সিপাহী নীচের বারাণ্ডাতে দাঁড়াইয়া কথা বার্ত্তা কহিতে ছিল, এমন সময়ে জিব্‌সন্ আসিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা আমার বুট্‌জুতা লইয়াছ কি? তাহারা কহিল, কই, বুট্‌জুতার বিষয় কিছু জানি না। জিব্‌সন্ তৎক্ষণাৎ দু পা পিছাইয়া এক জন সিপাহীর মাতা তাগিয়া হস্তস্থিত ভরা বন্দুক আওয়াজ করিল, সিপাহীর ঘাড়ে গুলি লাগিবাতে সে প্রথমে দুই লাফে কিঞ্চিৎ হঠিয়া যায়, পরে দেখিতে দেখিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

বিচারের সময় সাবুদ হইয়াছে, জিব্‌সন্ বেতর মাতাল হইয়াছিল, কিন্তু ইতি পূর্ব্বে আপনার এক জন সঙ্গীর কাছে বলিয়াছিল "আমি বুট্-হারানর দফা রফা করিতেছি র'স্; লক্ষ্মীছাড়া নেটিভ্‌দের একটাকে খুন করিলেই এ চুরি থামিবেক।"

জুরিরা জিব্‌সন্‌কে অপরাধী স্থির করিয়া সদয় হইবার নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ জানান, কারণ অতিশয় সুরাপান দোষে ঐ ব্যক্তির মন প্রকৃতিস্থ ছিল না। বিচারপতি ফিয়ার সাহেব তাহার যাবজ্জীবন কঠিন পরিশ্রমের দণ্ডবিধান করিয়াছেন।

ইহার উপর যাহা কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইতে পারে, আমরা বুদ্ধি পূর্ব্বক তাহা সংবরণ করিলাম।

সপ্তম সর্গ।

বিরহিণী

"दुल्लहजणाणुराओ लज्जा गुरुई
परव्वसो अप्पा ।
पिअसहि विसमं पेम्मं
मरणं सरणं णवरिअमेक्कं ॥"
হর্ষদেব।

১।—সংগীত।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল ঠুংরি বা কাওয়ালি।
লক্ষ্ণৌ গজেলের সুর।

১

সরলা দুখিনী,
আজি একাকিনী,
উদাসিনী হয়ে চলিলে কোথায়!

২

মলিন বদন,
সজল নয়ন,
দাঁড়ায়ে নীরব হয়ে পুতলির প্রায়।

৩

যেন ভব মনে,
জ্বলে ক্ষণে ক্ষণে,
যে জ্বালা প্রবোধ দিয়ে জুড়ান না যায়

এ ঘোর সংসার,
অকূল পাথার,
সোণামুখী তরীখানি ডোবো ডোবো তায়।

৫

কে রে সে নিদয়,
পাষাণ হৃদয়,
হেন সুকুমারী নারী পাথারে ভাসায়!

২।—সংগীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট্, তাল ঠুংরি বা কাওয়ালি।
সুর—"কামিনী কমলবনে"।

কে তুমি যোগিনী বালা,
আজি এ বিরল বনে;
বাজায়ে বিনোদ বীণা,
ভ্রমিছ আপন মনে!

২

গাহিছ প্রেমের গান,
গদগদ মন প্রাণ,
বাধ বাধ সুর তান
ধারা বহে দুনয়নে।

৩

পদ কাঁপে থর থর,
টলমল কলেবর,
এলোথেলো জটাজাল
লটপট সমীরণে।

শত শশী পরকাশি
অপরূপ রূপরাশি,
বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে
হেরিছে হরিণীগণে।

যেন মণিহারা ফণী,
কার প্রেমে পাগলিনী,
কেন হেন উদাসিনী,
হে উদার-দরশনে !

২

হা নাথ ! হা নাথ ! গেল গেল প্রাণ,
মনের বাসনা রহিল মনে ;
ধেয়ায়ে ধেয়ায়ে সে শুভ বয়ান,
বিরহিণী তব মরিল বনে।

এস এস অয়ি এস এক বার,
জনমের মত দেখিয়ে যাই ;
এ হৃদয় ভার নাহি সহে আর,
দেখে ম'লে তবু আরাম পাই।

৩

হা হতভাগিনী জনমদুখিনী,
শিরোমণি কেন ঠেলিনু পায় ;
মাণিক হারালে বাঁচে না সাপিনী,
শুনেছিনু তবু হারানু হায় !

৪

অয়ি নাথ ! তুমি দয়ার সাগর,
আমি মাতাপিতা-বিহীনা বালা ;
আহা ! তবু কত করিয়ে আদর,
খুলে দিলে করে গলার মালা।

অবোধিনী আমি, কেহ নাই মোর,
কেন শুনে কাণ-ভাঙান কথা,
ফিরে দিনু তব প্রেম-ফুল-ডোর ;
বুঝিতে নারিনু ব্যথীর ব্যথা !

৬

সেই তুমি সেই সজল নয়ানে,
কাতর হইয়ে গিয়েছ চলি ;
যে বিষম ব্যথা পেয়েছি পরাণে,
এ বিজন বনে কাহারে বলি !

৭

খেদে অভিমানে চলি চলি যায়,
ফিরে নাহি চায় আমার পানে ;
দেহ থেকে যেন প্রাণ লয়ে ধায়,
যাই যাই আমি, যায় যেখানে।

পিছনে পিছনে তোমার সহিতে,
ধেয়েছিনু নাথ আনিতে ধোরে ;
মান লাজ ভয় আসি আচম্বিতে,
ধোরে বেঁধে যেন রাখিল মোরে।

হাঁপায়ে উঠিল প্রাণের ভিতর,
বিঁধিতে লাগিল মরম স্থান ;
ডুবিল তিমিরে ধরা চরাচর,
ঘোর অন্ধকার হইল জ্ঞান।

১০

কটমট করি বিকট দামিনী,
ভাসিল সে ঘোর তিমির-রাশে ;
হাসে খল খল কালী উলঙ্গিনী,
অট অট হিহি শমন হাসে।

১১

মাভৈ, মাভৈ, নাই নাই ভয়,
না উঠিতে এই অভয় স্বর,
বজ্রাঘাতে মম তব মূর্ত্তিময়-
হৃদয়-মুকুর হইল চূর ;

১২

শতধা শতধা ছড়ায়ে পড়িল,
ব্যাপিল সকল জগতময়,
শত শত তব মুরতি শোভিল,
ঘুচিল আমার সকল ভয়।

১৩

একি রে ! তিমিরা ঘোরা অমা নিশি,
এই চরাচর গ্রাসিল এসে ;
দেখিতে দেখিতে একি ! দিশি দিশি
কোটি কোটি তারা ফুটিল হেসে।

১৪

হে তারকারাজি, হীরকের হার,
তামসী খনির আলোকমালা !
ভিতরে ভিতরে তোমা সবাকার,
প্রতিকৃতি কার করিছে আলা ?

১৫

ফুলে ফুলময় হ'ল ধরাতল,
বিকসিল ফুল সকল ঠাঁই ;
ফুলের আলোকে কানন উজল,
ফুল বই কেন কিছুই নাই !

১৬

চারি দিকে সব বেলের বেদিতে,
কার এ মুরতি গোলাপময় ;
আমার নাথের মতন দেখিতে,
আমারে দেখিতে দাঁড়ায়ে রয় !

১৭

তোমার মুরতি বিরাজে অম্বরে,
বিরাজে আমার হৃদয় মাঝে ;
সলিলে, সাগরে, ভূতলে, ভূধরে,
তোমারি হে নাথ মুরতি রাজে।

১৮

ওতো নয় নয় অরুণ উদয়,
সুসান্ত্ব প্রশান্ত তোমারি মুখ ;
ওতো নয় ঊষা নবরাগময়,
অনুরাগে রাগে তোমারি বুক।

১৯

বিমল অম্বর শ্যাম কলেবর,
শুকতারা দুটি নয়ন রাজে ;
লাল-আভা-মাখা শাদা ধারাধর,
উরসে চিকণ চাদর সাজে।

২০

পবন তোমায় চামর ঢুলায়,
কানন যোগায় কুসুম ভার ;
পাখীরা ললিত বাঁশরী বাজায়,
ধরায় আমোদ ধরেনা আর !

২১

নির্ঝর নিকর ঝর ঝর করি,
আঘোষে তোমার মহিমা গান ;
প্রতিধ্বনি ধনী সে গানে শিহরি,
চপলার মত ধেয়ে বেড়ান।

সে মোর প্রণয়-প্রলয়ের পরে,
তোমা বিনা আর কিছুই নাই ;
হে প্রেম-সাগর ! চেয়ে চরাচরে,
কেবল তোমারে দেখিতে পাই।

২৩

যে মূরতি তব এ হৃদয় হ'তে
ব্যাপিয়া বিরাজে ভুবনময়,
হিয়া দিয়া পুন যদি কোন মতে
তিরোহিত সেই মূরতি হয়,

২৪

নিশ্চয়ি তখনি দেখিতে দেখিতে,
আচম্বিতে সব বিলয় পাবে ;
উদিবে গগন তপন সহিতে,
ধরিত্রী গলিয়ে মিলিয়ে যাবে।

২৫

ঘোর অন্ধকার আসিবে আবার,
হাঁপায়ে মারিতে বিরহী বালা ;
আঁধার ! আঁধার ! দূরে দূরে তার,
জ্ব'লে জ্ব'লে ওঠে বিকট জ্বালা।

২৬

চমকিয়ে আমি হইব পাষাণ,
তবুও পরাণ নড়িবে তায় ;
অভাগী মরিলে পেয়ে যায় ত্রাণ,
তা হ'লে বিরহ দহিবে কায় !

২৭

আহা এস নাথ, এস এস কাছে,
জুড়াও আমার কাতর প্রাণী ;
বিষাদে চকোরী মনে ম'রে আছে,
দেখাও তাহারে শশীরে আনি !

২৮

হেরিব সে শুভ মূরতি মোহন,
যে মূরতি সদা জাগিছে প্রাণে ;
শুনিব সে বাণী বীণার বাদন,
যে বীণা এখনো বাজিছে কাণে।

২৯

হেরিয়ে তোমারে গিরি তরু লতা,
ফল ফুলে সাজি দাঁড়াবে হেসে ;
ঝুরু ঝুরু সুরে কহি কহি কথা,
সমীর কুশল সুধাবে এসে।

৩০

শুনে তব রব নব জলধর,
গরজিবে ধীর গভীর স্বরে ;
হয়ে মাতোয়ারা ময়ূর নিকর,
নাচিবে ডাকিবে শিখর পরে।

৩১

বসি বসি মোরা বন-ফুল-বনে,
চাব হাসি হাসি তাদের পানে ;
মিলায়ে মিলায়ে নয়নে নয়নে,
স্নেহে নিমগন করিব প্রাণে।

৩২

সে বিষ ভবনে যাইতে তোমারে
হবেনা, পাবেনা পরাণে ব্যথা ;
আর কুরঙ্গিণী নাই কারাগারে,
হয়েছে বনের সচলা লতা।

৩৩

যোগিনী হইয়ে পাগলিনী প্রায়,
খুঁজেছি তোমায় ভারত যুড়ে ;
আঁচলের নিধি হারালে হেলায়,
পাওয়া কি তা যায় মেদিনী খুঁড়ে !

৩৪

কোথা এত দিন হব রাজরাণী,
বসিব আদরে পতির বামে ;
পুষিব তুষিব কত দুখী প্রাণী,
গুরু জনে সুখে সেবিব ধামে ;

৩৫

কোথা বনে বনে যেন অনাথিনী,
উদাসিনী হ'য়ে ঘুরে বেড়াই ;
ডাকি নাথ, নাথ, দিবস যামিনী,
কই তাঁরে কই দেখিতে পাই !

৩৬

হে পৃথিবী দেবী, গগন, পবন,
তোমরা না জান এমন নয় ;
বল কোথা মম পতি প্রাণধন
জীবন-কুসুম ফুটিয়ে রয় !

৩৭

ওগো তরু, লতা, ওহে গিরিবর,
পাগল হয়েছি খুঁজিয়ে যাঁরে ;
দেখেছ কি সেই প্রিয় প্রাণেশ্বর ?
কোথা গেলে আমি পাইব তাঁরে !

৩৮

অয়ি আশা ! তুমি মৃতসঞ্জিবনী,
অমৃত-সাগরে তোমার স্থান,
বিপদ-সাগর-তারিণী তরণী,
ব'ধোনা অবলা বালার প্রাণ।

৩৯

এই কিগো সেই মায়া মরীচিকা,
ঢল ঢল করে বিমল জল ;
হাসিয়ে পালায় চপলা লতিকা,
আগে আগে ধায় যতই চল।

৪০

হরিণী রূপসী দাঁড়ায়ে শিখরে,
কেন আছ খাড়া করিয়ে কাণ !
ঘুমায়েছে বীণা মম হৃদি পরে,
করে কি কিন্নরে স্বরগে গান ?

৪১

একি ! আচম্বিতে ম্লান হয় কেন
জগতব্যাপিনী নাথের ছবি,
কেন কেঁপে ওঠে, রাহু-মুখে যেন
করে থর থর মলিন রবি !

৪২

হৃদয়েরো প্রিয় মূর্ত্তি মধুরিমা,
কেঁপে কেঁপে হেলে পড়িছে কেন !
বিজয়া-বিকালে সোণার প্রতিমা,
দুলে দুলে জলে ডুবিছে যেন।

৪৩

তবে কি হা নাথ ! তুমি আর নাই,
পাবনা দেখিতে তোমারে আর !
যাই যাই আমি পাতালে পালাই,
এড়াই কাতর হৃদয় ভার।

৪৪

ধরণী, আমায় ধোরনা ধোরনা !
রুধনা পবন, ছাড়রে পথ !
সে মধুর স্বরে কোরনা ছলনা,
গেওনা গাহনা নাথের মত।

৪৫

অভাগীর বুঝি ফিরিল কপাল,
এ আওয়াজ্ আর কাহারো নয় !
আয়রে পবন ধাবাল ছাবাল !
ধেয়ে ধরি গিয়ে চরণদ্বয়।

৪৬

বহ বহ বহ সংগীত-লহরী !
ধরগো সপ্তমে পুরবী তান !
বয়ে লয়ে চল ত্বরা তনু তরী !
অমৃত-সাগরে জুড়াব প্রাণ।

৩।—সংগীত-লহরী।

রাগিণী পুরবী, তাল আড়াঠেকা।

সুর—"দিবা অবসান হ'ল"

১

কে জানেরে ভালবাসা,
শেষে প্রাণনাশা হবে!
শান্তির সাগরে আহা
প্রলয় পবন ববে!

২

ভালবাসে, ভালবাসি,
ভূমা প্রেমানন্দে ভাসি,
সদা মন হাসি হাসি,
সৌরভ গৌরবে।

৩

প্রেমের প্রতিমা খানি
আদরে হৃদয়ে আনি,
পদ্মবনে বীণাপানি
পূজি মহোৎসবে।

৪

প্রাণ প্রেম-রসে ভোর,
গলে দোলে প্রেম-ডোর,
হৃদে প্রেম ঘুমঘোর,
মাতোয়ারা নয়ন চকোর;—

৫

আশেপাশে দৃষ্টি নাই,
আপনার মনে ধাই,
হেসে চমকিয়ে চাই
বাঁশরীর রবে!

৬

আচম্বিতে চোরা বাণে
বিষম বেজেছে প্রাণে,
এখনো প্রেমের ধ্যানে
ভোলা মন তবু ম'জে রয়;—

৭

হা আমি যাহার লাগি
হয়েছি ব্রহ্মাণ্ড-ত্যাগী,
মোরে যদি সে বিরাগী;
অনুরাগী কেন তবে!

৮

এত চাই ভুলিবারে,
ভুলিতে পারিনে তারে;
ভালবেসে কে কাহারে
ভুলে গেছে কবে?

৯

বিরাগের আশঙ্কায়
হৃদে শেল বিঁধে যায়,
তবু হায় স'য়ে তায়
কাঁদে সে নীরবে!

১০

ওই আসে উষা সতী,
হাসে দিশা, বসুমতী,
সরোজিনী রসবতী
হাসে খেলে সমীরের সনে;-

১১

হাসে তরু লতা রাজি,
প্রফুল্ল কুসুমে সাজি;
বুঝি এরা মোরে আজি
উপহাস করে সবে!

কইগো অরুণোদয় !
এ যে রবি মগ্ন হয়,
যেন অনুরাগময়
বিরহীর উদাস হৃদয় ;—

১৩

এত নহে কমলিনী,
কুমুদিনী, আমোদিনী ;
যেন পাড়াগেঁয়ে মেয়ে
সেজেছে পরবে ।

১৪

একি ভ্রম হয়ে গেল,
কোথা উষা, নিশা এল ;
পাগল করিল মোরে,
মিলে আজি স্বভাবে মানুষেরে !—

১৫

মনের ভিতরে যার
ছারখার, হাহাকার,
দিবা নিশা সম তার ;
সব তারে সবে ।

১৬

যার জ্বালা, সেই জানে,
থাকিব আপন স্থানে,
দেখি এ কাতর প্রাণে
যাতনা বেদনা কত সয় ;—

১৭

কেন কেন, একি একি,
সব শূন্যময় দেখি,
করাল কালিমা কেন
গ্রাসিয়াছে ভবে !

১৮

কি হ'ল বুকের মাঝে,
যেন এসে বজ্র বাজে ;
কে এলরে রণসাজে,
ঝনঝনা বিকট বাজনা !—

১৯

হা জননী ধরণী গো,
বুঝিতে যে পারিনি গো !
অভাগার দেহ-ভার
কত আর ববে !

২০

হর মা সন্তাপ হর,
ধর ধর ধর ধর,
এই আমি তব কোলে
হইগো বিলয় !—

৪৭

হাহা নাথ ! ওকি ! পোড়না পোড়না !
ভীষণ শিখর— ওখান থেকে ;
এই এই আমি ! দেখনা দেখনা !
সেই আদরিণী ডাকিছে ডেকে ।

৪৮

আহা এস এস, এসহে হৃদয়ে,
তাপিত হৃদয় জুড়াল সখা ;
তুমিও এসেছ বনে যোগী হয়ে !
কার মনে ছিল পাইব দেখা !

৪৯

তোমা বিনে নাথ সকলি আঁধার,
অকূল পাথার হইত জ্ঞান ;
এখনি কি হোতো, কি হোতো আমার !
ছাড়িব না আর থাকিতে প্রাণ !

৫০

আহা সন্ধ্যাদেবী, আজি কি মধুর
রাজিছে তোমার মূরতি খানি !
তোমার সমীর করি ঝুর্ ঝুর্
শরীরে অমিয় ঢালিছে আনি ।

৫১

যাও সমীরণ, আমার মতন
জ্বলিয়াছে যে যে বিরহী বালা,
মিলায়ে তাদের পতি প্রাণধন,
পরাইয়ে দাও ফুলের মালা !

৪ ।—সংগীত ।

রাগিণী ললিত, তাল আড়াঠেকা ।

মিলনের সুর ।

১

মিলিল যুবতী সতী
প্রিয় প্রাণপতি সনে,
মরি মরি হৃদয় লোভা
কি শোভা হইল বনে !

২

ফুটিল অম্বরতলে
তারা হীরা দলে দলে,
রাজিল চন্দ্রিমা ছটা
প্রকৃতির চন্দ্রাননে ।

৩

বনদেবী হাসি হাসি,
আদরে সমুখে আসি,
সাজালেন বরক'নে
চারু ফুল আভরণে ।

৪

লতারাজী বনবালা,
ফুলের বরণডালা
শিরে ধরি ফিরি ফিরি,
মরি, হেসে হেসে বরে, বরে ;—

৫

কুসুম-পরাগ-চোর
সমীর আমোদে ভোর,
বিবাহ মঙ্গল গীতি
গাহগো কোকিলগণে !

ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে বিরহিণী নামক
সপ্তম সর্গ ।

পৌলভর্জ্জীনী।

(দ্বিতীয় ভাগ, দ্বাদশ সংখ্যা ১৮৮ পৃষ্ঠার পর)

যেরূপ, এক স্থানে দাঁড়াইলে উদ্যানের কোন ভাগই চক্ষুর অগোচর থাকিত না, সেই রূপ আবার, সর্ব্ব ভাগে গতায়াত করিবারও কোন অসুবিধা ঘটিত না। বৃক্ষবাটিকার পরিধি মণ্ডলে একটি শিলা ঘটিত রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইল। এই প্রধান পথের শাখা প্রশাখা স্বরূপ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ করিয়া দিয়া পৌল উদ্যানের সকল ভাগই সুগম করিয়া তুলিল। চারি দিকে যে সকল রাশি রাশি পাষাণ খণ্ড পতিত ছিল, তদ্দ্বারা স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া পৌল সেই সকল মন্দিরের গায়ে কর্দ্দম লেপন করিয়া দিল, পরে তাহার উপর গোলাপ জুঁই, মাধবী প্রভৃতি গুল্ম লতা রোপণ করিল। অল্পদিনান্তরেই শিলামন্দির গুলির দুর্দ্দর্শন মরুময় পার্শ্বভাগ পুষ্প-পল্লবে আবৃত হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিল। এক স্থলে একটি সংকীর্ণ গিরি-গুহা ছিল, তাহার মুখভাগ তরুরাজী দ্বারা এরূপ আচ্ছন্ন হইল, যে মধ্যাহ্নে সেই গুহার ভিতর যাইলে তাপও লাগিত না রৌদ্রও দেখা যাইত না। কোথাও, চারি দিকে কেবল বনতরু, মধ্যে এক সুস্বাদ ফলধারী বৃক্ষ রহিয়াছে। কোথাও শস্য পাকিয়া শরৎকাল উপস্থিত হইয়াছে, কোথাও বা আর এক প্রকার বৃক্ষের মুকুল হওয়াতে বসন্তলক্ষ্মী বিরাজমান আছেন, এই পথটি দিয়া একেবারে কুটীর সম্মুখে যাওয়া যায়, ঐ পথটি ধরিয়া গেলে একেবারে গিরি চূড়ায় গিয়া উঠা যায়, এইরূপ কত প্রকার কৌশল, কত প্রকার সৌন্দর্য্য ও কত প্রকার শিল্পের নিদর্শন যে রাখা হইয়া ছিল, তাহার বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না। ঐ যে পর্ব্বত শিখর দেখিতেছ, ওস্থলে দাঁড়াইলে সমুদ্র পর্য্যন্ত দেখা যায় এবং মধ্যে মধ্যে ইয়োরোপ হইতে আগত বা তথায় গমনোদ্যত এক এক খান জাহাজ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কখন কখন সায়ংকালে ঐ স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক পরিবারস্থ সকলে সুশীতল বায়ু সেবন করত কুসুমের সৌরভ ও নির্ঝর জলের ঝর্ঝর ধ্বনি দ্বারা সন্তর্পিত হইতেন। সেই সময়ে আলোক ও অন্ধকার পরস্পর সংস্পর্শ করত সন্ধ্যা দেবীর বিলাস বিভ্রম প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাদের চিত্ত মোহিত করিত। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত কৃত্রিম অরণ্যের বিশেষ বিশেষ স্থলের যে সকল নাম দিতেন, তেমন মধুর নাম কখন শুনি নাই। যে চূড়ার কথা এই মাত্র বলিলাম, তথা হইতে অনেক দূর দেখা যাইত, এবং আমি যখন আপন আলয় হইতে এই দিকে আসিতাম, তখন অনেক অগ্রে দেখিতে পাইত, এই নিমিত্ত শিশুরা ঐ শিখরকে 'মিত্র দর্শন' কহিত। যেমন দেখিত, যে সমুদ্রে জাহাজ দেখিলে লোকে খবর দিবার নিমিত্ত 'আবিষ্কৃয়া শিখরে' নিশান তুলিয়া দেয়, তাহারাও সেই রূপ দূর হইতে আমাকে দেখিয়া, [illegible]টি বেণু যষ্টির উপর শাদা রুমাল [illegible]লিয়া দিত। কমলা লেবুর বৃক্ষ ও কদলী-বৃক্ষ দ্বারা পরিবৃত একখণ্ড শাদ্বল ভূমি ছিল, শিশুরা কখন কখন পরস্পর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তথায় নৃত্য করিত, এজন্য সেই স্থানের নাম 'সংগতিস্থল' হইয়াছিল। যে বনস্পতির ছায়ায় বসিয়া জননীরা সর্ব্ব প্রথম পরস্পরকে স্ব স্ব দুঃখ নিবেদন করিয়া ছিলেন, তাহাকে 'অশ্রুমার্জ্জন' কহিত। কিন্তু ভর্জ্জীনী-কুঞ্জ নামক স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রমণীয়। মিত্র দর্শন নামক শিখরের ঠিক নিম্নদেশে একটি নির্ঝর ছিল, তাহার জল মৃত্তিকা হইতে স্তম্ভাকারে উঠিয়াই ঐ স্থানে ছড়াইয়া পড়িত। তদ্দ্বারা একটি অতি [illegible] ক্ষুদ্র

জলাশয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। পৌলের জন্মসময়ে তাহার মাতাকে আমি একটি নারিকেল দিয়াছিলাম, তিনি সন্তানের বয়ঃক্রম নিরূপণার্থ ঐ জলাশয়ের ধারে নারিকেলটি রোপণ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া বিবি দিলাতূরও দুহিতার জন্মকালে আর একটি নারিকেল তাহার নিকটে রোপণ করিলেন। বৃক্ষ দুটি পাশাপাশি প্রবৃদ্ধ হইয়া আপনাদের মস্তকস্থ পল্লবজাল পরস্পর সংশ্লিষ্ট করিল এবং কালক্রমে ফলবান্ হইল। প্রতি বৎসর ফলোৎপত্তি সময়ে শিশু দুটির বয়ঃক্রম গণনা করা হইত এবং তাহাদিগকে 'পৌলের তরু' ও 'ভর্জ্জীনীর তরু' বলিয়া সকলে নাম দিয়াছিল। জলাশয়ের নিকট আর কোন বৃক্ষ রোপণ করে নাই বটে, কিন্তু সন্নিহিত গিরি শিখরে নানাবিধ আরণ্য লতা ও বনবৃক্ষ জন্মিয়া ঐ স্থান জঙ্গলময় করিয়া রাখিয়াছিল।

উক্ত পর্ব্বত চূড়ার পার্শ্বভাগ লম্বভাবে উত্থিত হইয়াছিল, এবং তাহার পার্শ্বস্থ জঙ্গলে সমুদ্রচারী পক্ষিগণ সাতিশয় প্রীতিলাভ করিত। সন্ধ্যাসময়ে কত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ সাগরপক্ষী ভানুমানের সহিত বিজন জলনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথায় যাইয়া রাত্রিকালে অবস্থান করিত; ভর্জ্জীনী কখন কখন এই অরণ্যময় নির্জ্জন প্রদেশে একাকিনী যাইয়া বিশ্রাম করিত, কখন বা তৎসন্নিহিত নির্ঝরে বস্ত্রাদি ধৌত করিত। সময়ান্তরে ঐ স্থানে যাইয়া ছাগদুগ্ধ দোহন করিত, কিম্বা ঐ দুগ্ধ হইতে পনীর প্রস্তুত করিত, এই অবসরে ছাগমিথুনকে পর্ব্বতকোটিতে সংক্রমণ পূর্ব্বক তৃণপত্রাদি আহার করিতে দেখিয়া সাতিশয় আমোদিত হইত। পৌল ঐ স্থানটি ভর্জ্জীনীর বিশেষ মনোনীত দেখিয়া বন হইতে নানা জাতীয় পক্ষিশাবক আনয়ন পূর্ব্বক তথায় রাখিয়া দিল, শাবকদিগের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ পক্ষীরাও উপস্থিত হইল। ভর্জ্জীনী প্রায়ই তাহাদিগের মধ্যে ধান ছড়াইয়া দিত, এই রূপে তত্রত্য পক্ষিকুল বিলক্ষণ রূপে ভর্জ্জীনীর পোষ মানিয়া ছিল। সে তথায় দেখা দিলেই, কলকণ্ঠ কোকিল, মরকতশ্যাম শুক, দহন-লোহিত মুরী এবং অন্যান্য জাতীয় বিহঙ্গমেরা গৃহপক্ষীর ন্যায় তাহার চারি দিকে আসিয়া দাঁড়াইত। ভাই ভগিনীতে তাহাদের আহার বিহার প্রভৃতি দেখিয়া পরম প্রমোদ লাভ করিত।

হে সুশীল সন্তানেরা! ঈদৃশ পরোপকার সাধনেই বাল্যদশা ক্ষেপণ করিয়াছিলে! বার্দ্ধক্যের এরূপ অবলম্বন পাইয়াছি বলিয়া তোমাদের জননীরা কতই ধন্যম্মন্য হইতেন। কত বারই আমি এই স্থলে তোমাদের সঙ্গে, দুগ্ধ অন্ন আলু আনারস খর্জ্জুর আম্র কদলী কমলালেবু প্রভৃতি নিরামিষ ভোজ্য ভোজন করিয়াছি! কত বারই, তোমাদের বাল্যকালকে তাদৃশ সৌভাগ্যে মণ্ডিত দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছি! যেমন আহার, তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তাও তেমনি নির্দ্দোষ ও নির্ম্মল ছিল। পৌল সর্ব্বদাই, কোথায় কি করিলে সুবিধা হইবে তাহারই কথা কহিত, তাহার মন আবাসের রমণীয়তা বিধানেই নিরন্তর প্রধাবিত থাকিত। এ স্থানের রাস্তাটা ভাল নাই, ও স্থানে ভাল ছায়া হয় না, এরূপ করিলে সে স্থানটি ভর্জ্জীনীর আরও মনে ধরিবে, এই সকল বিষয় লইয়াই সে কাল কাটাইত এবং সেই সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিতে বিলম্ব করিত না।

বর্ষাকালে তাহারা বড় একটা গৃহের বাহিরে যাইত না, প্রভুভৃত্যে একত্র হইয়া ভিতরেই থাকিত। তৎকালে তাহাদের গৃহের বেড়ার ধারে ধারে কৃষিকার্য্যোপযোগী নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র এবং কৃষিকর্ম্মের ফল স্বরূপ, ধান্য যব কলায় প্রভৃতি শস্যের ঝুড়ি অতি পরিপাটী রূপে সাজান থাকিত। প্রাচুর্য্য

তাহাদের গৃহে ত নিত্য বিরাজমান ছিলেন, এবং কখন কখন তাহার উপরে সৌখীনতাও ভোগ হইত। মার নিকট শিক্ষা করিয়া ভর্জ্জীনী ইক্ষুরস ও কলম্বারস মিশ্রিত করিয়া, অতি চমৎকার সুশীতল এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করিয়া রাখিত। রাত্রিকালে একমাত্র প্রদীপের আলোকে ভোজন শেষ হইলে বিবি দিলাতুর বা মার্গারেট্ এক একটি উপকথা বলিতেন। কিরূপে ইয়োরোপের নিবিড় অরণ্যে একজন পথিক পথহারা হইয়া দস্যুহস্তে পতিত হন, কিরূপে জনশূন্য দ্বীপবিশেষের নিকট একখানি জাহাজ বানচালি হইয়া সকলে ডুবিয়া মরে, ইত্যাকার উপন্যাস শুনিতে শুনিতে সন্তান দুটির হৃদয় দয়াতে এবং লোচন অশ্রুজলে পূর্ণ হইত। তাহারা তখন এই কামনা করিত, 'যেন আমরা এক দিন এই রূপে বিপদ্গ্রস্ত কোন পথিকের দুর্ভাগ্য মোচনে সমর্থ হই।' এই রূপে কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া দুই পরিবার আপন আপন গৃহে শয়ন করিত। চালের উপর বৃষ্টি পড়িয়া যে চড় চড় শব্দ হয়, কিম্বা বেলাবপ্রের উপর তরঙ্গভঙ্গ হইয়া যে কলকলধ্বনি উত্থিত হয়, তাহা শুনিতে শুনিতে তাহাদিগের নিদ্রা সুখ পরিবর্দ্ধিত হইত। যেরূপ বিপদের গল্প করিতেছিল, ভগবান্ তাহাদিগকে তাদৃশ বিপদ্ হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন ভাবিয়া তাহাদের মনে চমৎকার দেবভক্তি ও অনির্ব্বচনীয় স্বাচ্ছন্দ্য স্ফুরিত হইত।

এক এক সময়ে বিবি দিলাতুর বাইবেলের সন্দর্ভ বিশেষ পাঠ করিতেন। ঐ গ্রন্থের কথা লইয়া তাহারা কখন তর্কবিতর্ক করিত না, তদীয় উপদেশামৃত মনে মনে পান পূর্ব্বক কেবল কার্য্য দ্বারা তাহার ফল দেখাইত। 'অমুক দিন সংসারচিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মচিন্তায় কাটাইতে হইবে, অমুক দিন আমোদে অতিবাহন করিতে হইবে' ইহা তাহাদের নির্দ্ধারিত ছিল না। প্রতিদিনই উৎসবের দিন, এবং সর্ব্বত্রই করুণানিধান সর্ব্বশক্তিমান্ অচিন্ত্যস্বরূপ ভগবানের উপাসনামন্দির, ইহা স্থির জানিয়া তাহারা সংসার ও ধর্ম্ম এ উভয়কে একীকৃত করিয়াছিল। ভগবানের দয়া মনে রাখিয়া তাহারা গতানুশোচনা ছাড়িয়া দিত, বর্ত্তমানের বিষয়ে সাহস অবলম্বন করিত, এবং ভবিষ্যতের নিমিত্ত আশা করিয়া রাখিত। নম্রস্বভাবা বিনয়পরায়ণা এই দুই মহিলা দুঃখদশায় পতিত হইয়া নিসর্গসিদ্ধ ধীরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, সন্তানদিগের মনেও তাহার বীজ বপন করিয়া দিলেন।

কিন্তু চিত্ত নিতান্ত বিশুদ্ধ ও সুশাসিত থাকিলেও কখন কখন তমোগুণ তাহাকে আক্রমণ করে। তন্নিমিত্ত যদি কখন তাহাদিগের মধ্যে কেহ বিমনা হইত, তাহা হইলে পরিবারস্থ প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রকৃতির অনুরূপ আচরণ অবলম্বন করিয়া তাহাকে সুস্থ করিত। মার্গারেট প্রেম প্রকাশ করিয়া মনোরঞ্জন করিতেন, পৌল সৌজন্য ও সারল্য প্রদর্শন করিত, বিবি দিলাতুর স্নেহগর্ভ সদুপদেশ প্রদান করিতেন, ভর্জ্জীনী নম্রতা ও সুশীলতা প্রকাশ করিত, ভৃত্যেরা পর্য্যন্ত বিমনা ব্যক্তির নিকট আসিয়া নানাবিধ প্রবোধ বাক্য কহিত। তাহার রোদনে সকলেই অশ্রুপাত করিত, এবং সর্ব্বথা আপনাদিগকে তাহার সমদুঃখসুখ দেখাইত। ঠিক এ রূপেই দুর্ব্বল লতাসমূহ পরস্পর অবলম্বন করিয়া ঝটিকার অবলেপ হইতে আত্মরক্ষা করে।

যদি দুর্দ্দিন না হইত, তাহা হইলে তাহারা প্রতি রবিবারে ঐ দৃশ্যমান বাতাবি গিরিজার উপাসনা করিতে যাইত। অনেক ধনবান্ লোক শিবিকা আরোহণে তথায় আসিত। এই দুই পরিবারের পরস্পর সদ্ভাব দেখিয়া তাঁহারা প্রায়ই পরিচয় করিতে ব্যগ্র

হইতেন এবং মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণাদিও করিতেন। কিন্তু এই দুই গৃহস্থ শিষ্টতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিতেন। ইঁহারা জানিতেন যে, ধনীরা শুদ্ধ চাটুকার লাভের নিমিত্ত দরিদ্রদিগের সঙ্গ প্রার্থনা করে, এবং চাটুকার হইলে ধনীদিগের সৎপ্রবৃত্তি কুপ্রবৃত্তি উভয়েরই স্তুতিবাদ করিতে হয়, এই নিমিত্ত তাঁহারা আঢ্যসংসর্গ করিয়া স্বীয় চারিত্র দূষিত করিতে চাহিতেন না, পক্ষান্তরে তাঁহারা বুঝিতেন যে নিতান্ত নির্দ্ধন ও ইতর লোকেরা প্রায়ই ঈর্ষ্যাপরবশ পরকুৎসাপ্রিয় এবং অভব্য হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত তাঁহারা নিতান্ত দরিদ্রদিগের সহিতও বড় পরিচয় রাখিতেন না। এজন্য প্রথম প্রথম আঢ্যেরা তাঁহাদিগকে ভীরু ও মুখচোরা ভাবিত, ইতরেরা গর্ব্বিত বলিয়া জানিত। কিন্তু তাঁহারা এরূপ শিষ্টভাবে সব দিক্ বাঁচাইয়া চলিতেন; বিশেষত দুঃখীর প্রতি এরূপ মমতা প্রকাশ করিতেন যে, কালসহকারে তাঁহারা আঢ্যদিগের নিকট সম্মান ও ইতরদিগের নিকট অনুরাগ লাভ করিতে লাগিলেন।

গির্জ্জা হইতে প্রত্যাগমন সময়ে তাঁহারা প্রায়ই একটি না একটি পরোপকার করিয়া আসিতেন। কখন কোন বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করিত, কখন একটি বালক, পীড়িত জননীকে দেখিতে যাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিত। সচরাচর যে সকল রোগাদি হইয়া থাকে, তাহার উপযুক্ত ঔষধ কিছু কিছু তাঁহাদিগের সঙ্গেই থাকিত। সেই সকল ঔষধ এরূপ সৌজন্য সহকারে প্রদান করিতেন যে, দিবার রীতি দেখিয়াই রোগীর অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিত। পীড়িত ব্যক্তি অসহায় হইয়া নির্জ্জনে থাকিতে যে সকল হৃদয়বেদনা সহ্য করে, তাহার অপনয়ন নিমিত্ত বিবি দিলাতুর বিধাতার করুণাবিষয়ে অতি হৃদয়ঙ্গম বক্তৃতা করিতেন, তদ্দ্বারা রোগীর সকল ভয় শঙ্কা অপগত হইত, সে যেন ভাবিত যে, তাহার সম্মুখে সাক্ষাৎ ভগবান্ আসিয়া আশ্বাস দিতেছেন। ভর্জ্জিনী যখন যখন এইরূপ স্থানে যাইত, ফিরিয়া আসিবার সময় তাহার নয়ন বাষ্পপূর্ণ দেখা যাইত, কিন্তু তাহার মনে অতি পবিত্র প্রমোদ সন্তানিত হইত। দিন থাকিতে ঔষধ প্রস্তুত করা তাহারই কর্ম্ম ছিল এবং সে অতি মধুর ভব্যতার সহিত রোগীকে উহা সেবন করাইত। ইত্যাদি পরার্থসাধনে প্রভাতকাল ক্ষেপণ পূর্ব্বক তাঁহারা কখন কখন আমার গৃহ পর্য্যন্ত আসিতেন। আমি আপন গৃহসন্নিহিত তটিনীতটে জানপদ-ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া তাঁহাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতাম। তাঁহাদিগকে এই রূপে ভোজন করাইবার সময়ে প্রায়ই কিঞ্চিৎ দ্রাক্ষাসব সংগ্রহ করিতাম। এই রূপে ভারতবর্ষসুলভ আহার দ্রব্যের সহিত ইয়োরোপীয় পানীয় মিলাইয়া ভোজনোৎসব পরিবর্দ্ধিত করিতাম। কখন বা সমুদ্রতটে যাইয়া তরুবিশেষের ছায়ায় আহার সম্পাদন হইত এবং উপকূলস্থিত গণ্ডশৈলে আসীন হইয়া, পদতলে ভিদ্যমান ঊর্ম্মিমালা অবলোকন করা যাইত। পৌল মৎস্যের ন্যায় সন্তরণপটু ছিল, সে তীরভূমিতে অতি দূর গমন করিয়া, সমুদ্রের তরঙ্গ নিকটে আসিলেই উহার আগে আগে পলায়ন করিত। অম্বুরাশি ঘোর গর্জ্জন ও ফেনা উদ্বমন করত পৌলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেন। ভর্জ্জিনী পৌলের ঈদৃশ জলক্রীড়া ভাল বাসিত না। সে পৌলকে তরঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত দেখিলেই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিত।

আহার শেষ হইলে শিশুরা নৃত্যগীত করিয়া সকলের প্রমোদ বিধান করিত। নৃত্য গীতের উপযুক্ত নাট্যশালারও

অভাব ছিল না। রৌদ্রের সময় আমরা চতুর্দ্দিকে তরুরাজীসমাচ্ছন্ন কোন প্রদেশে আশ্রয় লইতাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সূর্য্যদেবের দীধিতিমালা বিটপ ও পত্রের অন্তরাল দিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক বনের অভ্যন্তরকে অতি চমৎকার শোভায় শোভিত করিত, কখন তাঁহার পূর্ণ মণ্ডলখানি পাদপবীথির প্রান্তভাগে দৃশ্যমান হইত। তখন বৃক্ষের হরিণ্ময় ও পিঙ্গলময় স্কন্ধসমূহ তাঁহার রক্তবর্ণ কিরণে স্ফুরিত হইয়া পিতলের স্তম্ভের সদৃশ হইত। বিহঙ্গবর্গ ইহার পূর্ব্বেই রাত্রি উপস্থিত ভাবিয়া আপন আপন অন্ধকারময় কুলায়ে লীন হইয়াছিল, কিন্তু এই রূপে আবার অরুণোদয় দেখিয়া সহস্র সহস্র গীত গাইয়া দিননাথকে স্তব করিত। রাত্রি হইয়া গেলেও আমরা চিন্তিত হইতাম না, বন মধ্যে তাঁবু ফেলিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতাম, প্রত্যূষে স্ব স্ব গৃহে আসিয়া দেখিতাম কোন কিছুরই ব্যত্যয় হয় নাই। তখন বাণিজ্যের এত বিস্তার হয় নাই, তৎকালে লোক সকল বিশ্বাসী ও সরল ছিল, গৃহে চাবি দিবার রীতি প্রচলিত ছিল না। এমন কি চাবি কিরূপ তাহা অনেকে কখন দেখেও নাই।

প্রতি বৎসর জননীদিগের জন্মতিথি উপলক্ষে যে উৎসব হইত, শিশুদিগের পক্ষে সেই উৎসবই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক আমোদকর হইত। এই দ্বীপে ঈদৃশ অনেক দরিদ্র ইয়োরোপীয় লোক আছে যাহারা অপত্য কলত্র সমেত বনে বনে কন্দ মূল খাইয়া দিনপাত করে। তাহাদের দুর্দ্দশার ইয়ত্তা নাই। কৃষ্ণদাসেরা ঘোর অজ্ঞানে আচ্ছন্ন বলিয়া ভাল মন্দ অবস্থার তারতম্য বুঝে না, চিরকাল দুঃখ পাইয়া আসিয়া তাহাদিগের এক প্রকার সহ্য হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহারা আপন দুর্দ্দশা তত গ্রাহ্য করে না, তন্নিমিত্ত তত মনোবেদনাও পায় না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দরিদ্র ইয়োরোপীয় পরিবারেরা সুখের আস্বাদনে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহে, সুতরাং তাহাদের মনোবেদনার শেষ নাই। আবার তাহারা মূর্খ বলিয়া, দারুণ দুর্দ্দশায় অনুরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে জানে না, কোনপ্রকার শ্রমসাধ্য ব্যবসায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, কেবল দৈবের নিন্দা করত অলসভাবে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় এবং দিন দিন সমধিক দুর্ভাগ্যে কবলিত হইতে থাকে। জননীদের জন্মদিনে শিশুরা ঈদৃশ দু এক পরিবারকে নিমন্ত্রণ করিত। পূর্ব্ব দিন পৌল যাইয়া আহ্বান করিয়া আসিত। পর দিবস দেখা যাইত, কতিপয় শীর্ণ রুগ্ন দারক দারিকা লইয়া এক দুঃখিনী মাতা আসিয়াছে, তাহার সন্তান গুলি এরূপ মুখচোরা যে, মুখে কথাটি নাই, এবং মুখ তুলিতেও যেন তাহাদের শঙ্কা হইতেছে। ভর্জ্জীনী মধুর বাক্যে সকলের ভয় বা লজ্জা ভাঙিয়া দিত। নিজের কিছু এমন সংগতি ছিল না যে অতি উত্তম খাদ্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াইতে সমর্থ হয়, তথাপি সে এ কথা সে কথা কহিয়া এরূপে করুণা ও মমত্ব দেখাইত যে, অতি সামান্য প্রকার ভোজ্যও নিমন্ত্রিতদিগের পরম হৃদ্য হইয়া উঠিত। 'পৌলের মা এই সরবৎ প্রস্তুত করিয়াছেন' 'আমার মা এই রুটি গুলি গড়িয়াছেন' 'এই ফলগুলি পৌল পাড়িয়া আনিয়াছে' এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিয়া, যত ক্ষণ না তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত দেখিত, তত ক্ষণ ভোজন করাইত। যদি দেখিত, যে কোন বস্তু কাহারও বড় ভাল লাগিয়াছে, তাহা হইলে উহা গৃহে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিত। কিন্তু এরূপ জানাইত না যে, তাহারা দুঃখী বলিয়া ভিক্ষা দিতেছে, বরং তাহার বাগ্‌ভঙ্গি দ্বারা ইহাই প্রকাশ পাইত, যে, বস্তুটি উত্তম হইয়াছে, কিম্বা নূতন প্রকার হইয়াছে, এই নিমিত্তই সে মিত্র-

তানিবন্ধন ভেট দিতেছে। যদি দেখিত যে, কাহারও অঙ্গবসন নিতান্ত জীর্ণ কিম্বা ছিন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে মার অনুমতি লইয়া আপন পুরাতন বস্ত্র গুলি পৌলকে দিয়া পাঠাইয়া দিত। পৌলকে কহিয়া দিত 'ভাই, এমনি সাবধান হইয়া দিয়া আসিবে যে তাহারা না জানিতে পারে, কারণ জানিতে পারিলে তাহাদের অভিমান হইয়া মনে কষ্ট হইবে। অতএব যখন তাহারা ঘরে না থাকে, তখন তাহাদের দ্বারে রাখিয়া দিও।' যেমন দেবতা আপন মূর্ত্তি গোপন রাখিয়া সকলের উপকার করেন, ভর্জ্জীনীও সেইরূপ করিতে ভাল বাসিত। উপকৃত ব্যক্তিরা শুদ্ধ তৎকৃত উপকার মাত্র ভোগ করিত, কে করিয়াছে তাহা জানিতে পারিত না।

তোমরা ইয়োরোপের লোক, তোমাদের বিশ্বাসই হইবে না যে, পৌল ও ভর্জ্জীনী কখন লেখাপড়া করে নাই, তাহাদের এত জ্ঞান এত ভদ্রতা কোথা হইতে হইল। তোমরা ভাব যে, তোমাদের সন্তানেরা বিদ্যাভ্যাস করিয়া সুখী হইবে। কিন্তু উহা এক প্রকার ভ্রম। বালক বালিকাদিগকে যে শিক্ষা দিবার রীতি সংসারে প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা প্রকৃত সুখের উপযোগী জ্ঞানযোগ না হইয়া বরং বুদ্ধি সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়। সেই সমস্ত শিক্ষা হইতে যে সকল সুখের স্বাদ বোধ হয়, তাহা অতি সামান্য, সে সুখ কৃত্রিম, সুতরাং অল্প কালেই ফুরাইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতির ভাণ্ডার অক্ষয়, প্রকৃতির পথে সঞ্চরণ করিলে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা অসীম। পৌল ও ভর্জ্জীনী লেখাপড়া করে নাই বটে, কিন্তু তাহারা প্রকৃতি পথের পান্থ হইয়াছিল, তাহাদের সকল জ্ঞানই তাঁহার নিকট উপদেশ পাইয়া উপলব্ধ হইয়া ছিল।

পৌল ও ভর্জ্জীনীর ঘড়ী বা পঞ্জিকা ছিল না, তাহারা ইতিহাস বা দর্শনশাস্ত্র পড়ে নাই। কিন্তু তাহারা প্রকৃতির নিয়মে সময় নিরূপণ করিত। বৃক্ষের ছায়া দেখিয়া তাহারা বেলা নির্ণয় করিত, তদীয় ফলমুকুল দেখিয়া ঋতু নির্ণয় করিত, এবং যত বার ফল হইয়াছে সেই সংখ্যা ধরিয়া বৎসর গণনা করিত। এই নিমিত্ত তাহাদিগের কথাবার্ত্তা অতি রমণীয় এক প্রকার মাধুরীতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত। ভর্জ্জীনী কহিত, "ওগো, খাবার সময় হইয়াছে, ঐ দেখ না, কলাগাছের ছায়া গাছের তলায় জমা হইয়াছে।" কখন বা—"আর বেলা নাই গো, তেঁতুল পাতা মুদিয়া যাইতেছে।" সন্নিহিত পল্লীগ্রামের দু একটি সহচরী তাহাকে এক দিন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গে ভাই, আমার কবে দেখা হইবে।" সে কহিল, "আকের সময়" তাহারা অমনি উত্তর করিল "ভাই, তোমার সেই আসা আমাদিগের হক্কে আকের চেয়েও মিষ্টি, আকের চেয়েও সুমধুর বোধ হইবে।" কেহ যদি তাহাকে তাহার নিজের আর পৌলের বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে সে কহিত, "এই, আমার দাদার বয়েস কত জান? আমাদের বাড়ীতে যে বড় নারিকেলে গাছটি আছে, সিটি যত বড়, দাদাও তত বড়; আর আমি ছোট গাছটির বয়িসী" "এই, আমি হবার পর বার বার আঁব হইয়াছে, আর চব্বিশ বার কলম্বা লেবু হইয়াছে।" ফলত তাহাদের কথা বার্ত্তা শুনিলে মনে হইত যে, তাহারা যেন বনদেবতা, তাহাদের আয়ু যেন তরুগণের সঙ্গে সংমেলিত আছে। জননীদের জন্মতিথি ব্যতীত অন্য পর্ব্বাহ তাহারা জানিত না, উদ্ভিজ্জগণের ফুলফল হইবার সময় ব্যতীত অন্য কোন ঋতু অবগত ছিল না এবং পরোপকার সাধন ব্যতীত অন্য কোন বিদ্যাই শিক্ষা করে নাই।

ফলে, ধনবান্ বা বিদ্বান্ ছিল না বলিয়া তাহাদের কোন কাজই আটকায় নাই। এমন দিনই যাইত না, যে দিনে

তাহারা কোন না কোন উপকার কিম্বা কোন না কোন জ্ঞান দান করে নাই। জ্ঞান দান না বলিবই বা কেন? যদিও সংসারের মতানুসারে তাহাদিগকে জ্ঞানী বলা যায় না, তথাপি আপন সাধুতার নিদর্শন দেখাইয়া লোককে সৎপথ দেখাইয়া দিয়াছিল।

এই রূপে প্রকৃতির এই দুই সন্তান শৈশব অতিবাহন করিল। অসচ্চিন্তা দ্বারা তাহাদের ললাট বিকৃতিভাব প্রাপ্ত হয় নাই, দুষ্প্রবৃত্তি দ্বারা তাহাদের মন কখন কলুষিত হয় নাই। তাহাদের চিত্ত নিরন্তর প্রীতি, ভক্তি ও নির্মলতার প্রিয় নিকেতন হইয়া থাকিত। তাহাদের চেষ্টা ইঙ্গিত ভঙ্গি সকলই সুচারু বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

পৌলের মুখে অনেক বার শুনিয়াছি যে, সে বিরলে ভর্জ্জীনীকে এইরূপে আভাষণ করিত। 'তোমাকে দেখিলেই আমার শরীরের গ্লানি দূর হয়। পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে নিম্নস্থ বনে তোমাকে বিচরণ করিতে দেখিলে আমার বোধ হয় যেন একটি অতি সুন্দর গোলাপ কুসুম রহিয়াছে। যখন তুমি কুটীরাভিমুখে গমন কর, তখন তোমাকে অবলোকন করিলে মনে ত হয় না যে, হংসীর পদগতি এত ললিত, কিম্বা তাহার অঙ্গ ভঙ্গি এমন মধুর! যখন বৃক্ষের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া যাও, তখনও আমার মনে হয় যে, তোমাকে সম্মুখে দেখিতেছি। তুমি যে ঘাসের উপর উপবেশন কর, এবং যে স্থান দিয়া গতায়াত কর, তাহা পর্য্যন্ত তোমার মাধুর্য্যে পূর্ণ হইয়া আমার পক্ষে তোমার সন্নিধানের সদৃশ হয়। তোমার নিকটে যাইলে আমার পরমাত্মা মোহিত হয়, অঙ্গুলির অগ্র ভাগ দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করিলে আমার দেহ হর্ষভরে উৎকম্প হয়। তোমার কি মনে পড়ে, যে দিন আমরা স্তনত্রয়ী পর্ব্বতের নদী পার হইলাম। তাহার তীরে আসিয়া আমার যার পর নাই ক্লান্তি বোধ হইয়া ছিল, কিন্তু তোমাকে পৃষ্ঠে আরোপণ করিবা মাত্র আমি পক্ষীর ন্যায় বেগ পাইলাম। বল দেখি কি মধুরতা দ্বারা আমাকে এত বশ করিয়াছ? তুমি বড় সুবুদ্ধি, তাই জন্যে কি? তা ত নয়, আমাদের জননীরা আরো ত সুবুদ্ধি। তুমি বড় ভাল বাস তাই জন্যে কি? তাও ত নয়, আমাদের জননীরা ত আরো কত ভাল বাসেন। আমার মনে হয় যে, তুমি বড় দয়ালু এই নিমিত্তই তোমার গুণে আমি মুগ্ধ আছি। কখন কি ভুলিতে পারিব যে, দাসীর নিমিত্ত অনুরোধ করিতে তুমি 'শ্যাম নদীর' তীর পর্য্যন্ত শুধুপায়ে গিয়াছিলে? এই গ্রহণ কর, প্রেয়সি, এই কলম্বার ফুলগুলি রাত্রে তোমার শয্যায় রাখিয়া দিও এই দেখ, তুমি খাইবে বলিয়া বন হইতে মধু ভাঙিয়া আনিয়াছি। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আমার বক্ষে ভর দিয়া উপবেশন কর, তাহা হইলেই আমার ক্লান্তি দূর হইবে।'

ভর্জ্জীনী উত্তর করিত ভ্রাত তোমাকে দেখিলে আমার যেরূপ আহ্লাদ হয়, তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারি না। জননীদিগের প্রতি আমার ত কত স্নেহ তুমি জান, কিন্তু যখন তাঁহারা তোমাকে পুত্র বলিয়া আহ্বান করেন, তখন আমার সেই স্নেহ শতগুণ হয়। তুমি আমাকে এত ভাল বাস কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ। কিন্তু ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ভাই, একত্র যাহারা থাকে তাহাদিগেরই ত পরস্পরের প্রতি এইরূপ স্নেহ জন্মে। দেখ, পক্ষিশাবকেরা এক কুলায়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া পরস্পরকে এই রূপই ভাল বাসে, এই রূপই কাছে কাছে থাকে। ঐ শুন, একটি পক্ষী শব্দ করিলেই কেমন অপর গুলি উত্তর করিতেছে। যখন তুমি পাহাড়ের উপর হইতে গান কর, তখন আমিও এই রূপে নিম্নে থাকিয়া তোমার সঙ্গে গান করিয়া থাকি। তোমার প্রতি আমার

স্নেহ চিরকালই আছে। কিন্তু যে দিনে, 'শ্যামনদীর' তীরবাসী ক্ষেত্রপতির সহিত বিবাদ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলে, সে দিন অবধি আমার শতগুণ প্রিয় হইয়াছ। সে দিন অবধি আমি মনে মনে বলি "ভাই আমার বড় সাহসী। সে না থাকিলে আমি ভয়ে মরিয়া যাই-তাম।" আমি পরমেশ্বরের কাছে সক-লেরই কুশল প্রার্থনা করি, কিন্তু তোমার নাম করিবার সময় আমি এরূপ একতান হই যে, আমার ভক্তি দ্বিগুণ হইয়া উঠে। কেন বল দেখি, আমার জন্যে ফল ফুল আনিতে তত দূরে যাও, তত উচ্চে আরো-হণ কর, আমাদের বৃক্ষবাটিকায় ত যথেষ্ট আছে। দেখ দেখি তোমার কত পরিশ্রম হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। এই বলিয়া শ্বেতবর্ণ রুমাল দিয়া ভ্রাতার মুখ পুঁছিয়া দিয়া বারম্বার চুম্বন করিল।

এই সময়ে নিগূঢ় ব্যাধি বিশেষে ভর্জ্জীনী দিন দিন খিন্ন হইতে লাগিল। ইন্দীবরসদৃশ মনোহর অপাঙ্গে কালিমা পড়িল এবং দেহ দুর্ব্বল ও বিবর্ণ হইয়া গেল। তদীয় ললাট হইতে ধীরতা ও অধর হইতে স্মিত শোভা অন্তর্হিত হইল। তাহাকে অকস্মাৎ বিষণ্ণ ও অকারণে প্রমুদিত হইতে দেখা যাইত। নির্দ্দোষ ক্রীড়া কিম্বা মনোমত বন্ধুর সংসর্গ পরিহার পূর্ব্বক সে অতি নির্জ্জন প্রদেশ সমূহে ভ্রমণ করিত, কিন্তু কোথাও নির্বৃতি পাইত না। কখন কখন পৌলকে দেখিয়া সবিভ্রমে তদভিমুখে গমন করিত, কিন্তু তাহার সন্নিহিত হইয়াই ভর্জ্জীনীর যেন সহসা লজ্জা বোধ হইত, কপোলের পাণ্ডুর ভাব অপগত হইয়া বদন আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, তখন লজ্জায় নতমুখী হইয়া চুপ্ করিয়া থাকিত। পৌল বলিত 'শৈলভূমি হরি-ন্ময় পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়াছে, বিহঙ্গবর্গ তোমার দর্শনে মুদিত হইয়া গান করিতেছি, সকলেই তোমাকে দেখিয়া প্রমোদ প্রকাশ করিতেছে, তুমি কি নিমিত্ত বিমনা রহিয়াছ বল দেখি? এই বলিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করিতে যাইত। কিন্তু ভর্জ্জীনী অমনি মুখ ফিরাইয়া এবং কাঁপিতে কাঁপিতে মাতৃসন্নিধানে পলায়ন করিত। ভ্রাতার বাৎসল্য পরিরম্ভ হতভাগিনীর যেন ভাল লাগিত না। ঋজুস্বভাব পৌল ঈদৃশ অভূতপূর্ব্ব ব্যাধির মর্ম্ম কিম্বা ঈদৃশ অদ্ভুত যদৃচ্ছা-চারের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিত না।

উষ্ণ কটিবন্ধের অন্তর্গত দেশ সমূহে গ্রীষ্মকাল এক এক বার মহাভীষণ হইয়া উঠে। এই বর্ত্তমান বৎসরে সেইরূপ দুরন্ত গ্রীষ্ম উপস্থিত হইল। তখন ডিসেম্বর মাস শেষ হইতেছিল। কর্কট-রাশিস্থ ভাস্করদেব নভোমণ্ডলের শিরোভাগে অধিরোহণ পূর্ব্বক তিন সপ্তাহ ধরিয়া দ্বীপ শোষণ করিতেছিলেন। রাজপথ হইতে রাশি রাশি ধূলি উঠিয়া আকাশে স্তম্ভের আকারে লম্বমান রহিল, সকল স্থানেরই মৃত্তিকা চণ্ডপ্রতাপে বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তৃণলতাদি দগ্ধ হইয়া গেল, এবং রাশি রাশি উষ্ণ বাষ্প পর্ব্বতপার্শ্ব হইতে বহির্ভূত হইতে লাগিল। সমুদ্র হইতে একখানিও মেঘ উঠিত না, কেবল যখন সূর্য্য অস্ত যাইতেন, সেই সময়ে তাঁহার মণ্ডলের চারি দিকে জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ঘোর রক্তবর্ণ মেঘ দেখা যাইত। সারারাত্রিতেও তপ্ত বায়ু-রাশি শীতল হইত না, চন্দ্রকলা অতি-বৃহৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেন। মৃগগণ গিরিসানুতে নির্জ্জীব প্রায় শয়ান হইয়া ঊর্দ্ধকণ্ঠে নিশ্বাস গ্রহণ করিত এবং তাহা-দের খেদসূচক শব্দে দিগন্ত পূর্ণ হইত। মৃগপাল সন্তাপ শান্তিলাভাশয়ে মৃত্তিকায় শয়ন করিত, কিন্তু তাহা পর্য্যন্ত সূর্য্যের কিরণে তপ্ত হইয়াছিল, তাহাতেও গাত্র জুড়াইত না। নানাজাতীয় পতঙ্গ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জীবদিগের রক্ত পান করিবার নিমিত্ত ইতস্তত গুন্ গুন্ করিয়া বেড়াইত।

অবোধ-বন্ধু

" করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

৩ য় ভাগ] মাঘ, — ১২৭৬। ১০ ম সংখ্যা।

বেকনসন্দর্ভ

১২।— চাতুরী।

চাতুরী এক প্রকার কুজ্ঞবিজ্ঞতা। চতুর ও বিজ্ঞ লোকে অনেক ভেদ; কেবল ভদ্রতা লইয়াই নয়, ক্ষমতা লইয়াও অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। অনেকে তাস উত্তম ভাঁজিতে পারে কিন্তু খেলায় তাদৃশ ব্যুৎপন্ন নয়। সেইরূপ অনেকে আপন সহবল জোটাইতে যথেষ্ট মজবুত এবং দলাদলিতেও মূর্ত্তিমন্ত; কিন্তু অন্য বিষয়ে তাঁহাদের বুদ্ধি সেরূপ খেলে না।

মানুষ চেনা ও বিষয় বোধ দুটি স্বতন্ত্র জিনিস; দেখ কেহ কেহ মানুষের মম বুঝিতে সুপটু, আসল কর্ম্মে তত নিপুণ নহে। যাহারা মানুষের স্বভাব চরিত্রই কেবল ভাল করিয়া অভ্যাস করিয়াছে গ্রন্থের দিকে তাদৃশ দৃষ্টি রাখে না তাহারাই এইরূপ ধরণের লোক। কার্য্য উদ্ধারের পক্ষে ইহারা উপযুক্ত পরামর্শ দিতে তেমন নিপুণ নয়। এইরূপ লোক আপন রাস্তায় বেস চলিতে পারে। অপরিচিত ব্যক্তির নিকট লইয়া যাও তখনই আপন অভিসন্ধি ভুলিয়া যাইবে। "দুই জনকেই পোসাক খুলিয়া অপরিচিত ব্যক্তির নিকট ছাড়িয়া দাও তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে" কে বিজ্ঞ ও কে মূর্খ জানিবার এই প্রাচীন নিয়মটি উহাদের পক্ষে সুবিধার নহে। চতুর লোক এক প্রকার খুচরা জিনিসের ফিরিওয়ালা; অতএব এস্থলে তাহাদের দোকান খুলিয়া সকলকে দেখান নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

তুমি যাহার সহিত আলাপ করিতেছ তাহার ভাবভঙ্গীর দিকে নজর রাখা একটি প্রধান চাতুরী। জেস্যুইটরাও এই প্রকার উপদেশ দিয়াছেন, কারণ এমন অনেক বিজ্ঞরূপ আছে যাহারা বাহিরে দিব্য পরিষ্কার কিন্তু মনে মনে আপন মতলব ছাড়ে না। কখন কখন সবিনয়ে ও

অধোমুখে তাহাদের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে. ইহাও জেস্যুইটরা বলিয়াছেন।

আর একটি চাতুরীর কথা বলিতেছি। যখন তোমার কোন অভিসন্ধি শীঘ্র শীঘ্র সিদ্ধ করিতে হইবে তখন যাহার সহিত তুমি কাজ করিতেছ তাহাকে উপরি পাড়া কথা পাড়িয়া ভুলাইয়া রাখ, তাহাতে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সে আর কোন বাধাই দিতে পারিবে না। আমি মহারাণী এলিজাবেথের সময়ের একজন মন্ত্রীকে জানিতাম তিনি যখন কোন হিসাব পত্রে সহি করাইতে আসিতেন তখন রাজ্য বিষয়ের কোন না কোন গল্প আনিয়া ফেলিতেন সুতরাং মহারাণীর হিসাবের দিকে তাদৃশ মনোযোগ থাকিত না।

যখন কেহ অতিশয় ব্যস্ত ও সুস্থির হইয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের বিবেচনা করিতে পারে না তখন তাহার নিকট কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলে তাহাকে ভুলাইয়া কার্য্য সাধন করিতে পারা যায়।

যদি কাহারও এরূপ আশঙ্কা হয় যে অন্য একজন সুন্দর রূপে কোন এক বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া তাহা সিদ্ধ করিয়া তুলিবে এবং উহা যাহাতে ভালরূপ না উত্তরিয়া উঠে তাহাই তাহার প্রধান বাসনা তবে সে, তদ্বিষয় সুসিদ্ধ হইবার পক্ষে তাহার আন্তরিক ইচ্ছা আছে, প্রকাশ করুক এবং এই রূপে উহার প্রস্তাব করুক যে শেষে উহা বিফল হইয়া পড়ে।

একজন কোন বিষয় বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিলে তাহার সহিত যাহার আলাপ হইতেছে এ বিষয় জানিবার জন্য তাহার অতিশয় কৌতূহল জন্মে।

তোমাকে কেহ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর যেরূপ ফলদায়ক হয় নিজে হইতে বলিলে সেরূপ হয় না। তুমি জিজ্ঞাসার জন্য প্রলোভন দেখাইতে পার; তোমার স্বাভাবিক আকৃতির কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইলেই লোকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবে। নেহেমিয়া এই রূপ করিয়াছিল। সে তাহার পূর্ব্বে আর কখনই রাজার অগ্রে বিষণ্ণ ভাব প্রকাশ করে নাই।

অবক্তব্য ও অপ্রীতিকর বিষয়ে লোকে যাহাদের কথায় তাদৃশ শ্রদ্ধা করে না তাহাদের দ্বারাই উহার প্রস্তাব কর এবং যে কথায় সকলের শ্রদ্ধা হইবে, উহা সময়ান্তরের জন্য রাখিয়া দাও। একজন সামান্য লোক কোন কথা বলিলে উহার যাথার্থ্য নির্ণয়ের নিমিত্ত যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে তখন তুমি উহার উত্তর দিও। নার্সিসস, সিনিয়স ও মেসালাইনার বিবাহের বিষয় পূর্ব্বোক্তরীতিতে ক্লাডিয়সের নিকট উত্থাপন করিয়াছিল।

যে বিষয়ে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে; "লোকে এইরূপ বলে" কিম্বা "এইরূপ করা রটনা হইয়াছে বটে" ইহা বলিয়া লোকের নামে তাহার প্রসঙ্গ করা একটি প্রধান চাতুরী।

আমি একজনকে জানিতাম তিনি যখন কোন ব্যক্তিকে চিঠী লিখিতেন তখন প্রধান বিষয়টি পুনশ্চ পাঠে লিখিতেন, যেন তাহা অতি সামান্য বিষয়।

আর একটি লোকের সহিত আমার আলাপ ছিল। তিনি যখন কোন বিষয়ের উত্থাপন করিতেন তখন প্রধান বিষয়টির কোন কথা না কহিয়াই চলিয়া যাইতেন এবং যেন তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন, ভাণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন এবং তখন অভিলষিত বিষয়ের প্রস্তাব করিতেন।

এরূপ কতকগুলি লোক আছে যে তাহারা যাহাকে ঠকাইতে ইচ্ছা করে সে যে সময় আসিবে সেই সময় কোন চিঠী হাতে করিয়া বসিয়া থাকে বা যে কাজ সচরাচর করে না তাহাই করিতে থাকে। সে উপস্থিত হইলে যেন ধরাই পড়িল আপনাদিগকে এরূপ দেখায়। ইহার উদ্দেশ্য এই যে আগন্তুক ব্যক্তি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করে সুতরাং অগত্যাই যেন তাহার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে হয়; কিন্তু উহার প্রকাশ করাই তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

কেহ কেহ কথা প্রসঙ্গে আপন নাম দিয়াই কোন বিষয়ের উত্থাপন করে। অন্যে তাহা শুনিয়া মনে করিয়া রাখে এবং যখন সে আপন নাম দিয়া উহা প্রচার করে তখন প্রথমোক্ত ব্যক্তি তদ্দ্বারা আপন উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লয়। এটি একটি বড় ছোট খাট চাতুরী নয়। আমি জানি এলিজাবেথের সময় দুই ব্যক্তি সেক্রেটরী পদের প্রার্থী ছিলেন তাঁহাদের পরস্পর সদ্ভাবও ছিল এবং ঐ বিষয় লইয়া কথোপকথনও চলিত। উহারই মধ্যে একজন এক দিবস বলিলেন রাজ্যের পতনাবস্থায় সেক্রেটরী হওয়া মঙ্গলের নহে, অতএব তিনি ঐ পদ ভাল বাসেন না। সে কথা তৎক্ষণাৎই অপর ব্যক্তির মনে ধরিয়া গেল। সে আপন পরিচিত ব্যক্তিদিগের নিকট রাজ্যের ভগ্নাবস্থায় মন্ত্রী হওয়া তাহার ইচ্ছা নয় ইহা বলিয়া বেড়াইল তখন প্রথমোক্ত ব্যক্তি ইহা ধরিয়া বসিল এবং কোন সূত্রে মহারাণীর গোচর করিয়া দিল। তিনি রাজ্যের ভগ্নাবস্থার কথা শুনিয়া এত বিরক্ত হইলেন যে তাহার পর ঐ ব্যক্তির কোন প্রার্থনাই গ্রাহ্য করিলেন না।

আর একরূপ চাতুরী আছে যাহাকে ইংলণ্ডের লোক "তাওয়ায় রুটী উল্টান" কহে। উহা এই—কেহ কেহ অন্যের নিকট কোন কথা উত্থাপন করিবার সময় অপর ব্যক্তি যেন পূর্ব্বে উহাকে ঐ কথা বলিয়াছিল এইরূপ ভাণ করিয়া উহার প্রস্তাব করিয়া থাকে। যখন এইরূপ কথা কেবল দুই জনের মধ্যে ঘটিয়া থাকে তখন কে তাহার অগ্রে উত্থাপন করিয়াছে তাহার নিশ্চয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

ইহাও এক প্রকার চাতুরী যে কেহ কেহ "শর্ম্মা এরূপ কাজে হাত দেন না, এইরূপ অভাব পক্ষ দ্বারা আপনাকে নির্দ্দোষী করে, এবং ভঙ্গীক্রমে অন্যের উপর সেই দোষ ফেলিয়া দেয়। টিগেলিনাস বর্হস্-এর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহার হৃদয়ে নানাবিধ আশা ভরসা নাই। কেবল সম্রাটের কোন বিপদ না ঘটে ইহাই তাঁহার বাঞ্ছা।

কতকগুলি লোকের এত গল্প উপস্থিত আছে যে, কোন বিষয়ে কাহাকে লওয়াইতে হইলে তাহা কোন না কোন গল্পের মধ্যে নিবেশিত করিয়া দেয়। ইহাতে তাহারা নিজে সতর্ক হইয়া থাকে কিন্তু অন্যে উহা সন্তোষের সহিত গ্রহণ করে।

আপনার বাক্য দ্বারাই আপন প্রশ্নের উত্তর লওয়া একটি সুন্দর চাতুরী। যে হেতু ইহাতে উত্তরদাতার অনেক ক্লেশ নিবারণ হয়।

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কেহ কেহ আপন বক্তব্যটি প্রকাশ করিবার প্রকৃত অবসর পাইবার আশায় কত অধিক কাল ক্ষেপ করে, তাহাকে কতপ্রকার ঘোর ফের করিয়া উহার উত্থাপন করিতে হয় এবং প্রকৃত কথার নিকট আসিবার জন্য কত অনর্থক বিষয়ের প্রস্তাব করিতে হয়। ইহা যথেষ্ট সহিষ্ণুতার ফল; কিন্তু ইহাতে অনেক কাজ হয়। তৎকালে যেরূপ প্রশ্নের কোন কথাই নাই হঠাৎ সেরূপ প্রশ্ন করিলে যাহার নিকট প্রশ্ন করা যায় সে অনেক সময়ে চমকিয়া উঠে এবং মনের ভাবও গোপন করিতে পারে না। দেখ যদি কোন ব্যক্তি আপন নাম গোপন করিয়া অন্য নামে কোন স্থানে বিখ্যাত হয় আর সেই স্থানে যদি কেহ অন্যকে উদ্দেশ করিয়াও তাহার প্রকৃত নাম উচ্চারণ করে সে তৎক্ষণাৎই চমকিয়া উঠে ও ফিরিয়া চায়।

এইরূপ চাতুরী অনেক আছে, সে গুলির সীমা করা দুঃসাধ্য; কিন্তু এগুলির একটি ফর্দ্দ করিয়া রাখা ভাল; কারণ চতুর লোক বিজ্ঞ বলিয়া চলিত হইলে রাজ্যের যত অনিষ্ট হয় এমত আর কিছুতেই হয় না।

কতকগুলি লোক আছে তাহারা কেবল কার্য্যের উৎপত্তি ও অবসান মাত্র জানে। কার্য্য প্রবাহ মধ্যে নিমগ্ন হইতে পারে না। কোন একটি বাটীর সিঁড়ী এবং ফটক অতি উৎকৃষ্ট কিন্তু সুন্দর কুঠারী একটিও নাই। এই সকল লোকও সেইরূপ। তুমি দেখিবে উহারা অন্যের সিদ্ধান্তে অনায়াসেই দোষ দিবে কিন্তু সেই বিষয় সমালোচনা বা তাহার উপর তর্ক বিতর্ক করিতে পারিবে না। অনেক সময়ে উহাদের অপারকতাই সুবিধা করিয়া দেয় এবং উহারা পথপ্রদর্শক বলিয়াও বিবেচিত হয়। কেহ কেহ অন্যকে প্রতারিত করিয়া আপন প্রতিপত্তি লাভ করে। তাহারা আপনার কার্য্য-কৌশল কিছুই দেখাইতে পারে না কেবল পরপ্রতারণামাত্র সার হয়। সলেমন বলিয়াছেন "বিজ্ঞ ব্যক্তি আপন পায়ের দিকে নজর রাখিয়া চলেন কিন্তু মুর্খেরা কূট পথের দিকেই ধাবমান হয়।"

নিসর্গসন্দর্শন।

প্রথম সর্গ, — চিন্তা।

'Nor hope, * * * * *
Nor peace nor calm around."

শেলি।

হায় আমি এ কোথায় এলেম এখন !
ছিলেম কি এত দিন ঘুমের ঘোরেতে ?
হেরিনু কি সে সকল কেবল স্বপন ?
নেই ফিরে আর সেই সুখের লোকেতে !

২

সেই সূর্য্য আলোকোরে রয়েছে ধরণী,
সেই সৌদামিনী খেলে নীরদ মালায়,
কল কল কোরে বহে সেই সুরধনী,
কিন্তু সেই সুখ এরা দেয়্ না আমায়।

৩

সেই তো মানুষ সব কাতারে কাতার,
চলেছে স্রোতের মত মোর চারি ভিতে.
কিন্তু সে সরল ভাব নাহি দেখি আর,
গরল গরজে যেন ইহাদের চিতে।

প্রথম যৌবন কাল বসন্ত উদয়,
কেমন প্রফুল্ল রয় হৃদয় তখন !
বোধ হয় মধুর সরল সমুদয়,
হায় সে সুখের কাল রহে অল্প ক্ষণ !

৫

ক্রমেই যাইছে বেড়ে নিদাঘের জ্বালা,
যে দিকে ফিরিয়ে চাই সব ছারখার,
সংসার ঝাঁপরে প'ড়ে সদা ঝালাপালা,
কি করি কোথায় যাই ঠিক নাই তার।

৬

দুই গতি আছে এই কুটিল সংসারে ;
হয় তুমি তেজোমান দিয়ে বলিদান,
পড়গে কোমর বেঁধে টাকার বাজারে ;
নয় ব'সে ঘরে পরে হও অপমান।

৭

হাধিক্ হাধিক্ ! আমি সবনা কখন,
অপদার্থ অসারের মুখবেঁকা লাথি,
করে প্রিয় পরিবার করুক্ ক্রন্দন,
শুনে যদি ফেটে যায় ফেটে যাক্ ছাতি।

৮

আশেপাশে উপহাসে কিবা আসে যায়,
ছিন্নেয় ছিন্নেমো করে স্বভাব তাহার ;
সফরী গণ্ডূষ জলে ফর্ফরি বেড়ায়,
তা হেরে কেবল হয় করুণা সঞ্চার।

[illegible]

বাস্তবিক যে সময় প্রিয় পরিজনে,
উদর অন্নের তরে হবে লালায়িত,
মুখ পানে চেয়ে রবে সজল নয়নে ;
সে সময়ে ধৈর্য্য কি হবে না বিচলিত ?

* এই কাব্যের তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ ১২৭০ সালে, প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ ১২৭২ সালে, এবং পঞ্চম সর্গ ১২৭৪ সালে রচিত হয়। ইহার অধিকাংশ অবোধবন্ধুর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত হইয়াছিল।

১০

তবে কি তাদের তরে আমি এই বেলা,
ধর্ম্ম কর্ম্ম রেখে দিয়ে তুলিয়ে শিকায়,
সুখের সর্ব্বস্ব ধন ভেসে ক'রে হেলা,
গোলে হরিবোল দিব মিশিয়া মেলায়?

১১

সেই উপাদানে কিগো আমার নির্ম্মাণ!
তবে কেন তা করিতে মন নাহি সরে?
আপনা আপনি কেন কেঁদে ওঠে প্রাণ?
কে যেন বারণ করে মনের ভিতরে!

১২

অয়ি সরস্বতী দেবী! ছেলেবেলা থেকে,
তব অনুরক্ত ভক্ত আমি চিরকাল;
ভুলিবনা কমলার কাম রূপ দেখে;
ভুগিতে প্রস্তুত আছি যেমন কপাল।

১৩

বাজাও তোমার সেই বিমোহিনী বীণা!
শুনিয়ে জুড়াক্ মোর তাপিত হৃদয়,
জুড়াবার কে আমার আছে তোমা বিনা,
তোমা বিনা ত্রিভুবন মরু বোধ হয়।

১৪

তব বীণা-বিগলিত অমৃত লহরী,
আর কি খেলিবে এই পরাধীন দেশে!
আর কি পোহাবে এই ঘোরা বিভাবরী!
আর কি সে শুভদিন দেখা দিবে এসে!

১৫

যখন জনমভূমি ছিলেম স্বাধীন,
কেমন উজ্জ্বল ছিল তাঁহার বদন!
এখন হয়েছে মা'র সে মুখ মলিন!
মন-দুখে পরেছেন তিমির বসন!

১৬

হায়, জননীর হেন বিষণ্ন দশায়,
কভু কি প্রফুল্ল রয় সন্তানের মন?
যেমন বিদ্যুৎ খেলে মেঘের মালায়,
বিমর্ষ মেজাজে বুদ্ধি খেলে কি তেমন?

১৭

অধীনতা পিঞ্জরেতে পোরা যেই লোক,
এক রত্তি জায়গায় সদা বাঁধা থাকে,
প্রতিভা কি তার মনে প্রকাশে আলোক?
পাশ না ফিরিতে চারি দিকে খোঁচা ঠ্যাকে।

১৮

স্বাধীন দেশের লোক, স্বাধীন অন্তর,
অবাধে ছুটায়ে দেয় বুদ্ধি আপনার,
ঘরে বোসে তোল্‌পাড়্ করে চরাচর,
যে বাধা বিষম বাধা, তা নাই তাহার।

১৯

এ দেশেতে বুদ্ধিমান্ যাঁহারা জন্মান্,
তাঁরাই পড়েন এসে বিষম বিপদে;
নাই হেথা তেমন ফালাও রঙ্গস্থান,
তিমি কি তিষ্ঠিতে পারে সুড়িখাড়ি নদে?

২০

রাজতন্ত্রের স্থিরতর শান্তির সময়,
রণপ্রিয় সেনা যদি শুধু বোসে থাকে,
বোসে বোসে মেতে উঠে ঘটায় প্রলয়,
আপনারা খুন্ করে আপন রাজাকে।

২১

তেমনি তেজাল বুদ্ধি না পেলে খোরাক্,
শুমে শুমে ঘোলে ঘোলে ঘাঁকে একেবারে;
যাঁর বুদ্ধি তাঁহাকেই ক'রে ফেলে খাক্;
বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই মারে।

২২

অহো সে সময় তাঁর ভাব ভয়ঙ্কর !
বিষণ্ণ গম্ভীর মূর্ত্তি, বিভ্রান্ত, উদাস,
কি যেন হইয়া গেছে মনের ভিতর,
বাদলে আবিল যেন উজ্জ্বল আকাশ।

২৩

নয়ন রয়েছে স্থির পৃথিবীর পানে,
তেমন উদার জ্যোতি আর তার নাই,
চট্‌কা ভেঙে ভেঙে পড়ে এখানে ওখানে,
সদা যেন জাগে মনে পালাই পালাই।

২৪

হা দুর্ভাগা দেশ ! তব যে সব সন্তান,
উজ্জ্বল করিবে মুখ প্রতিভা-প্রভায়,
বেঘোরে তাঁহারা যদি হারান্ পরাণ,
জানিনে কি হবে তবে তোমার দশায় !

২৫

যে অবধি স্বপনের মায়াময়ী পুরী,
ছেড়ে এসে পড়েছি যথার্থ লোকালয়ে,
সে অবধি আমার সন্তোষ গেছে চুরী,
সদা এক তীক্ষ্ণ জ্বালা জ্বলিছে হৃদয়ে।

২৬

উথলিছে ভয়ানক চিন্তা পারাবার,
তরঙ্গের তোড়ে পোড়ে যত দূর যাই,
আঁধার আঁধার তত কেবল আঁধার,
ধাঁদায় কানার মত কুল হাতড়াই।

ইতি নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে চিন্তা
নামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

সমুদ্রদর্শন।

"বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়-
মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা।"
কালিদাস।

১

একি এ, প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্মুখে আমার !
অসীম আকাশ প্রায় নীল জল-রাশি ;
ভয়ানক তোল্‌পাড় করে অনিবার,
মুহূর্ত্তেকে যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি।

২

আগু পাছু কোটি কোটি কি কল্লোল-মালা !
প্রকাণ্ড পর্ব্বত সব যেন ছুটে আসে :
উঃ কি প্রচণ্ড রাব ! কাণে লাগে তালা,
প্রলয়ের মেঘ যেন গরজে আকাশে।

৩

তুলার বস্তার মত ফেনা রাশি রাশি,
তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ধায় ;
রাশি রাশি শাদা মেঘ নীলাম্বরে ভাসি,
ঝড়ের সঙ্গেতে যেন ছুটিয়া বেড়ায়।

৪

সমীরণ এমন কোথাও হেরি নাই,
ঝরঝর নিরন্তর লাগে বুকে মুখে ;
ব্রহ্মাণ্ডের বায়ু যেন হয়ে একঠাঁই,
ক্রমাগত আসে আজি মম অভিমুখে।

উড়িতেছে ফেনা সব বাতাসের ভরে,
ঝকুঝোকে বড় বড় আয়নার মতন ;
আহা মরি ও সবার ভিতরে ভিতরে,
এক এক ইন্দ্রধনু সেজেছে কেমন !

৬

যেন এরা সসম্ভ্রমে শূন্যে বেড়াইয়া,
দেখিতেছে জলধির তুমুল তাড়ন ;
যেন সব সুরনারী বিমানে চাপিয়া,
ভয়ে ভয়ে হেরিছেন দেবাসুর-রণ।

৭

ফরফর-নিশান চলেছে পোতশ্রেণী,
টলমল ঢলঢল, তরঙ্গ দোলায় ;
হাসিমুখী পরী সব আলুথালু বেণী,
নাচন্ত ঘোড়ায় চ'ড়ে যেন ছুটে যায়।

৮

আপনার মনে ওহে উদার সাগর !
গড়ায়ে গড়ায়ে তুমি চলেছ সদাই ;
প্রাণীদের কলরবে পোরা চরাচর,
কিন্তু তব কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই।

৯

আহা সদাশয় সাধু উদার অন্তরে,
থাকেন আপন ভাবে আপনি মগন !
জনতার কলকলে তাঁহার কি করে ?
প্রয়োজন জগতের মঙ্গল সাধন।

১০

কেন তুমি পূর্ণিমার পূর্ণ সুধাকরে,
হেরে যেন হয়ে পড় বিহ্বলের প্রায়,
কেঁপে ওঠে কলেবর কোন্ রসভরে,
হৃদয় উথুলে কেন চারিদিকে ধায় ?

১১

অথবা কেনই আমি সুধাই তোমায়,
কার্ না অমন হয় প্রিয় দরশনে ;
ভালবাসা এ জগতে কারে না মাতায়,
সুখের সামগ্রী হেন কি আছে ভুবনে !

১২

যখন পূর্ণিমা আসি হাসি হাসি মুখে,
উথল হৃদয় পরে দেয় আলিঙ্গন ;
তখন তোমার আর সীমা নাই সুখে,
আহ্লাদে নাচিতে থাক খেপার মতন।

১৩

বড়ই মজার মিত্র পবন তোমার ;
তরঙ্গের সঙ্গে তার রঙ্গ নানা তর ;
গলা ধরাধরি করি ফিরি অনিবার,
ট'লে ট'লে চ'লে ঢ'লে খেলে মনোহর।

১৪

বেলার কুসুম বনে পশিয়ে কখন,
সর্ব্বাঙ্গ ভুর্ভুরে করে তার পরিমলে,
ভারে ভারে আনে ফুল চিকণ চিকণ,
আদরে পরায়ে দেয় তরঙ্গের গলে।

১৫

হয়তো হঠাৎ মেতে ওঠে ঘোরতর,
তরঙ্গের প্রতি ধায় অসুরের প্রায় ;
ভয়ানক দাঁপাদাঁপি করে পরস্পর ;
পরস্পর ঘোর ঘোষে বিশ্ব ফেটে যায়।

১৬

তব কোলাহলময় কল্লোলের মাঝে,
ছোট ছোট দ্বীপ সব বড় সুশোভন ;
যেন কলরব-পূর্ণ মানব-সমাজে,
আপনার ভাবে ভোর এক এক জন।

৪১

যতই তোমার ভাব ভাবি হে অন্তরে,
তুতই বিস্ময় রসে হই নিমগন ;
এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যাহার উপরে,
না জানি কি কাণ্ড আছে ভিতরে গোপন।

৪২

আজি যদি আসি সেই মুনি মহাবল,
সহসা সকল জল শোষেন চুম্বুকে ;
কি এক অসীমতর গভীর অতল,
আচম্বিতে দেখা দেয় আমার সমুখে !

৪৩

কি ঘোর গর্জ্জিয়া ওঠে প্রাণী লাখেলাখ !
কি বিষম ছট্‌ফট্ ধড়্‌ফড়্ করে !
হঠাৎ পৃথিবী যেন কাটিয়া দোফাঁক,
সমুদায় জীব জন্তু পড়েছে ভিতরে।

৪৪

কোলাহলে পুরেগেছে অখিল সংসার ;
জীবলোক দেবলোক চকিত স্থগিত ;
আর্ত্তনাদে হাহাকারে আকাশ বিদার,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন বেগে বিলোড়িত।

৪৫

আমি যেন কোন এক অপূর্ব্ব পর্ব্বতে,
উঠিয়া দাঁড়ায়ে আছি সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় ;
বালুময় ঢালুভাগ পদমূল হ'তে,
ক্রমাগত নেমে গিয়ে মিশেছে তলায়।

৪৬

ধুধু করে উপত্যকা অতল অপার,
অসংখ্য দানব যেন তাহার ভিতরে,
করিতেছে হুড়াহুড়ি ঘোর ধুন্ধুমার ;
মরীয়া হইয়া যেন নেতেছে সমরে।

৪৭

ফেরোগো ও পথ থেকে কল্পনা সুন্দরী,
ওই দেখ যাদকুল নিতান্ত আকুল,
ঠাঁয় মারা যায় ওরা মরুর উপরি,
হেরে কি অন্তর তব হয়নি ব্যাকুল ?

৪৮

সেই মহাজলরাশি আন তরা ক'রে,
ঢেকে দাও এই মহামরুর আকার ;
অমৃত বর্ষিয়া যাক্ ওদের উপরে ;
শান্তিতে শীতল হোক্ সকল সংসার !

৪৯

এই যে দাঁড়ায়ে পুন সেই কিনারায় !
বহিছে তরঙ্গ রঙ্গে সেই জল রাশি !
উদার সাগর দাও বিদায় আমায় !
আজিকার মত আমি আসি তবে আসি !!

ইতি নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে সমুদ্রদর্শন
নামক দ্বিতীয় সর্গ।

পৌলভঙ্গীনী।

এই সময়ে এক রাত্রিতে ভঙ্গীনীর পূর্ব্বোক্ত ব্যাধির উপদ্রব দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। এক বার শয়ন, আবার উপবেশন, পুনর্ব্বার শয়ন, মুহুর্মুহুঃ এইরূপ করিয়া তাহার নিদ্রাও হইল না, স্বাস্থ্য বোধও হইল না, তখন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আপন স্নানকুণ্ডে গমন করিল। তখন জ্যোৎস্নায় সেই স্থান ধবলময় হইয়াছিল, নির্ঝরটি তখনও শুষ্ক হয় নাই, পিঙ্গলবর্ণ উপলখণ্ডের উপর দিয়া তদীয় স্ফটিকসদৃশ স্বচ্ছ জলবেণী তখনও কুলকুল শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল ভঙ্গীনী তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ নিমগ্ন

করিল এবং সেই সুশীতল জলে তাহার দেহতাপ কিছু শান্ত হইল, সেই সময়ে তাহার মনে নানা কথাও উঠিতে লাগিল। সে ভাবিল যে, শৈশবে এই কুণ্ডেই জননীরা পৌলকে ও আমাকে একত্রে স্নান করাইতেন, পরে পৌল আমার মনোগত হইবে বলিয়া এই স্নানকুণ্ডটি প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে, এবং ইহার তলভাগ বালুকাময় করিয়াছে, এবং ধারে ধারে এই সকল সুগন্ধি পুষ্পতরু রোপণ করিয়াছে। ইহা ভাবিতে ভাবিতে দেখিল যে নিকটে যে দুটি নারিকেল তরু আপনার ও পৌলের জন্মসময়ে রোপিত হইয়াছিল, সে দুটির মস্তকস্থিত পল্লবজাল পরস্পর মিলিত হইয়াছে, এবং এই ভাবে জলে ইহাদের ছায়া পড়াতে বোধ হইতেছে, যেন তাহার নিজ বাহুতে ও বক্ষস্থলে বৃক্ষ দুটি সংলগ্ন হইয়া আছে। তখন ভর্জ্জীনীর মনে উদয় হইল, যে পৌলের স্নেহ কুসুমের সৌরভ অপেক্ষা মধুরতর, নির্ঝরের বারি অপেক্ষা নির্ম্মলতর, এবং ঐ দুটি তরুর স্কন্ধ অপেক্ষা স্থিরতর। ইহা মনে করিয়াই সে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। ক্ষণ কাল পরেই তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন বহ্নিশিখা প্রদীপ্ত হইল, তেমন সুশীতল জল উষ্ণ বোধ হইল। সেই বিবিক্ত স্থান যেন ভয়ানক হইয়া উঠিল, সেই সকল বৃক্ষের অন্ধকার যেন বিপদপূর্ণ মনে হইল। সে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক জননীর নিকট উপস্থিত হইল, জননীর করপল্লব আপন করকমলে ধারণ পূর্ব্বক, মনে করিল সকল বেদনা নিবেদন করি। কত বারই তাহার মুখ হইতে পৌলের নাম বাহির হইতে হইতে রহিয়া গেল, কিন্তু তাহার হৃদয় বেদনা দ্বারা এরূপ আক্রান্ত ছিল, যে জিহ্বা বাক্শক্তিহীন হইয়া গেল। সে একটি কথা কহিতে না পারিয়া শুদ্ধ অশ্রুজলে জননীর বক্ষ ভাসাইয়া দিল। বিবি দিলাতুর দুহিতার ভাব ভঙ্গিতে সকলই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কথা কহিতে পারিলেন না, কেবল মাত্র বলিলেন 'ভগবানকে স্মরণ কর, তিনিই আমাদের একমাত্র শরণ্য, তিনি এখন যে দুঃখ সহ্য করাইতেছেন, তাহা পরিণামে সুখ দিবার নিমিত্ত ব্যতীত আর কিছু নহে। এই মাত্র মনে রাখ, যে শুদ্ধ ধর্ম্ম আচরণ করিবার নিমিত্তই আমরা ধরণীতলে সংস্থাপিত হইয়াছি।'

ইতিমধ্যে একদা, কয়েক দিনের রৌদ্রে প্রভূত বাষ্পরাশি সমুদ্র হইতে আকাশে উঠিয়া, অতি বিশাল ছত্রের মত দ্বীপকে আবরণ করিল। পর্ব্বত সমূহের ধূমাবৃত শিখরদেশে এক এক বার বিদ্যুৎ দেখা যাইতে লাগিল এবং তদনন্তরই হৃদয়-কম্পী স্তনিতরবে বনান্ত মাঠ ও উপত্যকা আঘ্রাত হইতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরেই এরূপ মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, যেন বোধ হইল আকাশ হইতে স্রোত বহিয়া পড়িতেছে। পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ হইতে জলরাশি বহিয়া আসিয়া এই শৈলান্তরস্থ ভূখণ্ডকে সমুদ্রবৎ করিয়া তুলিল, কেবল দুইখানি ঘর দ্বীপের ন্যায় জাগিতে লাগিল। জলপ্রবাহ ভয়ানক গর্জ্জন করত গুহার মুখ দিয়া নির্গত হইতে লাগিল এবং তাহার সঙ্গে বৃহৎ বৃহৎ গণ্ডশৈল-উৎপাটিত মহীরুহ ঘোর বেগে ভাসিয়া আসিল। চারি দিক্ ফেনায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

পরিবারস্থ সকলে বিবি দিলাতুরের গৃহে আসীন হইয়া উৎকম্পা গাত্রে দেবতার নাম লইতে ছিলেন। গৃহের চাল খানি বায়ুভরে নমমান হইয়া একপ্রকার কর্কশ সংঘট্ট শব্দ উৎপাদন করিতেছিল। যদিও দ্বার ও বাতায়ন রুদ্ধই ছিল, তথাপি যখন শীঘ্র শীঘ্র বিদ্যুৎ হইতে লাগিল, তখন তদীয় অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি বৃতির ছিদ্র দ্বারা গৃহে প্রবেশ করাতে অভ্যন্তরস্থ সমুদয় বস্তু গুলি বেশ দেখা যাইতে লাগিল। পৌল ও দমিঙ্গ ঝটিকায় দৃক্পাত না করিয়া, এক কুটীর হইতে অন্য কুটীরে যাইয়া, কোথায় কি হইতেছে, দেখিতে

১৭

কোনটীতে নারিকেল তরু দলে দলে,
　হালীগেঁথে দাঁড়ায়েছে মাথায় মাথায় ;
তাহাদের মনোহর ছায়াময় তলে,
　ধবল ছাগল সব চরিয়া বেড়ায় ।

১৮

কারো পরে ঘেরে আছে ভয়ঙ্কর বন,
　করিছে শ্বাপদ সংঘ মহা কোলাহল ;
নিরন্তর ঝর্ ঝর্ নির্ঝর পতন,
　প্রতিশব্দে পরিপূর্ণ গগন মণ্ডল ।

১৯

কোনটির তীরভূমে জলস্থল জুড়ে,
　জাগিছে কঠোরমূর্ত্তি প্রকাণ্ড ভূধর ;
খাড়া হয়ে উঠেগেছে মেঘরাশি ফুঁড়ে,
　দাঁড়াইয়ে যেন কোন দৈত্য ভয়ঙ্কর ।

২০

কেহ যদি উঠি তার সূচাগ্র শিখরে,
　হেঁট হয়ে দেখে তব তুমুল ব্যাপার,
না জানি কি হয় তার মনের ভিতরে !
　কে এমন বীর, বুক নাহি কাঁপে যার ?

২১

কোনটি বা ফলফুলে অতি সুশোভন,
　নন্দন কানন যেন স্বর্গে শোভা পায় ;
সম্ভোগ করিতে কিন্তু নাহি লোক জন,
　বিধবা-যৌবন যেন বিফলেতে যায় !

২২

পর্য্যটক অগ্নিবৎ মরুভূমি মাঝে,
　বিষম বিপাকে প'ড়ে চারি দিকে চায়,
দূরে দূরে তরুময় ওয়েসিস্ সাজে,
　প্রাণ বাঁচাবার তরে ধেয়ে যায় তায় ।

২৩

তেমনি তোমার তোড়ে পড়িয়া যাহারা,
　পোতভগ্ন জলমগ্ন ব্যাকুল পরাণ ;
তরঙ্গের ঝাপটেতে ভয়ে জ্ঞানহারা ;
　তাদের এ সব দ্বীপ আশ্রয়ের স্থান ।

২৪

তোমারি হৃদয়ে রাজে ইংলণ্ড দ্বীপ,
　হরেছে জগত মন যাহার মাধুরী ;
শোভে যেন রক্ষকুল উজ্জ্বল প্রদীপ
　রাবণের মোহিনী কনক লঙ্কাপুরী ।

২৫

এ দেশেতে রঘুবীর বেঁচে নাই আর,
　তাঁর তেজোলক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে তিরোহিতা !
কপটে অনাসে এসে রাক্ষস দুর্ব্বার,
　হরিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা সীতা ।

২৬

হা হা মাত, আমরা অসার কুসন্তান,
　কোন্ প্রাণে ভুলে আছি তোমার যন্ত্রণা !
শত্রুগণ ঘেরে সদা করে অপমান,
　বিষাদে মলিনমুখী সজলনয়না !

২৭

যেন তুমি তপোবন-বাসিনী হরিণী,
　দৈবাৎ পড়েছ গিয়ে ব্যাঘ্রের চাতরে,
ধুক্ ধুক্ করে বুক, থরথর প্রাণী,
　সতত মনেতে ত্রাস কখন্ কি করে ।

২৮

দাঁড়ায়ে তোমার তটে হে মহাজলধি,
　গাহিতে তোমার গান, এল একি গান ;
যে জ্বালা অন্তর মাঝে জ্বলে নিরবধি,
　কথায় কথায় প্রায় হয় দীপ্যমান্ ।

২৯

গড়াও গড়াও তুমি আপনার মনে !
কাজ নাই শুনে এই গীত খেদময়,
তোমার উদার রূপ হেরিয়ে নয়নে,
জুড়াক্ এ অভাগার তাপিত হৃদয় !

৩০

ধরাধামে তব সম কেহ নাহি পারে,
বিস্ময় আনন্দ রসে আলোড়িতে মন ;
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে তোমার ভাণ্ডারে,
নিসর্গের তুমি এক বিচিত্র দর্পণ।

৩১

কোথাও ধবলাকার কেবল বরফ,
কোথাও তিমিরময় দেদার আঁধার,
কোথাও জলন-জ্বালা জ্বলে দপ্ দপ্,
সকল স্থানেই তুমি অনন্ত অপার।

৩২

কলের জাহাজে চোড়ে মানব সকলে,
দম্ভ ভরে চোকে আর দেখিতে না পায় ;
মনে করে তোমারে এনেছে করতলে,
যা খুশি করিতে পারে, কিছু না ডরায়।

৩৩

কিন্তু তব ভ্রূক্ষেপের ভর নাহি সয় ;
একমাত্র অবজ্ঞার কটাক্ষ ইঙ্গিতে,
একেবারে ত্রিভুবন হেরে শূন্যময়,
কাত্ হয়ে শুয়ে পড়ে জাহাজ সহিতে।

৩৪

চতুর্দ্দিকে তরঙ্গের মহা কোলাহলে,
ওঠে মাত্র আর্ত্তনাদ দুই এক বার ;
যেমন ঝড়ের সঙ্গে ওঠে বনস্থলে,
ভয়াকুল কুমারীর কাতর চিৎকার !

৩৫

দুই এক বার মাত্র ভুড়্ ভুড়্ করে,
মুহূর্ত্তে মিলায়ে যায় বুদ্বুদের প্রায় ;
মাটির পুতুল চোড়ে ভেলার উপরে,
জনমের মত হায় রসাতলে যায় !

৩৬

পুরাকালে তব তটে কত কত দেশ,
ঐশ্বর্য্য কিরণে বিশ্ব কোরেছিল আলো ;
যেমন এখন পরি মনোহর বেশ,
কত দেশ বেলাভূমে সেজে আছে ভাল।

৩৭

দেবের দুর্লভ লঙ্কা, ভূস্বর্গ দ্বারকা,
কালের দুর্জ্জয় যুদ্ধে হয়েছে নিধন ;
আলো কোরে ছিল রাত্রে যে সব তারকা,
ক্রমে ক্রমে নিবে তারা গিয়েছে এখন।

৩৮

কিন্তু সেই সর্ব্বজয়ী মহাবল কাল,
যার নামে চরাচর কাঁপে থরহরি ;
আপনার জয়চিহ্ন, যুঝে চিরকাল
দাগিতে পারেনি তব ললাট উপরি।

৩৯

সত্যযুগে আদি মনু যেমন তোমায়
হেরেছেন, হেরিতেছি আমিও তেমন ;
কাল তব সঙ্গে শুধু গড়ায়ে বেড়ায়,
জাহির করিতে নারে বিক্রম আপন।

৪০

না জানি ঝড়ের কালে হে মহাসাগর,
কর যে কি ভয়ানক আকার ধারণ !
প্রলয়-প্রকুপ্ত সেই মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
ভেবে বিচলিত প্রায় হইতেছে মন।

করিল, তাহা শুনিয়া অতি চমৎকৃত হই-লাম। সে কহিল 'কেন বলুন দেখি অনিশ্চিত ধনের নিমিত্ত পরিবার ছাড়িয়া যাইব। কৃষি অপেক্ষা ভাল বাণিজ্যই বা কি আছে? আর কোন্ ব্যবসাতে পঞ্চাশ গুণ — কখন কখন শত গুণ পর্য্যন্ত — লাভ হইয়া থাকে? ব্যবসা যদি না করিলেই নয়, তবে কি ভারতে না গিয়া ব্যবসা হয় না? চাষের জিনিসে ঘর খরচ হইয়া যাহা উদ্বর্ত্ত হয়, তাহা শহরে গিয়া বেচিয়া এলে কি ব্যবসা করা হয় না? জননীরা বলেন দমিঙ্গ বৃদ্ধ হইয়াছে, কৃষিকর্ম্ম চালায় কে? ভাল, আমি তো আর বৃদ্ধ নহি, আমার তো দিন দিন বলবৃদ্ধিই হইতেছে, তবে ভাবনাটা কি? আমি না থাকিলে যদি কাহারও কোন ব্যারাম হয়, তবে কি হইবে? কে তদারক করিবে? একে তো ভর্জ্জীনীর শরীরটি কেমন কেমন হইয়াছে? আপনি বলেন কি? এমন সময়ে আমি কিনিশ্চিন্ত হইয়া ভারতে যাইতে পারি? না মহাশয়, তাহা কখনই হইবে না, আমি কখনই যাইতে পারিব না।'

উত্তর শুনিয়া আমি বিভ্রাটে পড়িলাম। ভর্জ্জীনীর অবস্থা সবিশেষ অবগত ছিলাম, আরও জানিতাম যে বিবি দিলাতুরের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে, এই সময়ে দুজনে কিছু দিনের নিমিত্ত পৃথক হইয়া থাকে এবং দুজনেরই বয়ঃক্রম কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু পোলের নিকট সে সকল বিষয়ের গন্ধও তুলিলাম না।

কিয়দ্দিন মধ্যে ফ্রান্স হইতে এক জাহাজ আসাতে বিবি দিলাতুরের নামে তাঁহার পিতৃস্বসার প্রেরিত এক পত্র উপস্থিত হইল। মরণকাল নিকটবর্ত্তী না হইলে কঠোর চিত্ত কখন কোমল হয় না। তাঁহার পিতৃস্বসা ইতি পূর্ব্বে এক উৎকট রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইয়া কিছু হতগর্ব্ব হইয়া ছিলেন, এই নিমিত্তই ঐ পত্রে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। তাহাতে লেখা ছিল যে, তুমি ফ্রান্সে প্রত্যাগমন কর। যদি এত দূরদেশে জল যাত্রা করিতে তোমার শরীর অপটু হয়, তবে কন্যাটিকে অবশ্যই পাঠাইবে, কারণ আমার ইচ্ছা যে তাহাকে এখানে রাখিয়া রীতিমত শিক্ষা দি, কোন মর্য্যাদাপন্ন বংশে বিবাহ দিয়া দি, এবং তুমি স্বৈরিণী হইয়া যে অতুল বিভবে বঞ্চিত হইয়াছ, তাহা তোমার কন্যাকেই লিখিয়া দিয়া যাই। কিন্তু ফ্রান্সে তাহার আসা চাই, তা নহিলে কিছুই করিব না।

পত্রার্থ অবগত হইয়া সকলেই বিষাদ সাগরে মগ্ন হইল। দমিঙ্গ ও মেরী রোদন আরম্ভ করিল, পোল নিশ্চেষ্ট থাকিয়া রাগতভাব ধারণ করিল, ভর্জ্জীনী মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক স্থির নয়নে জননীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল, মার্গারেট্ বিবি দিলাতুরকে সম্বোধিয়া কহিলেন 'ভাল, প্রিয় সখি! এত দিন সংসারে আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে তোমার কি মন সরিবে? বিবি দিলাতুর উত্তর করিলেন 'না সখি! না বাছারা! আমি তোদের ছাড়িয়া কখনই যাইব না। তোমাদের সকট জীবন কাটাইলাম, তোমাদের নিকটেই প্রাণত্যাগ করিব। আমার যাহা কিছু সুখ ভোগ, এ তোমাদের সংসর্গেই হইয়াছে। এ দেশে আসিবার পর আমার শরীর পড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা দেশের দোষে নহে। মনস্তাপই তাহার যথার্থ কারণ, স্বামীর মৃত্যু এবং স্বজনের দুর্ব্যবহার এই দুই কারণেই আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জন্মভূমিতে পিতৃকুলের অতুল ঐশ্বর্য্য হইতে আমার যাহা হয় নাই, এখানে তোমাদের নিকটে থাকিয়া আমার সেই সুখ ও শান্তি লাভ হইয়াছে। ইহা কি আমি ভুলিতে পারিব?'

এই বাক্য সকলের চক্ষে আনন্দাশ্রু উদয় করিল। পোল স্নেহভরে বিবি দিলাতুরের হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিল জননি, আমিও তোমায় ছাড়িয়া ভারতবর্ষে যাইব না।

আমরা সকলে মিলিয়া পরিশ্রম করিব তাহা হইলে তোমার কি কিছু অপ্রতুল হইতে পারিবে? ভর্জ্জীনী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হৃষ্ট হইয়াও মুখে তত জানাইল না। তথাপি সে দিন তাহার মুখমণ্ডলে মনোরম প্রফুল্ল ভাব বিসারিত থাকিল এবং তাহার চিত্তখেদ অপগত দেখিয়া আর সকলের আনন্দ উথলিয়া উঠিল।

পর দিন প্রভাতে সকলে মিলিয়া প্রাতর্ভোজনকালীন ঈশ্বরস্তোত্র পড়িতেছেন, এমত সময়ে দমিঙ্গ আসিয়া খবর দিল যে, দুই কৃষ্ণদাসের আগে আগে এক জন অশ্বারোহী পুরুষ গৃহাভিমুখে আসিতেছেন। দমিঙ্গের এই কথা শেষ হইবামাত্র দ্বীপের গবর্ণর লাবুর্দনে সাহেব কুটীরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে সকলে ভোজনে বসিতে ছিল। এবং ভর্জ্জীনী এদেশের রীতি অনুসারে অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশনে ব্যাপৃত ছিল। শাসনকর্ত্তা দেখিলেন যে, আর আর খাদ্যের মধ্যে গুটীকত আলুসিদ্ধ ও অপক্ক কদলীফল রহিয়াছে। নারিকেলের খোলা ভিন্ন অন্য কোন ভোজনপাত্র ছিল না এবং কদলীদল দ্বারা সংস্করণের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে ছিল। শাসনকর্ত্তা এরূপ দারিদ্র্য দেখিয়া প্রথমে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। পরে বিবি দিলাতুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'কার্য্যান্তর ব্যাসক্তি বশত আমি এত কাল আপনার প্রতি কোন অবধান অর্পণ করি নাই। রাজকার্য্যের সম্বাধ থাকিলে প্রায় বিশেষ বিশেষ লোকের প্রতি পৃথক্ পৃথক্ আদর অভ্যর্থনা করা হয় না। এই নিমিত্তই আমি এতদিন জানিতে পারি নাই যে, আপনি আমার অবধানের অতি উপযুক্ত পাত্রী, ফ্রান্সে আপনার এক আঢ্যা পিতৃস্বসা আছেন, তিনি আপনাকে নিজ সমীপে যাইতে লিখিয়াছেন। তাঁহার বাঞ্ছা যে, আপনাকে উত্তরাধিকারিণী করেন। বিবি দিলাতুর নিবেদন করিলেন যে স্বীয় শরীরের অপটুতা বশত তাঁহার তত দূর যাওয়া ঘটিবে না। তখন শাসনকর্ত্তা কহিলেন 'ভাল, আপনি যেন পারিবেন না। কিন্তু এই সুন্দরী নবকুমারীকে সে অতুল বিভবে বঞ্চিত করিলে তো বড় অন্যায় কাজ হয়। এ স্থলে আমার ইহাও বলা আবশ্যক যে, ফ্রান্সের কর্ত্তৃপক্ষেরা আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতে আজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে যেমন প্রকারে হউক, আপনাদের এক জনকে তথায় যাইতে হইবে। এ নিমিত্ত রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাও আমাকে করিতে হইবে অত্রত্য অধিবাসিবর্গের হিতবর্দ্ধন করাই আমার কর্ম্মের মুখ্য তাৎপর্য্য, এনিমিত্ত আমি নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কখন রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করি না। বোধ করি কতিপয় বৎসরের নিমিত্ত দুহিতাকে চক্ষের অন্তর করিতে আপনার বলবতী অনিচ্ছা হইবে না, কারণ ইটি না করিলে তাদৃশ অতুল ঐশ্বর্য্য হস্তবহির্ভূত হয়। লোকে ধনের নিমিত্তই উপনিবেশে থাকে, যাহার গৃহে ধন সঞ্চিত আছে, তাহার এ দেশে থাকিয়া কি প্রয়োজন। এই বলিয়া আপনার অনুচর এক জন কৃষ্ণকায়কে একথলি মুদ্রা ভোজপীঠে রাখিতে কহিয়া বলিলেন 'দেখুন যাইবার ব্যয়নির্ব্বাহার্থে এই আসিয়াছে।

পরে, বিবি দিলাতুর এত দিন যাইয়া তাঁহাকে আত্মদুঃখ নিবেদন করেন নাই, তাঁহাকে দুচারি মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। পৌল কহিলেন 'মহাশয়, মা তো এক বার আপনার নিকট গিয়াছিলেন। কিন্তু আপনি তাহার সমুচিত সমাদর করেন নাই।

শাসনকর্ত্তা পৌলের কথায় কিছু উত্তর না দিয়া বিবি দুলাতুরকে জিজ্ঞাসিলেন আপনার কি দুই সন্তান?' বিবি দিলাতুর উত্তর দিলেন, না মহাশয়, উটি আমার সখীর পুত্র। কিন্তু দুটিই আমাদের সাধারণ ধন এবং সমান স্নেহ ভাজন।' তখন

লাগিল, এবং যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেই স্থানে সেইরূপ প্রতিবিধান করিয়া গৃহ রক্ষা করিল। যত ক্ষণ না ঝঞ্ঝা শেষ হইল, তত ক্ষণ তাহারা এই রূপেই ব্যাপৃত রহিল। পরে বৃষ্টি ধরিবার চিহ্ন দেখিয়া বিবি দিলাতুরের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সকলকে আশ্বাস প্রদান করিল। ফলে, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বৃষ্টি ধরিয়া গেল, বায়বী দিশার বায়ু উঠিয়া সব মেঘ উড়াইয়া দিল, এবং অস্তগমন সময়ে মেঘাদিশূন্য পরিষ্কার দিগন্ত ভাগে লম্বমান সূর্য্যমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হইল।

এই বিষম বৃষ্টি দ্বারা আপনার নিকুঞ্জের দশা কিরূপ হইয়াছে তাহা দেখিতেই ভর্জ্জীনীর সর্ব্বাগ্রে ইচ্ছা হইল। পৌল কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ভাবে ভর্জ্জীনীর নিকট গিয়া আপন হস্তাবলম্ব প্রদান করিতে চাহিল। ভর্জ্জীনী স্মিতমুখে ভ্রাতার হস্ত অবলম্বন পূর্ব্বক কুটীর হইতে নির্গত হইল। তৎকালে সুশীতল সমীরণ সশব্দে বহিতেছিল, চারি দিক্ হইতে জল গড়াইতে ছিল এবং শৈলের শীর্ষদেশে জলের ফেন এবং শুভ্র বাষ্পরাশি উষ্ণীষবৎ হইয়াছিল। তাহাদের বৃক্ষবাটিকার তলভাগে অনেক রন্ধ্র উৎপন্ন হইয়াছিল, অনেক ফলতরু উন্মূলিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং বিশাল সিকতাস্তূপে ভর্জ্জীনীর নির্ঝর কুণ্ড পূর্ণ ও ক্ষেত্রভূমি আচ্ছাদিত হইয়াছিল। নারিকেল বৃক্ষ দুটি সজীব এবং দণ্ডায়মান ছিল, কিন্তু শাদ্বল বা নিকুঞ্জ বা বিহঙ্গনগণের চিহ্ন মাত্র দেখা গেল না, কেবল মাত্র কতিপয় কোকিল সন্নিহিত গিরিকোটিতে উপবিষ্ট হইয়া দুঃখময় গীত দ্বারা বাত্যানিহত শাবকের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছিল।

ঈদৃশ ধ্বংস দশা অবলোকন পূর্ব্বক ভর্জ্জীনী ভ্রাতাকে কহিল 'তুমি এই স্থানে যে সকল বিহঙ্গম আনিয়াছিলে, বাত্যা তাহাদিগকে বিনাশ করিল, তুমি উপবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলে তাহা বিধ্বস্ত হইল। হায়, পৃথিবীর সকল বস্তুই বিনাশী, স্বর্গেই কেবল পরিবর্ত্ত নাই।' পৌল কহিল 'হায়রে! কোন স্বর্গীয় বস্তু দিয়া তোমার সন্তোষ সাধন করি এমন ক্ষমতা আমার হইল না। অথবা, আমি যেরূপ অকিঞ্চন, পৃথিবীতেই বা আমার কি আছে। ভর্জ্জীনী ঈষৎ লজ্জিত ভাবে কহিল 'ভাই, সেই পৌল মুনির চিত্র খানিতো তোমারই।' এই কথা শুনিয়াই পৌল চিত্র আনিবার নিমিত্ত জননার গৃহে দৌড়িয়া গেল। ভর্জ্জীনী যে চিত্র খানির কথা কহিল সে খানিতে পৌল মুনির * এক ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। মার্গারেট্ শৈশবে এই ছবি খানি কণ্ঠে ধারণ করিতেন। যখন বিদেশে একাকিনী সগর্ভাবস্থায় বাস করেন, তখন ঐ চিত্রখানি দ্বারা তাঁহার বিনোদন হইত। তিনি সর্ব্বদাই পৌল মুনির চরিত্র বিষয়ে চিন্তা করিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহার সন্তানের মুখশ্রী ও স্বভাব ঐ মহাত্মার কিছু কিছু অনুরূপ হইয়াছিল অন্তত মার্গারেট্ তাহা মনে করিতেন। উহা ধরিয়াই পুত্রের নাম রাখা হয়। যেরূপ পৌল মুনি জনগণের অপরাগ ও দ্বেষের পাত্র হইয়া লোকালয়ের বিদূরে বাস করিয়া ছিলেন, সেইরূপ তাঁহার সন্তানও কানীন বলিয়া সমাজের বহিস্থ হইয়া থাকিবে, কোন কুটুম্বের আশ্রয় পাইবে না এই মনে করিয়া মার্গারেট্ পৌল মুনিকে পুত্রের শরণ্য দেবতা কল্পনা করিয়া দিয়াছিলেন। যখন পৌল চিত্র আনিয়া ভর্জ্জীনীকে দান করিল, তখন ভর্জ্জীনী গদ্গদস্বরে নিবেদন করিল ভ্রাতঃ যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে, আমি এ চিত্র খানিকে হস্তান্তর করিব না। আর চির

---

* পৌল মুনি খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর অল্প দিন পরেই খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। নিউটেষ্টামেণ্টের কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট সন্দর্ভ তাঁহারই রচিত। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার বিষয়ে তিনি এক মহোদ্যোগী নায়ক ছিলেন।

কাল মনে রাখিব যে, পৃথিবীতে তোমার যা কিছু ছিল, তুমি আমাকে তাহা দান করিয়াছিলে।' এরূপ বাৎসল্যসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া পৌল ভাবিল যে, ভর্জ্জীনীর আবার আপনার প্রতি স্নেহের আবির্ভাব হইয়াছে এবং আবার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এই মনে করিয়া সপ্রেমে কণ্ঠ ধারণ করিতে চাহিল, কিন্তু ভর্জ্জীনী এমনি শীঘ্র তথা হইতে পলায়ন করিল যে, পৌলের প্রসারিত বাহু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। পৌল এরূপ দুরূহময় আচরণের ভাব বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিল।

এই সময়ে একদা মার্গারেট্ সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'এসনা কেন, দুটি সন্তানের বিবাহ দেওয়া যাউক। আমার পুত্রের আজি পর্য্যন্ত বড় একটা বোধ শোধ হয় নাই বটে, কিন্তু উভয়েরই পরস্পরের প্রতি সাতিশয় অনুরাগ দেখা যাইতেছে। যখন প্রকৃতি উত্তেজনা করিবেন, তখন উহাদিগের উপর চৌকী দেওয়া ভার হইবে, তখন কি হইতে কি হয় কে বলিতে পারে। বিবি দিলাতুর কহিলেন 'সখি! দুজনেই অতি শিশু এবং দুজনেই দরিদ্র। যদি এ বয়সে ভর্জ্জীনী সন্তান প্রসব করিয়া লালন পালন করিতে না পারে, তবে কি দুঃখের কথা! তোমার দমিঙ্গ তো বৃদ্ধ, মেরীরও তেমন বল সামর্থ্য নাই। আর, প্রিয় সখি, আমি নিজেও গত পোনর বৎসর অবধি অত্যন্ত অপটু হইয়াছি। উক্ত দেশে, বিশেষত আবার হৃদয়ে আঘাত লাগিলে, অতি শীঘ্র শরীর পড়িয়া যায়, এবং জরা আসিয়া ধরে। কেবল মাত্র পৌলই আমাদের মধ্যে একটু পরিশ্রমের উপযুক্ত আছে। সেও আবার ছেলে মানুষ, তাহার মন আজিও স্থির হয় নাই। অতএব যত দিন না সে পরিবারের ভরণপোষণে সমর্থ হয়, তত দিন বিবাহ দিয়া কি হইবে ভাই। এখন তো দেখিতেছ যে, কায়ক্লেশে এক প্রকার দিনপাত হইতেছে মাত্র। তবে যদি এক বার পৌলকে কিছু দিনের নিমিত্ত ভারতবর্ষে পাঠান যায়, তাহা হইলে কিছু দিন ব্যবসা করিয়া সে কিছু টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। সেই টাকা দিয়া জনকতক কৃষ্ণদাস ক্রয় করিলে পরিবার চলিয়া যাইতে পারে। এমনটি হইলে এক দিন ভর্জ্জীনীর পৌলের সহিত বিবাহ সঙ্ঘটন করা যায়; কেন না আমি বেশ বুঝিয়াছি যে, তোমার পৌল না হইলে আমার ভর্জ্জীনীর সংসার সুখ হইবে না। এ বিষয়ে প্রতিবেশী মহাশয় কি বলেন এক বার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাইবে।'

বাস্তবিকও দুই সখী আমার নিকট এই কথার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আমিও অনুমোদন করিয়া কহিলাম 'ভারতে যাইবার সমুদ্র পথে বড় একটা ঝড় ঝটিকা নাই, উপযুক্ত ঋতুতে যাত্রা করিলে যাতায়াতে তিন মাসের অধিক লাগে না। আমি আপন পল্লীতে পৌলের নিমিত্ত পণ্য সঞ্চয় করিয়া দিব, কেন না মদীয় প্রতিবেশীরা পৌলের প্রতি বড় সন্তুষ্ট। আমাদের এখানে যে এত তুলা হয়, সুতাকাটা কল নাই বলিয়া আমরা তাহার কোন উপযোগ করিতে পারি না, আর অত্রত্য বনভূমিতে আবলুশ্ কাষ্ঠ এত সুলভ যে, লোকে জ্বালানি করিয়া থাকে, যদি কিয়ৎ পরিমাণে এই দুই পদার্থ আর অরণ্য হইতে কিছু ধুনা সংগ্রহ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে সকল ভারতে লইয়া গেলে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে, কেন না সেখায় ওসব জিনিসের দাম খুব, অথচ এখানে বিনা মূল্যে পাওয়া যায়।' এই কথা শুনিয়া উভয় সখীই কহিলেন 'তবে শাসনকর্ত্তার একখানি অনুমতি পত্র মহাশয়কেই সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে।' আমি তাহাতে সম্মত হইয়া ভাবিলাম, আগে পৌলের মনটাই বুঝিয়া দেখি। কিন্তু পৌলের নিকট প্রস্তাব করাতে সে অতি সুবোধের মত যে সকল কথা কহিয়া আমাদিগের অভিসন্ধিতে অসম্মতি প্রকাশ

শাসনকর্ত্তা পৌলকে কহিলেন ' ভদ্র, তুমি ছেলেমানুষ, যখন তোমার জ্ঞান হইবে, বুঝিতে পারিবে যে উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তি-দিগের কি দুর্দ্দশা, তখন জানিতে পারিবে যে কি রূপে ধূর্ত্তেরা নিজ গুণ ঘোষণা করিয়া পদস্থ ব্যক্তির নিকট প্রতিপত্তি লাভ করে; বিনয়পরতন্ত্র সজ্জনেরা আত্মশ্লাঘায় অসমর্থ ও চাটুবচনে অনিপুণ বলিয়া যে ফল ভোগ করিতে পান না, বাচাল দুর্জ্জনেরা তাহা অনায়াসে লাভ করে।

পরে বিবি দিলাতুর কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া শাসনকর্ত্তা তাঁহার পার্শ্বে ভোজনপীঠে ভোজন করিতে বসিলেন। গৃহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাব গৃহস্বদ্বয়ের সদ্ভাব এবং অনুজীবীদিগের প্রভুভক্তি দেখিয়া তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, এখানে বাসনপাত্র কাষ্ঠময় বটে, কিন্তু সকলের মুখ-লক্ষ্মী সুশান্ত এবং অন্তঃকরণ সুবর্ণময়। শাসনকর্ত্তাকে ঈদৃশ প্রিয়ম্বদ দেখিয়া পৌল সরল ভাবে তাঁহার সৌজন্যের প্রশংসা করিল এবং তাঁহার সৌহার্দ্দকামনা প্রকাশ করিয়া হস্তস্পর্শ ও আলিঙ্গন দ্বারা মৈত্রী বন্ধন করিল, শাসনকর্ত্তাও পৌলের মুগ্ধ ভাবে সম্ভ্রম প্রকাশ পূর্ব্বক আপন হিতৈষিতা নিবেদন করিলেন।

ভোজনানন্তর বিবি দিলাতুরকে একান্তে আনিয়া শাসনকর্ত্তা কহিলেন ' যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে অবিলম্বেই আপনার কন্যাকে ফ্রান্সে পাঠান যাইতে পারে, কারণ শীঘ্র এক জাহাজ খুলিয়া যাইবে। এই জাহাজে আমার পরমাত্মীয় এক মহিলা স্বদেশ যাত্রা করিবেন, ভর্জ্জিনীর যাওয়া অবধারিত হইলে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দি যে, পথে ভর্জ্জিনীর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আপনি ভাল করিয়া বিবেচনা করুন, বিয়োগদুঃখ পরিহারার্থ এরূপ অসংশয়িত বিভব লাভে উপেক্ষা করিলে নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম করা হয়। আমি বিশেষ খবর জানি, আপনার পিসীর বড় অধিক দিন নাই, অতএব এমন সুযোগ ছাড়িলে আবার ধন কোথা পাইবেন? ঐশ্বর্য্য কি নিত্য নিত্য মেলে? বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই আমার পরামর্শে মত দিবেন।' বিবি দিলাতুর কহিলেন, ' কন্যার সুখকামনাই আমার মনের এক মনোরথ। অতএব সে যাইতে চাহিলে আমি কখন অসম্মত হইব না।'

বাস্তবিকও, বিবি দিলাতুর দুটি সন্তানকে কিছু দিনের নিমিত্ত পৃথক্ করিবার সুযোগ পাইয়া বড় অসুখী হয়েন নাই। দুহিতাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন 'বৎসে, দমিঙ্গ ও মেরী উভয়েই বৃদ্ধ, পৌল তো ছেলেমানুষ, মার্গারেটেরও জরা আগত-প্রায়, আর আমি তো একেবারে অপটু হইয়াছি। বল দেখি, এখন আমার কিছু হইলে এই দূরদেশে নির্ধন অবস্থায় তোমার দশা কি হইবে। তখন প্রতিপালন করিতে কেহই থাকিবে না, তখন প্রাণধারণার্থে তোমাকে মজুরের কর্ম্ম করিতে হইবে, ইহা ভাবিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।' তনয়া উত্তর করিল, ' আমাদিগকে পরিশ্রম করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে হইবে ইহা পরমেশ্বরের আজ্ঞা; তোমার নিকটেই আমি পরিশ্রমের গুণ কীর্ত্তন ও তাহা অবলম্বন করিতে শিখিয়াছি। এত দিন পর্য্যন্ত ঈশ্বর আমাদিগকে করুণাচ্ছায়ার মধ্যে রাখিয়াছেন, তখন কি তিনি আমাদিগকে ভুলিয়া যাইবেন? তুমি তো কত বার বলিয়াছ যে ঈশ্বরের দয়া দুঃখী লোকের উপরেই অধিক প্রবল। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার মন সরে না যে তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাই।' এই বাক্যে বিগলিত হইয়া জননী কহিলেন, 'বাছা, আমার বাসনা যে, পৌলের সহিত বিবাহ দিয়া তোমাদের সুখবর্দ্ধন করিয়া দিব। এখন মনে কর যে তাহার সৌভাগ্য তোমার ইচ্ছার অধীন।'

অনুরাগিণী নববালা মনে জানে যে; তাহার পূর্ব্বাভিলাষবার্ত্তা কেহই অবগত নহে।

সে মনের উপর যেমন, নয়নের উপরও তেমনি অবগুণ্ঠন আরোপণ করিয়া থাকে। কিন্তু যখন বান্ধবের কর দ্বারা সে অবগুণ্ঠন উত্তোলিত হয়, তখন তাহার হৃদয়ের প্রণয়-জনিত সমুদয় যন্ত্রণা প্রকাশ হইয়া পড়ে, যখন পূর্ব্বতন গোপনভাব একেবারে অপগত হয় তখন মনোগত সকল রহস্যই ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

ভর্জ্জিনী পৌলের প্রতি নিজ অনুরাগ এত দিন কাহারও নিকট ব্যক্ত করে নাই, নূতন ভাব মনে প্রবেশ করাতে যে সকল গূঢ় চিত্তবেদনা অনুভব করিয়াছে তাহা দেবতা ভিন্ন আর কাহারও নিকট জানায় নাই। এখন জননী তাহার অনুরাগের অনুমোদন করিলেন দেখিয়া ভর্জ্জিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না; মনের সব কথা খুলিয়া বলিল। কিরূপে মনের চাপল্য বোধ করিয়াছে, কিরূপে কর্ণেসপ অনুরাগের উপদেশ অবগণনা করিয়াছে, সে সমুদয় অকপটে ব্যক্ত করিল এবং কহিল 'যদি তুমি আমার অনুরাগে অসন্তুষ্ট হইলে না, তবে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। এখন যাহা উচিত বোধ হয়, স্থির কর। মা আমার শুভকামনায় নিযুক্ত আছেন ভাবিয়া আমার সান্ত্বনা হইবে, এখন তুমি যাহা বলিবে তাহাতেই প্রস্তুত আছি।'

বিবি দিলাতুর দেখিলেন যে যাহা ভাবিয়া কন্যার মনোগত ভাবের প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বিপরীত ফল দর্শিল। তখন কহিলেন 'বৎসে, আমি তোমার প্রবৃত্তির অন্যথাচরণ কখনই করিব না। কিন্তু পৌল যেন তোমার অনুরাগ সহসা অবগত না হয়, কারণ দয়িতার চিত্ত আত্মাসক্ত জানিলে প্রণয়ীর প্রার্থনীয় আর কিছু থাকে না, তখন সে অনায়াসে উপার্জ্জিত প্রণয়ের অনাদরও করিতে পারে।'

দিনান্তে জননী ও দুহিতা একাকী বসিয়া আছেন, ইত্যবসরে শ্যামবর্ণ-পরিচ্ছদ-পরিধান এক দীর্ঘ পুরুষ তাঁহাদের সন্নিধানে আসিলেন। ইনি দ্বীপে মিশনরীর কার্য্য করিতেন এবং দুই সখীর দীক্ষাগুরু ছিলেন। শাসনকর্ত্তার আদেশে তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক কহিলেন, 'বাছারা, পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দেও। দেখ তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা একেবারে বিভব লাভ করিয়াছ। এখন যত ইচ্ছা দান ধর্ম্ম করিয়া পরোপকার ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। শাসনকর্ত্তা মহাশয়ের সহিত তোমাদিগের যে কথোপকথন হইয়াছে, তত্তাবৎ আমি অবগত হইয়াছি। তুমি মা, শরীরগত অপটুতা বশত এত দূর যাইতে পার না বটে, কিন্তু আমাদের এই নবকুমারী তো কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না। দেখ বাছে, বিধাতার আদেশ প্রতিপালন না করিলে ঘোরতর অধর্ম্ম হয়। আর, বৃদ্ধ গুরুজনের বাক্য অন্যায় হইলেও শুনিতে হয়। আমি মানি বটে, পরিবারের সহিত বিয়োগ তোমার পক্ষে বড় কষ্টকর হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞায় কি না করিতে হয়? তিনি মানুষের নিমিত্ত কত করিয়াছেন, তাঁহার সন্তান স্বরূপ মানববর্গের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত তনুত্যাগ পর্য্যন্ত করা আমাদের উচিত। কেমন মা, তোমার কি ফ্রান্সে যাইতে ইচ্ছা হয় না?'

ভর্জ্জিনী নতনেত্রে কম্পিতকায়ে উত্তর দিল 'যদি পরমেশ্বরের আজ্ঞা এমনই হয়, তবে আমি কোনমতে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিব না। পরমেশ্বরের আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।' গদ্গদ স্বরে এই বলিয়া উঠিল।

মিশনরী তৎক্ষণাৎ অপসৃত হইয়া শাসনকর্ত্তার নিকট কার্য্যসিদ্ধি আবেদন করিলেন। এ দিকে বিবি দিলাতুর ভর্জ্জিনীর বিদেশযাত্রা বিষয়ে পরামর্শ করিবার নিমিত্ত আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না যে, ভর্জ্জিনী ধনার্থে জন্মভূমি পরিত্যাগ করে। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে উপযুক্ত এই এক সার কথা জানি যে, ধনের অনুসরণ না করিয়া

প্রকৃতির অনুসারী হওয়াই শ্রেয় এবং গৃহলভ্য সুখের অতিরিক্ত সুখ আশা করা উচিত নহে। কিন্তু ধনাশার মাধুরীর নিকট মদীয় উপদেশ কোথায় লাগে। বিবি দিলাতুরের গুরুবাক্য কিম্বা সংসার শুষ্ক লোকের কুসংস্কার কি মদীয় ঋজু-যুক্তিগর্ভ সূক্তি দ্বারা হতমান হইতে পারে? তিনি কেবল ভাল দেখায় না বলিয়াই আমার পরামর্শ চাহিলেন, কিন্তু বাস্তবিক দীক্ষাগুরুর উপদেশানুসারেই কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া ছিলেন। মার্গারেট্ পুত্রের সৌভাগ্য-মৃগ তৃষ্ণায় বিভ্রান্ত না হইয়া প্রথমে বিলক্ষণ অসম্মতি দেখাইয়াছিল বটে, কিন্তু মিশনরী সকলকার চিত্ত স্থির করিয়া দিয়া গেলেন। কেবল পৌলই মায়েঝিয়ের গোপন সম্ভাষণ দেখিয়া অত্যন্ত খেদিত হইতে লাগিল। তাহার মুখে সর্ব্বদাই এই কথা লাগিয়াছিল 'নিশ্চয় আমার সর্ব্বনাশের নিমিত্তই চক্রান্ত হইতেছে, নতুবা আমাকে এত গোপন কেন?'

ইতি মধ্যে এই সকল নরু পর্ব্বতে কমলার অনুগ্রহ হইয়াছে এ কথা প্রচারিত হইল এবং অনেক ব্যবসাদার নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া বিক্রয় করিবার আশায় পাহাড়ের দুর্গম বন্ধুর মার্গে আরোহণ করিতে লাগিল। কত রঙ্গিন বসন, কত রেশমী বস্ত্র, কত ঢাকাই কাপড়, কতরকম রুমাল, কতরকম ছিট, তাহারা ভর্জ্জীনীর সম্মুখে প্রসারিত করিল; সে তন্মধ্যে মনোনীত করিতে লাগিল, তাহার জননী দ্রব্যের গুণাগুণ পরীক্ষা ও মূল্য নির্ণয়ার্থ নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভর্জ্জীনী পরের মন সন্তুষ্ট করিতে এত ব্যস্ত, যে জিনিশ কিনিবার সময় আপনার কথা বিস্মৃত হইল। 'এ রুমাল খানি বাসনপাত্র পুঁছিবার বেশ হইবে, এখানি দমিঙ্গ ও মেরীর দরকারে লাগিবে, এই করিতে করিতেই সব মুদ্রা নিঃশেষিত হইল। পরে যখন দেখিল যে, আপনার নিমিত্ত কিছুই কেনা হয় নাই, তখন যে সকল বস্ত্র দান করিয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে কিছু কিছু চাহিয়া লইয়া আপন প্রয়োজন সমাধান করিল। এই সকল খরচ দেখিয়া পৌলের মন বড় অধীর হইল। সে নিশ্চয় বুঝিল যে ভর্জ্জীনী যাইবে বলিয়াই এ সকল উদ্যোগ হইতেছে। তখন আমার নিকটে গিয়া নিতান্ত কাতর ভাবে বলিল, 'ভগিনী তো চলিল, সব উদ্যোগ হইতেছে, আপনার পায়ে পড়ি, এক বার আসিয়া মা'দের এ দুর্ব্যবসায় থামাইয়া দিন।' যদিও জানিতাম, আমার প্রয়াস বৃথা হইবে, তথাপি পৌলের অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না।

যখন ভর্জ্জীনী মস্তকে এক খানি লাল রুমাল বাঁধিয়া শুদ্ধ যৎসামান্য নীল বসনের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকিত, তখনই তাহার রূপের ছটায় সকলে সন্তর্পিত হইত। এখন বিবিধ মহার্ঘ বসন ধারণ করাতে তাহার শোভা যে পরম রমণীয় হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সুন্দর সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা তাহার তনু দেহযষ্টিখানি কেমন সুদৃশ্য হইয়াছিল! কেশপাশ দুই বেণীতে বিভক্ত হইয়া তদীয় কৌমার মস্তকাকে রম্য শোভায় শোভিত করিয়াছিল, নীলোৎপলসদৃশ লোচনযুগলে হৃদগত দুঃখের চিহ্ন স্পষ্ট প্রতীত হইতেছিল, আবার সুকুমার অন্তঃকরণ নব প্রণয়ের সংবোধন চেষ্টায় আকুলীভূত হওয়াতে তদীয় লাবণ্য সবিশেষ সমুজ্জ্বল এবং স্বরভঙ্গি সাতিশয় হৃদয়হারিণী হইয়াছিল। এই নবীন মনোহর বেশ যেন তাহার মনোগত নহে ইহা বুঝা যাইতেছিল, তদ্দ্বারা চিত্তখেদ আরো স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতে ছিল। তাহার ভাব দেখিয়া আর্দ্র না হইত এমন লোক নাই। পৌলের শোক উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। মার্গারেট পুত্রের অতিশয় বৈমনস্য দেখিয়া কহিল 'বৎস, তুমি কেন মিছা আশার বশ হইয়া আপন দুঃখ বাড়াইতেছ। তোমার জন্মবৃত্তান্ত তোমার নিকট আর গোপন রাখিবার দরকার কি, বাছা, আমার

জীবনের রহস্য শোন। দিলাতুরদুহি-তার ব্রিটনী ও নর্ম্যাণ্ডবাসী কুটুম্ব আছে। তোমার জন্ম কৃষাণকন্যার গর্ভে। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তুমি জারজ।'

'জারজ' এই কথা শুনিয়া পোল অত্যন্ত বিস্মিত হইল। এই অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে জননী কহিলেন 'ওবাছা, তোমার পিতা ধর্ম্মতঃ আমার স্বামী হয়েন নাই। কুমারী অবস্থায় রিপুর বশ হইয়া আমি অকার্য্য করিয়াছিলাম, তুমি তাহারই ফল। আমার চপলতা হেতুক তোমার পিতৃকুল নাই, আমার কলঙ্ক তোমার মাতৃকুল গিয়াছে। অভাগারে!— পৃথিবীতে আমি বই তোর আর কেহ নাই।' এই বলিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পোল তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন,'মা! তুমি বই আমার আর কেহ নাই শুনিয়া তোমার প্রতি দ্বিগুণ মমতা হইল। আজি তুমি কি রহস্যই আমার নিকট প্রকাশ করিলে! দিলাতুরদুহিতা যে কি জন্য আমার প্রতি দুই মাস অবধি অনাদর করিতেছেন, তাহা এতক্ষণে বুঝিলাম। সেই জন্যই সে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। হায় হায়, সে মনে মনে আমাকে অশ্রদ্ধা করে!'

সায়ম্ভোজনের সময় সকলে ভোজ-পীঠে বসিল বটে, কিন্তু এক এক প্রকার আবেগ বশতঃ কাহারও খাওয়া হইল না এবং কেহ একটি কথাও কহিল না। ভর্জ্জীনী উঠিয়া অশ্বত্থাসিত এই বনস্থীকে আসিয়া বসিল, ক্ষণকাল পরে পোল তাহার নিকটে গিয়া আসন গ্রহণ করিল। কিয়ৎকাল উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। উক্ত দেশে মধ্যে মধ্যে এরূপ রমণীয় রজনী দেখা দেয়, যে অতি সুদক্ষ চিত্রকরও তাহার শোভা তুলিকা দ্বারা বর্ণন করিতে পারে না। সে রাত্রিও তাদৃশ মনোরম-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। কুমুদিনীনাথ গগনের ঠিক্ মধ্যস্থল অলঙ্কৃত করিয়া পরিবেষযুক্ত কতিপয় মেঘের আবরণ নিরাস করিতেছিলেন। বনান্তে ও শৈল-শিখরে জ্যোৎস্না বিসারিত হইয়া উহা-দিগকে রজতশবলিত মারকত শোভায় সুশোভ করিয়াছিল, বাতাস্ স্থির হইয়া-ছিল, নিকুঞ্জ বা পর্ব্বতগর্ভে বিহঙ্গদম্পতী সুরম্য চন্দ্রিকা ও সুশীতল পবনে স্নিগ্ধ-শরীর হইয়া কুলায়মধ্যে পরস্পরকে আলি-ঙ্গন করত মধুর কলরবে কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতেছিল, পতঙ্গেরা পর্য্যন্ত ঘাসমধ্য হইতে আনন্দধ্বনি উদীরণ করিতেছিল, গগনগর্ভের তারকাস্তবক সমুদ্রসলিলে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে চঞ্চল তরঙ্গে উহার কিরণজাল কাঁপিতেছিল। ভর্জ্জীনী শূন্য দৃষ্টিতে নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে সমুদ্রকূলস্থিত কতি-পয় ধীবরনৌকার আলো লক্ষিত হইল, এবং বন্দরের প্রবেশপথে এক খানি জাহাজের মাস্তুল ও তলভাগ নয়নগোচর হইল। সে জানিত যে, বাতাস্ উঠিলে ঐ জাহাজই নঙ্গর তুলিয়া তাহাকে লইয়া ইউরোপ যাত্রা করিবে। ইহা মনে হইবা মাত্র শোক উচ্ছলিত হইল, পাছে পোল টের পায়, এই ভয়ে মুখ ফিরাইয়া নয়ন-জল গোপন করিল।

বিবি দিলাতুর মার্গারেট ও আমি এই তিন জনে তাহাদের অদূরে কদলী-তলে বসিয়াছিলাম। নিস্তব্ধ রাত্রিকালে তাহাদের যে কথোপকথন হইল, তাহা বেশ শুনিতে পাইলাম। সেই কথোপ-কথন আমার আজি পর্য্যন্ত অবিকল মনে আছে। ৵

পোল কহিল 'তিন দিনের মধ্যেই তোমার যাওয়া হইবে শুনিলাম। আগে তুমি সমুদ্রের নামে কাঁপিয়া উঠিতে, কই এখন সমুদ্রে যাইতে তোমার ভয় করিবে না?' ভর্জ্জীনী কহিল, 'গুরুজনের বাক্য কি রূপে অমান্য করি, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে কি বলিয়া পরাঙ্মুখ থাকি।' পোল কহিল 'তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া এক অজ্ঞাত-পূর্ব্ব দূরবাসী কুটুম্বের নিকট চলিলে?'

ভর্জ্জীনী কহিল, 'হায় রে! আমার কি যাইতে বড় সাধ? আমার তো ইচ্ছা চিরকাল এই খানেই থাকি। কিন্তু মা তাহাতে রাজী নন কি করি। ঠাকুর মহাশয় বলিলেন যে, না যাইলে ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করা হয়। আরও কহিলেন যে, জীবনটা কেবল লোককে পরীক্ষা করা মাত্র। উঃ! এ বড় বিষম পরীক্ষা।

পৌল কহিল 'কি বলিলে! তোমার যাইবার এত হেতু? থাকিবার একটিও হেতু নাই? বটে বটে, তোমার যাইবার আর একটি বিশেষ হেতু আছে. সেটি আমায় বলিলে না। ধনের মত পদার্থ আর কি আছে? তুমি এক নবীন সমাজে উপস্থিত হইয়া এক নবীন লোককে ভ্রাতৃসম্বোধন করিবে, আমাকে আর মনেও করিবে না। তুমি ধনাঢ্য ও কুলমর্য্যাদা সম্পন্ন এক জনকে সেই মধুর নাম অর্পণ করিবে। কিন্তু ভাবিতেছ না যে, যথাই যাও, জন্মভূমির মত স্থান কোথাও পাইবে না, এমন স্নেহ আর কোথাও মিলিবে না। যে স্থানে সকলেরই মন তোমার প্রতি বাৎসল্য ভাবে পূর্ণ আছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন স্থানে তুমি তেমন হৃদয়ঙ্গম বন্ধু বান্ধব পাইবে? এত দিন মার কোলে লালিত হইয়া কিরূপে সে সুখ বিস্মৃত হইবে? বল দেখি তাঁহারই বা কি দশা হইবে? যখন গৃহে, উদ্যানে কিম্বা পরিক্রমের সময়ে তোমাকে আপন পার্শ্বে না দেখিবেন, তখন তিনি কিরূপে প্রাণধারণ করিবেন? আমার মা তোমাকে তেমনি স্নেহ করেন, বল দেখি তাহারই বা কি যাতনা হইবে? যখন তাঁহারা তোমার বিরহে হতাশ্বাস হইয়া রোদন করিবেন, তখন আমি কি বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিব? হায়, হায় নিষ্ঠুর! আমি আপনার কথা বলিতেছি না। কিন্তু বল দেখি এক বার, যখন প্রভাতে আমাদের দেখা হইবে না, সন্ধ্যার সময়েও মিলিত হইব না, তখন আমি কি হইয়া যাইব? আমাদের জন্মসময়ে রোপিত এই দুটি নারিকেল বৃক্ষের উপর যখন চক্ষু পড়িবে, তখন কে আমার শোক থামাইয়া দিবে। হায়, যদি ধনলোভে নিতান্তই বিদেশে যাও, তবে আমাকেও সঙ্গে করিয়া লও আমি ঝড়ের সময় তোমাকে সাহস দিব, আমি আপন বক্ষে তোমার মস্তক রাখিয়া ভয় ঘুচাইয়া দিব, আমি আপন হৃদয়ে তোমার হৃদয়কে প্রত্যুজ্জীবিত করিব, আর যখন ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়া সৌভাগ্য ও মহিমা উপার্জ্জন করিবে, তখন আমি দাসের ন্যায় তোমার শুশ্রূষা করিব। ফ্রান্সের প্রাসাদ সমূহে তোমাকে সর্ব্বজনের আদরভাজন দেখিলেই আমার অতুল সুখ হইবে। তোমাকে আত্ম সমর্পণ করিয়া তোমার পদতলে প্রাণত্যাগ করিলেই আমার যার পর নাই সম্পত্তি লাভ হইবে।'

এই বলিতে বলিতে স্তম্ভিত বাষ্পভরে তাহার কণ্ঠ রোধ হইল এবং অনতিবিলম্বে অশ্রাকুলিত শ্বাস বিচ্ছিন্ন ভর্জ্জীনীর স্বর শুনা গেল, 'কেবল তোমার নিমিত্তই তো আমি যাইতে সম্মত হইয়াছি। দুই পরিবারের ভরণপোষণের তুমি যে পরিশ্রম কর তাহা তোমার সাধ্যাতীত ইহা ভাবিয়াই না আমার যাইতে সঙ্কল্প হইয়াছে! তুমি ভাবিতেছ যে সামান্যকুলজাত বলিয়া আমি তোমাকে অশ্রদ্ধা করি। যদি আমার ভ্রাতা বলিতে ইচ্ছা থাকিত. তবে কি আর কাহাকেও সে নাম দিতে পারি। তোমাকে যে আমি ভ্রাতা অপেক্ষা কত অধিক ভাল বাসি, তাহা তোমার কি বোধ হয় নাই? তোমাকে সন্নিহিত হইতে দিব না এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে চলিতে গিয়া আমার যে কত কষ্ট হইয়াছে তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই? আমি ভাবিয়াছিলাম যে যত দিন দুই হস্ত এক না হয়, তত দিন তুমিও সেইরূপ পণ করিবে। কিন্তু আর আমি ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারি না। যাহা ইচ্ছা হয় কর, চাই আমাকে আটক করিয়া

রাখ, চাই পাঠাইয়া দেও। চাই মারিয়া ফেল, চাই বাঁচাইয়া রাখ। হায় আমি কি অদৃঢ়ব্রতা! তোমার তত স্নেহ দেখিয়া চিত্ত বিচলিত হয় নাই, কিন্তু তোমার দুঃখ দেখিয়া হৃদয় রোধ করিতে পারিলাম না।'

এই কথা শুনিয়া পোল বেগে ও দৃঢ়রূপে ভর্জীনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিল 'আমি তোমার সঙ্গেই বিদায় হইব। কে রাখিবে রাখুক।' তৎক্ষণাৎ আমরা তাহার নিকটে গেলাম এবং বিবি দিলাতুর কহিলেন 'তুমি যাইলে আমরা কাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিব।'

পোল কাঁপিতে কাঁপিতে এই বাক্য গুলি উচ্চারণ করিল 'বৎস! — বৎস! — উনি আমাকে বৎস বলিয়া মা হইতে আসিয়াছেন! উনি আমার মা, যিনি ভাই ভগিনীকে পৃথক্ করিয়া দিতেছেন! দুজনেই তোমার কোলে বড় হইয়াছি, দুজনেই তোমার স্তন দুগ্ধ পান করিয়াছি, দুজনেই তোমারি কাছে পরস্পরকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছি। এখন তুমিই আমাদিগকে পৃথক্ করিতেছ! যে দুরন্ত দেশে তোমায় কেহ আশ্রয় দেয় নাই, যে কুটুম্বেরা তোমার মনোভঙ্গ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই নিষ্ঠুর দেশে সেই নিষ্ঠুর কুটুম্বদিগের নিকটে ভর্জীনীকে পাঠাইতেছ! তুমি বলিবে যে আমি ভর্জীনীকে ধরিয়া রাখিবার কে, বলিবে যে ভর্জীনীর উপর আমার কি অধিকার আছে। সে আমার ধন, প্রাণ, মান, যশ, কুল, শীল, সে আমার সর্ব্বস্ব। আমি সে ছাড়া কিছুই জানি না। আমরা দুজনে এক স্তনপান করিয়াছি, এক দোলায় দুলিয়াছি, আমাদিগের সমাধিও কেহ পৃথক্ করিতে পারিবে না। সে যদি যায়, তাহার সঙ্গে আমি যাইবই যাইব। যদি শাসনকর্ত্তা তাহাকে উঠিতে না দেন, তবে কি আমি সাগরে ঝম্প দিতে জানি না। তাহার বিরহে সমুদ্র আমার পক্ষে স্থল অপেক্ষা শতগুণ প্রার্থনীয়। বিধাতা এখানে আমায় তাহার কাছে থাকিতে না দিন, আমি নিদান তোমার অন্তরে গিয়া তাহার প্রত্যক্ষে প্রাণত্যাগ করিব। হা কঠিনপ্রাণে! হা নৃশংসে! যেমন তুই সমুদ্রের উপর বিশ্বাস করিয়া ভর্জীনী সমর্পণ করিতেছিস্, তেমনি যেন সমুদ্র তোর নিকট তাহাকে আর ফিরিয়া না দেয়! যেন আমার মৃত দেহ স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া তোর সম্মুখে পড়ে! যেন ভর্জ্জীনীর শব ও আমার শব একত্রে সমুদ্রতীরের প্রস্তরের উপর লাগিয়া যায়! তাহা হইলে একেবারে দুই সন্তানের বিনাশে তোরে অনন্ত শোকে মগ্ন হইতে হইবে! তাহা হইলে আপনি যেমন নির্দয়, তাহার তেমনি প্রতিফল পাইবি!'

নৈরাশ্যে পোলের বুদ্ধিলোপ হইয়াছিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিকণা বাহির হইতেছিল, মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহাতে স্থূল স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিয়াছিল। দুই জানু কাঁপিতেছিল, এবং আমি তাহার উত্তপ্ত হৃদয়দেশে হাত দিয়া দেখিলাম, মহাবেগে রক্ত চলিতেছে। অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত ধারণ করিলাম। ভর্জীনী সভয়ে বলিয়া উঠিল 'হে মিত্র! আমরা বাল্যকালে একত্রে যে সকল সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছি, আমি তোমার সহিত যে সকল অভেদ্য বন্ধনে গ্রথিত আছি, তত্তাবতের নাম উচ্চারণ করিয়া শপথ করিতেছি যে, যদি এখানে থাকি, তোমারই হইয়া থাকিব, যদি এখান হইতে যাই, প্রত্যাগমনের পর তোমারই হইব। জননীরা বাল্যকালে আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন, এবং এখনও আমার জীবনের প্রভু হইয়া আছেন, আমি তাঁহাদিগকে সাক্ষী মানিলাম। হে পরমেশ্বর! তুমি শ্রবণ করিলে। হে মকরালয়! আমি তোমার বক্ষঃস্থলে আত্ম সমর্পণ করিতেছি, তুমি আমার প্রতিজ্ঞার সাক্ষ্য দিও! হে জগৎপাবন পবন দেব! কখন মিথ্যা কথা দ্বারা

তোমাকে কলঙ্কিত করি নাই, তুমি আমার ব্রতের সাক্ষী রহিলে!'

যেমন হিমালয়শৃঙ্গের কঠিন তুহিনশিলা রবিকিরণে বিগলিত হইয়া গড়াইয়া পড়ে, তদ্রূপ দৰিতজনের মধুর বাক্যে পৌলের আরূঢ় রোষ প্রশান্ত হইল, তাহার উদ্ধত শীর্ষ নত হইয়া পড়িল, নয়ন হইতে অশ্রুবৃষ্টি হইল। তাহার জননী পুত্রের নেত্রবারিতে আপনার বাষ্প সম্মেলিত করিয়া তাহাকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক স্তব্ধ হইয়া রহিল। বিবি দিলাতুর কহিলেন 'আর আমি থাকিতে পারি না। আমার হৃদয় শতধা হয়! ভর্জ্জীনীর আর এ বিষম জলযাত্রা স্বীকারে কাজ নাই। প্রতিবেশী মহাশয়, বাছাকে লইয়া আজি আপনার ঘরে রাখুন। আজি আট দিন হইল, এখানে কাহারও চক্ষের পাতা পড়ে নাই।' আমি পৌলকে কহিলাম 'বৎস, ভর্জ্জীনীর তো আর যাওয়া হইবে না। কালি সকালে শাসনকর্ত্তাকে সে কথা বলা যাইবে। আজি চল আমার গৃহে রাত্রি অতিবাহন করিবে। দেখ রাত্রি অনেক হইয়াছে, প্রায় নিশীথকাল উপস্থিত।' এই বলিয়া তাহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলাম। তথায় কথঞ্চিৎ যামিনী অতীত হইলে পৌল প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক এই স্থানে প্রত্যাগমন করিল।

মরীশস্ বাসী বৃদ্ধ এত দূর পর্য্যন্ত কহিয়া বলিল 'কিন্তু যাহা হউক, আর এই শোকাবহ ইতিবৃত্ত বলিবার প্রয়োজন কি? মানুষের দশাবিবর্ত্তের মধ্যে কেবল এক দিকই রমণীয়। আমাদিগের জীবন যেন অহোরাত্র পরিবর্ত্ত সদৃশ। ইহার এক স্থান তমসাচ্ছন্ন না হইলে অপর ভাগ সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল হইতে পায় না।' আমি কহিলাম 'তাত, যখন এমন মনোহর ভাবে কথারম্ভ করিয়াছেন, তখন সমাপন করিয়া কৌতূহল পরিপূর্ণ করুন। সুখের কথা শুনিতে আনন্দ হয় বটে, কিন্তু দুঃখের বৃত্তান্ত শুনিলে চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানযোগ হয়। প্রভাতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পৌলের ভাগ্যে কি ঘটিল, কৃপা করিয়া বর্ণন করুন। বৃদ্ধ এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

গৃহে আসিয়া পৌল সর্ব্বাগ্রে দেখিতে পাইল যে, মেরী এক উন্নত শিখরে আরূঢ় হইয়া সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। 'ভর্জ্জীনী কোথা' এই কথা দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিবা মাত্র সে পৌলের প্রতি মুখ ফিরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। পৌল একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ শহরের বন্দরে গমন করিল। তথায় শুনিল যে সূর্য্যোদয়কালে ভর্জ্জীনী জাহাজে আরোহণ করিয়াছে, অব্যবহিত পরেই জাহাজ পালভরে চলিয়া গিয়াছে, এখন একেবারে দৃষ্টিপথের অতীত হইয়াছে। তখন পৌল কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া আবাসে প্রত্যাগমন করিল।

এ স্থান হইতে বোধ হয় বটে যে, ঐ দৃশ্যমান শৈলমালা লম্বভাবে সমুত্থিত হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক উহা সেরূপ নহে। উচ্চভাগে সানুভূমি বরাবর স্তরে স্তরে উঠিয়াছে এবং একবার কতিপয় দুর্গম পথ পার হইতে পারিলে অবলীলাক্রমে এক স্তর হইতে স্তরান্তরে যাওয়া যায়। তখন ঐ দৃশ্যমান অঙ্গুষ্ঠাকার চূড়ার পদতলে পর্য্যন্ত উঠাও অসাধ্য হয় না। ঐ চূড়ার ঠিক্ নিম্নভাগে বিবিধ তরুষণ্ডমণ্ডিত এক শিলামঞ্চ বর্ত্তমান আছে। তাহার চারি ধারেই ভয়ঙ্কর ভৃগু রহিয়াছে। অত উচ্চ বলিয়া ঐ শিলামঞ্চকে বোধ হয় যেন আকাশে এক অরণ্য ঝুলিতেছে। অঙ্গুষ্ঠাকার চূড়াতে নিরন্তর যে সকল মেঘ আসিয়া লাগে, তদ্দ্বারা অনেক ক্ষুদ্র গিরিনদীর স্রোতঃপুষ্টি হয়। কিন্তু ঐ সকল গিরিনদী এত নীচে আসিয়া পড়ে যে, পূর্ব্বোক্ত শিলামঞ্চ হইতে কোনপ্রকার ধ্বনিই শ্রুতিগোচর হয় না। ঐ মঞ্চে দণ্ডায়মান হইলে, অটবীসমাচ্ছন্ন অনেক উপত্যকা চূড়াশেখরিত অনেক শৈল, অগাধ জলনিধি এবং ষষ্টি ক্রোশ দূরে অবস্থিত বুর্বো দ্বীপ

ক্রমে ক্রমে নয়নগোচর হয়। এই উচ্চ স্থানে সংস্থিত হইয়া পোল, ভর্জ্জীনার অধিরূঢ় জাহাজ খানি দেখিতে পাইল। তখন সেখানি প্রায় পনর ক্রোশ দূরে চলিয়া গিয়াছিল, এবং সমুদ্রের ললাটে কজ্জল-তিলকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে ছিল। পোল তাহার দর্শনে কিয়ৎ ক্ষণ পর্য্যবসিত করিল, পরে তাহা জলধির গর্ভে বিলীন হইলেও সেই ভৈরব স্থানে সে উপবেশন করিয়া রহিল। তথায় তরুগণের শীর্ষ কম্পিত করিয়া এবং তালীপত্রে মর্ম্মর ধ্বনি উদ্গারণ পূর্ব্বক পবন পোলকে বীজন করিতে লাগিল। এই বিজন প্রদেশে পোলের বিষাদ দ্বিগুণিত হইল এবং সে শৈলপার্শ্বে মস্তক রাখিয়া ও ভূমিতে জানুদ্বয় অর্পণ করিয়া চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল। আমি তাহার অনুসন্ধানে ইতস্তত ফিরিয়া পরিশেষে ঐ স্থানেই তাহাকে ঐ রূপে আসীন দেখিলাম এবং অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া গৃহে আসিতে সম্মত করাইলাম। গৃহে আসিয়া সে বিবি দিলাতুরকে দেখিবা মাত্র 'মিথ্যাবাদিনি' বলিয়া তিরস্কার করিল। তিনি কহিলেন 'রাত্রি তিনটার সময় সুবাতাস উঠাতে শাসনকর্ত্তা পাল্‌কী লইয়া ভর্জ্জীনাকে লইতে এলেন, আমাদের কথা না শুনিয়া এবং রোদন না মানিয়া ভর্জ্জীনীকে আধ্‌মরা অবস্থায় লইয়া গেলেন।' পোল কহিল 'আমি ভর্জ্জীনার নিকট চিরকালের বিদায় লইতাম, তাহা করিতে না দিলে কেন? তা হলে তো আমি কতক সুস্থ হইতাম, তা হলে তো বলিতে পারিতাম যে 'ভর্জ্জীনি, যদি কখন কোন কথা কহিয়া তোমার মনোদুঃখ দিয়া থাকি তবে এই শেষ দেখার সময় মার্জ্জনা করিয়া যাও। বিধাতার ইচ্ছা যে, তোমার সহিত একত্রে থাকিবার সুখ আমার সাঙ্গ হয়, অতএব এই চরম আভাষণ গ্রহণ কর। তুমি যেখানে যাও, সুখে স্বচ্ছন্দে থাক ইহাই আমার প্রার্থনা।' যখন দেখিল যে জননীরা তাহার কথায় কান্দিয়া উঠিয়াছে, 'যা, হতভাগীরা, চোখের জল পুঁছিয়া দিতে আর কাহাকেও ডাক্। আমি আর তোদের কেহ নহি।' এই বলিয়া আবাসের চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল। যে যে স্থল ভর্জ্জীনার বড় প্রিয় ছিল, সেই সেই স্থল এক এক বার দর্শন করিল। ছাগমিথুন ও শাবক গুলিকে সশব্দে অনুসরণ করিতে দেখিয়া কহিল 'আমার সহচরীকে তোরা আর দেখিতে পাইবি না। তাহার হাতে আর খাইতে পাইবি না।' পরে ভর্জ্জীনীর নিকুঞ্জে গিয়া পক্ষিকুলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল 'হা পক্ষিগণ! তোমাদের জননীভূতা সেই ক্ষামাঙ্গী আর আসিবে না।' গৃহকুক্কুর ইতস্তত দৌড়িতেছে দেখিয়া কহিল 'হায়! তুই তাহাকে আর দেখিবি না।' পরে, গত রাত্রে যে স্থানে দুজনে আলাপ করিয়াছিল, তথা হইতে সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল যে সে জাহাজখানা নাই, অমনি নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। পাছে তাহার দুঃখাবেগ কোন বিষম ঘটনায় পর্য্যবসিত হয় এই ভয়ে আমরা তাহার পাছে পাছে ফিরিতে লাগিলাম। জননীরা অনেক স্নেহচিহ্ন দেখাইলেন অনেক মিষ্ট কথা কহিলেন। পরিশেষে ভর্জ্জীনার জননী 'বৎস' 'জামাতা' ইত্যাদি নামে আহ্বান করিয়া তাহার আশা সঞ্জীবিত করিলেন এবং এই উপায়েই তাঁহার মনোদুঃখ কতক শান্ত হইল। তাঁহার সাধ্য সাধনাতে ঘরে প্রবেশিয়া কিছু আহার করিল। আহারাবসরে, ভর্জ্জীনা বর্ত্তমান ভাবিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক উত্তমোত্তম খাদ্য দিতেছিল, কিন্তু আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া রোদন করিতে লাগিল।

কলিকাতা,—সিমুলিয়া—মণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।

অবোধ-বন্ধু

" করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী ॥"

৩ য় ভাগ] ফাল্গুন, — ১২৭৬। [১১ এ সংখ্যা।

বেকন সন্দর্ভ

১৩। — ধন।

ধন পুণ্যের পক্ষে রসদের বোঝা বই আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। লাটিন ভাষায় উহার নাম "বাধা"। সৈন্যের পক্ষে রসদ যেরূপ পুণ্যের পক্ষে ধনও সেই-রূপ। ইহা ব্যতীত কাজও চলে না এবং ফেলিয়া যাইবারও যো নাই; কিন্তু ইহাতে গমনের অতিশয় ব্যাঘাত জন্মে। ইহার জন্য কখন কখন জয়শ্রী হারাইতে হয় বা উহা লাভ করিবার পক্ষে অনেক গোলযোগ ঘটে। দান ব্যতীত অধিক ধনের আর কোন প্রকৃত ব্যবহার দেখিতে পাই না; অন্যান্য সব কেবল বৃথা কল্পনা মাত্র। সলমন্ বলেন "যেখানে ধন অধিক সেখানে ভোগের লোকও বিস্তর এবং ধনীর কেবল চক্ষে দেখা মাত্রই ফল।" শুদ্ধ নিজে ধন ভোগ করায় অধিক ধনের আস্বাদগ্রহ হয় না; তাহাতে কেবল ধনরক্ষা, ধনবিভাগ, ও ধনদানের ক্ষমতা আছে, এবং ধনী বলিয়া খ্যাতিও হইয়া থাকে: কিন্তু ধনীর পক্ষে প্রকৃত উপকার কিছুই নাই। তুমি দেখিতেছ না যে সর্ব্বসাধারণকে ধনের একটা প্রকৃত ব্যবহার হইতেছে ইহা দেখাইবার জন্য দুষ্প্রাপ্য বস্তু সকল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরও কত মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে এবং কত কত বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ কাজ হইতেছে। তুমি ইহা বলিতে পার, ধন মানুষকে অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার করে; সলমন্ও বলিয়াছেন "ধনীর বিবেচনায় ধন দুর্ভেদ্য দুর্গের স্বরূপ।" তিনি উহা ভালই বলিয়াছেন, কারণ ইহা কেবল ধনীর বিবেচনায়ই মাত্র কাজের নহে। কেননা ধনে লোক নানা বিপদে পড়িয়া থাকে, উহা হইতে উদ্ধার হওয়া অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

কেবল বাহ্যাড়ম্বরের জন্য ধন চাহিও না। যাহা তুমি সদুপায়ে পাও শান্ত

হইয়া ব্যবহার করিতে পার, আহ্লাদপূর্ব্বক বিভাগ করিতে পার, এবং সন্তোষের সহিত রাখিয়া যাইতে পার তাহাই ভাল; কিন্তু যোগী ঋষির মত ধনকে ঘৃণা করিও না। সিসিরো র‍্যাবাইরীয়স্ পস্থিউমসের বিষয়ে যেরূপ বলিয়াছেন সেই রূপে ধন চিনিয়া লও। তিনি বলিয়াছেন র‍্যাবাই-রীয়স্ অর্থ পিপাসা শান্তির জন্য ধন-কামনা করেন নাই; কেবল উদার পরোপকারের জন্যই করিয়াছিলেন। সলমন্ যাহা বলিয়াছেন তাহাও শুন এবং ব্যস্ত হইয়া ধন সংগ্রহ করিও না। তিনি বলেন "যে ধনোপার্জ্জনে অতিশয় ব্যগ্র সে কখন সদুপায়ে ধন সংগ্রহ করিতে পারে না।"

কবিরা বলিয়া থাকেন "দেবরাজ যে ধন দেন তাহা অতিশয় মন্দগামী কিন্তু যাহা মৃত্যুর নিকট হইতে আইসে তাহা দ্রুতগামী" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সদুপায়ে ও সৎপরিশ্রমে যাহা উপার্জ্জন করা যায় তাহাতে অধিক কালবিলম্ব হয় এবং যাহা অন্যের মৃত্যুর দরুন (অর্থাৎ উত্তরাধিকারী হইয়া) পাওয়া যায় তাহা একেবারে আসিয়া পড়ে; অথবা যখন প্রতারণা, উৎপীড়ন ও অন্যান্য অন্যায় উপায় দ্বারা ধন আইসে তখন উহা যেন দৌড়িয়াই আইসে।

ধনী হওয়ার অনেক পথ আছে কিন্তু তাহার অধিকই পাপপূর্ণ। কৃপণতা একটী উৎকৃষ্ট উপায় বটে কিন্তু দোষশূন্য নহে। ইহাতে লোককে উদারাশয় ও বদান্য হইতে দেয় না। ভূমির উর্ব্বরতা দ্বারা ধনোপার্জ্জন করা অতি উৎকৃষ্ট। ইহা, লোকমাতা বসুন্ধরার প্রসাদ স্বরূপ; কিন্তু উহা বহুকালসাধ্য, ধনী লোকে কৃষি আরম্ভ করিলে অতি অল্পকালমধ্যেই বিপুল অর্থাগম হয়। আমি ইংলণ্ডের এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে জানিতাম; আমাদের সময়ে তাঁহার যত মোকাম ছিল এত আর কাহারও ছিল না। তিনি এক জন প্রধান পশুপালক, প্রধান মেষরক্ষক এবং প্রধান কাষ্ঠব্যবসায়ী ছিলেন। পাথরিয়া কয়লা, ভুসা জিনিস, সীসা, লৌহ প্রভৃতি নানাবিধ বস্তুর কারবারও অতিশয় ফলাও ছিল; সুতরাং নিরন্তর আমদানীর পক্ষে পৃথিবী তাঁহার নিকট সমুদ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

এক জন বলিয়াছেন "তিনি অতিকষ্টে অত্যল্পমাত্র ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন কিন্তু সহজেই বড়মানুষ হইয়াছিলেন।" কারণ যখন মানুষের মূলধন এরূপ হইয়া উঠে যে বাজারের সুবিধার অপেক্ষা করিতে পারে এবং অন্যের যাহা পুঁজির বাহির এরূপ সওদাও করিতে পারে অথচ খুচরা ব্যাপারীদিগের পরিশ্রমের অংশভাগী হয় তখন সে অবশ্যই অতুল ধনশালী হইবে সন্দেহ নাই।

সাধারণ বাণিজ্যে অতিসৎ উপায়েই উপার্জ্জন হয়। পরিশ্রম ও সুখ্যাতির দ্বারা তাহার উন্নতিও হইয়া থাকে। কিন্তু চুক্তির কারবারে যাহা লাভ হয় তাহা সর্ব্বাংশে সৎ নহে। উহাতে অন্যের দরকারের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়, চাকরদের নিকট ঘুসও লওয়া হয় এবং চাতুরী

করিয়া অন্য খরিদ্দারকেও তাড়াইতে হয়। এরূপ কার্য্যে ধূর্ত্ততার বিশেষ সংস্রব আছে।

সওদা বদল করার বিষয়, যখন কোন ব্যক্তি কেবল বিক্রয়ের জন্য জিনিস খরিদ করে যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। বখরার কারবারে বিস্তর মুনফা হয় কিন্তু যাহাদের উপর ভার থাকে তাহারা বিশ্বাসী হওয়া চাহি।

সুদের কারবারে নিষ্কণ্টকে লাভ হয়, কিন্তু উহা অতিশয় কুৎসিত ব্যবসা। সুদ-খোর অন্যের পরিশ্রম দ্বারা আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করে; অমাবস্যাতেও উহার লাঙ্গল কামাই হয় না। যদিও ইহা লাভের নিষ্কণ্টক পথ বটে কিন্তু ইহার কতকগুলি দোষও আছে। সময়ে সময়ে দালালরা আপন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত দেউলে-পাড়া খাতককেও আনিয়া দেয়। যাহার অদৃষ্টে নূতন উদ্ভাবন বা বিশেষ স্বত্ব জুটে সময়ে সময়ে তাহার যথেষ্ট অর্থাগম হয়। কানারি দ্বীপে যে প্রথম ইক্ষুর চাষ করিয়াছিল তাহার অদৃষ্টেও ঐ রূপ ঘটিয়াছিল, অতএব যাহার উদ্ভাবনী শক্তি আছে এবং বিবেচনারও অপ্রতুল নাই সেই যথার্থ তার্কিক। সময় বুঝিয়া চলিতে পারিলে সে গুরুতর কার্য্যও সাধন করিতে পারে।

যে নিশ্চিত লাভের উপর নির্ভর করে সে কখন বড় মানুষ হইতে পারে না, এবং যে সর্ব্বস্ব কারবারে খাটায় সে প্রায়ই দেউলে পড়ে ও দরিদ্র হইয়া যায়। অত-এব নিশ্চিত লাভের আশাকে সাহসের উপর প্রহরী রাখা ভাল তাহা হইলেই লোকসান্ সামালিতে পারিবে।

একচেটিয়া ও একেবারে বাজারের সমু-দায় জিনিস খরিদ করা (যেখানে উহা আইনবিরুদ্ধ নয়) ধনী হইবার প্রধান উপায়। বিশেষতঃ লোকের কি অত্যন্ত দরকার যদি তাহা ভাল জানা থাকে ও সেই জিনিস সর্ব্বাগ্রে খরিদ করিয়া গুদামজাত করিয়া রাখা যায় তাহা হইলেও যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা। চাকরী দ্বারা উপার্জ্জনে যদিও উন্নতি হইতে পারে বটে কিন্তু খোসামুদি, মনযোগান কিম্বা অন্যান্য কুৎ-সিত কার্য্য দ্বারা যদি চাকরী লইতে হয় তবে উহা হইতে নীচ কাজ আর নাই। খোসামুদি করিয়া কাহারও উত্তরাধিকার পত্রে নাম লেখান বা গুছি সরবরাহকার হওয়ার বিষয় সেনেকার সম্বন্ধে উত্তম বলি-য়াছিলেন। "সেনেকা উত্তরাধিকার পত্র ও ওছাওতি যেন জাল ফেলিয়া ধরিতেন।" ইহা সকলের অধম; ইহাতে চাকরী অপেক্ষা নীচ লোকের সেবা করিতে হয়।

যাহারা ধনকে ঘৃণা করে তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিও না; কারণ যাহারা ধনোপার্জ্জনে নিরাশ হইয়াছে তাহারাই ধনকে ঘৃণা করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা যখন ধনী হয় তখন তাহাদের মত অর্থ পিশাচ হইতে আর কাহাকেও দেখা যায় না।

তোমার যেন সিকি পয়সা না বাপ হয় না। ধনের পাখা আছে উহা কখন কখন আপনা আপনি উড়িয়া যায় কখন বা অধিক ধনের আশায় উড়াইয়া দিতে হয়।

কেহ কেহ আপন আত্মীয়গণকে ধন দিয়া যান, কেহবা সাধারণের উপকারার্থে দিয়া থাকেন কিন্তু দুই দিকে পরিমিতরূপ দান করাই ভাল। যখন কোন ব্যক্তি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয় তখন যদি তাহার বয়স ও বিবেচনার পরিপাক না হইয়া থাকে তাহা হইলে অনেক অর্থলোলুপ গৃধ্র আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া ফেলে।

অনাথনিবাস, অতিথিশালা প্রভৃতি যদি কেবল জাঁকজমকের জন্য স্থাপিত হয় তাহা হইলে উহা কেবল ভক্তিহীন পূজা মাত্র অথবা বহিশ্চিত্রিত শবমাত্র বলিলেও বলা যায়; উহার ভিতর পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়াছে। অতএব পরিমাণ ধরিয়া তোমার দানশীলতার মাপ করিও না, উহা কতদূর কার্য্যের হইল তাহা ধরিয়া মাপিয়া লও। মৃত্যুকালে দান করিব বলিয়া স্থির হইও না। যদি ভাল করিয়া বিবেচনা কর তবে এরূপ করা কেবল অন্যের ধনে নবাবী মাত্র, নিজের ধনে নহে।

নিসর্গসন্দর্শন।

তৃতীয় সর্গ।

বীরাঙ্গনা।

" কে ও রণমাঝে কার কুলকামিনী,
করে অসি, মুক্তকেশী, দৈত্যকুলনাশিনী!
ভক্ত বলে নিতম্ব তার, আর রণে কাজ নাই,
যে দিকে ফিরিয়া চাই হেরি ঘোররূপিণী! "

উদ্ভট গীত

অযোধ্যা নিবাসী এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ
কাশীতে ছিলেন এসে জীবিকার তরে,
সঙ্গে ছিল বাড়ীর নফর এক জন,
বড়ই মমত্ব তার তাঁহার উপরে।

একদা সায়াহ্নে মণিকর্ণিকার ঘাটে,
করিতে ছিলেন সুখে সু-বায়ু সেবন;
দিনমণি ঝুলে ঝুলে বসিছেন পাটে;
সন্ধ্যার লোহিত রাগ রঞ্জি: : । । .

হঠাৎ জাগিল মনে স্বদেশ স্বঘর,
বন্ধু জন, মিত্রগণ, প্রিয় পরিবার;
প্রিয়া সনে দেখা নাই পঞ্চ সম্বৎসর,
না জানি কি দশা এবে হয়েছে তাহার।

৪

হায়রে কঠিন বড় পুরুষের প্রাণ!
অনায়াসে ফেলে আসি সাধ্বী রমণীরে,
বিদেশে পড়িয়ে করি অর্থের দেয়ান,
সুখে খাই পরি, ভ্রমি সুরনদী তীরে।

বড়ই কাতর হ'ল অন্তর তাঁহার,
বিশ্বের কিছুই আর ভাল নাহি লাগে,
আপনারে ধিক্কার দেন বার বার,
প্রিয়ার পবিত্র মুখ মনে শুধু জাগে।

নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত প্রায় এলেন বাসায়,
সারা রাত হোলোনাক নিদ্রা আকর্ষণ,
শ্বশুর আলয় হতে আনিতে জায়ায়,
করিলেন প্রাতঃকালে ভৃত্যেরে প্রেরণ।

কাশী থেকে সেই স্থান সপ্তাহের পথ,
অবিশ্রামে চলে ভৃত্য গদগদ চিতে,
উত্তরিল সাত দিন না হইতে গত,
বধূ ঠাকুরাণীদের বাপের বাড়িতে।

৮

তারে দেখে বাড়িশুদ্ধ আনন্দে মগন,
পরাণ পেলেন ফিরে বিয়োগিনী সতী,
বহিল শীতল অশ্রু, জুড়াল নয়ন,
দুখিনীরে স্মরেছেন প্রিয় প্রাণপতি।

৯

জনক জননী তাঁর, যতনে, আদরে
করিলেন পথশ্রান্ত দাসের সৎকার;
বসিলে সে সুস্থ হয়ে পানাহার পরে,
সুধালেন জামাতার শুভ সমাচার।

১০

কহিল সে "প্রভু মম আছেন কুশলে,"
আর তার সেখানেতে আসা যে কারণে;
শুনিয়ে হলেন তাঁরা সন্তুষ্ট সকলে;
পাঠালেন পর দিনে কন্যে তার সনে।

১১

কর্ত্রীকে লইয়ে সাথে কৃতজ্ঞ নফর,
পথে করি যথাযোগ্য শুশ্রূষা তাঁহায়,
পদব্রজে চলি চলি অষ্টাহের পর,
দিনান্তে পৌঁছিল আসি কাশীর সীমায়।

১২

কতই আনন্দ হ'ল দুজনের মনে!
এত যে পথের ক্লেশে শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষীণ,
তবু যেন বাড়ে বল প্রতি পদার্পণে,
হস্ত আর মধ্যে আছে ক্রোশ দুই তিন।

১৩

হঠাৎ পশ্চিমে হ'ল মেঘের উদয়,
একেবারে হুহু কোরে জুড়িল গগন
উঠিল ঝটিকা ঘোর প্রচণ্ড প্রলয়,
কল কল করিয়ে উড়িল পক্ষীগণ।

১৪

ধক্ ধক্ দশ দিকে বিদ্যুতের জ্বালা,
কক্কড় অশনির ভীষণ গর্জ্জন,
মম্মড় ভেঙে পড়ে লক্ষ বৃক্ষ-ডালা,
ছটাচ্ছট্ বৃষ্টি শিলা বাঁটুল বর্ষণ।

১৫

দেখে সে প্রলয় কাণ্ড ভৃত্য হতজ্ঞান,
কি রূপে কর্ত্রীকে লয়ে উত্তরিবে বাসে,
ভেবে আর কিছু তার না পায় সন্ধান,
মাথা ধোরে বসিল সে প্রান্তরের ঘাসে।

১৬

ব্যাকুল হেরিয়ে তারে ধীরা ধৈর্য্যবতী
কহিলেন "কেন তুমি হইলে এমন,
উঠ বেটা, ভয় নেই, চল করি গতি!
এ বিপদে তারিবেন বিপদ তারণ!"

১৭

হয়েছিল নফর চিন্তিত যার তরে,
তাঁহারি মুখেতে শুনি প্রবোধ বচন,
দ্বিগুণ বাড়িল বল হৃদয় ভিতরে,
দাঁড়ায়ে করিল কোশে কোমর বন্ধন।

১৮

"চল মাঁয়ি ঠাকুরাণী! চল যাব আমি;
ঝঞ্ঝা ঝটিকারে করি অতি তুচ্ছজ্ঞান;
চাহিয়ে আছেন পথ আপনার স্বামী;
তাঁর তরে দিতে হলে দিই আমি প্রাণ।"

১৯

পরস্পর উৎসাহে উৎসাহী পরস্পরে,
ঝড়ের সঙ্গেতে বেগে করিল পয়ান,
দৃক্‌পাৎ নাই সেই দুর্য্যোগ উপরে,
অটল মনের বলে মহা বলবান্।

২০

যেরূপ বীরের ন্যায় করিছে গমন,
পথ হারাইয়ে যদি নাহি পড়ে ফাঁদে,
অবশ্য এ রাত্রে পাবে প্রভু দরশন ;
বোধ করি বিধি বুঝি সাধে বাদ সাধে।

২১

যে প্রকার মরুভূমে মায়া মরীচিকা
ভুলায়ে পথিকে ফেলে বিষম ফাঁপরে,
সেই রূপ অন্ধকারে বিদ্যুৎ লতিকা
ইহাদের দিশেহারা করিল প্রান্তরে।

২২

এই মাত্র আলো, এই ঘোর অন্ধকার,
মাঠেতে বেড়ায় ঘুরে চোকে ধাঁদা লেগে;
অটল সাহসীদ্বয় নিতান্ত নাচার!
ততই বিপাকে পড়ে, যত যায় বেগে।

২৩

যতই হয়িছে ক্রমে যামিনী গভীর,
ততই বাদল-বেগ যাইতেছে বেড়ে ;
তোলপাড় ত্রিভুবন, ধরিত্রী অধীর,
প্রকুপ্ত নিয়তি যেন আসিতেছে তেড়ে।

২৪

মানুষের বুকে আর কত ধাক্কা সয়,
যুঝে যুঝে এলাইয়ে পড়িল তাহারা ;
নির্ভয় হৃদয়ে হ'ল ভয়ের উদয়,
ক্ষণ পরে সেই স্থানে প্রাণে যাবে মারা!

২৫

অহহ মনের সাদ মনেই রহিল!
দেখা আর হোলোনাক প্রিয় প্রভু সনে,
প্রায় তাঁর কাছে এসে তাহারা মরিল,
তাহা তিনি জ্ঞাত নন এখন স্বপনে!

২৬

"ওহে ক্রুদ্ধ ভূতগণ, প্রাণ নেবে নাও!
রণস্থলে জান্ দিতে মোরা নাহি ডরি ;
প্রার্থনা, এ বার্ত্তা গিয়ে প্রভুকে জানাও!
রয়েছেন চেয়ে তিনি আশা পথ ধরি।"

২৭

নিশাদের শরাহত কুরঙ্গের প্রায়,
জীবনে নিরাশ হয়ে চায় চারি ভিতে ;
এক বার ঘুরে পড়ে, আর বার ধায়,
সহসা আলোক এক পাইল দেখিতে।

২৮

বোধ হয় জ্বলে ছুরে, ঘরের ভিতরে,
বায়ে কেঁপে কেঁপে যেন ডাকিছে নিকটে
ধাইল সে দিকে তারা উৎসুক অন্তরে,
নৌকাডুবি লোক যেন উঠে আসে তটে।

২৯

যে ঘরের আলো সেই, সেটা থানা ঘর,
চ্যারাকেতে সলতে জ্বলে টিনের লেণ্ঠানে ;
চার জন নেড়ে ব'সে তক্তার উপর,
খাটিয়ায় দেড়ে এক গুড়গুড়ি টানে।

৩০

কেলেমুস্কি, বেঁটে, ভুঁড়ে, চোক কুৎ কুৎ,
ঘাড়ে গদ্দানেতে এক, হাঁস্‌ফাঁস্ করে,
ভালুকের মত রোঁয়া, আস্ত মাম্‌দো ভূত,
নবাবের ঢঙে বোসে ঠমকের ভরে।

৩১

বেঁকান জাম্‌দানি তাজ্ শিরের উপর,
গালভরা পান, পিক্ দাড়ি বেয়ে পড়ে,
লতেছেন উৎকোচের হিসাবপত্তর,
মুখেতে না ধরে হাসি, ঘাড় দাড়ি নড়ে।

৩২

এমন সময়ে সেথা পোঁছিল দুজন,
সর্ব্বাঙ্গ শলিলে আর্দ্র, শ্বাসগত প্রাণ,
বলিল "রক্ষ গো ! মোরা নিলেম শরণ,
মনে নাহি ছিল আজি পাব পরিত্রাণ।

৩৩

দেখা মাত্র হিহি কোরে সবাই হাসিল,
কেহই দিলনা কাণ করুণ কথায়,
থানার বাহিরে এক ভাঙা কুঁড়ে ছিল,
হইল হুকুমজারি থাকিতে তাহায়।

৩৪

তখনো দেয়ার ভাব রয়েছে সমান ;
কুঁড়েতে বিরক্ত হয়ে গেল দুজনায় ;
কাপড় নিংড়িয়ে, সেই জল করি পান,
ভিতরে শুলেন কর্ত্রী নফর দাওয়ায়।

৩৫

শোবা মাত্র শিথিলিয়ে আসিল শরীর,
পর ক্ষণে হ'ল ঘোর নিদ্রা আকর্ষণ ;
এত যে ঝড়ের তোড়ে নড়িছে কুটীর,
তবু তাহে একটুও নাহিক চেতন।

৩৬

এই রূপে দুই জনে গভীর নিদ্রায়
অভিভূত হয়ে পোড়ে আছে ধরাতলে,
সজোরে বাজিল লাথি নফরের গায়,
পড়িল হাঁটুর চাপ চেপে বক্ষস্থলে।

৩৭

চম্‌কে ভৃত্য গোঁগোঁ কোরে নয়ন মেলিল,
দেখিল চেপেছে এক অস্ত্রধারী নেড়ে ;
ধড় মড় কোরে তারে আছাড়ে ফেলিল,
দাঁড়াল ঘোরায়ে লাঠি ঘর দ্বার বেড়ে।

৩৮

চেয়ে দেখে সেই সব থানার নচ্ছার,
বলেতে পশিতে চায় উটজ ভিতরে ;
কারো হাতে আলো, কারো লাঠি, তরওয়ার,
হানিতে উদ্যত অস্ত্র তাহার উপরে।

৩৯

"রহ রহ" বোলে ভৃত্য হাঁকাইল লাঠি,
লাঠি খেয়ে আগুয়ান্ গুঁড়ো হয়ে গেল,
দেখে তাহা দুরাত্মারা শস্ত্র বস্ত্র আঁটি,
চারিদিকে ঘেরে একেবারে ধেয়ে এল।

৪০

যুঝিতে লাগিল দাস মহা পরাক্রমে,
"উঠ মাঁয়ি, রহডাকু," ঘন ঘন হাঁকে,
লাফায়ে লাফায়ে বেগে মহনে আক্রমে,
চোঁ চোটে ধড়াধ্বড় শুষে লাঠি হাঁকে।

৪১

হঠাৎ বাজিল বুকে অস্ত্র খরধার,
ঠিকরে পড়িল এসে ঘরের দ্বারেতে ;
"যাঁর জন্যে মরি, তাঁরে রক্ষ ভগবান্ !
কেরে এ পাপেরা—" কথা রহিল মুখেতে।

৪২

কোলাহলে নিদ্রাভঙ্গ হইল নারীর,
দেখিলেন সেই সব দুরন্ত ব্যাপার,
জ্বলিল ক্রোধাগ্নি হৃদে, কাঁপিল শরীর,
গ'র্জ্জে উঠে ছাড়িলেন প্রচণ্ড হুঙ্কার।

৪৩

সিংহী যদি গুহামুখে শিকারীকে দেখে,
যে প্রকার বেগে এসে করে আক্রমণ,
হুহুঙ্কারে বীরাঙ্গনা ছুটে কুঁড়ে থেকে,
অস্ত্র কেড়ে, করিলেন দেহকে ছেদন।

৪৪

এক চোটে মুণ্ড তার হ'ল দুই চির,
খিচিয়ে উঠিল দাঁত, চিতিয়ে পড়িল,
ধড়্‌ফড়্ করে ধড়, নিকলে রুধীর,
ভিস্তির মোসক প'ড়ে গড়াতে লাগিল।

৪৫

যারা ছিল, ছুট দিল বাঁচাইতে প্রাণ,
তাড়িলেন মুক্তকেশী পিছনে পিছনে,
মাঝপথে করিলেন কেটে খান্ খান্,
লাগিলেন চিৎকার করিতে ক্ষণে ক্ষণে

৪৬

সে সময়ে ঝড় বৃষ্টি থেমেছে সকল,
পূর্ব্ব দিকে হইতেছে অরুণ উদয়,
ধরেছে প্রশান্ত ভাব ধরণী মণ্ডল,
যেন তাঁরি ভয়ে বায়ু ধীর হয়ে বয়।

৪৭

চিৎকারে ভাঙ্গিল লোক কলকল স্বরে,
দেখিল মাঠেতে কাটা যবন ক জনে,
রক্তমাখা নারী এক, তরওয়ার করে,
শবের উপরে চেয়ে গর্ব্বিত নয়নে।

৪৮

সকলেরি ইচ্ছা তার জানিতে কারণ,
সাহস না হয় গিয়ে জিজ্ঞাসিতে তাঁয়;
ভিড়েতে ছিলেন সেই শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ,
দূরে থেকে চিনিলেন নিজ বনিতায়।

৪৯

ধাইলেন ঊর্দ্ধশ্বাসে তাঁরে লক্ষ্য করি;
হেরে সতী প্রিয় প্রাণপতিরে আসিতে,
ধেয়ে এসে আলিঙ্গিয়ে রহিলেন ধরি;
লাগিলেন অশ্রুজলে উভয়ে ভাসিতে।

ইতি নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে বীরাঙ্গনা
নামক তৃতীয় সর্গ।

[চতুর্থ সর্গের কবিতাগুলি গত বৈশাখের পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া এ স্থলে উহা পরিত্যক্ত হইল।]

পঞ্চম সর্গ।

ঝটিকার রজনী, পর দিনের প্রভাত।
(১০ ই কার্ত্তিক [১২৭৪ সাল] ১১ ই কার্ত্তিক।)

"Thou wert not sent for slumber!"
লর্ড বায়রন্।

এ কিরে প্রলয় কাণ্ড আজি নিশাকালে!
সেই সর্ব্বনেশে ঝড় উঠেছে আবার;
সমুদ্র উথুলে যেন ঘরের দেয়ালে,
পড়িছে গর্জ্জিয়া এসে বেগে অনিবার!

২

সোঁসোঁ সোঁসোঁ দমকের উপরে দমক,
খড়্‌খড়্ খোলা পড়ে, কোঠা ঝড়্‌ঝড়্,
মানবের আর্ত্তনাদ ওঠে ভয়ানক,
লণ্ডভণ্ড চতুর্দ্দিক্, বিশ্ব তোলপাড়্।

সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বৃষ্টির ঘোরঘটা,
তড়্বড় কশাঘাৎ ছাদে, ঘরে, দ্বারে,
উঃ কি বিকটতর শব্দ চটচটা !
হুলস্থূল তুমুল বেধেছে একেবারে।

৪

যেন আজ আচম্বিতে দৈত্যদানাদল,
মত্ত হয়ে লাফাতেছে শূন্য মার্গোপরে ;
ভূমণ্ডলে ধরি ধরি, করি কোলাহল,
ভাঁটার মতন নিয়ে লোফালুফি করে।

৫

প্রচণ্ড প্রতাপ তব দেব নভস্বান্ !
বুঝি আজ ধরাধাম যায় রসাতল,
সুর নর যক্ষ রক্ষ সবে কম্পমান্,
ওলট পালট প্রায় গগন মণ্ডল।

৬

সাধে কি সেকালে লোকে পুজেছে পবন,
এর চেয়ে দেখিয়াছে তুমুল ব্যাপার,
ভয়ে আর বিস্ময়ে ঘুলিয়া গেছে মন,
স্তব্ধ হয়ে নমিয়ে করেছে নমস্কার।

শোলার মানুষ গুলো কম চেঁটা নয়,
ফাঁনুষ ছুটাতে চায় তোমার হৃদয়ে,
কোথা তারা, আসুক্ বাহিরে এ সময়,
দাঁড়ায়ে দেখুক চেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে।

৮

দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই পড়িবে, মরিবে,
রহিবে মনের আশা মনেই সকল ;
হায় সেই আর্ত্তরাব কে আর শুনিবে !
চতুর্দ্দিকে কেবল তোমার কোলাহল।

অহহ, এখন কত হাজার হাজার,
চারি দিকে মহাপ্রাণী হারাইছে প্রাণ !
এই শুনি আর্ত্তনাদ এক এক বার,
বোঁবোঁ শব্দে পুন তুমি পূরে দাও কাণ।

১০

অনল তোমার বলে দাউ দাউ দহে,
সমুদ্রের লাফালাফি তোমারি কৃপায়,
চলে বলে জীবলোক তব অনুগ্রহে,
তুমি বাম হ'লে সবে জীবন হারায়।

১১

বিচিত্র হে লীলা তব জগতের প্রাণ !
তুমিই না গুড়ি গুড়ি কুসুম কাননে
পশিয়ে, রসিয়ে গাও প্রণয়ের গান,
চুম্বি চুম্বি ফুলকুল প্রফুল্ল আননে ?

১২

তুমিই না শোকার্ত্তের বিজন কুটিরে,
কাতর করুণ স্বরে শোক-গান গাও,
সদয় হৃদয়ে তার অতি ধীরে ধীরে,
নয়নের তপ্ত অশ্রু মুচাইয়ে দাও ?

১৩

তুমিই না ছেলেদের ঘুমের বেলায়
“ঘুমপাড়ানী মাসীপিসী” গাও কাণেকাণে,
বুলাও ফুর্ফুরে হাত শুড়শুড়িয়ে গায় ?
তাতেই তাদের চোকে ঘুম ডেকে আনে !

১৪

আজি কেন হেরি হেন ভীষণ আকার,
যেন হে তোমার ঘাড়ে চাপিয়াছে ভূতে,
বাড়ী ঘর দুদ্দাড় করিছ চুর্ম্মার,
জীবজন্তু হায় হায় ফেলিতেছ পুঁতে।

১৫

মধুর প্রকৃতি যাঁর উদার অন্তর,
সহসা হেরিলে তাঁরে দুর্দ্দান্ত মাতাল,
যেমন হইয়া যায় মনের ভিতর,
তেমনি হতেছে হেরে তোমার এ হাল।

১৬

তবু আহা প্রেয়সীর কোল আলো করি,
গলায় আমার যাদু অবিনাশ মণি!
দেখোরে পবন এই উগ্র মূর্ত্তি ধরি,
করোনা বাছার কাণে কোলাহল ধ্বনি!

১৭

এই যে প্রেয়সী তুমি বসেছ উঠিয়ে,
চুপ্‌কোরে থাক, বড় বহিতেছে ঝড়,
অবিন্ এখনো বেশ আছে ঘুমাইয়ে,
চমকিয়া উঠে পাছে করে ধড়্‌ফড়্।

১৮

"তাইতো বেধেছে এ যে কাণ্ড ভয়ঙ্কর,
হয়েছে ভুকম্প নাকি, কেঁপে কেন ওঠে—
দেয়াল দেরাজ শেষ করে থথ্‌থর,
দুলিছে কি বাড়ী ঘর ঝড়ের ঝাপোটে?"

১৯

তাহাই যথার্থ বটে, ভূকম্প এ নয়;
যেই মাত্র ঝট্‌কা ঝড় আসে বেগভরে,
অমনি আমূল বাটী প্রকম্পিত হয়,
ঘর দ্বার জান্‌লা আন্‌লা থথ্‌থর করে

২০

খাটে শুয়ে আছি, দেখ বন্ধ আছে ঘর,
তবুও দুলিছে খাট লইয়ে আমায়;
বেশ তো, রয়েছি যেন বজ্‌রার ভিতর,
টল টল করে তরী লহরী-লীলায়!

২১

'আশ্বিনে ঝড়ের দিনে দুপর বেলায়,
দুলে উঠে ছিল সব শুদ্ধ এই পাকে!
ভাবিলেম তখন দুলিছে কল্পনায়,
যথার্থ দুলিলে কোঠা কতক্ষণ থাকে!

২২

"সে ভ্রম সম্পূর্ণ আজি ঘুচিল আমার;
মৃদুল হিল্লোলে দোলে পাদপ যেমন,
প্রচণ্ড বাত্যার ধাক্কা খেয়ে অনিবার
ভুধর অবধি পারে দুলিতে তেমন।"

২৩

রেখে দাও ভুধর, ভুধর কোন্ ছার,
ভূপৃষ্ঠের যে ভাগে বাজিছে এই ঝড়,
সেই ভাগ অবশ্য কাঁপিছে বারবার;
নহিলে কি বাড়ীঘর করে ধড়্‌ফড়্?

২৪

"এতেও তামাসা, এ তামাসা এল কিসে?
কিম্বা ঝড়ে বাড়ী যার দুলে প'ড়ে মরে,
সে কি না তরঙ্গে তরী দোলায়ে হরিবে,
আনন্দে দুলিছে বসি তাহার ভিতরে!!"

২৫

দুলুক্ উড়ুক্ আর, তাহে ক্ষতি নাই,
কিছুতেই তোমার কাঁপেনা যেন বুক্;
কাকুতি মিনতি ভাই শুনিতে না চাই,
নাহি যেন কোরে বোস কাচুমাচু মুখ।

২৬

বহুক্ বহুক্ বাত্যা আপনার মনে,
এস প্রিয়ে মোরা কোন অন্য কথা কই;
জলে কিছু পড়ি নাই, পশি নাই বনে,
ঘরের ভিতরে কেন ভয়ে ম'রে রই?

২৭

"কি ভয় আমার, আমি তোমার সঙ্গিনী,
তুমি যা করিবে নাথ, তাহাই করিব ;
নেমে যেতে চাও, চল নামিব এখনি ;
এখানে বসিয়ে থাক, বসিয়ে রহিব।"

২৮

দেখিতেছি মনে তুমি পাইয়াছ ভয়,
আমার কথায় আছ কাষ্ঠ ধৈর্য্য ধরি,
ধক্ ধক্ ঘন ঘন নড়িছে হৃদয়,
নিশ্বাস পড়িছে দীর্ঘ উপরি উপরি।

২৯

"এ ভয় কেবল নয় আপনার তরে,
যেই আমি চেয়ে দেখি অবিনের পানে,
বুকের ভিতর অগ্নি ওঠে ছ্যাঁৎ ক'রে,
একেবারে কিছু আর থাকেনাক প্রাণে।

৩০

"বাছারে দুদের ছেলে অবিন্ আমার,
কিছুই জানেনা যাদু কি হয় বাহিরে,
ঘোরঘটা কোরে ঝড়ী শিয়রে তোমার,
গর্জ্জিয়া রাক্ষসী যেন বেড়াইছে ফিরে!"

৩১

হা ভীরু, হইলে দেখি বিষম উতলা!
গোলকোরে ছেলেটীর ভাঁঙাইবে ঘুম,
যুক্তি কথা বোঝনা কেবল কলকলা,
ঝড়ের অধিক তুমি লাগাইলে ধুম।

৩২

"আমি হে অবলা, তাই হইয়াছি ভীতা,
ভীতু বোলে কেন আর কর অপমান!
যে ঝড়ে পৃথিবী দেবী আপনি কম্পিতা,
সে ঝড়ে আমার কেন কাঁপাবে না প্রাণ?

৩৩

"বল দেখি এ দুর্জ্জয় ঝড়ের সময়ে,
বোসে এই তেতলার টঙের উপর,
কোন্ রমণীর ভয় হয় না হৃদয়ে?
কত কত পুরুষের কাঁপিছে অন্তর।"

৩৪

এবার দিয়েছ দেখি কবিত্বেতে মন,
চলেছে পদের ছটা কোরে গগ্‌গড়্,
আঁটিয়া উঠিতে আমি নারিব এখন ;
সরস্বতী স্বজাতির পক্ষপাতী বড়!

৩৫

"কবিরা অমন ঢের জানে নানা তর,
যাহার যেটুকু পুঁজি নাড়া দেয় তার ;
কেবল ভামিনী নহে গর্ব্বে গরগর,
পুরুষেরো আছে সখা বেতর ঠ্যাকার।

৩৬

"ক্রমেই দেখনা নাথ বেড়ে গেল ঝড়,
এখানে থাকিতে আর বল কোন্ প্রাণে ;
বুকেতে ঢেঁকীর পাড় পড়ে ধড়্ফড়্,
চৌদিকের কোলাহলে তালালাগে কাণে।

৩৭

"ঝন্‌ঝড়্ ঝঝড় ঝড়ের ঝন্‌ঝড়ি,
খপ্‌খড় খখড়্ খানরেল্ খপখড়ে,
তত্তড়্ ততড়্ বৃষ্টির তব্বড়ি,
দুদ্দুড়্ দুদুড়্ দেয়াল দুলে পড়ে।

৩৮

"ভয়েতে আমার প্রাণ যাইছে উড়িয়া,
আপত্তি করোনা আর দোহাই দোহাই ;
ধীরে ধীরে অবিনিরে বুকেতে করিয়া,
তড়বড়ি নেমে চল নীচেতে পালাই।"

৩৯

রোসো তবে একটু আর, থামো, দেখি দেখি,
বাহিরে এখন সখি বিষম ব্যাপার ;
বিপদ এড়াতে পাছে বিপদেই ঠেকি,
যেমন ঝড়ের ঝট্‌কা, তেমনি আঁধার ।

৪০

কে জানে কি ভেঙে চূরে পড়িছে কোথায়,
হয় তো প্রাচীর এসে পড়িবেক ঘাড়ে,
নয় তো উঠিব গিয়ে ইঁটের গাদায়,
টাল্‌খেয়ে ছেলেশুদ্ধ পড়িব আছাড়ে ।

৪১

তার চেয়ে হেথা থাকা ভাল কিনা ভাল,
আপনার মনে তুমি ভেবে দেখ প্রিয়ে,
লেণ্ঠান নিকটে নাই, যাবেনাক আলো,
বিপদ বাড়াবে বৃথা বাহিরেতে গিয়ে ।

৪২

আমরা তো ব'সে আছি রাজার মতন,
নূতন-গাঁথন দৃঢ় কোঠার ভিতর ;
না জানি বহিছে বাত্যা করিয়া কেমন,
দুখীদের কুটীরের চালের উপর ।

৪৩

আহা তারা কোথা গিয়ে বাঁচাইবে প্রাণ,
ছেলে পুলে নিয়ে এই ঘোর অন্ধকারে ;
এ দুর্যোগে কে এসে করিবে পরিত্রাণ,
সকলেই ব্যতিব্যস্ত লয়ে আপনারে !

৪৪

যাহারা এখন হায় জাহাজে চড়িয়া,
ঘুরিতেছে সমুদ্রের তরঙ্গ চক্কে ;
জানি না কেমন করে তাহাদের হিয়া,
এ দুরন্ত ঝটিকার প্রচণ্ড দমকে !

৪৫

হয় তো তাদের মাঝে কোন কোন ধীর,
বসিয়া আছেন বেশ অটল হৃদয়ে ;
আমরা এখানে প্রিয়ে হয়েছি অস্থির,
ক্ষণে ক্ষণে কাঁপে প্রাণ মরণের ভয়ে !

৪৬

অয়ি ধীরা, কোথা তব সে ধৈর্য্য এখন,
যার বলে স্থির থাক বিপদে সম্পদে ;
নিশি যাবে নিরাপদে দৃঢ় কর মন,
অধীর হইলে ক্লেশ বাড়ে পদে পদে ।

৪৭

অবিনু আমারো প্রাণ, প্রিয় বংশধর,
অমঙ্গল ভাবিতেও ফেটে যায় হিয়ে ;
ভাঙ্গিয়া পড়িলে ঘর উহার উপর,
আমি কি তা চুপ্‌কোরে দেখিব বসিয়ে !

৪৮

আমরা এ ঘর প'ড়ে যদি মারা যাই,
ওপারের সখাও সেথায় মারা যাবে ;
ত্রিশূন্যে তাহারো ঘর ঠেকা ঠেশ নাই,
কে তাঁরে দেখায়ে ভয় সহজে নামাবে ?

৪৯

তোমারো দিদির দশা দেখ দেখি ভেবে,
তাঁদেরো তো ঘরগুলি কম শূন্যে নয় ;
যদিও প্রাণের দায়ে ভয়ে যান্ নেবে,
উপর পড়িলে নীচে জীবন সংশয় ।

৫০

অমন মধুর, আহা অমন উদার,
প্রাণধন মিত্র সব যদি চ'লে যায় ;
জীর্ণারণ্য হবে তবে এ সুখ সংসার :
কি লয়ে ধরিব প্রাণ বিজন ধরায় !

৫১

একা ভেকা হয়ে আমি বাঁচিতে না চাই,
মরি যদি সকলের সঙ্গে যেন মরি ;
যত খুষি ঝোড়্, ঝড়ি ! লাফাই ঝাঁপাই,
মরীয়া মেজাজ মোর, তোরে নাহি ডরি

৫২

আশ্বিনে ঝড়ের * মাঝে জন্মিল অন্তরে
নিসর্গের উগ্র মূর্ত্তি দর্শন লালসা ;
সেই মহা কৌতূহল সমাবেগ ভরে,
বাটীর বাহির হয়ে ধায়িনু সহসা।

৫৩

উঃ যে প্রচণ্ড কাণ্ড হেরিনু তখন !
কথায় বুঝান তাহা বড়ই কঠিন ;
চিত্রিতে নারিলে স্পষ্ট কষ্ট পায় মন ;
তাই পাকে সে কথা তুলিনি এত দিন।

৫৪

যেই মাত্র দাঁড়ায়েছি সদর রাস্তায়,
দুধারে দুলিতে ছিল যত বাড়ী ঘর,
হুড়মুড় কোরে এল গ্রাসিতে আমায় ;
বোঁবোঁ কোরে ইটে কাঠে ছায়িল অম্বর।

৫৫

ছুটিলাম ঊর্দ্ধশ্বাসে গঙ্গাতটোদ্দেশে,
পোড়ে উঠে লুঠে লুঠে ঝড়ের চক্কায়,
ক্রমিক পিছনে যেন তোড়ে বান্ এসে,
ফেনার মতন মোরে মুখে কোরে ধায়।

৫৬

মাথার উপর দিয়ে গড়ায়ে তখন,
বৃষ্টি মেঘ ইট কাঠ এক স্তরে জুটে,
ধেয়েছে প্রচণ্ড, চণ্ড বেগে বন্ বন্,
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন চলিয়াছে ছুটে

৫৭

ঘাটে গিয়ে দেখি, তার চিহ্ন মাত্র নাই,
কেবল অসংখ্য নৌকা পোড়ে সেই স্থানে
গাদাগাদি কাঁদাকাদি কোরে এক ঠাঁই,
রহিয়াছে স্তূবাকার পর্ব্বত প্রমাণে।

৫৮

নৌকার গাদায়—কাঠ খড়ের গাদায়,
হামাগুড়ি টেনে আমি উঠিনু উপরে ;
দাঁড়ালেম চেপে ভর দিয়ে দুই পায়,
বাম হস্তে দৃঢ় এক কাষ্ঠদণ্ড ধ'রে।

৫৯

উত্তাল গঙ্গার জল গোর্জ্জে কল্ কল্,
চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে কোরে তোল্‌পাড়্,
বোঁবোঁ কোরে টেনে এনে জাহাজ সকল,
দুরায়ে চড়ায় তুলে মারিছে আছাড়।

৬০

মস্মড্ মাস্তুল ভাঙ্গি তালগাছ পড়ে ;
ডেক্ কাম্‌রা চুর্ম্মার, উৎক্ষেপ প্রক্ষেপ
মাল্লা সব কাটাকই ধড়্‌ফড়ে রড়ে ;
"হাল্লা, লা, লা, হেল্‌প্ হেল্‌প্ হেল্‌প্ !"

৬১

প্রত্যক্ষেতে এই সব দেখিয়া শুনিয়া,
বিস্ময়ে বিষাদে খেদে ভেরে এল মন,
শরীর উঠিল শিয়ে ঝিম্ ঝিম্ করিয়া ;
নেত্রপথে ঘুরিতে লাগিল ত্রিভুবন।

* ১২৭১ সাল, ২০ এ আশ্বিন বেলা এগারটার সময় যে ভয়ঙ্কর ঝড় আরম্ভ হইয়া বেলা পাঁচটার পর শেষ হয়, তাহার নাম আশ্বিনে ঝড়।

৬২

তখন আমার এই বুকের পাটায়,
যাহা তব চিরপ্রিয় কুসুম শয়ন,
দমকে দমকে এসে প্রতি লহমায়,
বাজিতে লাগিল ঝড় বজ্রের মতন।

৬৩

ছাতি যেন কাটে ফাটে, শুয়ে পড়ি পড়ি,
হাতে পায়ে পাশে খাল ধরিতে লাগিল
হঠাৎ দমক এক এসে দড়বড়ি,
পুত্তলির মত মোরে ছুড়ে ফেলে দিল।

৬৪

একি একি, প্রিয়ে তুমি কাতর নয়ানে,
কেন কেন করিতেছ অশ্রু বরিষণ;
দেখ আমি মরি নাই, বেঁচে আছি প্রাণে;
করুণায় আর্দ্র তবু কেন তব মন!

৬৫

অয়ি আদরিণী, মনোমোহিনী আমার,
নয়ন শারদ শশী, হৃদয় রতন!
অতীতের দুখ মম স্মরোনাক আর,
ধুয়ে ফেল ম্লান মুখ, মুছ বিলোচন!

৬৬

পুন সেই সুমধুর স্বর্গীয় সুহাস,
খেলিয়া বেড়াক্ ওই পল্লব অধরে;
ভাসুক্ উষার চারু তৃপ্তিময় ভাস
বিকসিত কমলের দলের উপরে।

৬৭

"বুঝিছে প্রভাত নাথ হ'ল এতক্ষণে;
ওই শুন মানুষের কলরব ধ্বনি;
বাতাসেরো ডাক আর বাজেনা শ্রবণে;
কার মনে ছিল আজ পোহাবে রজনী

৬৮

"তরুণ অরুণ আহা হইবে উদয়,
শান্তিময়ী উষার ললাট আলো করি!
পরাণ পাইবে ফিরে প্রাণী সমুদয়,
তাঁর মুখ চেয়ে সবে আছে প্রাণ ধরি।

৬৯

"এত যে ধরণী রাণী পেয়েছেন দুখ,
হারাইয়ে তরু লতা চারু আভরণ;
তবুও হেরিয়ে আজি অরুণের মুখ,
বিকসিত হবে তাঁর বিষণ্ণ আনন।

৭০

"পবনও তাঁরে হেরে যাবে চমকিয়া,
আপনার দোষ বেশ বুঝিতে পারিবে;
ভয়ে লাজে খেদে দুখে মরমে মরিয়া,
ধীরে ধীরে চারিদিকে কেঁদে বেড়াইবে।

৭১

"হায় অভাগিনী, কেন আপনা পাসরি,
করিলেম কথাকাটাকাটি মুখে মুখে,
আহা ক্ষমা কর নাথ, ধরি করে ধরি,
না জানি কতই ব্যথা পেয়েছ হে বুকে।"

৭২

একি প্রিয়ে! কেন হায় পাগলিনী প্রায়,
মিনতি বিনতি মোরে কর অকারণ!
কই তুমি কিছুই তো বলনি আমায়,
কয়েছ সকল কথা কথার মতন।

৭৩

অয়ি, অয়ি, অয়ি আত্মগুণাবমানিনী!
তব সুললিত সেই বীণারঝঙ্কার,
যেন প্রবাহিত হ'য়ে সুধা প্রবাহিনী,
পূর্ণ করি রাখিয়াছে হৃদয় আমার।

৭৪

বস প্রিয়তমে, তুমি অবিনের কাছে :
যাই আমি দেখি গিয়ে ছাতের উপর
চারি দিক না জানি কেমন হয়ে আছে,
এই ঘোর ভয়ঙ্কর প্রলয়ের পর।

৭৫

কই, ভাল হয় নাই ফরসা তেমন,
এখনও বেশ জোরে বহিছে বাতাস,
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিবিন্দু হয়িছে পতন,
জলে মেঘে ঘোলা হয়ে রয়েছে আকাশ।

৭৬

হেরিয়া নিসর্গ দেব সংসারের প্রতি
পবন-দুর্দ্দান্ত-পুত্র-কৃত অত্যাচার, *
দাঁড়ায়ে আছেন যেন হয়ে ভ্রান্তমতি,
নিস্তব্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি, বিষণ্ণ বদন।

৭৭

ধরা অচেতনা হয়ে প'ড়ে পদতলে,
ছিন্নভিন্ন কেশ বেশ, বিকল ভূষণ,
লাবণ্য মিলায়ে গেছে আনন কমলে,
বুঝি আর দেহে এঁর নাহিক জীবন।

৭৮

দিগঙ্গনা সখীগণে মলিন বদনে,
স্তব্ধ হয়ে দূরে দূরে দাঁড়াইয়ে আছে,
অবিরল অশ্রুজল বহিছে নয়নে;
যেন আর জন প্রাণী কেহ নাই কাছে।

৭৯

হা জননী ধরণী গো কেন হেন বেশ,
কেন মা পড়িয়ে আজি হয়ে অচেতন;
জানি না কতই তুমি পাইয়াছ ক্লেশ,
কত না কাতর হয়ে করেছ রোদন!

৮০

কি কাণ্ড করেছ রেরে দুরন্ত বাতাস!
স্থল জল গগন সকল শোভাহীন,
ভূচর খেচর নর বেতর উদাস,
ব্রহ্মাণ্ড হয়েছে যেন বিষাদে বিলীন।

৮১

ওই সব বিশীর্ণ প্রাসাদ পরম্পরা,
দাঁড়াইয়ে ছিল কাল প্রফুল্ল বদনে;
আজ ওরা লণ্ডভণ্ড, চূর্ণ্মার করা,
হাতী যেন দ'লে গেছে কমল কাননে!

৮২

একি দশা হেরি তব উপবনেশ্বরী,
কাল তুমি সেজে ছিলে কেমন সুন্দর!
বিবাহের মাঙ্গলিক বেশ ভূষা পরি,
যেমন রূপসী ক'নে সাজে মনোহর;

৮৩

সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে একেবারে,
প্রাণত্যেজে প'ড়ে আজি কেন গো ধরায়!
সাধের বাসর ঘরে কোন্ দুরাচারে,
এমন করিয়ে খুন্ করেছে তোমায়!

* আমরা এই কবিতায় নিসর্গের যে মূর্ত্তি চিত্র করিতে যত্ন পাইয়াছি, 'অত্যাচারের' পরিবর্ত্তে উৎপীড়ন শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহার ঔদার্য্যের হ্রাস হয়; সেই মারাত্মক দোষের পরিহারার্থ মিলদোষ স্বীকার করিলাম।

"অল্পস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছন্
বিচারমূঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বম্।"

৮৪

খোলার কুটীর ওই সব গেছে মারা,
ভেঙে চুরে প'ড়ে আছে হয়ে অবনত;
না জানি উহায় কত গরিব বেচারা,
ঘুমাইগে আছে হায় জনমের মত !

৮৫

কাল তারা জানিত না স্বপনে কখন,
উঠিয়াছে অন্নজল চিরকাল তরে ;
জননীর কোলে শিশু ঘুমায় যেমন,
ধরণীর কোলে ছিল নির্ভয় অন্তরে !

৮৬

এখনো থামিছ দেব অশান্ত পবন,
দয়া মায়া নাই কিগো তোমার হৃদয়ে !
স্থির হও, খুলে দাও মেঘ আবরণ,
বাঁচুক্ ধরার প্রাণ অরুণ উদয়ে !

ইতি নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে ঝটিকা
নামক পঞ্চম সর্গ ।

সমাপ্ত ।

বৃক্ষ পতন।

(জাহ্নবী দেবী বিরচিত ।)

ওই দেখ তরুবর কিবা শোভা ধরে ।
নব নব পাতাগুলি শোভে থরে থরে ॥
চারিদিকে ডালপালা করিয়া বিস্তার ।
যৌবন উদয় যেন হয়েছে তাহার ॥
লতাগুলি চারিদিকে এঁকেবেঁকে গিয়ে ।
রহিয়াছে নানা রঙ্গে বৃক্ষেরে জড়িয়ে ॥
শ্বেত, পীত, নীল ফুল ফুটে মাঝে মাঝে ।
সুশোভিত করিয়াছে মনোহর সাজে ॥
ধীরে ধীরে সুশীতল সমীর সঞ্চরে ।
পাতাগুলি হেলে দুলে নড়ে.বায়ুভরে ॥
পাখী সব উড়ে বসে শাখায় শাখায় ।
গান করে, মন হরে, শ্রবণ জুড়ায় ॥
ভানুর করেতে জীব তাপিত হইয়ে ।
শ্রম নিবারণ করে তব তলে গিয়ে ॥
বড় সুশোভিত হয়ে আছ তরুবর ।
হা, এ শোভা চিরদিন রবেনা তোমার ॥
এত যে বৃক্ষের শোভা, কিছু দিন পরে ।
শুকায়ে শুকায়ে পত্র পড়িবেক ঝরে ॥
ক্রমেতে সূর্য্যের তেজে শাখা শুকাইয়ে ।
কাষ্ঠসার হয়ে তুমি রহিবে পড়িয়ে ॥
সেইরূপ মানবের যৌবন সময় ।
দর্প অহঙ্কার ভরে মত্ত হয়ে রয় ॥
সাবধান সাবধান ওহে বন্ধুগণ ।
বৃক্ষের মতন হবে হইতে পতন ॥

পৌলভর্জ্জীনী।

পর দিন উঠিয়া ভর্জ্জীনার বস্তু গুলি সংগ্রহ করিতে লাগিল। যে কুসুমমালা সে ধারণ করিয়াছিল, যে নারিকেলের খোলে জলপান করিত, সে গুলি অতি মহার্ঘ্য বস্তুর ন্যায় বারম্বার চুম্বন ও হৃদয়ে ধারণ করিল। যেমন সহকারমুকুলের সংসর্গ দ্বারা বস্ত্র সকল সুবাসিত হয়, সেই-রূপ দয়িতজনের সংস্পৃষ্ট দ্রব্য গুলিও হৃদয়হারী হইয়া উঠে। পরে, জননীরা তাহার দুঃখ দেখিয়া সন্তপ্ত হইতেছেন, বুঝিয়া আপনাকে সুস্থির করিল এবং স্বীয় পরিশ্রম পরিবারের ভরণপোষণার্থ নিতান্ত আবশ্যক, মনে করিয়া দমিঙ্গের সহিত উদ্যানে ও ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিল।

এই যুবক পূর্ব্বে সংসারের ঘটনা জানিতে কণামাত্র উৎসুক হইত না। কিন্তু ভর্জ্জীনার সহিত লেখালেখি করিতে হইবে বলিয়া সর্ব্বাগ্রে লেখা পড়া শিখিতে ব্যগ্র হইল এবং আমার নিকট অধ্যয়ন আরম্ভ করিল। কিরূপ দেশে ভর্জ্জীনী উত্তীর্ণ হইবে তাহা জানিবার নিমিত্ত ভূগোলে নিবিষ্টমনা হইল। যে সমাজে যাইতেছে, তথাকার আচার ব্যবহার রীতি নীতি কি-রূপ, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত ইতি-হাসপাঠে অনুরক্ত হইল। যেমন প্রীতি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া সে প্রথমে চাষ করি-বার পদ্ধতি শিখে এবং নিতান্ত কদর্য্য মরুময় ভূমিতলকে রমণীয় শোভায় শোভিত করিতে পটু হয়, সেইরূপ এক্ষণেও প্রীতি নিবন্ধন তাহার বিদ্যা উপার্জ্জনে আসক্তি জন্মিল। বাস্তবিকও আমার বোধ হয় যে, পৃথিবীতলের অনেক শিল্প ও অনেক বিজ্ঞান প্রীতিধর্ম্মের প্রসবস্বরূপ। যখন আমাদিগের চিত্তে প্রীতি প্রস্ফুরিত হয়, তখন তাহার চরিতার্থতাসম্পাদনার্থ আমরা নানাবিধ ব্যাপারে উৎসাহযুক্ত হই, এবং নানাপ্রকার প্রারম্ভে অভিনিবিষ্ট হই। এই রূপে শিল্পের চর্চ্চা আরম্ভ হয়, এবং শিল্পের চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানও প্রকাশ পান। প্রকৃতি এই রূপে প্রীতিকে জীব-বর্গের প্রসূতিস্বরূপও করিয়া দিয়াছেন, আবার প্রীতি দ্বারাই সমাজের উন্নতি-সাধন ও জ্ঞানচর্চ্চা হইবার সুবিধান করিয়া দিয়াছেন।

ভূগোলপাঠে পৌলের বড় আমোদ বোধ হইল না। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সবি-শেষ স্বরূপ বর্ণনা না থাকিয়া, কেবল কোন্ দেশের কে রাজা, ইহারই উল্লেখ থাকে দেখিয়া সে উহাতে হতাদর হইল। ইতিহাসেও সে অধিক আমোদ প্রকাশ করিল না, বিশেষত নব্যকালের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া সে কেবল এই মাত্র অবগত্ হইল যে, রাজারা প্রায়ই নির্দ্দয় এবং প্রজারা প্রায়ই উৎপীড়িত হয়; দুই জাতি অনর্থক বিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়; মধ্যে মধ্যে এরূপ বিপত্তি মনুষ্যসমাজকে আক্রমণ করে যে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না; এবং লোকে দুরূহেয় ষড়যন্ত্র-বিশেষে ব্যাপৃত থাকিয়া সমাজের বন্ধন শিথিল করে। উপন্যাস পাঠ করিতে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় ভাল লাগিত। মানবেরা যে সকল প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে ব্যাপারবান্ থাকে তাহার বিবরণ উপন্যাসে অনেক পাওয়া যায় বলিয়া সে বড় আমোদিত হইত। পৌল আপন অবস্থার সহিত উপন্যাসে বর্ণিত ব্যক্তিগণের দশাবিবর্ত্ত তুলনা করিতে বড় আমোদ বোধ করিত। এই নিমিত্ত টেলিমেকস্ গ্রন্থ তাহার বড় মনো-গত হইল। উহাতে জানপদ দশার যে সকল মনোরম বর্ণনা আছে, এবং মানব-প্রকৃতির যে সকল প্রতিরূপ চিত্রিত আছে তাহা আলোচনা করিয়া সে পরম প্রীত হইত। ঐ গ্রন্থের যে অংশগুলি মিষ্ট লাগিত, সেগুলি জননী ও বিবি দিলা-

তুরকে পড়িয়া শুনাইত। কিন্তু পড়িতে পড়িতে গ্রন্থের প্রতি এত একতান হইত, যে ভাবতরে তাহার স্বর গদগদ হইয়া আসিত এবং চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িত। কিন্তু যে সকল উপন্যাস গ্রন্থ আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বজনবল্লভ, তাহা পাঠ করিয়া পৌলের বড় দুঃখবোধ হইল। তাহাতে যে সকল অশ্লীল ব্যবহার ও কদর্য্য রীতির বিবরণ আছে, তত্তাবৎ সে স্বভাবোক্তি বলিয়া জানিতে পারিয়া ভর্জ্জীনীর নিমিত্ত মহা উদ্বিগ্ন হইল। 'পাছে ভর্জ্জীনী কুসংসর্গে আচার ভ্রষ্ট হইয়া আমাকে ভুলিয়া যায়' এই ভাবিয়া পৌল বড় উন্মনা হইল। বাস্তবিকও তাহার আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত কদর্য্য গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে কাহার মনে না হয় যে, যে সকল দেশে ঈদৃশ গর্হিত রীতি নীতি প্রবল আছে, তথাকার সকলেই ধর্ম্মহীন ও চারিত্রবিবর্জ্জিত এবং তাহাদিগের সংসর্গে থাকিলে সরল ব্যক্তির চিত্তপ্রস্রবণও বিষদূষিত হইতে পারে।

দেড় বৎসর অতীত হইল, তথাপি ভর্জ্জীনীর কোন সম্বাদ পাওয়া গেল না। কেবল জনশ্রুতিতে জানা গিয়াছিল যে, সে জাহাজযোগে নির্ব্বিঘ্নে ফ্রান্সে পঁহুছিয়াছে। পরে অনেক দিন গত হইলে ভারতবর্ষে গমনোন্মুখ এক জাহাজ এই দ্বীপে এক বার ধরাইয়া ফ্রান্সের অনেক চিঠীপত্র আনিয়া দিল। তাহার মধ্যে, বিবি দিলাতুরের নামে একটি পুলিন্দা ও একখানি পত্র ছিল, উহা ভর্জ্জীনীর প্রেরিত। ঐ বুদ্ধিমতী বালিকা, জননীর মনে দুঃখ হইবে এই আশঙ্কায় পত্র দ্বারা কোন বিশেষ অসন্তোষ ব্যক্ত করে নাই বটে, কিন্তু লিখনভঙ্গীতে বিবি দিলাতুরের স্পষ্ট বোধ হইল যে, কন্যা বড় দুঃখ পাইতেছেন। এই পত্রে ভর্জ্জীনীর হৃদয়গত ভাব এমন সুন্দর রূপে প্রকাশিত আছে যে, আমি অদ্যাপি চিঠীখানি অবিকল মনে রাখিয়াছি।

'পরমভক্তিভাজন মাতৃচরণেষু

'তোমাকে স্বহস্তে অনেক পত্র লিখিয়াছি; কিন্তু একখানিরও উত্তর পাই নাই বলিয়া মনে হয় যে, তোমার নিকট সে গুলি পঁহুছে নাই। কিন্তু এই বার, তোমাদিগকে খবর দিবার ও তোমাদিগের খবর পাইবার এক সুযোগ করিয়াছি, অতএব ভরসা আছে যে, এই পত্রখানি তুমি পাইবে।

'তোমাদিগের সহিত বিচ্ছেদ অবধি আমি অনেক বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিয়াছি। পূর্ব্বে পরের দুঃখ ব্যতীত আর কিছুতে কখন কাঁদি নাই, এবারকার রোদন তন্নিমিত্ত বড় মনোবেদনা দিয়াছে। এখানে আসিবার পর দিদিমা ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসিলেন যে, লেখাপড়া আমার কত দূর হইয়াছে। তাঁহাকে বলিলাম যে, লিখিতেও জানি না, পড়িতেও জানি না কেবল ঘরকন্নার কাজ শিখিয়াছি এবং মাতৃ আজ্ঞা পালন করিতে জানি। তিনি শুনিয়া বিস্ময় রাখিবার স্থান পান্ না। কহিলেন যে, আমার দাসীর উপযুক্ত শিক্ষা হইয়াছে। পরদিন অবধি আমাকে বিদ্যালয়ে দিলেন। তথায় ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, অশ্বারোহণ, ইত্যাদি শিখাইবার নিমিত্ত শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু আমার মেধা এমনি মন্দ যে, তাঁহাদের বিস্তর প্রয়াসেও আমি বড় একটা কিছু শিখিতে পারি নাই। আমি এখন বুঝিতেছি যে, আমি বড় জড়বুদ্ধি। সে যাহা হউক, দিদিমার দয়ার হ্রাস নাই। তিনি প্রতি ঋতুতে নূতন নূতন পরিচ্ছদ দিতেছেন এবং দুজন পরিচারিকা দিয়াছেন। ইহাদেরও বেশভূষা বড়ঘরের স্ত্রীজনের মত।

'আপনার এমন সৌভাগ্য দশা দেখিয়া আমি তোমাদিগকে আনুকূল্য করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। কিন্তু দিদিমা যে উত্তর দিলেন, তাহা তোমাদিগকে কি রূপে বলি, বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি

বরাবর আমাকে সত্য বলিতে শিখাইয়াছ, অতএব তোমার নিকট কিছুই অপ্রকাশ রাখিব না। দিদিমা কহিলেন যে, যাহারা তোমাদিগের মত সামান্য দশার লোক, তাহাদিগের অর্থে প্রয়োজন নাই; দুঃখী লোকের হাতে অর্থ হইলে ঝনঝাট বাড়ে। মনে করিয়াছিলাম, অন্যের হাতে চিঠী লিখাইয়া লইয়া তোমাদিগের নিকট পাঠাইব। কিন্তু এখানে তেমন বিশ্বাসী লোক না থাকাতে মনোযোগ দিয়া লেখা-পড়া আরম্ভ করিলাম। ভগবানের প্রসাদে শীঘ্র কৃতকার্য্যও হইয়াছি। প্রথমকার দুই পত্র আমার পরিচারিকাদের হাতে পাঠাইয়া দিতে দিয়াছিলাম, কিন্তু এখন বোধ হয় যে, তাহারা সে গুলি দিদিমাকে দিয়া দিয়াছে। এবার বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের উপর চিঠী পাঠাইবার ভার দিলাম। তুমি তাঁহারই ঠিকানায় আমাকে পত্র লিখিও। দিদিমার ইচ্ছা নহে যে, তোমাদের সহিত লেখালেখির সম্পর্ক রাখি। তিনি বলেন যে, আমার যে সকল শুভ কল্পনা করিতেছেন, তোমাদের সহিত লেখালেখি করিলে তাহা কিছুই হইবে না। তিনি আর দুই জন পরিচারিকা ব্যতীত আর কাহারও সহিত বড় দেখা শুনা হয় না। কেবল মধ্যে মধ্যে এক জন সমৃদ্ধ ও বৃদ্ধ কুলীন আসিয়া দেখা করেন। শুনিতে পাই আমাকে তাঁহার বড় মনে ধরিয়াছে। কিন্তু সত্য বলিতে কি যখন বিবাহাদিতে আমার মন হইবে, তখন তাঁহাকে আমি পতি বরণ করিতে পারিব না।

ধন ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও আমার এক পয়সা ব্যয় করিবার ক্ষমতা নাই। যে পোষাক পরি, তাহাতেও আমার সম্পূর্ণ স্বত্ব নাই, আমি না ছাড়িতে ছাড়িতে পরিচারিকারা তাহার জন্য কলহ করে। সমৃদ্ধির বক্ষঃস্থলে অবস্থিত হইয়াও আমি দরিদ্রের শেষ, যখন তোমাদের কাছে ছিলাম, তখন আমার সম্পত্তি বেশী ছিল, কেননা তখন আমি সৎকর্ম্ম করিতে পারিতাম, এখন এক পয়সা দান করিবার যো নাই। যখন বুঝিয়া দেখিলাম যে, তত্ত্বে যে শিক্ষা আমাকে দেওয়া হইতেছে, তদ্দ্বারা সৎকর্ম্ম করিবার ক্ষমতা বাড়িতেছে না, তখন আপনার পুরাতন সুকর্ম্ম ধরিলাম এবং তুমি শিখাইয়াছ বলিয়া মনে মনে তোমাকে নমস্কার করিলাম। আমি এই সঙ্গে তোমার ও জননী মার্গারেটের নিমিত্ত নিজ তৈয়ারী জোড়াকতক মোজা, দনিজের জন্য একটি টুপী এবং মেরীর জন্য একখানি লাল রুমাল পাঠাইলাম। অপিচ এই সঙ্গে নানারকম ফল ও ফুলের বীজ পাঠাইতেছি। যেমন সেখানে, তেমনি এখানকার মাঠেও অনেক রকম ফুল আপনা আপনি হইয়া থাকে, কিন্তু কেহ তাহাদিগকে যত্ন করে না। আমার বেশ বোধ হইতেছে যে, একথলি টাকা পাঠাইতে পারিলে তোমরা যত খুশী না হইতে, বিবিধ বীজের থলি পাইয়াতত খুশী হইবে। যদি কখন আমাদের সেই বাগানে কলাগাছের কাছে আতা জন্মে এবং নারিকেলের পাতা আর ঝাউগাছের পাতা সংশ্লিষ্ট হয়, তবে তোমার কত আহ্লাদ হইবে! তোমার জন্মভূমি নর্ম্মাণ্ডীকে বড় ভাল বাস, তখন তোমার মনে হইবে যেন সেই স্বদেশেই রহিয়াছ।

তোমার আজ্ঞা আছে যে, আপনার সকল সুখ দুঃখ তোমাকে নিবেদন করিব। তোমার নিকটে না থাকিয়া সুখ আর কি? আর, যখন ভাবি যে ঈশ্বরের আজ্ঞায় এবং জননীর আদেশে এখানে আসিয়াছি, তখন সব কষ্ট ভুলিয়া যাই। কিন্তু বড় খেদ এই যে তোমাদের বিষয়ে কোন কথা শুনিতেও পাই না, কহিতেও পাই না। যখন আমার পরিচারিকাদের নিকট (অথবা আমার পরিচারিকা কেন বলি, তাহারা আমার দিদিমারই পরিচারিকা) তোমাদের কথা তুলিতে যাই, তাহারা অমনি বলে "ঠাকুরাণিকে, তুমি ফ্রান্সের মহিলা তোমার সে সকল বর্ব্বর দেশের কথা ভুলিয়া যাও-

রাই ভাল।" হায় রে — আপনাকে না ভুলিলেও আর বালক কালের স্থান ভুলিতে পারি না। যেখানে তোমাদের বাস, সেই স্থান কি না আমাকে ভুলিতে বলে! আমার পক্ষে ফ্রান্সই বর্ব্বরদেশ, কেননা এখানে এমন জনমানবটি নাই, যাহার নিকটে স্বীয় আন্তরিক জননী স্নেহ নিবেদন করি। সেই স্নেহ কি মৃত্যুর পূর্ব্বে এক ক্ষণও আমার সঙ্গছাড়া হইবে!

একান্তভক্ত নিতান্তবৎসলা
ভবদীয়তনয়া
ভর্জ্জীনী দিলাতুর

পুনশ্চ——

মেরী ও দমিঙ্গ বালককালে আমাকে কত যত্ন, কত মমতা করিয়াছে; অতএব তাহাদের প্রতি তোমার যেন সমান দয়া ভাব থাকে। আর প্রভুভক্ত কুক্কুর বনে আমাকে খুঁজিয়াছিল, অতএব আমার হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন কর।

যে ভর্জ্জীনী গৃহকুক্কুরের পর্য্যন্ত নাম করিতে ভুলে নাই, সে এত ক্ষণে পৌলের নাম এক বারও করিল না এই দেখিয়া ঐ যুবক অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করিল, কারণ সে জানিত না যে অবলাগণের লেখ্যপত্র যত দীর্ঘ হউক না কেন, প্রিয়-জনের নাম তাহারা শেষেই উল্লেখ করে।

পত্রান্তে দুই প্রকার পুষ্পবীজের কথা উল্লেখ করিয়া পৌলকে সেগুলির বিশেষ যত্ন করিতে কহিয়া ভর্জ্জীনী, কেমন স্থানে সেগুলি করিতে হইবে, কহিয়া দিয়াছে। সেই স্থলে তাবি কুসুমের স্বরূপও কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছে। তদনন্তর পত্রে এই প্রার্থনাটি লেখা ছিল যে, তাহারা দুই জনে যে শৈলপার্শ্বে বসিয়া সেই চরম প্রণয়ালাপ করে, পৌল যেন সেই শৈলের নাম 'বিয়োগগিরি' রাখে।

সব বীজগুলি একটি থলির ভিতরে রক্ষিত ছিল। থলিটির নির্ম্মাণপারিপাট্য তেমন কিছু ছিল না, কিন্তু যখন পৌল দেখিল যে উহার গায়ে 'প' ও 'ভ' এই দুইটি বর্ণ ভর্জ্জীনীর গুটীকতক মনোহর কেশ দ্বারা সংঘটিত হইয়া বসান রহিয়াছে, তখন পৌলের নিকট সেই থলি অমূল্য হইয়া দাঁড়াইল।

এই পত্র পাঠ করিতে সকলের চক্ষে জল আসিল। বিবি দিলাতুর উত্তর লিখিলেন "তুমি যাওয়া অবধি আমাদের সকল আনন্দ দূর হইয়াছে, আমি নিজে অধীর হইয়া আছি। এখন, আমি আর তোমাকে সেখানে থাকিতে অনুরোধ করি না, তোমার যাহা ভাল মনে হয় কর, ইচ্ছা হয় থাক, না হয় অবিলম্বে চলিয়া আসিবে।" পৌল এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া বলিল "যেমন তোমার স্বহস্তনির্ম্মিত ক্ষুদ্র থলিতে আমাদের দুই নাম মেলাইয়া দিয়াছ, তেমনি আমিও ইয়োরোপ ও আফ্রিকার দুইজাতীয় বৃক্ষ একত্র করিয়া বৃক্ষবাটিকাকে তোমার মনের মত করিয়া রাখিতেছি। আমি শুদ্ধ গুটীকতক নারিকেল বই আর কিছু পাঠাইলাম না, ভাবিলাম যে জন্মভূমির বিবিধ বস্তু দর্শন করিতে ঔৎসুক্য জন্মিয়া যদি তোমার এখানে আসিতে ইচ্ছা হয়। সকলেরই ইচ্ছা যে, তুমি প্রত্যাগমন কর, আমার প্রার্থনা এই যে সকলকার সেই ইচ্ছা পূরণ কর। তুমি যাওয়া অবধি এক দিনের তরে সুখ কাহাকে বলে জানি না।"

ফুলের বীজগুলি পৌল অতি যত্নপূর্ব্বক রোপণ করিল বটে, কিন্তু রোপণসময়ে বায়ু দ্বারা বীজগুলি বিক্ষিপ্ত বা হইল, অথবা তথাকার মৃত্তিকা সেই সকল পুষ্পের পক্ষে তেমন অনুকূল নহে এই বলিয়াই বা হউক, বৃক্ষগুলি তেমন বাড়িল না, দুচারিটি অঙ্কুর যাহা বাহির হইয়াছিল, সেগুলিও অল্প দিনে নির্জ্জীব হইয়া গেল।

এই সময়ে সৌভাগ্যোদয়ের নিত্য সহচরী ঈর্ষ্যা অনেক জনরব তুলিয়া দেওয়াতে পৌলের মন নিতান্ত ব্যাকুল হইল। ভর্জ্জীনীর পত্র যে জাহাজযোগে আসে, তাহার

লোকেরা ঘোষণা করিল যে অমুক সম্ভ্রান্ত রাজসভাসদের সঙ্গে ভর্জ্জীনীর সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। কেহ বা কহিল যে, সে কর্ম্ম এত দিনে হইয়া গিয়াছে। পোল প্রথমে এ সকল কথায় তত কান দেয় নাই, কিন্তু যখন তাঁক্ত বন্ধুবা কৃত্রিম দুঃখ ভাণ করিয়া পোলের আশাভঙ্গবিষয়ে অক্ষেপ সূচনা করিতে লাগল, তখন তাহার ঐ সকল জনরবে কিছু কিছু বিশ্বাস হইতে লাগিল। বিশেষতঃ ইয়োরোপের দেশাচারবর্ণক উপন্যাসসমূহের বর্ণনা ভাবিয়া পোলের মনে যথার্থই আশঙ্কা হইল পাছে সংসর্গগুণে ভর্জ্জীনীর চিত্ত দূষিত হইয়া গিয়া থাকে এবং পূর্ব্বতন সমুদয় প্রতিজ্ঞা ও সমুদায় আশ্বাস ভুলিয়া গিয়া থাকে। ইত্যাদি বিবেচনায় পোলের বিরহদুঃখ অনন্তগুণ হইল এবং পূর্ব্বোক্ত পত্রের পর ছয় মাসের মধ্যে ভর্জ্জীনীর কোন সংবাদ না পাইয়া সে অস্থির হইয়া পড়িল। বেচারা আমার নিকটে আসিয়া প্রার্থনা করিল "হয় আপনি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আমার উদ্বেগ শান্ত করিয়া দিন, নয় উদ্বেগ সমূলক বুঝিয়া আমি একেবারে হতাশ হই।"

আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, তুঙ্গগিরির অপর পার্শ্বে প্রায় এখান হইতে দুই ক্রোশ দূরে এক ক্ষুদ্র নদীতীরে অবস্থিতি করি। তথায় আমার সঙ্গী কেহ নাই, পরিগ্রহ সন্তান দাস দাসী বিবর্জ্জিত হইয়া আমি একাকী তথায় বাস করি।

যদি মনোগত সহচরী না মিলে, তবে আমার মতে একাকী থাকাই ভাল। যে কেহ সংসারে নানা যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহারই নির্জ্জনের প্রতি অনুরাগ হয়। ইহাও সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, যথায় যথায় দেশাচারদোষে কিম্বা রাজত্বের উচ্ছৃঙ্খলতা বশতঃ অথবা কুকর্ম্ম নিবন্ধন লোকদিগকে অপকৃষ্ট দশায় থাকিতে হয়, সেই সেই স্থানের অনেক লোক দারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য কিম্বা তাদৃশ কোন নির্জ্জন প্রদেশে একাকী থাকে। ইহার প্রমাণ মিশর দেশের দুরবস্থার ইতিহাস, শেষাশেষি গ্রীকদিগের অবস্থা এবং হিন্দুদিগের মধ্যে বানপ্রস্থ আশ্রমের বহুল প্রচার। বর্ত্তমান কালেও ইটালিবাসী ও অন্যান্য দক্ষিণ-ইয়োরোপীয়েরা সেইরূপ। বাস্তবিকও সমাজে থাকিতে যে সকল দুঃখ সহিতে হয়, নির্জ্জনে তাহার কিয়দংশ অপনীত হইয়া নৈসর্গিক সুখের কিছু কিছু স্বাদ পাওয়া যায়। এক্ষণকার সমাজ সকল এত কুসংস্কারে আন্দোলিত হয়, তন্মধ্যে অন্তরাত্মা শান্তিভাগী হন না। যে সকল মিথ্যা বিরুদ্ধ ও পরিবর্ত্তমান মত অবলম্বন করিয়া সমাজস্থ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পর বিবাদ করে, তন্মধ্যে আমাদের মন বিভ্রান্ত হইয়া যায়, কিছুই স্থির করিতে পারে না। কিন্তু নির্জ্জনে যাইলে এই সকল বাহ্যভ্রান্তি বিগলিত হইয়া যায়, তখন প্রকৃতির অবিরুদ্ধ সমুচিত প্রবৃত্তি সকল মনে পুনঃ সঞ্চারিত হয়। যদি কোন কুলুষিত নদীর জলপ্রবাহ আপন গতিপথের বহিঃস্থিত কোন আশয়ে বিসারিত হইতে পায়, তাহা হইলে যেমন সমুদায় জলসংশ্লিষ্ট মৃত্তিকা তলায় সংগৃহীত হয়, জল স্বচ্ছ হইয়া উঠে এবং সেই স্বচ্ছ জলে নদীর তট হরিন্ময় শাদ্বল ও আকাশের উজ্জ্বল্য এ সমুদায় প্রতিফলিত হয়, তেমনি নির্জ্জনে যাইয়া মন সংসারের বিবিধ সংক্ষোভ হইতে মুক্ত হইতে পারিলে সাক্ষাৎ প্রকৃতির প্রতিবিম্ব তাহাতে স্থানলাভ করে।

নির্জ্জনে মনের যেমন আকুলতা দূর হয়, শরীরেও তেমনি স্ফূর্ত্তি আধান হয়। নির্জ্জনবাসী লোকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী হয়, তাহার প্রমাণ ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা। ফলতঃ সাংসারিক দশায় থাকিতে হইলেও আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে বাহ্য ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়া কাল্পনিক নির্জ্জন করিয়া নিতে হয়, নহিলে সংসারের কোন স্থিরতর সুখ অনুভূত হয় না; আমা-

দিগের আচরণ ও একমার্গানুযায়ী হয় না। সুখ ও শান্তির পক্ষে নির্জ্জন এত আবশ্যক। আমি এমন কথা বলি না যে সকলেই নিঃসঙ্গ ও একাকী হইয়া থাকুক। মানুষমাত্রেরই এত অভাব এত প্রয়োজন আছে যে, সে সমুদায় সমাধানার্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে মানবজাতির সহিত অভেদ্য সূত্রে গ্রথিত থাকিতে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই মানবজাতিসাধারণের নিকট অনেক পদার্থ ও অনেক সুখের নিমিত্ত ঋণী থাকে, পরিশ্রম দ্বারা স্বজাতির কোন কাজে আসিতে না পারিলে সে ঋণশোধ হয় না। কিন্তু জগদীশ্বর আমাদিগের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ যেমন ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উপযুক্ত করিয়াছেন, যেমন তিনি বায়ুর অনুরূপ শ্বাসযন্ত্র দিয়াছেন, ভূমির অনুরূপ চরণ দিয়াছেন, জ্যোতির অনুরূপ চক্ষু করিয়াছেন, তেমনি মনুষ্যের হৃদয়কে তিনি আত্মসাৎ করিয়া রাখিয়াছেন। জগদীশ্বরই মানব অন্তঃকরণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয় হইতে পারেন। তাঁহার প্রতি উত্তাম হইলে অন্তঃকরণের প্রীতি ভক্তি প্রভৃতি প্রবৃত্তি সকল পরম চরিতার্থতা লাভ করে। সেই অন্তঃকরণকে যে সাংসারিক বিষয় হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক তাহার প্রতি প্রেরণ করা, তাহা নির্জ্জন ব্যতীত আর কুত্রাপি সুচারুরূপে ঘটে না।

ইত্যাদি ভাবিয়া আমি জনসমাজের দূরে অবস্থান করি, কেন না এক কালে মানুষের কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইলাম, কিন্তু তাহারা আমাকে উৎপীড়ন করিয়া উহার ফল দিয়াছে। ইয়োরোপের অধিকাংশ এবং আফ্রিকা ও আমেরিকার কতক ভাগে পর্য্যটন করিয়া আমি এই দ্বীপের রমণীয় শীতাতপ ও শান্তভাব দেখিয়া এই স্থানেই আশ্রয় লইয়াছি। তরুতলে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছি, স্বহস্তে জঙ্গল কাটিয়া একখানি ক্ষেত্র করিয়াছি। আর গৃহদ্বারের সম্মুখে এক তটিনী পাইয়াছিল, ইহাতেই আমার সকল কার্য্য চলিতেছে, সকল সুখ লাভ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন কতক গুলি গ্রন্থ আছে, তৎপাঠজনিত বিশুদ্ধ চিদানন্দও মধ্যে মধ্যে লাভ হয়। সংসারের সঙ্গে কোন সম্পর্কই ত নাই, কেবল ঐ সকল গ্রন্থে সংসারের বর্ণনা পাঠ করিয়া এক অপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ হইতেছে। কি কি রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া মানবেরা দুঃখদশায় পতিত হয়, গ্রন্থ পাঠাবরসে তাহা আলোচনা করিয়া এবং স্বীয় বর্ত্তমান অবস্থায় সে সকল দুঃখের অভাব দেখিয়া, আমার দুঃখাভাবজনিত একপ্রকার শান্ত সুখ অনুভব হয়। আমি যেন এক জলযাত্রী, সংসারসাগরে যানভঙ্গানন্তর যেন এক অতি নির্জ্জন সমুদ্রশৈলে আশ্রয় লইয়াছি, এরূপ ব্যক্তির মত আমি সংসারে সর্ব্বভাগে আঘাত ঝটিকা ঔদাস্যে অবলোকন করি। সুদূরবর্ত্তী ঝঞ্ঝার নিস্বন দ্বারা আমার বিশ্রামসুখ দ্বিগুণিত হয়। যে অবধি মানুষের সংসর্গ ছাড়িয়া পরস্পর বিরোধ বিসর্জ্জন দিয়াছি, সে অবধি আমার দ্বেষ গিয়াছে, এখন আমি মানুষের দশায় কেবল দুঃখ করি। যেমন কোন পথিক পথের ধারে জলাশয়ে কাহাকেও নিমগ্ন হইতে দেখিলে উদ্ধারার্থ হাত বাড়ায়, আমিও সেইরূপ হতভাগা দেখিলে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিতে যাই। কিন্তু কখন ভব্য ব্যতীত আর কেহ আমার পরামর্শে কান দেয় নাই। প্রকৃতির বাক্যকে অভব্যেরা অবজ্ঞা করে তাহারা স্ব স্ব প্রবৃত্তির অনুযায়ী এক মনোরথ কল্পনা করিয়া তাহার অনুসন্ধানে কুমার্গগামী হয়, এবং পরিণামে দুর্দ্দশায় পড়িয়া দৈবের উপর দোষার্পণ করে, তখন মনে থাকে না যে আপন ভ্রান্তিরই ফলভোগ করিতেছে। যে সকল হতভাগাকে আমি যথার্থ পথে আনিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম, তাহাদিগের কাহারও বিপত্তি দৈবের দোষে ঘটে নাই, সকলের দুঃখই স্বয়ংকৃত। যশ কিম্বা ঐশ্বর্য্য লাভের কোন পন্থা বলিয়া দিব এই আশায় তাহারা আমার কথা

শুনিতে আসিল, কিন্তু যখন দেখিল যে, আমি বরং সে সকল অসার বস্তুর অনুসরণ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দি, তখন আর আমার উপদেশ ভাল লাগিল না। প্রত্যুত আমি ঐ সকল প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে আসিয়াছি বলিয়া গালি দিতে লাগিল, আপনারাই মানবজাতির পরমোপকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিল এবং আমাকে স্বাবলম্বিত সংক্ষোভজালে জড়িত হইতে পরামর্শ দিল। কিন্তু যদিও সকলকে মনের কথা কহি, কাহারও কথায় সহসা মন ভিজিতে দিনা, আপন কর্ত্তব্য স্বয়ং আলোচনা পূর্ব্বক স্থির করি এবং আমার মন আর আমাকে সংসারে যাইতে বলে না। আমি স্বায় জীবনের অতীত সংক্ষোভ সকল স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান নিশ্চিন্তাবস্থা সমধিক সম্ভোগ করি। যখন গৃহদ্বারের পুরোবর্ত্তী স্রোতের কলকল শুনি এবং তাহার ফেনার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন, সংসারদশার অলীক মনোরথ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং যে সকল অকিঞ্চিৎকর উদ্যোগপরম্পরায় এক সময়ে ব্যাপৃত ছিলাম, তাহাই মনে পড়ে, কারণ সেগুলিও ফেনার ন্যায় অসার ও জল কলকলের ন্যায় বৃথাড়ম্বরযুক্ত।

আমার আশ্রম বনমধ্যে অতি নিভৃত স্থানে অবস্থিত বটে, কিন্তু সেখানকার দৃশ্যরাজী এরূপ রমণীয় ভঙ্গি ধারণ করিয়া আছে, যে তাহা দেখিলে মাদৃশ ব্যক্তির মনে বিবিধ ভাবের উদয় হয়, এবং অন্তঃকরণে একপ্রকার চমৎকার শান্তিসুখ সঞ্চারিত হয়। দ্বারের পুরোবর্ত্তিনী গিরিনদী ঠিক সোজাভাবে বনান্ত ভেদ করিয়া যাওয়াতে সম্মুখে বহু দূর অবধি আমার দৃষ্টিপথ অনিরুদ্ধ থাকে। নদীর ধারে ধারে নানাবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ মহীরুহ সমূহ লতাপাশে পরস্পর সংসক্ত হইয়া চারি দিকে হরিণ্ময় আভা বিস্তার করে। কুসুমোদ্গমকালে এত শ্বেতবর্ণ ফুল হইয়া চারিদিক আচ্ছন্ন হয়, যে যেন বরফ পড়িয়াছে মনে হয়। যদি এক বার বনের ভিতর দিয়া চলিয়া যাও, তবে গাত্রবস্ত্র সে দিনের নিমিত্ত সুবাসিত হইয়া যায়। গ্রীষ্মকালে নানাদেশীয় পক্ষী সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া দ্বীপের ফলভোগ করে। বৃক্ষের যে পল্লবজাল রৌদ্রে পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যায়, পক্ষীদিগের পক্ষকান্তি সেই পিঙ্গলবর্ণকে ধিক্কার দেয়। অরণ্যের চিরন্তন ভূস্বামী বানরেরা শ্যামপ্রভাযুক্ত শাখাসমূহে বিবিধ ক্রীড়াপ্রসঙ্গে নিরত থাকে, কেহ ডালে লেজ জড়াইয়া ঝুলিতেছে, কেহ সন্তান বুকে করিয়া এডাল ওডাল করিতেছে। বনমধ্যে সর্ব্বদাই আনন্দধ্বনি ও দক্ষিণদেশাগত পক্ষীদিগের কলরব শুনা যায়। বনচারিণী গিরিনদী প্রস্তরময় তলভাগে কুলকুল ধ্বনি করত প্রবহমাণ হইতেছে এবং স্থানে স্থানে বৃক্ষের বিটপাবলী ও বৃক্ষবিলাসিগণের কেলি কৌতুক স্বীয় স্বচ্ছ জলে প্রতিবিম্বিত করে। তথা হইতে এক শ পা অন্তরে একটি জলপ্রপাত আছে। নদী যেখানে পাহাড়ের এক স্তর হইতে স্তরান্তরে পড়িতেছে, সে স্থলে তদীয় জলরাশি দেখিতে ঠিক স্ফটিক স্তম্ভের মত হইয়াছে। সে খানে নিরন্তর স্তূপাকারে ফেনা উঠিতেছে। এই সংক্ষুভিত জলরাশি হইতে নানাপ্রকার ধ্বনি বাহির হয়। বায়ুভরে কখন সেই ধ্বনি বনান্তে বিসৃত হইয়া পড়ে, কখন একেবারে সংগৃহীত হইয়া নিকটবর্ত্তী দর্শকের শ্রবণে ঘণ্টানিনাদবৎ প্রতীয়মান হয়। সেখানকার বায়ু জলশীকরসংসর্গে নিত্য সুশীতল থাকে এবং তটনাতটস্থ তৃণশষ্পদিগকে উজ্জীবিত করিয়া তথায় অতিচমৎকার হরিণ্ময় আভা প্রসারিত রাখে।

তাহার কিয়দ্দূরে এক শিলাতল আছে, তথায় বসিলে প্রপাতের সান্দ্র কল্লোলে কর্ণ বধিরীকৃত হয় না, অথচ তদঙ্গ-স্পর্শী সুশীতল বায়ুও সেবন করা যায় এবং নির্ঝরের জলকলকল সুক্ষ্ম রূপে শুনা যায়। কখন কখন লাতিশয় গ্রীষ্ম বোধ

হইলে আমরা সেই শিলাতলে ভোজন সম্পাদন করিতাম। ভর্জ্জিনীর সামান্য কার্য্যগুলিও পরার্থ সাধনে প্রয়োজিত হইত। সে ফল খাইয়া তাহার আঁটি বা বীজ রোপণ করিতে কখন ভুলিত না। বলিত 'ইহা হইবে বৃক্ষ জন্মিয়া পরিশ্রান্ত পথিককে ছায়া দিবে এবং আহার দিবে। না হয়, কোন পাখী ইহার ডালে বাসা করিবে এবং ফলে প্রাণ ধারণ করিবে'। একদা ঐ শিলাতলে বসিয়া খর্জ্জুর ভক্ষণ পূর্ব্বক আঁটি গুলি এক পাশে পুতিয়া দিল। কিছু দিন পরে গুটীকতক খেজুর চারা বাহির হইল এবং তন্মধ্যে এক চারা সজীব ও ফলবান্ হইল। ভর্জ্জিনীর যাত্রাকালে চারাটি হাটুসমান উচ্চ হইয়াছিল। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যেই বার হাত প্রমাণ বাড়িয়া উঠিল এবং শীর্ষদেশ পরিপক্ব ফলরাজী দ্বারা পিঙ্গলবর্ণ হইল। এক দিন যদৃচ্ছাক্রমে সেখানে যাইয়া পৌলের দৃষ্টি সেই বৃক্ষের উপর পড়িল। তত ক্ষুদ্র আঁটি হইতে তত বড় গাছ হইয়াছে দেখিয়া পৌলের চমৎকার বোধ হইল, কিন্তু পরক্ষণেই ভর্জ্জিনী এত দিন গিয়াছে ভাবিয়া মহাদুঃখ বোধ হইল। আমরা যে সকল বস্তুর সহবাস করি তদ্দ্বারা জানা যায় না যে, কত শীঘ্র কাল যাইতেছে, কারণ তাহাদিগের পরিবর্ত্ত অল্পে অল্পে হয় বলিয়া লক্ষ্য করিতে পারি না, সুতরাং আয়ুঃক্ষয় বিষয়ে মনোযোগ হয় না। কিন্তু যে সকল পরিচিত পদার্থ বহুদিনান্তরে দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তাহাদিগের পূর্ব্বতন অবস্থার সহিত অধুনাতন পরিবর্ত্ত তুলনা করিয়া বুঝিতে পারি যে, জীবনস্রোত কত বেগে প্রবাহিত হইতেছে। যেমন নবা রমণে পর্য্যটনে নির্গত হইয়া নানা দেশ ভ্রমণানন্তর বৃদ্ধাবস্থায় জন্মভূমিতে পুনঃ পদার্পণ করিলে সকলেই নূতন বোধ হয়, যাহাদিগকে স্তন্যপায়ী দেখিয়া যাই, তাহারা গৃহস্থ হইয়াছে, তাহাদের পিতা পিতামহেরা কোন কালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, বয়স্যবর্গের মধ্যে কেহই নাই, ইত্যাদি দেখিয়া মনে যেমন বিষাদ উপস্থিত হয়, খর্জ্জুরতরু দর্শনে পৌলের তাদৃশ বিষাদ হইল। এক বার ভাবিল 'প্রিয়ার বিরহদৈর্ঘ্য সূচককে কাটিয়া ফেলি।' আবার মনে করিল 'বৃক্ষটি ভর্জ্জিনীর দয়া গুণের চিহ্ন হইয়া আছে।' এই কথা মনে হওয়াতে প্রেমভরে উহার স্কন্ধ আলিঙ্গন ও বল্কল চুম্বন করিল।

হে মহীরুহ! আজি পর্য্যন্ত তোমার বংশ জীবিত আছে। তাহাদিগকে দেখিলে আমার যেমন আহ্লাদ হয়, গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সৌধ অট্টালিকাদির ভগ্নশেষ দেখিলে তাহার কিছুই হয় না। যে প্রকৃতি নরপতিগণের দুরাকাঙ্ক্ষার স্মরণস্তম্ভ সকলকে নিত্য নিত্য বিলীন করিতেছেন তিনি সেই দরিদ্রদারিকা ভর্জ্জিনীর সাধুতার চিহ্নভূত তোমার সন্তানবর্গকে চিরজীবী করুন।

এই কারণ বশত, যখন যখন পৌল আমার গৃহের দিকে আসিত, তখন তাহাকে ঐ স্থানেই দেখিতে পাইতাম। এক দিন দেখি, নিতান্ত খিন্ন হইয়া সেই স্থানে বসিয়া আছে। সেই সময়ে আমার সহিত যে কথোপকথন হইল, তাহা অবিকল তোমাকে বলিতেছি। যদি আমার দীর্ঘ দীর্ঘ অবান্তর সন্দর্ভ শুনিয়া তোমার শ্রবণখেদ না হইয়া থাকে, তবে সহিষ্ণু ভাবে শ্রবণ কর এবং আমার বাচালতা মার্জ্জনা কর, কারণ বৃদ্ধ বয়সে লোকে সহজেই বাবদূক হয় এবং পরম প্রেমাস্পদ বান্ধবগণের কথা বলিবার সময় কেহই জিহ্বা বন্ধন করিয়া রাখিতে পারে না। তুমি প্রশ্নের ভঙ্গি ও উত্তরের তাৎপর্য্য দেখিয়া বুঝিয়া লইবে যে, কোন্‌টা কার কথা। ইহা দ্বারা আরও বোধ হইবে যে, পৌল কেমন চতুর অথচ সরল।

কলিকাতা,—সিমুলিয়া—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।

অবোধ-বন্ধু

"করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

৩ য় ভাগ] চৈত্র, — ১২৭৬। [১২ শ সংখ্যা।

পৌলভর্জ্জীনী

পৌল। আমার বিষাদের পার নাই। দিলাতুরকুমারী দুই বৎসর দুই মাস হইল গিয়াছেন এবং শেষ আট মাসের মধ্যে এক বার সংবাদও দেন নাই। তাঁহার ধন হইয়াছে, আমি দরিদ্র। ইচ্ছা হয় ফ্রান্সে যাইয়া রাজসেবা দ্বারা সম্পত্তি উপার্জ্জন করি, তাহা হইলে ভর্জ্জীনীর দিদিমা আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবেন, কেন না সম্ভ্রান্ত কুলে বিবাহ দেওয়াই তাঁহার অভিপ্রায়, অতএব আমি সম্ভ্রান্ত হইলে আমাকে বিবাহ না দিবেন কেন?

প্রবয়া। বৎস, তুমি কি জন না যে, তোমার কুলমর্য্যাদা নাই?

পৌল। মা বলেন বটে। কিন্তু আমার অপেক্ষা কাহার কুল কিসে ভাল কিছুই বুঝিতে পারি না।

প্রবয়া। কুলমর্য্যাদা নাই বলিয়া শুদ্ধ যে তুমি বড় পদ পাইবে না তাহা নয়, ভদ্রসমাজে তোমার আদরও হইবে না।

পৌল। আপনিই ত বলেন যে, যোগ্যতা থাকিলেই ফ্রান্সে উচ্চ পদ পাওয়া যায় এবং সামান্যবংশোদ্ভব ব্যক্তিও উপযুক্ত হইলে কখন দুঃখ পান না। এই নিমিত্তই বলেন যে, ফ্রান্সের এত প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। আপনার মুখে এমন অনেক ব্যক্তির নামও শুনিয়াছি, যাহারা দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পরিশেষে স্বদেশের গরিমা বাড়াইয়া গিয়াছেন। তবে কি এখন দমাইয়া রাখিবার নিমিত্ত আমাকে ও সকল কথা বলিতেছেন?

প্রবয়া। বৎস, তোমাকে দমাইয়া রাখিব এরূপ ইচ্ছা আমার কখন নাই। আমি যে সকল কথা তোমাকে বলিয়াছি, তাহা অতীত কালের বৃত্তান্ত। এখন সে সব কিছু নাই, এখন সকল পদার্থই অর্থায়ত্ত, সকল পদই শুদ্ধ কতিপয় সম্ভ্রান্ত বংশের ভোগে আইসে, না হয় ত কতিপয় দলের আমিষ স্বরূপ হইয়া আছে। রাজ্যে যে সকল দল আছে এবং যে সকল সম্ভ্রান্ত বংশ আছে, তাহারা নরপতি রূপ সূর্য্যকে মেঘের ন্যায় ঢাকিয়া রাখিয়া তাঁহার সমুদয় জ্যোতি নিজে ভোগ করে, নিরুদ্দিষ্ট তোমার

মত সামান্য লোকেরা রাজানুগ্রহের এক অংশও পাইয়া উঠেন না। পূর্ব্বকালে দেশের শাসনপ্রণালী এত জটিল ও সঙ্কুল ছিল না, সর্ব্ব প্রকার গুণ ও যোগ্যতার সবিশেষ সমাদর ছিল। যেমন নব পরিষ্কৃত জঙ্গলভূমি প্রচুর শস্য উৎপন্ন করে, সেই গুণবান্ ব্যক্তিদিগের উপর প্রচুর রাজপ্রসাদ বৃষ্টি হইত। কিন্তু লোক চিনিতে পারে এমন মহানুভব রাজা অতি বিরল। সচরাচর সকল রাজাই পারিষদভূত সম্ভ্রান্তবর্গ বা দলবিশেষের মত লইয়াই সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন।

পৌল। তাদৃশ একজন সম্ভ্রান্তের আশ্রয় লইলে তিনিও ত নিদেন সহায়তা করিবেন।

প্রবয়া। বড় লোকের সহায়তা বাঞ্ছা করিলে, নয় তাঁহাদের দুরাকাঙ্ক্ষা নয় তাঁহাদের ভোগস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিতে হয়। এ উভয়ই তোমার কর্ম্ম নয়, কারণ তুমি কুলীন নও, তাতে আবার পাজী নও।

পৌল। কেন আমি ত গ্রন্থে পড়িয়াছি যে, পাজীর আচরণ না করিয়া যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়ব্রত হয় এবং যত্নপূর্ব্বক মিত্রতার কার্য্য সম্পন্ন করে, সে অবশ্যই বড় লোকের নিকট আদর পায়। আমিও তাই করিব।

প্রবয়া। বৎস, গ্রীক্ ও রোমকদিগের বৃত্তান্তে তুমি তদ্রূপ দৃষ্টান্ত পাইয়াছ বটে সত্য, কেননা ক্ষুদ্রদশাতেও তাহাদিগের ধর্ম্মে আদর ছিল। কিন্তু মধ্যকালে যত লোক ক্ষুদ্রদশা হইতে বুদ্ধিবলে মহত্ত্বলাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহই ত বড় লোকের সাহায্য পান নাই। যদি রাজা গুণগ্রাহী না হইতেন, তাহা হইলে ফ্রান্সের ধনীরা কি ধার্ম্মিক লোককে পুরস্কার দিতেন। কিন্তু এক্ষণকার রাজারা তত নীচে দৃষ্টি দেন না, অতএব সামান্য ব্যক্তি গুণবান্ হইলেও কেহ তাঁহার খবর লয় না, সুতরাং যে সকল পদ ও সম্মান ও পুরস্কার সদ্গুণশালী পুরুষের প্রাপ্য, তাহা অর্থের আয়ত্ত হইয়া আছে।

পৌল। আচ্ছা বড় লোক না হয় কোন দলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিব, তাহাদিগের মত অবলম্বন করিব, তাহাদিগের অভিপ্রায় প্রাণপণে সিদ্ধ করিব, তাহা হইলে অবশ্যই দলের প্রিয়পাত্র হইব।

প্রবয়া। তবে কি পাঁচ জনের মত ধনের নিমিত্ত ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিবে?

পৌল। না, না, আমি তা বলি না। আমি যথার্থপথে থাকিব, অযথার্থের দিকে কখন যাইব না।

প্রবয়া। তাহা হইলে দলের প্রিয় না হইয়া দ্বেষেরই ভাজন হইবে। যথার্থ ধরিয়া চলে না এমন কোন দলই নাই। দলমাত্রেই দুরাকাঙ্ক্ষাপরবশ, সুতরাং ক্ষমতালাভেই ব্যগ্র, ধর্ম্ম অধর্ম্ম বড় ভাবে না।

পৌল। হায় রে দুর্দশা! তবে আমি ভর্জ্জীনী পাইব না! তবে চির কালই দরিদ্র হইয়া অসুখে থাকিব।

এই বলিয়া দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িল।

প্রবয়া। শুদ্ধ ঈশ্বরেরই আশ্রয় লও এবং মানব জাতিকে তোমার দল মনে কর, তাহার কার্য্যসাধনই তোমার একমাত্র কর্ম্ম ভাব। কি ধনীরা, কি ভিন্ন ভিন্ন জাতি, কি নরপতি, কি দল সকল ইহারা সকলেই বিশেষ বিশেষ কুসংস্কার ও কুপ্রবৃত্তির অধীন। তাহাদিগের মধ্যে কাহারও আশ্রয় লইলে এবং তাহাদের কার্য্যসাধন করিতে গেলে প্রায়ই পাপ করিতে হয়। কেবল ঈশ্বর অবলম্বন করিতে কোন পাপ নাই, কেবল মানব জাতির কাজ করিতে কোন অধর্ম্ম নাই, যাহারই সদ্গুণ ও ধর্ম্মভক্তি আছে, সেই মানব জাতির কাজ করিতে পারে।

অন্যের উপর বড় হই এমন বাসনাই

বা তোমার কেন? এরূপ বাসনা কখনই প্রকৃতির অনুমত নহে। দেখ, যদি সকলের মনেই এ বাসনা বলবতী হয়, তবে কাহারও কাহার সহিত মিল থাকে না, ব্যক্তিমাত্রেরই প্রতিবেশীর সহিত বিরোধ হয়। যে অবস্থায় সংস্থাপিত হইয়াছ, তাহার কর্ত্তব্যসমূহ সুসিদ্ধ হইলেই যথেষ্ট বোধ কর, আপনার ভাগ্যে কদাচ অসন্তুষ্ট হইও না। দেখ, তোমার বর্ত্তমান অবস্থা নিবন্ধন কোন ক্ষতিই ত হয় না, এর জন্য তোমাকে ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়িতে হয় না, বড় লোকের মত পরের কথায় কান পাতিয়া থাকিতে হয় না, কিংবা ক্ষুদ্রাশয় লোকের মত ধনী ব্যক্তির অনুবৃত্তি করিতে হয় না। ইয়োরোপে সম্পত্তি অর্জ্জনার্থ লোকে যেমন ধূর্ত্ত ভ্রষ্টাচার ও চাটুকার হয়, এদেশে গ্রাসাচ্ছাদনলাভার্থ তেমন কিছুই হইতে হয় না। তুমি যে অবস্থায় আছ, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মে ভূষিত হইতে পার, তুমি সাধু সত্যবাদী অমায়িক বিদ্যাপরায়ণ সহিষ্ণু মিতাচারী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মভক্ত সকলই হইতে পার, তজ্জন্যে কেহ তোমাকে কোন কথা বলিবে না, কেহ তোমার উদয়মান বিজ্ঞতাকে উপহাস করিবে না। ঈশ্বরপ্রসাদাৎ তোমার স্বাতন্ত্র স্বাস্থ্য হিতাহিতবোধ ও সচ্চরিত্র এ সকলি আছে। হায় তুমি যে সকল রাজার প্রসাদকামনায় বিদেশে যাইতে চাহিতেছ, তাহাদেরও ত এত সৌভাগ্য নাই!

পৌল। হায়! আমার যে ভর্জ্জিনী নাই। সে থাকিলে সবই থাকে, সে না থাকিলে সব মিছা। সেই আমার কুল, সেই আমার কীর্ত্তি, সেই আমার সম্পত্তি। ভাল, তার দিদিমার ত ইচ্ছা যে, এক জন যশস্বী লোকের সহিত তাহার বিবাহ দিবে, অতএব আমি মন দিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করি, বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া অনেকে ত সম্ভ্রান্ত ও কীর্ত্তিশালী হইয়াছে। আমি জ্ঞানপ্রভাবে স্বদেশের উপকার করিব, তাহার নিমিত্ত চাটুকারও হইতে হইবে না, কোন ব্যক্তির ক্ষতি করাও হইবে না। কোন ব্যক্তির অনুবৃত্তি করিতে হইবে না, অথচ আপনা হইতেই আমার যশ বিস্তার হইবে।

প্রবয়া। বৎস, তেমন প্রতিভাশক্তি অতি মহার্ঘ বটে। ইহার নিকটে কুলমর্য্যাদাই বল আর ধনমর্য্যাদাই বল সকলি অকিঞ্চিৎকর। নিঃসংশয়, বিদ্যার মত ধন নাই, চোরে লইতে পারে না, অথচ তদ্দ্বারা লোকের অনুরাগভাজন হওয়া যায়। কিন্তু বিদ্যা কি অল্প আয়াসে লাভ হয়? বিদ্যাবিষয়ক প্রতিষ্ঠা পাইতে যে কত কষ্ট হয় তাহার কি ইয়ত্তা করা যায়? একে ত বিদ্যা হইলে চিত্তের এমনি এক সুকুমারতা জন্মে যে, অত্যল্প অপমানও অসহ্য বোধ হয়, তাহাতে আবার সমকালবর্ত্তী লোকদিগের ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষে পড়িতে হয়। কোন দেশেই যাজকেরা সৈনিক পুরুষের সুখ্যাতি দেখিলে অসূয়া করে না, শাস্ত্রজীবীরাও সমুদ্রসঞ্চারী নাবিকের অভ্যুদয় দেখিলে মাৎসর্য্য প্রকাশ করে না। ফলতঃ যে ব্যক্তি যে ব্যবসার লোক, সে তাহাতেই বড় হইতে চায়, অন্য ব্যবসাতে কাহাকেও বড় হইতে দেখিলে তাহার চক্ষু টাটায় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বিদ্বানের প্রতি সকলেই ঈর্ষ্যাপর হয়, বিদ্যাবিনোদী ব্যক্তির সৌভাগ্যপথে সকলেই প্রতিবন্ধক হয়, কারণ সকলেরই বুদ্ধিমান্ বলিয়া অভিমান আছে, অতএব বুদ্ধিমত্তার সুখ্যাতি লইতে সকলেরই সাধ, সুতরাং বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার ব্যবসার লোকেরই প্রতিদ্বন্দ্বী ও অক্ষণ্ণল ভাজন। তুমি বহি লিখিয়া লোকের হিত করিবে বলিতেছ, কিন্তু আমার মতে, যে ব্যক্তি একটি ফলতরু রোপণ ও বর্দ্ধিত করিয়া পৃথিবীর ভাণ্ডার বাড়ায়, সে গ্রন্থলেখক অপেক্ষা অর্হত্তর।

পৌল। তবে এই খর্জ্জুরতরু যে রোপণ করিয়াছে, সে এই দ্বীপবাসীদিগের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছে।

এই বলিয়া তরুস্কন্ধ আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রেমভরে চুম্বন করিল।

প্রবয়া। পৃথিবীর সকল গ্রন্থ অপেক্ষা যাহা উৎকৃষ্ট, যাহাতে সৌভ্রাত্র সমদৃষ্টিতা দয়া ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুরই উপদেশ নাই, সেই খ্রীষ্টশাস্ত্রের পর্য্যন্ত দোহাই দিয়া ইয়োরোপীয়েরা ছয় শতাব্দী কাল দুরন্ত বিগ্রহে প্রবৃত্ত ছিল। অদ্যাপি সেই গ্রন্থের মতানুসরণের ভাণ করিয়া কত রাজা প্রজাপীড়ন করিতেছে, কত প্রবল লোক দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতেছে, তাহা কে গণিতে পারে। এখন ভাব দেখি বাছা, ঈদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইতে যখন ঈদৃশ অশুভ ফল উৎপন্ন হয়, তখন গ্রন্থ লিখিয়া লোকের হিত করিব এ বাসনা কোথায় থাকে? বিবেচনা কর দেখি, প্রাচীনকালাবধি যাঁহারা জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন, সেই সকল বিজ্ঞবর তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষদিগের অধিকাংশের কি দশা ঘটিয়াছিল। যে হোমর তেমন মনোরম সরস্বতীতে সেই জ্ঞানকে পরিচ্ছন্ন করিলেন, তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইয়াছে। যে সক্রেটিস আপন উপদেশ ও চরিত্র দ্বারা যাবজ্জীবন এথেনীয়দিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন, তাঁহাকে ধর্ম্মাধিকরণের নিকট অপরাধী হইয়া বিষপান করিতে হইল। যে পাইথা গোরাস্ ইতর জন্তুদিগের প্রতি করুণা বিস্তার করেন, ক্রটন্ নগরের পৌরেরা অগ্নি দ্বারা তাঁহার প্রাণ বধ করিল! আমি কিই বা বলিতেছি! শুদ্ধ কি তাঁহাদের শরীরের উপরই অত্যাচার হইয়াছে? অনেকের নাম পর্য্যন্ত দূষিত হইয়াছে! চপল ও কৃতঘ্ন লোকে অনেকের কীর্ত্তি পর্য্যন্ত রসিকতাপ্রকাশের উপযুক্ত স্থল বোধ করিয়া কলঙ্কিত করিয়াছে।

তবে যে দুই এক জনের যশোমালা এত কালেও কলুষিত না হইয়া স্বচ্ছ ভাবে অস্মৎকাল পর্য্যন্ত সুশোভিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা স্বসমকালীন লোকসমাজের দূরে অবস্থিত থাকিয়া ঈর্ষ্যার নখর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। যেমন ইটালী ও গ্রীসের অনেক প্রাচীন প্রতিমা ভূমিগর্ভে নিহিত ছিল বলিয়া অনন্তরাগত বর্ব্বরদিগের বিধ্বংসক হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তদ্রূপ সেই পবিত্রকীর্ত্তি মহাত্মারা লোকলোচনের অগোচর থাকিয়াই অক্ষতযশা হইয়া আছেন।

অতএব দেখ বিদ্যাবিষয়ক কীর্ত্তি কত বিষম। শুদ্ধ ধার্ম্মিক হইলে রক্ষা নাই, ধার্ম্মিককেও অনেক সময়ে প্রাণদানে পর্য্যন্ত প্রস্তুত থাকিতে হয়। আর, তুমি ভাব যে, ফ্রান্সের সমৃদ্ধ লোকেরা বিদ্যাবান্‌দিগকে কণামাত্র মমতা করে? তুমি মনে কর যে বিদ্বানেরা রাজসভাতে আদর পান, জন্মভূমিতে সম্ভ্রম লাভ করেন, কিম্বা লক্ষ্মীর মুখ দেখিতে পান? কিছুই নহে। তবে মন্দের মধ্যে ভাল এই যে, বিদ্বান্ বলিয়া কেহ তাঁহাদিগের প্রতি অসূয়া করে না। ইদানীন্তন কালে ঐশ্বর্য্য বা ভোগ ব্যতীত আর সকলেতেই লোকের ঔদাস্য ভাব — কেহই শাস্ত্রবিষয়িণী সুখ্যাতিকে বড় একটা গণনা করে না। শাস্ত্র দ্বারা কাহারও কোন বড় পদপ্রাপ্তি, বা বড় ক্ষমতা উপার্জ্জন, তাহা পূর্ব্বে হইত। সে সময়ে হয় যাজকপদবীতে নয় ধর্ম্মাধিকরণে কিম্বা শান্তিরক্ষাকার্য্যে উচ্চ উচ্চ পদ পাইয়া ক্ষমতাশালী পুরুষদিগের কতক পুরস্কার লাভ হইত। কিন্তু বহি রচনা ব্যতীত আর কোন কর্ম্মই জুটে না। তথাপি এ কথা বলিতে হয় যে, প্রতিভাসপন্ন পুরুষেরা আঢ্যসমাজে হাজার সম্মানহীন হউন, তাঁহাদিগের গ্রন্থ দ্বারা জীবলোকের অনন্ত উপকার দর্শে। যদি অদগুণশালী ব্যক্তির গুণ লুক্কায়িত থাকে, তবে তাঁহাদিগের গ্রন্থেই সে গুণের কীর্ত্তিগান হয়, তাঁহাদিগের গ্রন্থ দ্বারা দুঃখিতের চিত্তবিনোদন হয়, দেশশুদ্ধ লোকের ভ্রমশোধন ও জ্ঞানবর্দ্ধন হয় এবং রাজার কর্ণে যথার্থ কথা

বলা হয়। ঈদৃশ ক্ষমতা অপেক্ষা প্রার্থনীয় বস্তু আর কিছুই নাই। ইহা কি সামান্য সান্ত্বনার কথা যে, এক জন দরিদ্র গ্রন্থকর্ত্তার সূক্তিসমূহ আকল্প কাল ধর্ম্মের প্রাকার ও উৎপীড়নের ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ হইয়া থাকিবে। যখন তিনি মনে মনে আলোচনা করেন যে, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্রেরা হাজার তাঁহাকে অবহেলাই করুক, স্বয়ং নির্ধন হইয়া হাজার অপ্রতিষ্ঠাকুহরে নিলীন থাকুন, এক সময়ে তাঁহার গ্রন্থ হইতে এক অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তি-প্রভা উদিত হইয়া অবনীপতিদিগের যশোদীপ্তিকে অন্তর্হিত করিয়া দিবে এবং চাটুকারদিগের বৃথা বচনপরিপাটীকে বিফল করিয়া দিবে।

পৌল। আমার যে যশ পাইবার ইচ্ছা, সে শুদ্ধ ভর্জ্জীনীর প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার নিমিত্ত। বাসনা হয় যে, এমন চমৎকার করিয়া তাহার গুণগান করি যে, সংসারশুদ্ধ লোকে শুনিয়া মোহিত হউক, তাহার কীর্ত্তি-ঘোষণা করুক এবং তাহার নামে আদর-প্রকাশ করুক। ভাল মহাশয়, আপনি ত এত বিজ্ঞ, এত বিদ্বান্, বলুন দেখি ভর্জ্জীনীর সহিত আমার বিবাহ হইবে কি না? আমার এক এক বার সংকল্প হয়, যদি বিদ্বান্ হইলে ভবিষ্যৎ জানিতে পারা যায়, তবে বিদ্যাটা ভাল করিয়া শিখা যাউক।

প্রবয়া। বাছা, যদি ভবিষ্যৎ জানিবার শক্তি থাকিত, তবে কি কেহ বাঁচিতে চাহিত। যখন একটিমাত্র বিপদের সম্ভাবনা হইলে মনের উদ্বেগের সীমা থাকে না, তখন সহস্র সহস্র দুঃখ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া জানিতে পারিলে আমরা কি হইতাম বিবেচনা কর দেখি। অমুক দিন আমার অমুক দুর্ঘটনা হইবেই হইবে ইহা বুঝিলে কি সংসারে সুখ থাকিত, না জীবনে স্পৃহা থাকিত? আমি মনে করি যে, ভাবী দুঃখের বিষয়ে অধিক চিন্তা করাও কিছু নহে। প্রয়োজনগুলি অগ্রে সমাধান করিয়া রাখিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর বিবেকশক্তি দিয়াছেন, অতএব বিবেকশক্তিকে সেই বিষয়েই অজস্র ব্যাপৃত রাখা আবশ্যক, নতুবা মিছামিছি ভাবী অনর্থাপাত চিন্তা করিলে বিবেকশক্তির অপব্যয় হয়। বাস্তবিকও অধিকাংশ লোকের বিবেকশক্তি প্রয়োজনসমাধানে নিযুক্ত থাকে বলিয়া বৃথা ভব্যচিন্তা করিবার অবকাশ থাকে, সুতরাং কল্পনাসমুত্থাপিত অলীক ভয় বা উদ্বেগে আকুল হইতে হয় না। বিশ্বপতি যে ভাল বন্দোবস্ত সর্ব্ব বিষয়ে করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা তাহারই শুভ ফল।

পৌল। আপনি ত বলিলেন, অর্থ থাকিলে ফ্রান্সে সব সুবিধা জুটে। ভালই হইল, আমি ভারতে যাইয়া বাণিজ্য করিব, তাহা হইলে অনেক অর্থ হইবে। তখন ফ্রান্সে যাইয়া ভর্জ্জীনীকে বিবাহ করিব।

প্রবয়া। কি! তবে জননীদিগকে অনাথা করিয়া যাইতে তোমার কষ্ট হইবে না?

পৌল। কেন, আপনিই আমাকে ভারতে পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন।

প্রবয়া। তখন ভর্জ্জীনী এখানে ছিল। এখন তুমিই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন।

পৌল। কেন, ভর্জ্জীনীর দিদিমার অনেক ধন আছে, সে অর্থ দিয়া তাঁহাদের দুঃখ ঘুচাইবে। আমি নেইবা রহিলাম।

প্রবয়া। বাপুরে! টাকা কি কেহ অমনি দেয়? যাহাদিগের নিকট প্রত্যুপকার পাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাদিগকেই অর্থ দিতে লোকে ব্যস্ত হয়। ভর্জ্জীনীর দিদিমার এমন কত জ্ঞাতি কুটুম্ব আছে, যাহারা বিবি দিলাতুর অপেক্ষা দুর্দশা-গ্রস্ত, অথচ কোথাও আশ্রয় না পাইয়া পরিশেষে উদরান্নের জন্য মঠে যাইয়া চির কাল অবরুদ্ধ থাকে।

পৌল। সর্ব্বনাশ! ইয়োরোপ কি বিষম স্থান! হায়, আমার ভর্জ্জীনী সে স্থানেই রহিয়াছে! বলুন দেখি, ধনবান্ কুটুম্বের কাছে যাইবার কি দরকার ছিল? চুলে ফুল পরিলে ও মাতায় একখানি লাল রুমাল বাঁধিলে তাহাকে কত সুন্দরই দেখাইত!

এই কুটীরে আমাদের সঙ্গে সে কেমন সুখে ছিল! ফ্রান্সের বহুমূল্য বসন ভূষণে, তথাকার সৌধ অট্টালিকাতে, তাহার কি প্রয়োজন ছিল? আয়রে প্রেয়সি! তুই ফিরিয়া আয়! তোর আর ঐশ্বর্য্যে কাজ নাই। সে সকল অট্টালিকা সে সকল সুখ সম্পত্তিতে তোর কিছু দরকার নাই। আমাদের কুটীরে আসিয়া যেমন ছিলি, তেমনি থাক্! হায়! হয় ত তাহার এখন কত দুর্দ্দশাই হইতেছে!

এই বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পরে কহিল 'মহাশয় আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে খুলিয়া বলুন, ভর্জ্জীনীর কি আজও আমার প্রতি মন আছে? যখন রাজসভার বড় লোকেরা তাহাকে বিবাহ করিতে ব্যগ্র হইতেছে, তখন কি তাহার পৌলকে মনে আছে?'

প্রবয়া। বৎস, নানা কারণে আমার নিঃসংশয় বিশ্বাস আছে যে, সে তোমাকে বই আর কাহাকেও পাণিদান করিবে না। বিশেষত, ভর্জ্জীনী যেরূপ ধর্ম্মশীলা, তাহাতে সে কি কখন ব্রতভঙ্গ করিতে পারে?

এই কথা শুনিয়া আমার কণ্ঠধারণপূর্ব্বক হর্ষ প্রকাশ করিল।

পৌল। ভাল, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, যেমন গ্রন্থে বর্ণনা দেখা যায়, ফ্রান্সের মহিলারা যথার্থই সেইরূপ ভ্রষ্টা।

প্রবয়া। বাছা! তাহাতে আর সন্দেহ কি! যে যে দেশে পুরুষে নারীর উপর দৌরাত্ম্য করে, সেই সেই স্থানেই স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনাশ হয়।

পৌল। সে কেমন কথা! পুরুষে কি কখন নারীর উপর দৌরাত্ম্য করিতে পারে? এরূপ অবলা হৃদয়ঙ্গমা জাতিকে যন্ত্রণা দিতে কাহারও কি কখন প্রবৃত্তি হয়?

প্রবয়া। বাছা! যদি কামিনীগণের অমতে তাহাদিগের বিবাহ দেওয়া হয়, যদি মূঢ়ের সহিত বুদ্ধিমতীর, বৃদ্ধের সহিত যুবতীর, পরিণয় বিধান করা হয়, তবে কি নারীর উপর দৌরাত্ম্য হয় না?

পৌল। ভাল, তাই বা করে কেন? যুবার সহিত যুবতীর, বুদ্ধিমানের সহিত মনস্বিনীর বিবাহ দিয়া যোগ্যসমাগম না ঘটায় কেন?

প্রবয়া। ফ্রান্সে অধিকাংশ যুবাই নির্দ্ধন। বিবাহে যত ধন চাই, তাহা উপার্জ্জন করিতে করিতে বৃদ্ধদশা উপস্থিত হয়, সুতরাং বিবাহ বৃদ্ধাবস্থাতেই ঘটে। কিন্তু যৌবন কালের উদ্দাম রিপু চরিতার্থ করিতে তাহারা পরস্ত্রী দূষণ করে, যখন নিজে বৃদ্ধ হইয়া বিবাহ করে তখন তাহাদের পত্নীরাও তৎকালীন যুবকদিগের সহিত কুকার্য্যে রত হয়। সকলেই যৌবন কালে প্রবঞ্চক ও বার্দ্ধক্যে প্রবঞ্চিত হয়। এইরূপ পরমাশ্চর্য্য নিয়মানুসারে চির কালই দাদ তোলাতুলি হইয়া আসিতেছে। স্বয়ং যে পাপের পাপী অন্যেরা সেই পাপের পাপী হইয়া তাহাকে প্রতিফল দিতেছে। ধন যত সংগৃহীত হইতেছে, অর্থাৎ যত অল্পসংখ্যক লোকের হাতে জড় হইতেছে, ততই দরিদ্রের সংখ্যা বাড়িতেছে, ততই পূর্ব্বোক্ত বিশৃঙ্খলা বদ্ধমূল হইতেছে। পৃথিবীতে যত সমাজ আছে, সকলেরই উপবনের সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। যেমন উপবনে কতিপয় বিশালচ্ছায়া-বিশিষ্ট বনস্পতি জন্মিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলি আওতা পাইয়া হীনবীর্য্য ও ক্ষীণ হইয়া যায়, সেইরূপ সমাজে কতিপয় প্রধান লোক নিতান্ত ধনশালী ও মহান্ হইয়া উঠিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকদিগের সৌভাগ্য রোধ হয়, ধন ক্রমেই সংগৃহীত হইতে থাকে, যাহার যতধন সে সেই পরিমাণে উপার্জ্জন করে, এই রূপে নির্দ্ধনেরা বস্তুগতি দ্বারাই রিক্ত হইয়া যায়। কিন্তু উপবনের সহিত তুলনাতে এই বিশেষ লক্ষিত হয় যে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ না থাকিলেও কতিপয় প্রকাণ্ড বনস্পতি দ্বারা উপবনের

শোভা থাকে। কিন্তু শুদ্ধ কতিপয় ধন-শালী পুরুষ থাকিলে সমাজের উন্নতিবিধান হয় না, প্রত্যুত লোকগণের অবস্থা যত সমান হয়, এবং মধ্যবিত্ত লোক যত অধিক হয় ততই সমাজের সম্পত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়।

পৌল। ভাল, বিবাহ করিতে অর্থে-রই বা দরকার কি?

প্রবয়া। অর্থ থাকিলে বিনা পরিশ্রমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়।

পৌল। ভাল, পরিশ্রম করিতে দোষ কি? আমার ত পরিশ্রমে অরুচি নাই।

প্রবয়া। বৎস, ইয়োরোপে খাটিয়া খাইলে ভদ্রলোকে অশ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা শরীরের পরিশ্রমকে মজুরি বলেন। আবার আপন হস্তে লাঙ্গল ধরা অপেক্ষা নিন্দা-স্পদ কর্ম্ম আর কিছুই নাই। শিল্পব্যব-সায়ীরা বরং পদে আছে, কিন্তু কৃষাণের অবস্থাকে সকলেই ঘৃণা করে।

পৌল। কি বলিলেন! যে কর্ম্ম দ্বারা সংসারশুদ্ধ লোকের প্রাণধারণ হয়, সেই কৃষিকার্য্যকে লোকে ঘৃণা করে। এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারি না।

প্রবয়া। বৎস, তুমি প্রকৃতির মার্গে পরি-বর্দ্ধিত হইয়াছ, তোমার কি সাধ্য যে জন-সমাজের কুনীতি বুঝিয়া উঠিবে। যাহা নিয়-মানুগত, তাহা সকলে বুঝিতে পারে, কিন্তু বিশৃঙ্খলার স্বরূপ আকলন করা দুঃসাধ্য। ধর্ম্ম সৌন্দর্য্য সুখ এ সকল পদার্থ কি তাহা সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া যায়, কারণ ইহাদের সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু অধর্ম্ম কুরূপতা দুঃখ এ সকল পদার্থ সামঞ্জস্য-বর্জ্জিত অতএব ইহাদিগকে কে আকলন করিতে পারে?

পৌল। সে যাহা হউক মহাশয়, কিন্তু ধনীরা ত তবে বড় সুখী, আপন প্রেমাস্পদ জনকে তাহারা যত ইচ্ছা সুখ দিতে পারে, কিছুতেই তাহাদের মনোরথের ব্যাঘাত হয় না।

প্রবয়া। বৎস, ধনীদিগের কোন সুখই অভুক্ত নাই, কারণ তাহাদের কিছুরই অভাব নাই। বল দেখি, ক্ষুধার পর ভোজন, তৃষ্ণার পর বারিপান, পরিশ্রমের পর বিশ্রাম কেমন সুখাবহ হয়! সেইরূপ প্রথমে অনেক কষ্ট, অনেক অসুখ ভোগ করিবার পর প্রণয়জনিত বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ হয়। কিন্তু ধনীদিগের যখন যাহা বাসনা হয়, তখনই তাহা পূর্ণ হয়, সুত-রাং কিছু কষ্টের পর বাসনা চরিতার্থ হইলে যে অতুল আনন্দ পাওয়া যায় তাঁহারা তদ্বিষয়ে বঞ্চিত। ভোগে ভোগে তাঁহাদের অতি তৃপ্তি ও বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের নূতন কামনা কিছুই নাই, বরং যে সকল সুখভোগে অভ্যাস হইয়াছে, তাহার কণামাত্র অস-দ্ভাব হইলে দারুণ যন্ত্রণা বোধ হয়। অতি তৃপ্তির দরুণ তাঁহাদের কিছুই ভাল লাগে না, তাঁহারা সকলেতেই নাক তোলেন, তাঁহাদের সময় যেন কাটে না, কোন আশা অসিদ্ধ নাই, প্রতিদিন কেবল সেই একই প্রকার সুখসাধন সামগ্রী উপভোগ করিতে করিতে আত্মবিরক্ত হইয়া যান। ভাবিয়া দেখ বৎস, সহস্র গোলাপ কুসুমের সৌরভ এক বার আঘ্রাণ করিলেই সকল স্বাদ ফুরাইয়া যায়, কিন্তু একটিমাত্র কাঁটা ফুটিলে কত ক্ষণ বেদনা থাকে। সেইরূপ ধনীরা পরমসুখসাধন পদার্থ সমূহের স্বামী হইয়াও একটিমাত্র দুঃখ পাইলে তাঁহাদের সকল সুখ দূষিত হইয়া যায়। কিন্তু দরি-দ্রেরা চির কাল দুঃখী, চির কাল কন্টক-শয্যায় শয়ান, অতি সামান্য সুখ হইলেই তাহাদের আমোদের সীমা থাকে না। ফলত যেমন অন্ধকারে না গেলে আলোর মজা বুঝা যায় না, তেমনি দুঃখ না জানিলে সুখ হয় না। এখন বল দেখি বাপু, কোন্ অবস্থা তোমার ভাল বোধ হয়, যে অবস্থাতে সব সুখ একপ্রকার ভোগ হইয়াছে, এখন কেবল সতত দুঃখের আশঙ্কা করিতে হয়, তুমি সেই অবস্থা চাও? কিংবা যে অবস্থাতে দুঃখের আর বাকী নাই,

সুতরাং কিঞ্চিৎ মাত্র সুখ হইলেই আমোদের সীমা থাকিবে না, সেই অবস্থা তোমার প্রার্থনীয় বোধ হয়? ধনীরা প্রথমোক্ত দশায় আছেন, দরিদ্রেরা শেষোক্ত দশা ভোগ করে। ফলে, এ উভয়প্রকার দশাই সহ্য করা অসাধ্য। মধ্যমপ্রকার অবস্থা না হইলে ধর্ম্মও থাকে না, সুখও হয় না।

পৌল। ভাল, ধর্ম্ম আপনি কাহাকে বলেন?

প্রবয়া। বৎস, তুমি স্বহস্তে পরিশ্রম করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেছ, ধর্ম্ম শব্দের অর্থ তুমি জানিবে না ত জানিবে কে? কেবল ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশে স্বার্থশূন্য হইয়া পরহিতসাধন করাকেই ধর্ম্ম বলা যায়।

পৌল। তবে ত, ভর্জ্জীনীর মত ধর্ম্মশীলা আর নাই! দেখুন পরের উপকার হইবে ভাবিয়াই সে ধনাভিলাষিণী হইয়াছে, ধর্ম্মের জন্যই সে ফ্রান্সে গিয়াছে! এমন ধর্ম্মশীলা হইয়া সে কি বুঝিবে না যে, এখানে না আসিলে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে? তাহার ধর্ম্মই তাহাকে প্রত্যাগমন করাইবে।

ভর্জ্জীনী প্রত্যাগমন করিবে এই ভাবিয়া পৌলের সকল উদ্বেগ দূর হইল। মনে করিল যে এত দিন সংবাদ পাওয়া যায় নাই, শুদ্ধ আসিবার উদ্যোগ হইতেছে এই নিমিত্ত। সুবাতাস হইলে ইয়োরোপ হইতে মরীশসে আসিতে কতই বা দিন লাগে, কত জাহাজ তিন মাসের মধ্যেই আসিয়া পঁহুছিয়াছে, তাহাতে আবার জাহাজনির্ম্মাণবিদ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কত উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, লোকে জাহাজচালনে কেমন দক্ষ কেমন পটু হইয়াছে, এখন কি দুই মাসের অধিক লাগিতে পারে? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তাহার উল্লাসের আর সীমা রহিল না। কি রূপে আর একখানি ঘর বাঁধিবে, কি রূপে বাগানখানি আরও ভাল করিবে, কি রূপে ভর্জ্জীনীকে বিবাহ করিয়া নিত্য নূতন আমোদ দ্বারা তাহাকে সুখী রাখিবে, সেই সকল কথা কহিতে লাগিল। 'ভর্জ্জীনীকে বিবাহ' এই কথা মনে উদয় হওয়াতে তাহার যে কি অপরিসীম আহ্লাদ হইল, তাহা বলা যায় না। আমাকে কহিল 'সে যাহোক মহাশয়, আপনি কিন্তু একাকী থাকিতে পাইবেন না, পরিশ্রমও করিতে পারিবেন না। ভর্জ্জীনীর ধন হইলে কত চাকর রাখা যাইবে, তখন কি আপনার খাটাখোটা ভাল দেখায়? আপনি আমাদের কাছে থাকিয়া ইচ্ছামত আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইবেন।' এই আশালতা আপন মনে দুরারোহিণী হইলে জননীদিগকে সেই আশ্বাস দিতে ঘরে চলিয়া গেল।

দিন কতক পরেই বড় আশার পর বড় আশঙ্কা উপস্থিত হইল। মনেরও এইরূপ ধর্ম্ম যে, একপ্রকার ভাব উদ্দাম ও উদ্ধত হইলে শীঘ্রই তদ্বিরুদ্ধ ভাব সেইরূপ উদ্দামরূপে আবির্ভূত হয়। মধ্যে মধ্যে আমাকে আসিয়া বলিত 'কই ভর্জ্জীনী আজিও সংবাদ পাঠাইল না! যদি সে যাত্রা করিত অবশ্যই খবর দিত। হায় হায় লোকে যাহা বলিয়াছে, তাহাই সত্য হইল। সে সকল জনশ্রুতি কিছুই মিথ্যা নহে। ধনের লোভে ভর্জ্জীনীও ধর্ম্ম হারাইল! যে সকল গ্রন্থে স্ত্রীর স্বভাব তত স্পষ্ট রূপে বর্ণিত আছে, তাহাতে স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম অলীকই বলিয়াছে। ভর্জ্জীনীর যদি ধর্ম্ম থাকিত, তবে কি সে আপন মাকে ছাড়িতে পারিত। তাহা হইলে কি সে আমাকে ভুলিয়া যাইত? যখন আমি কেবল তাহাকেই ভাবিতেছি, তখন সে এক বারও আমার কথা মনে করে না। আমার যন্ত্রণার শেষ নাই, সে এখন আমোদ করিতেছে। হায় হায়! ইহা ভাবিলে আর আমাতে আমি থাকি না, আমার কিছুই ভাল লাগে না, সকলতেই বিরক্ত বোধ হয়। পরমেশ্বর করুন যে, ভারতবর্ষে শীঘ্র যুদ্ধ আরম্ভ হউক, আমি

যুদ্ধে যাইয়া প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলেই সকল যাতনা শেষ হয়।

আমি কহিলাম বৎস প্রাণত্যাগের সাহস কিছু বড় প্রশংসিত নহে তাহা অতি অল্পক্ষণস্থায়ী। অনেকে বৃথা কীর্ত্তি লিপ্সাতেও প্রাণত্যাগ করে। যে ব্যক্তি সহিষ্ণু হইয়া প্রতিদিনের অসংখ্য কষ্ট বহন করে, অথচ তাহাকে প্রশংসা করিতে বা সাহস দিতে জন মানবটী নাই, তাহার সাহসই প্রকৃত সাহস। নতুবা সুখ্যাতির উপর ভর করিয়া, কিম্বা উদ্ধত রিপু চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কিম্বা কোন দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত লোকে যে সাহস অবলম্বন করে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। ভগবানের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সহিষ্ণুতা স্বরূপ বর্ম্ম ধারণ করিয়া যিনি অশেষ বিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হয়েন, তাঁহার মত সাহস থাকিলেই যথার্থ ধার্ম্মিক হওয়া হয়। সে কহিল 'হায়, তবে ত আমার ধর্ম্মও নাই! যে দিকে চাই, সেই দিগকেই আপনাকে হতভাগা মনে হয়! আমার চতুর্দ্দিকেই নৈরাশ্য!" আমি কহিলাম 'বৎস, কখন স্খলন হয় না, চিরকাল সমান থাকে, এমন ধার্ম্মিক কি মানুষে হইতে পারে? আন্তরিক রিপুরা নিরন্তরই আমাদিগকে সংক্ষোভিত করিতেছে, তাহাদিগের বশে যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ যে বুদ্ধি এক এক বার ধন্দ্বিত ও বিচলিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তজ্জন্য, হায় হায় আমার গেল, বলিয়া দুঃখই বা কি? এই চিত্ত-বিকারের মহৌষধ স্বরূপ এবং এই মনের অন্ধকারের প্রদীপ স্বরূপ এক পদার্থ আছে, তাহার নাম শাস্ত্র। যখন বিবেক স্বরূপ জ্যোতি মোহ স্বরূপ কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হয় তখন শাস্ত্রের আলোক দ্বারাই তাহাকে সপ্রকাশ করিতে হয়।

শাস্ত্রের কথা কি বলিব বৎস! শাস্ত্র যেন ঈশ্বরের হস্তালম্ব, ইহার সাহায্যে আমরা দুর্মতি পঙ্ক হইতে উদ্ধার পাই। যে অনন্ত জ্ঞানের বশে বিশ্ব[illegible]লের ভিতর [illegible]সিত হইতেছে, শাস্ত্র তাহার [illegible]দিলেন। স্বরূপ। যে শক্তি দ্বারা সেই প্রতিবিম্বকে পৃথিবীতলে আনা ও রাখা হইয়াছে, তাহাও ঐশী শক্তি বলিতে হইবে। সূর্য্যের কিরণমণ্ডলের ন্যায় শাস্ত্র দ্বারাই সকল বস্তু প্রকাশিত সুশোভিত ও সজীব হইয়া থাকে। সকল পদার্থ সকল কাল সকল লোক ও সকল স্থান শাস্ত্রের প্রভাবে আমাদের হস্তামলকবৎ হইয়া যায়, শাস্ত্রের উপদেশেই জীবনের যথার্থ পথ অনুসরণ করিতে পারি, শাস্ত্রের সাহায্যে সকল ভ্রান্তি সংশোধন করিয়া লই। শাস্ত্র প্রভাবে দুষ্প্রবৃত্তি স্তম্ভিত হয় ও পাপের প্রসর রুদ্ধ হয়। প্রাচীন কালে যে সকল মহাপুরুষ পুণ্যপথাবলম্বী হইয়া চিরকাল মাননীয় ও যশস্বী হইয়াছেন, শাস্ত্র তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাদিগের মনে পুণ্যের বীজ রোপণ করে। সেই শাস্ত্রের দুহিতা স্বরূপা বিদ্যা যেন দেবলোকের কোন বিদ্যাধরী মানবমণ্ডলীর অশুভ নিরাসার্থ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে যে দুঃসময়ে ধর্ম্ম কর্ম্মের লোপ হইয়া ধরাতল প্লাবিত হইয়াছে, সেই সেই অবসরেই বিদ্যার বিমল জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া প্রধানতম প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের চিত্তে প্রতিফলিত হইল। ভাব দেখি বৎস, তোমা অপেক্ষা [illegible]গুণে দুর্দশাপন্ন কত পুরুষ শুদ্ধ বিদ্যার [illegible] উপাসনাতেই সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন। অতএব শাস্ত্রেই মনোনিবেশ কর। যে সকল বিজ্ঞবর গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা দুর্ভাগ্য মার্গের প্রাচীন পথিক, যখন কেহই সাহায্য করিতে না পাকে, তখন তাঁহারাই হাত বাড়াইয়া দিয়া উদ্ধার করেন এবং আমাদিগের সঙ্গী হন। উত্তম গ্রন্থ আর উত্তম বন্ধু উভয়ই তুল্যমূল্য।

পৌল কহিল 'হায়, যদি ভর্জ্জীনী এখানে থাকিত তাহা হইলে কখন কি মনস্তাপ হইত! যা বহি পড়িয়া তাহা

সুতরাং কিঞ্চিন্নতে যাইতাম? সে যখন প্রের সৌন্দলিয়া আহ্বান করে এবং মধুর ভাবে দৃষ্টিপাত করে, তখন কি মনে অসুখ থাকিতে পায়।”

আমি কহিলাম ‘সে কথা অতি যথার্থ বৎস! মনোরমা ও অনুরক্তা প্রেয়সীর মত বন্ধু কেহই নাই। অবলাগণের ললিত বিলাসিতার নিকট পুরুষের কোন খেদ স্থান পায় না। চিন্তার তামসী মূর্ত্তি তাহাদিগের বিভ্রমের নিকট অন্তর্হিত হয়। তাহাদিগের মুখশ্রীতে রম্যতা ও সারল্য সর্ব্বদা বিরাজমান। তাহাদিগের আহ্লাদ দেখিলে কাহার আনন্দ উচ্ছলিত না হয়? তাহাদিগের সুমধুর মন্দ হাস্য দেখিলে কাহার ললাট আকুঞ্চিত না হয়? তাহাদিগের অশ্রুজলে কাহার ক্রোধ না গলিয়া যায়? ভর্জ্জীনী আসিবে বাছা! তাহার জন্য চিন্তা কি? আর এক কথা এই যে, বিরহ দুঃখভোগ করিয়া সে তোমা অপেক্ষা শতগুণে অভিজ্ঞ হইয়া আসিবে। তুমি শোকে অধীর হইয়া তাহার অভিমত বৃক্ষবাটিকার প্রতি কোন মনোযোগ দিতেছ না, সে জানিলে কি ভাবিবে বল দেখি!

ভর্জ্জীনীর প্রত্যাগমনের আশ্বাস পাইয়া পৌলের আবার সাহস হইল। পরদিন অবধি মনোযোগ দিয়া সে গৃহকার্য্যাদি দেখিতে লাগিল। আমি তাহাকে আশ্বাস দিতে পারিয়াছি বলিয়া বড় সুখ বোধ হইল। একদিন প্রাতঃকালে পৌল দেখিল যে আবিক্তিয়াশিখরে একটী শুভ্র নিশান তুলিয়া দিয়াছে। পৌল জানিত যে এই নিশান দ্বীপের দিকে কোন জাহাজ আসিতে দেখিলেই তুলিয়া থাকে, অতএব ভর্জ্জীনীর কোন পত্রাদি যদি আসিয়া থাকে এই আশায় শহরে গেল। তখন দ্বীপস্থ কাণ্ডারী চিরন্তন প্রথা অনুসারে নবাগত জাহাজের তথ্যাদি জানিতে সযত্নে গমন করিয়াছিল। পৌল তাহারই প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। এ ব্যক্তি ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইয়া গেল এবং সে গবর্ণরকে জানাইল যে জাহাজের নাম সেণ্ট্ জিরন্, পরিমাণে প্রায় একুশ শ মণী, কাপ্তেনের নাম আবিন্। জাহাজ সংপ্রতি আট ক্রোশ দূরে অগাধ জলে রহিয়াছে। যদি সুবাতাস হয়, পরদিন দুই প্রহরের পর দ্বীপে আসিয়া লঙ্গর করিবে, এখন কিন্তু যেখানে আছে, সেই স্থানেই থাকিবে। এই খবর জানাইয়া, ফ্রান্স হইতে পূর্ব্বোক্ত জাহাজ যোগে যে সকল চিঠীপত্র আসিয়া ছিল, তাহা গবর্ণরকে অর্পণ করিল। তন্মধ্যে বিবি দিলাতুরের নামে ভর্জ্জীনীর প্রেরিত একখানি চিঠী ছিল। পৌল গ্রহণ পূর্ব্বক উহা চুম্বন করিল এবং হৃদয় বস্ত্রে রাখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সমস্ত পরিবার বিয়োগ গিরিতে তাহার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ছিল, পৌল ঊর্দ্ধবাহু হইয়া দূর হইতে তাহাদিগকে পত্র দেখাইল। সকলে পত্র শুনিবার বিস্মিত বিবি দিলাতুরকে ঘেরিয়া বসিল। পত্রে লেখা ছিল ‘দিদিমা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ বিরাগ প্রদর্শন করাতে চটিয়া গেলেন, বিষয়পত্রাদি দিবার বন্দোবস্ত রহিত করিলেন এবং এমন সময়ে আমাকে জাহাজে তুলিয়া দিয়াছেন যে, ঠিক্ ঝড় ঝটিকার কালেই দ্বীপে পঁহুছিতে হইল। যখন আমি কহিলাম, মা এখানে নাই, তদ্ব্যতীত আমার হৃদয় এক প্রকার পরাধীন হইয়াছে, অতএব কিরূপে বিবাহ করিব, তখন দিদিমা উত্তর দিলেন ‘তুই পাগল হইয়াছিস্, বহি পড়িয়া তোর বুদ্ধি বিগড়িয়া গিয়াছে।’ সে যাহৌক্ মা, আমি যে আবার তোমাদিগকে আলিঙ্গন করিতে পাইলাম, আবার দেখিতে পাইলাম, তাহাই পরম লাভ। সেই অভিলাষ আজিই চরিতার্থ করিতাম, কিন্তু কাপ্তেন কাণ্ডারীর নৌকায় আমাকে যাইতে দিলেন না। বলিলেন যে সমুদ্রের ভাব দেখিয়া তত ক্ষুদ্র নৌকাতে আমাকে পাঠাইতে তাঁহার

মন সরে না। ফলে সে কথা সত্য, একটুও বাতাস নাই, অথচ সমুদ্র বড় অস্থির রহিয়াছেন। পত্র পাঠ সমাপ্ত হইবামাত্র সকলে আহ্লাদে মত্ত হইয়া কহিল 'ভর্জ্জীনী আসিয়াছে যে।' প্রভু ভৃত্যে সকলেই পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল। বিবি দিলাতুর কহিলেন 'বৎস পৌল, প্রতিবেশী মহাশয়কে এই খবর দিয়া এস।' তৎক্ষণাৎ দমিঙ্গ মশাল জ্বালিল এবং উভয়ে আমার গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিল।

রাত্রি দশটা হইবে, এমন সময়ে প্রদীপ নিবাইয়া শুইতে যাইতেছি, বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখি যে বনে আলো জ্বলিতেছে। ক্ষণকাল পরেই পৌল আমাকে ডাকিল। অমনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বসন পরিধান করিতেছি, তৎক্ষণাৎ পৌল পরিশ্রমে হাঁস্‌ফাঁস করিতে করিতে আসিয়া আমার কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক কহিল 'চলুন্ মহাশয়, ভর্জ্জীনী আসিয়াছে। ভোর হইলেই জাহাজ ডাঙায় ধরিবে, চলুন্ এই বেলা বন্দরে যাওয়া যাউক।' শুনিবা মাত্র প্রস্তুত হইলাম এবং তিন জনে বন্দরে যাইবার পথ ধরা গেল। বনে বনে কতক দূর গিয়া যখন বাতাবিকুঞ্জ হইতে বন্দরে যাইবার পথে পড়িয়াছি, তখন পশ্চাতে একজনের পদশব্দ শুনিলাম। ফিরিয়া দেখি এক জন কৃষ্ণকায় দ্রুতবেগে দৌড়িতেছে। নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসিলাম 'এত শীঘ্র কোথায় যাও?' কহিল 'আমি স্বর্ণরেণু নামক প্রদেশ হইতে আসিতেছি, গবর্ণরের কাছে যাইয়া জানাইতে হইবে যে, অম্বর দ্বীপে একখান জাহাজ লঙ্গর করিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে তোপ করিয়া বিপত্তি জানাইতেছে, সমুদ্রেরও ভাবগতি ভাল নয়।' ইহা বলিয়াই সে বরাবর চলিয়া গেল।

তখন আমি কহিলাম 'তবে স্বর্ণরেণুতেই যাওয়া যাক, কেন না ভর্জ্জীনী ত সেই স্থানেই আছে। আমি জানি স্বর্ণরেণু এখান হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ পথ হইবে।' তদনুসারে উত্তরমুখ হইয়া যাইতে লাগিলাম। দূর স্থলের ভিতর গ্রীষ্ম বোধ হইতেছিল, চন্দ্র উদিয়া দিলেন। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পরিধি দ্বারা বেষ্টিত আছেন দৃষ্ট হইল, আকাশের মলিনভাব দেখিয়া আমার মনে মহাভয় হইল, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুত চমকাইতে ছিল, সমুদ্রের দিক হইতে কৃষ্ণবর্ণ ঘন মেঘমালা মহাবেগে সঞ্চালিত হইয়া দ্বীপের মধ্যস্থলে সংগৃহীত হইতেছিল, অথচ ধরণীতে বাতাসের লেশ মাত্র ছিল না। যাইতে যাইতে বোধ হইল যেন দূরে বজ্র নির্ঘোষ হইতেছে, কিন্তু মনোযোগ দিয়া শুনাতে বুঝা গেল যে উহা কামানের ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি মাত্র। এইরূপ তোপ শুনিয়া এবং আকাশের তেমন ভীষণ ভাব দেখিয়া আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, আর একটু সন্দেহও রহিল না যে জাহাজ হইতে বিপত্তিসূচক তোপ হইতেছে। ক্ষণকাল পরে সে শব্দও শুনিতে না পাইয়া হৃদয় আরও আকুল হইল, সেই স্তব্ধভাব ততোধিক ভয়ঙ্কর বোধ হইল।

আমরা সকলেই মৌনভাবে চলিতে লাগিলাম, মনের শঙ্কা মনেই রহিল, কেহ কোন কথা কহিতে পারিল না। প্রায় দুপহর রাত্রি সময়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে স্বর্ণরেণুতে পঁহুছিয়া দেখি যে, ভৈরব রবে সাগরের তরঙ্গ আসিয়া স্থলে লাগিতেছে, তাহাতে বেলা ভূমি ও তত্রত্য গণ্ডশৈল সমূহ শুভ্রবর্ণ ফেনায় জলপাপ্‌ হইতেছে এবং লবণাম্বু সঞ্চলিত হওয়াতে খদ্যোতিকার মত আলোকশিখা দেখা দিতেছে। অন্ধকারে বিশ্ব আচ্ছন্ন থাকিলেও এই আলোক দ্বারা দেখা গেল যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলেডিঙ্গী গুলিকে সিকতাময় তীরে বহুদূর উঠাইয়া রাখিয়াছে। কিছু দূরে দেখি কতকগুলি লোক আগুন জ্বালিয়া বনের প্রান্তে বসিয়া আছে, আমরাও তথায় যাইয়া প্রভাত প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম এবং নানা জনের নানা কথা চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলাম। একজন বলিল

সুতরাং কিঞ্চিন্নতে খানা জাহাজ স্রোতে দের সীন্দুলের দিকে আসিতেছে, দেখিয়াছিলাম, সন্ধ্যার দুই ঘণ্টা পরে ঐ জাহাজ হইতে বিপত্তিসূচক তোপ হইয়াছিল, কিন্তু সমুদ্রের কুভাব দেখিয়া কেহ নৌকা লইয়া যাইতে পারে নাই। ক্ষণকাল পরেই দেখি যে জাহাজে আগুন জ্বালিয়া বিপদ জানাইতেছে। আমার বোধ হয় যে দ্বীপে আসিবার সময় জাহাজ খানা উদ্যামাকের খাড়িতে না প্রবেশিয়া অম্বর দ্বীপের খাড়িতে প্রবেশিয়াছে। ঠিক্ত বলিতে পারি না, কিন্তু যদি তাহা ঘটিয়া থাকে, তবে ভয়ের কথা বটে, কারণ অম্বর দ্বীপের খাড়িতে জল বড় কম।' আর একজন কহিল 'বল কিহে! আমি কতবার অম্বর দ্বীপের খাড়িতে নৌকা চালাইয়াছি, আমি জলের ভাব জানি না! যদি জাহাজ উহার মধ্যে প্রবেশিয়া থাকে, তবে কোন শঙ্কা নাই।' আর এক জন কহিল 'না হে না! অম্বর দ্বীপের খাড়িতে জেলেডিঙ্গী ঠেকিয়া যায়, তাহার মধ্যে জাহাজের প্রবেশ হওয়াই অসম্ভব। আমি দেখিয়াছি জাহাজ খানা অম্বরদ্বীপের ওপারে লঙ্গর করিয়াছে। যদি প্রাতঃকাল সুবাতাস হয়, তবে সে চাই বাহির জলেও যাইতে পারে, দ্বীপের দিকেও আসিতে পারে।' এই রূপে কত জনে কত কথা কহিতে লাগিল, আমরা নিস্তব্ধ হইয়া কেবল শুনিতে লাগিলাম। ভোর হয় হয়, এমন সময়ে দেখা গেল যে প্রায় শওয়া মাইল অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মত অম্বর দ্বীপ রহিয়াছে, সমুদ্রে আর কিছু দেখা গেল না। কেবল দ্বীপের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে এক একটী পর্ব্বত চূড়া মেঘের আবরণে লুকাইতেছে, আবার মেঘ চলিয়া গেলে বাহির হইতেছে। সাতটার সময় বনের মধ্যে নাগরার শব্দ হইল এবং অবিলম্বে কতিপয় বন্দুকধারী সৈনিক অনেক কৃষ্ণকায় ও দ্বীপের কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক গবর্ণরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। গবর্ণর সমুদ্রের তীরে সিপাহীদিগকে সারিবন্দী দাঁড়করাইয়া দিয়া যুগপৎ আওয়াজ করিতে কহিলেন। তীরে আওয়াজ হইবা মাত্র সমুদ্রে একটী আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ তোপ হইল। তোপের শব্দে জাহাজ অতি সন্নিহিত বোধ হইল এবং সকলে আগ্রহের সহিত আলোর দিকে দৌড়িয়া গেল। তখন ঘন কুজ্ঝটিকার মধ্যে একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ ও তাহার দড়িদাড়া দৃষ্টিগোচর হইল। এত নিকটে ছিল যে মালিম্ খালাসীদিগকে যে সঙ্কেত শব্দ করিয়া হুকুম দিতেছেন এবং খালাসীরা মালিমের আজ্ঞানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় তিন বার 'মহারাজ কী জয়' বলিয়া যে জয়শব্দ করিতেছে, তাহা পর্য্যন্ত স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল। ✓

যখন জাহাজের লোকে দেখিল যে তাহাদিগের সাহায্যার্থ আমরা তীরে সজ্জীভূত আছি, তখন তিন মিনিট অন্তর তোপ হইতে লাগিল। লাবুর্দনে সাহেব তীরের স্থানে স্থানে আগুন জ্বালিতে হুকুম দিয়া নিকটবাসীদিগকে, আহার দ্রব্য কাষ্ঠফলক কাছি খালিপিপা প্রভৃতি তৎকালোপযোগী সামগ্রী যোগাইতে কহিলেন। ক্ষণকাল পরে পূর্ব্বোক্ত সামগ্রী লইয়া এক দঙ্গল লোক উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে একজন প্রাচীন গবর্ণরের নিকটে যাইয়া কহিল 'মহাশয়, পাহাড়ের ভিতর সারারাত এক প্রকার সোঁসোঁ রব শুনা গিয়াছে, বিনা বাতাসে গাছের পাতা নড়িতেছে, সামুদ্রিক পক্ষীরা স্থলে আশ্রয় লইতেছে, বোধ হয় শীঘ্রই ঝড় হইবে।' গবর্ণর কহিলেন 'ভয় কি, ভাই সকল! ঝড়ের জন্যেই ত আমরা উদ্যোগ করিতেছি, জাহাজের লোকেও বোধ করি সতর্ক হইয়া আছে।' ফলে, ঝড় যে শীঘ্র হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। মাতার উপরে যে সকল মেঘ ছিল, তাহাদের

মধ্যভাগ ঘোর কাল, অথচ ধারে ধারে রক্তবর্ণ। চারিদিক হইতে সামুদ্রিক পক্ষী উড়িয়া চীচীকুচি করিতে করিতে দ্বীপের দিকে আসিতে লাগিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলেও তাহাদের দিগ্‌ভ্রম হইল না।

বেলা নটার সময়ে সমুদ্র হইতে ভয়য়ঙ্কর গর্জ্জন উঠিল মনে হইল যেন বজ্র ও জলরাশি একত্র হইয়া পাহাড় হইতে গড়াইয়া পড়িতেছে। 'ঐ ঝড় এলো রে' বলিয়া সকলেই চীৎকার করিল এবং পরক্ষণেই ভয়ঙ্কর বাত্যা উঠিয়া অম্বরদ্বীপ ও তাহার খাড়ীর উপরিস্থিত কুজ্ঝটিকারূপ আবরণ উড়াইয়া দিল। তখন দেখাগেল সেণ্ট্ জিরনের উপরিতলায় জাহাজ শুদ্ধ লোক জড় হইয়াছে, তাহার সম্মুখভাগ সমুদ্রের দিকে অভিমুখ হইয়া তিন খান রশি দ্বারা বাঁধা আছে, পশ্চাদ্ভাগে একটি মাত্র লঙ্গর আছে, মাস্তুল দড়া দড়ি সব শোয়াইয়া রাখিয়াছে, মরীশসের চারি ধারে যে প্রস্তরময় চর আছে, জাহাজখানা তাহার ভিতরে আসিয়া অম্বরদ্বীপ ও মরীশসের মধ্যেবর্ত্তী খাড়িতে প্রবেশিয়াছে। যেমন এক একবার বড় বড় তরঙ্গ আসিয়া লাগিতেছিল, অমনি জাহাজের সম্মুখভাগ উত্তোলিত ও পশ্চাদ্ভাগ জলে নিমগ্ন হইতেছিল। এই ভাবে চড়ায় ঠেকিয়া তাহার তীরে আসিবারও যো ছিল না বাহির হইবারও উপায় ছিল না। উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া তাহার ভগ্নকাষ্ঠ সকল জমীর উপরে কতক দূর প্রক্ষেপ করিল এবং পরক্ষণেই ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করত ফিরিয়া গিয়া তীরের কতক্দূর জলশূন্য করিল। 'প্রস্তরখণ্ড সমূহ তাহার বেগে বিচালিত হইয়া গড় গড় শব্দে গড়াইতে লাগিল। বাতাস ক্রমেই বাড়িল এবং অর্ণব ক্রমেই ভীষণ হইয়া উঠিলেন। খাড়িটীময় শ্বেতবর্ণ ফেনারাশি আচ্ছাদনে ঢাকিয়া গেল, সেই স্তূপাকার ফেনের মধ্য হইতে নীলবর্ণ তরঙ্গের চঞ্চল দেহ দেখা-দিতে লাগিল। এই ফেনরাশি শিলাময় বেলাভূমির নিকটে চারি হস্ত প্রমাণ উচ্চ হইলে পবনদেব কতক্দূর স্থলের ভিতর তাহাদিগকে বিসারিত করিয়া দিলেন। যখন ধবলাকারে সেই ফেন পর্ব্বত মূল পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিল, তখন, ঠিক যেন সমুদ্র হইতে মেঘ উঠিতেছে এরূপ বোধ হইল। ঝড় যে অনেকক্ষণ থাকিবে তাহার সকল চিহ্নই দেখা গেল। সমুদ্র তরঙ্গ দ্বারা গগন স্পর্শ করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা ঘোরবেগে দ্বীপাভিমুখে ধাবমান হইয়া তত্রত্য স্থির মেঘের উপর জমা হইতে লাগিল। আকাশের নীলবর্ণ একেবারে অন্তর্হিত হইল, কি জলধি কি মহীতল সকল স্থানেই এক প্রকার পাণ্ডুর বর্ণ আলোক প্রকাশমান ছিল!

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দোদুল্যমান হওয়াতে জাহাজের যে দশা ঘটিবার কথা, তাহাই ঘটিল। সম্মুখের সব কাছি ছিঁড়িয়া গেল এবং তরঙ্গের বেগে সঞ্চালিত হইয়া জাহাজ তীর হইতে আধ্ রশি দূরে সামুদ্রিক শিলায় পড়িয়া ধাক্কা খাইল। সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। পৌল জলে ঝাঁপ দিতে যায়, ধরিয়া কহিলাম "বৎস কর কি? প্রাণ হারাইবে না কি?' সে চীৎকার করিয়া বলিল 'আমি তাহাকে বাঁচাইতে যাই, আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।' শোকে তাহাকে জ্ঞানশূন্য দেখিয়া তাহার কটি দেশে এক গাছা লম্বা রশি বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিলাম, দমিঙ্গ ও আমার হাতে রশির খুঁট্ রহিল। পৌল একবার সাঁতার দেয়, আবার পাড়ের উপরে দৌড়িয়া যায়, এই ভাবে জাহাজ অভিমুখে চলিল। তরঙ্গের গতাগতিতে জাহাজের নিকট পর্য্যন্ত এক এক বার ডাঙ্গা হইতেছিল, সেই সময়ে পৌল জাহাজ পাইলাম বলিয়া ধাবমান হয়, কিন্তু ক্ষণান্তরে উত্তাল জলরাশি আসিয়া জাহাজকে পশ্চাদ্ভাগের দিকে নত করে, পুরোভাগ আকাশে তুলিয়া দেয়, এবং পৌলকে তীরের উপর কতক্দূর লইয়া প্রক্ষেপ করে। বারম্বার ইহা ঘটাতে তাহার চরণ দিয়া রক্ত

পড়িতে লাগিল বক্ষে শক্ত আঘাত লাগিল এবং সে অচেতন হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলেই উঠিয়া দেখিল ঢেউ অপসৃত হওয়াতে আবার জাহাজপর্য্যন্ত ডাঙ্গা বাহির হইয়াছে, অমনি তদভিমুখে দৌড়িল।

এই সময়ে জাহাজের লোকেরা উহার রক্ষা বিষয়ে হতাশ হইয়া কেহ দড়ি কেহ পিপা কেহ খাঁচা কেহ কাষ্ঠফলক অবলম্বন করিয়া জলে দলে দলে ঝাঁপ দিতে লাগিল। তৎকালে জাহাজের বারেন্দাতে যে পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইল, তাহা অন্তঃকরণে অবিনাশি ভাবে চিত্রিত আছে। তখন দেখিলাম পোলের অসংসাহসিক কার্য্য দেখিয়া ভর্জ্জীনী হস্ত সঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করিতেছে। ঈদৃশ সুন্দরী কুমারী এমন বিপদে কবলিত হইতেছে দেখিয়া সকলের মন শোক ও নৈরাশ্যে নিমগ্ন হইল। কিন্তু ভর্জ্জীনী নিজে ধীর ও অকম্প ভাবে দাঁড়াইয়া হস্ত কম্পন দ্বারা আমাদিগের সঙ্গে জন্মেরশোধ বিদায় প্রার্থনা করিল। তৎকালে সব খালাসীই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিল। কেবল দেখিলাম ভীমের ন্যায় মহাপ্রাণ এক নাবিক সর্ব্বাঙ্গনগ্ন হইয়া জাহাজের প্রান্ত ভাগে দণ্ডায়মান ছিল, পরে বিনীত ভাবে ভর্জ্জীনীর সম্মুখে যাইয়া ভূমিতে জানু অর্পণ করিল এবং তাহার প্রাণ বাঁচাইবার উদ্দেশে অঙ্গবসন খুলিতে চাহিল। কিন্তু ভর্জ্জীনী সগৌরবে তাহার হস্তরোধ পূর্ব্বক সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। তখন দর্শক মণ্ডলী হইতে এই ধ্বনি উঠিল 'ছাড়িওনা, ছাড়িওনা, উহাঁকে বাঁচাও বাঁচাও।' কিন্তু সেই সময়েই পর্ব্বতাকার এক প্রকাণ্ড কল্লোল খাড়ির মধ্যে প্রবেশিয়া সঘোর গর্জ্জনে জাহাজের দিকে ধাবমান হইল, তরঙ্গ যেন ফেন-শেখরিত ঊর্দ্ধভাগ ও কৃষ্ণবর্ণ পার্শ্ব দেশ কম্পিত করত জাহাজকে গিলিতে গেল। এই ভৈরব মূর্ত্তিতে ভীত হইয়া খালাসী একাকী ঝম্প প্রদান করিল। তখন ভর্জ্জীনী মরণ অনিবার্য্য দেখিয়া এক হস্ত বসনের উপর অপর হস্ত হৃদয়ে রাখিয়া স্থির নয়নে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিল। মনে হইল যেন দেব কন্যা সুরলোকে যাইবার নিমিত্ত ধরণী ত্যাগ করিতেছেন।

হায়! সেই দিন কি ভয়ঙ্কর! হায়! সকলি সাগরের গর্ভে বিলীন হইল। অনেকে ভর্জ্জীনীর রক্ষা নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া জলের দিকে নামিয়াছিল, ঢেউ আসিয়া তাহাদিগকে তীরে তুলিয়া দিল, সেই সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত খালাসীও ডাঙ্গায় উঠিল। সাক্ষাৎ যমের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া সে বালুকার উপরে জানু রাখিয়া বলিল 'হে পরমেশ্বর! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিলে সত্য! কিন্তু যে মনস্বিনী কুমারী প্রাণ বাঁচাইতেও লজ্জা পরিত্যাগ করিল না, তাহার নিমিত্ত আমি এ প্রাণ সচ্ছন্দে দিতে পারিতাম। ক্রমিঙ্গতে আমাতে পোলকে টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিলাম, তখন তাহার নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছিল। গবর্ণর তাহাকে এক জন চিকিৎসকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমরাও যদি ভর্জ্জীনীর মৃতদেহ ভাসিয়া আসিয়া স্থলে লাগিয়া থাকে, এই আশায় চড়ায় চড়ায় অন্বেষিতে লাগিলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাতাস ফিরিয়া যাওয়াতে সে চেষ্টা বৃথা ভাবিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলাম। হায়রে! হতভাগীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াও হইল না' এই ভাবিয়া মনে আরও ক্ষোভ হইল। কত লোক মগ্ন হইল, কত জিনিশ নষ্ট হইল, কিন্তু একজনের নিমিত্ত সকলেই দহ্যমান হইতে লাগিলাম। ঈদৃশ সাধুশীলার এরূপ বিপত্তি দর্শন করিয়া বিধাতার ন্যায়পরতা বিষয়ে অনেকের সন্দেহ উদয় হইল। বাস্তবিকও সংসারে এমন ভয়ানক ও অসংগত দুর্ঘটনা ঘটে যে জ্ঞানীরও ঈশ্বরের উপর আশা ভরসা স্খলন হয়।

এ দিকে পোল যত দিন চলৎশক্তি রহিত থাকে, তত দিন সন্নিহিত এক গৃহস্থের বাড়ীতে থাকিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত করা হইল। 'কিরূপে বিষম খবর

লইয়া যাইব' ইহা আন্দোলন করিতে করিতে দমিঙ্গ ও আমি গৃহাভিমুখে চলিলাম। যখন তালীনদীর উপত্যকায় প্রবেশিয়াছি, কতিপয় কৃষ্ণকায়ের মুখে শুনিলাম যে নিকটবর্ত্তী উপসাগরে অনেক কাষ্ঠভঙ্গাদি ভাসিয়া আসিয়াছে। শুনিবা মাত্র সমুদ্রতীরে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বাগ্রেই দেখি যে ভর্জ্জিনীর শব রহিয়াছে, বালিতে শরীরের অর্দ্ধভাগ নিমগ্ন, যে ভঙ্গিতে মরিতে দেখিয়াছি, আকারে সেই ভঙ্গিই বর্ত্তমান, মুখশ্রী কিছু মাত্র বিকৃত হয় নাই, চক্ষু দুটী মুদ্রিত, কিন্তু ললাটে ধীরতা সুন্দর রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, কেবল কপোলতলে কৌমার বয়সের লাবণ্য ও মৃতাবস্থার বিবর্ণতা এ উভয়ের মিলন হইয়াছে, একখানি হাত বসনের উপর অর্পিত রহিয়াছে, অপর কর খানি বক্ষঃস্থলে নিহিত ও দৃঢ়রূপে বদ্ধমুষ্টি হইয়া আছে। সেই হাত হইতে অতি কষ্টে একটী কৌটা বাহির করিলাম। কিন্তু যখন দেখি যে, কৌটার ভিতর সেই চিত্রখানি আঁটা আছে, যে খানি পৌলের নিকট ভিক্ষা করিয়াছিল এবং যেখানিকে যাবজ্জীবন সঙ্গে রাখিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তখন আমি বিস্ময়ে নিমগ্ন হইলাম। আহা! হতভাগীর অকৃত্রিম অনুরাগের এই চরম নিদর্শন দেখিয়া আমার শোক উদ্বেল হইয়া উঠিল, আমি মুক্তকণ্ঠে না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলাম না। দমিঙ্গ ত বিলাপধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। পরে শবটী লইয়া এক জেলের বাড়ীতে রাখিলাম এবং উহা প্রক্ষালন ও অবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত কতিপয় মালাবারী স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিলাম।

তাহারা সে বিষয়ে নিযুক্ত রহিল, এ দিকে আমরা পাহাড়ে উঠিয়া গৃহের নিকটবর্ত্তী হইলাম। তৎকালে বিবি দিলাতুর ও মার্গারেট জাহাজের খবর প্রতীক্ষায় ভগবানের নাম লইতে ছিলেন। প্রথমা আমাকে দেখিবা মাত্র 'কই, বৎসা কই, আমার প্রাণপ্রিয়া কন্যা কই' এই বলিয়া যখন দেখিলেন আমরা নয়ন জলে ভাসিতেছি ও কথা কহিতে পারিতেছি না, তখনই কন্যার বিপত্তি নিশ্চিত বুঝিয়া তাঁহার শ্বাসরোধ হইল এবং কণ্ঠ হইতে ঘর্ঘর ধ্বনি বাহির হইতে লাগিল, কেবল প্রশ্বাস ও অনবরত ফুঁপানী শুনা যাইতে লাগিল। 'কই' আমার বাছা কই 'তাহাকেও যে দেখি না' এই বলিয়া মার্গারেটের মূর্চ্ছা হইল। তাঁহাকে সমাশ্বস্ত করিয়া কহিলাম 'ভাবনা নাই, তোমার পৌলের নিমিত্ত কিছু চিন্তা নাই, গবর্নর তাহার চিকিৎসার নিমিত্ত উত্তম বিধান করিয়াছেন।' তখন মার্গারেট বিবি দিলাতুরকে লইয়া ব্যস্ত হইলেন। এই মহিলা ভূয়োভূয়ঃ সুদীর্ঘ মূর্চ্ছাতে মগ্ন হইতে লাগিলেন। সারা রাত্রি তাঁহারা এরূপ অসহ্য যন্ত্রণা ও এরূপ বহুকালস্থায়ী মোহ হইতে লাগিল যে আমি বুঝিলাম সন্তানশোকের মত শোক নাই, মার বাড়া দুঃখ নাই। চেতনা পাইয়া ঊর্দ্ধ দিকে স্থিরদৃষ্টি হইয়া থাকিতেন, আমি ও মার্গারেট এত স্নেহের কথা বলিতাম, প্রীতি পূর্ব্বক কত হস্ত পীড়ন করিতাম, কতবার 'সখি' 'প্রিয়সখি' প্রভৃতি আদরের বাক্য বলিতাম, কিছুতেই তাঁহার মনোযোগ হইত না, এই সকল স্নেহচিহ্ন তিনি যেন অনুভবই করিতেছেন না মনে হইল। কেবল মাত্র এক এক বার গলরন্ধ্র-বিনির্গত ঘর্ঘর শোকধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল।

পরদিন পৌল পাল্কী চড়িয়া ঘরে আসিল। ভাবিয়াছিলাম, এ সময়ে জননীদের সহিত পৌলের সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল। কিন্তু দেখা হওয়াতে উভয় পক্ষেই উপকার বোধ হইল। পৌলকে পাইয়া তাঁহাদের কিছু সান্ত্বনা হইল, উভয়ে কাছে গিয়া বারম্বার চুম্বন ও আলিঙ্গন করিলেন, তীব্র দুঃখ প্রভাবে এতক্ষণ চক্ষে জল বাহিরায় নাই, এখন প্রচুর বাষ্পবর্ষ হইয়া চিত্তভার কিছু লঘু হইল এবং তিন

জনেই কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া, দীর্ঘ নিদ্রা সদৃশ এক প্রকার গাঢ় সুষুপ্তিতে পড়িয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে গবর্ণর আমাকে গোপনে বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি ভর্জ্জীনার দেহ নগরে আনয়ন করিয়াছেন, এবং সমারোহ পূর্ব্বক বাতাবি গিরিজাতে সমাধি কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। খবর পাইয়া শহরে গেলাম, দেখিলাম, সর্ব্ব প্রদেশের ভদ্রলোকেরা এই সমাধি বিধান কার্য্যে সমাগত হইয়াছেন, বন্দরস্থিত জাহাজে নিশান তুলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে তোপ হইতেছে। এক দল বন্দুকধারী সৈন্য আওয়াজ করিয়া অন্ত্যেষ্টি যাত্রার পুরঃসর হইল এবং শোক ও বিষাদ প্রকাশের নিমিত্ত বন্দুক অবনত করিয়া ধরিল। বাদ্যকরেরা শোক সূচক বাদিত্র আরম্ভ করিল। যে সকল কঠোরচিত্ত যোদ্ধাবর্গ কত বার মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইয়াছে, এই সময়ে তাহাদের মুখেও বিষাদ ও কারুণ্যের চিহ্ন স্পষ্ট প্রকাশিত হইল, দ্বীপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বংশসম্ভূতা আট জন নবকুমারী শ্বেত বসন পরিধান করিয়া শবাধার ধারণ করিল, এক দল দারকদারিকা স্বর মিলাইয়া সংকীর্ত্তন ধরিল, তাহাদিগের পশ্চাৎ দ্বীপবাসী মান্য ব্যক্তিরা অনুগমন করিতে লাগিলেন, সর্ব্বশেষে গবর্ণর সাহেব এক বিশাল লোক সংঘ কর্ত্তৃক অনুগত হইয়া অন্ত্যেষ্টিযাত্রার সঙ্গী হইলেন।

রাজকীয় আদেশে ভর্জ্জীনীর সচ্চরিত্রের এইরূপ পুরস্কার নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু যখন এই দুই পর্বতের নিকটে শব উপস্থিত হইল, চিরকাল ভর্জ্জীনী যে স্থানের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছিল, এবং এখন যেখানে নৈরাশ্য অর্পণ করিয়া গিয়াছে, সেই স্থান ও সেই দুই কুটীর যখন সকলের নয়ন পথের অতিথি হইল, তখন অন্ত্যেষ্টির তত সমারোহ কোথায় অন্তর্হিত হইল, বাদ্য গান সংকীর্ত্তন নিস্তব্ধ হইল, মাঠময় কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস ও কুঁপানি শুনা যাইতে লাগিল। সেই সন্নিহিত পল্লীর বালিকারা উপস্থিত হইয়া, কেহ রুমাল কেহ কুসুমমালা, ভর্জ্জীনীর গাত্রে স্পর্শ করাইয়া লইল। মৃতদেহ সংস্পর্শে সেই সকল পদার্থ তাহাদিগের চক্ষে পরম পবিত্র পরম মহার্ঘ বোধ হইল, ভর্জ্জীনীকে তাহারা দেবতাবিশেষ মনে করিয়া ঈদৃশ শ্রদ্ধা প্রদান করিল। জননীরা তাহার মত কন্যা হয় এই কামনা করিল, প্রণয়ীরা তাদৃশ অকৃত্রিম প্রণয়ের প্রণয়িণী প্রার্থনা করিল, দরিদ্রেরা তেমন উপকারী বন্ধু পাই বলিয়া অভিলাষ করিল, এবং কৃষ্ণকায় দাসেরা কহিল 'যেন জন্মে জন্মে ভর্জ্জীনীর মত দয়ালু কর্ত্রী পাই।' সমাধিস্থানে শব উপনীত হইলে মাদাগস্করের কৃষ্ণকায়া স্ত্রীরা এবং মোজাম্বিক উপকূলের কাফ্রিরা শবের চারিদিকে ফলপূর্ণ ঝুড়ি রাখিয়া দিল এবং নিকটবর্ত্তী তরুশাখায় বস্ত্রখণ্ড ঝুলাইয়া দিল। বাঙ্গালাদেশীয় ও মালাবারী স্ত্রীলোকেরা পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষী আনিয়া শবের নিকটে ছাড়িয়া দিল। এইরূপে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পৃথিবীর সকল জাতির আচারানুসারে নির্ব্বাহিত হইল। অকৃত্রিম ধর্ম্মের এমনি ক্ষমতা যে, তাহার নিমিত্ত সর্ব্ব জাতি শোক করে এবং তাহার শবের নিকট ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালী সম্মেলিত হইয়া যায়।

কতিপয় 'দরিদ্রবালিকা পৃথিবীতে আমাদের এক ভরসা ছিল, তাহাও হারাইলাম, এখন সেই উপকারিণীর সঙ্গে মরাই ভাল' এই বলিয়া সমাধিগর্ত্তে ঝাঁপ দিতে গেল। তাহাদিগের আত্মহত্যা নিবারণার্থ পাহারা রাখিতে হইল। গিরিজার দক্ষিণদ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করিল। যে স্থানে কতবার ভর্জীনী জননীদের সঙ্গে ভজনা করিত এবং ভাই ভগিনীর মত পৌলের সহিত ভূমিতে জানু রাখিয়া হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে রাখিত, তথাকার সন্নিহিত বংশকুঞ্জের পার্শ্বে ভর্জীনী সমাহিত হইল।

প্রত্যাগমনের সময় গবর্ণর কতিপয় পারিষদ সমভিব্যাহারে জননীদের আলয়ে আসিলেন। তিনি রুক্ষবাক্যে বিবি দিলা-তুরের পিতৃস্বসার ক্রূরতা নিন্দা করিলেন এবং পৌলকে কহিলেন, 'পরমেশ্বর সাক্ষী, আমি তোমার ও তাহার সুখের নিমিত্তই ভর্জীনীকে পাঠাইয়া ছিলাম। দৈব তাহার বিরোধী হইল। যাহা হউক সখে, যাহাতে তুমি ফ্রান্সের সেনা দলে নিযুক্ত হও, তাহা করিয়া দিব এবং তোমার জননীকে আপনার মার মত দেখিব।' এই বলিয়া প্রীতিভাবে হস্তধারণ করিলেন, কিন্তু পৌল কোন কথা না কহিয়া তাহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল।

তিন জনেই শোকে অধীর, অতএব কাজে কাজেই তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে আমি তাহাদের গৃহে অবস্থিতি করিলাম। তিন সপ্তাহ অতীত হইলে পৌলের উঠিবার শক্তি হইল, কিন্তু শরীরে যতই বলাধান হইল, ততই তাহার শোক বাড়িতে লাগিল। সকলেতেই অন্যমনস্ক, সর্ব্বদাই শূন্যদৃষ্টি, কোন কথায় উত্তর দেয় না। বিবি দিলাতূর মৃতপ্রায় হইয়াও এক এক বার বলিতেন 'বাছা, তোকে দেখিলে মনে হয় যেন ভর্জীনীকে দেখিতেছি।' কিন্তু পৌল ভর্জীনীর নামেই চমকিয়া উঠিত এবং তাহার জননী হাজার ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেও বিবি দিলাতূরের নিকট হইতে চলিয়া যাইত। প্রায়ই সে একাকী বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ পূর্ব্বক ভর্জীনীর নারিকেলতলে উপবেশন পূর্ব্বক ভর্জীনীর নির্ঝরের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। যে চিকিৎসক পরম যত্ন সহকারে তাহাকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন 'পৌলের যাহা ইচ্ছা যায়, তাহাই করিতে দাও। কেহ কোন বিষয়ে উহার ইচ্ছার ব্যাঘাত করিও না, ইহাই কেবল ঈদৃশ দুর্দ্ধর্ষ শোকের একমাত্র ঔষধ। এখন মুখ দিয়া কথাটিমাত্র বাহির করে না, এই মৌনভাব শুধরাইবারও আর উপায় নাই।'

আমি তাঁহার পরামর্শ অনুসরণ করিব স্থির করিলাম। কিছু বলাধান হইলেই পৌল আবাসের সন্নিধান পরিহার করিতে আরম্ভ করিল। আমি দমিঙ্গের হাতে কিছু খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিলাম, কোন মতে চক্ষের অন্তরাল করিলাম না। সে বাড়ীর যতদূরে যায়, ততই যেন তাহার আমোদ বাড়ে এবং শরীরেরও অনেক সুস্থতা হইল। প্রথমে বাতাবিগিরিজার দিকে যাইয়া বেণুবনবীথিতে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিল যে এক স্থানে মৃত্তিকা উচ্ছ্বসিত রহিয়াছে, তথায় ভূমিনিহিতজানু হইয়া সুদীর্ঘ কাল ভজনা করিল। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রস্ফুরিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা ভাবিলাম যে ইহার মন প্রকৃতিস্থ হইল। আমরাও তাহার সঙ্গে স্তোত্র আরম্ভিলাম। ভজনা সাঙ্গ হইলে সে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দ্বীপের উত্তর দিকে অভিমুখ হইল, আমাদিগকে না রাম না গঙ্গা কিছুই বলিল না। আমার দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে পৌল ভর্জীনীর সমাধিস্থান কখনই জানিতে পারে নাই, অতএব বেণুবীথিতে কি নিমিত্ত ভজনা করিল এ কথা জিজ্ঞাসিলাম। সে কহিল 'ঐ স্থানে আমি ও ভর্জীনী অনেক বার একত্রে বন্দনা করিয়াছি।'

বনের ধারে যাইতে রাত্রি উপস্থিত হইল। তখন সাধ্যসাধন দ্বারা কিঞ্চিৎ আহার করাইয়া তরুতলে তৃণভূমির উপরে নিদ্রা গেলাম। প্রত্যূষে ভাবিলাম পৌল এখন ঘরে ফিরিয়া যাইবে, সেও বেণুবনের উপরে বাতাবিগিরিজার চূড়া দেখিয়া তাহার প্রতি এই রূপে দৃষ্টিপাত করিতেছিল যেন সেই দিকেই যাইবে। কিন্তু সহসা উত্তর মুখ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার ভ্রমণাভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ফিরাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। এই রূপে ভ্রমণ করিতে করিতে সমুদ্রের তীরে উপ

স্থিত হইল এবং যে স্থানে সেণ্টজিরন্ জাহাজ জলসাৎ হয়, সেই স্থানে আসিয়া অতর্কিত রূপে সমুদ্রতীরে অবতীর্ণ হইল। তখন সমুদ্র দর্পণের ন্যায় মসৃণ ও নিস্তব্ধ রহিয়াছে দেখিয়া, 'ভর্জ্জীনী কোথারে! ওরে আমার প্রিয়তমা ভর্জ্জীনী কোথারে!' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ অচেতন হইয়া পড়িল। ধরাধরি করিয়া বনমধ্যে আনিয়া অনেক যত্নে তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলাম। তখন আবার সমুদ্রতীরেই যাইতে উদ্যত দেখিয়া কহিলাম 'বৎস, কেন বল দেখি ঐ সকল দারুণ স্থান দর্শন পূর্ব্বক আপনাকে দগ্ধ করিতেছ, আমাদিগকেও পরিতাপিত করিতেছ।' বারম্বার এই বলিয়া অনুনয় করাতে অন্য দিকে চলিল। যে যে স্থানে একণে বালসহচরী ভর্জ্জীনীর সহিত এক সঙ্গে গমন করিয়াছে, একণে সে সকল স্থান পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিল। দাসীর ক্ষমা প্রার্থনা করিতে যে পথ দিয়া উভয়ে শ্যামনদীতে যায়, সেই পথে ভ্রমণ করিল, যে স্থানে চলিতে অশক্ত হইয়া তরুতলে বিশ্রাম করে, সে স্থান দর্শন করিল, যে বনে পথহারা হয়, তাহাতেও প্রবেশ করিল। প্রিয়তমা যেখানে কোন কষ্ট পাইয়াছে, যেখানে ক্রীড়া করিয়াছে কিংবা উৎসব করিয়াছে, তাহার করুণার অত্যল্প চিহ্ন যেখানে বর্ত্তমান আছে, সে সমুদয় প্রদেশেই পৌল তীর্থযাত্রীর ন্যায় চংক্রমণ করিল। তুঙ্গ পর্ব্বতের তরঙ্গিণী, আমার আলয়, তৎসন্নিহিত জলপ্রপাত, ভর্জ্জীনীর রোপিত খর্জ্জুরতরু, যে তৃণভূমিতে সে বেড়াইতে ভাল বাসিত সেই হরিদ্বর্ণ তৃণ শোভিত শাদ্বল, তাহার সঙ্গীতশালাভূত বনপ্রদেশ, এ সকল বিষয়ই পর্য্যায়ক্রমে পৌলের লোচনবাষ্প আনয়ন করিল। যে সকল স্থান পূর্ব্বে উভয়ের প্রমোদধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইত, এখন সে সকল স্থান, 'ভর্জ্জীনী কোথারে! ওরে আমার প্রিয়তমা ভর্জ্জীনী কোথারে!' এই আর্ত্তনাদে পূরিত হইতে লাগিল।

এই রূপে বনে বনে ঘুরিয়া তাহার দুই চক্ষু বসিয়া গেল, শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইল এবং ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। অতীত সুখের কথা মনে পড়িলে শোক দ্বিগুণ হইয়া উঠে এবং উদ্ধত দুঃখাবেগ নির্জ্জনে বৃদ্ধিই পাইতে থাকে, অতএব কোন নূতন স্থানে লইয়া পৌলকে অন্যমনস্ক করিয়া দি এই আশয়ে উইলিয়ম পল্লীতে লইয়া গেলাম। উইলিয়ম পল্লীর লোকেরা কৃষিবাণিজ্যসম্বন্ধীয় নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে, ছুতরেরা বন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিতেছে, কেহবা তাহা করাত করিতেছে, পথে সর্ব্বদাই শকটাদি যাতায়াত করিতেছে, তৃণক্ষেত্রে ছাগযূথ ও গোযূথ চরিতেছে, চারি দিকেই লোকাকীর্ণ, চারি দিকেই বসতি। তথাকার ভূমি অপেক্ষাকৃত উচ্চ বলিয়া অনেক ইয়োরোপীয় ফলতরু বর্দ্ধিত হয়, সুশীতল বায়ু ইয়োরোপীয়দিগের স্বাস্থ্যের সাতিশয় অনুকূল। এই প্রদেশ দ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থাপিত ও চতুর্দ্দিকে অরণ্যবেষ্টিত বলিয়া তথা হইতে সমুদ্র কিম্বা লুইবন্দের নগর অথবা বাতাবিগিরিশৃঙ্গ কিম্বা পৌলের দুঃখোদ্বোধক অন্য কোন পদার্থই দৃষ্টিগোচর হয় না, এমন কি লুইবন্দ নগরের সন্নিহিত শৈলমালা পর্য্যন্ত দূরতা নিবন্ধন নীলবর্ণ রেখার মত দেখায় এবং মধ্যে কতিপয় মেঘস্পর্শী তুঙ্গ শৃঙ্গ ধূমের ন্যায় প্রতীত হইতে থাকে। আমি এই স্থলেই পৌলকে আনয়ন করিলাম। কি বৃষ্টি কি রৌদ্র কি দিবা কি রাত্রি সর্ব্ব অবসরেই তাহাকে পথ চলাইতাম ও ব্যাপৃত রাখিতাম, সর্ব্বদা সঙ্গে বেড়াইতাম এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে জঙ্গল মাঠ প্রভৃতি দুর্গম পথে ঘুরাইতাম ভাবিতাম যে, এই রূপে শ্রান্তিবোধ হইবে, পরিচিত পদার্থ না দেখিয়া অন্যমনস্ক হইবে এবং কোন্ পথে যাইতেছে তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু

সে সকল অভিপ্রায় বৃথা হইল। প্রণয়ীর চক্ষু প্রিয়ার চিহ্ন সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হয়। অহোরাত্রের পরিবর্ত্ত,জনপদের কোলাহল কিম্বা অরণ্যের স্তব্ধ ভাব সকলই তদীয় প্রিয়তমার অভিজ্ঞান ও স্মারক স্বরূপ। প্রিয়াশোক বিস্মৃত হওয়া তাহার অসাধ্য। অয়স্কান্তশলাকা যেখানে থাকুক, উত্তরেই মুখ করে, তেমনি প্রণয়ীর মন হাজার ব্যাক্ষিপ্ত হইলেও প্রিয়াচিন্তায় আসক্ত থাকে। উইলিয়ম পল্লীর মাঝামাঝি এক স্থানে জিজ্ঞাসিলাম 'বল দেখি আমরা এখন কোথায় রহিয়াছি।' সে অমনি উত্তর দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া কহিল 'কেন, ঐ যে আমাদের পাহাড়। আসুন, ঘরে ফিরিয়া যাই।'

দেখিলাম যে অন্যমনস্ক করিবার সকল চেষ্টা বৃথা হইল। তখন ভাবিলাম যুক্তিনির্দ্দেশ ও উপদেশদান দ্বারা শোক নষ্ট করা যায় কি না এক বার দেখি। এই উদ্দেশে তখনই তাহার কথা উত্তর করিলাম 'হাঁ, অই আমাদের পাহাড় বটে। আর এই দেখ আমার হাতে, ভর্জ্জীনীকে যে ছবিখানি দিয়াছিলে, তাহা রহিয়াছে। মৃত্যুকালে এইখানি হৃদয়ে রাখিয়া তাহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে এবং তাহার হৃদয়ের চরম উচ্ছ্বাস পর্য্যন্ত তোমার প্রতি উন্মুখ হইয়াছিল।' চিত্রখানি পাইয়া পৌলের চক্ষে একপ্রকার দুর্দ্ধর্ষ আনন্দ প্রকাশ পাইল। ব্যগ্রতার সহিত গ্রহণ পূর্ব্বক ছবিখানি হৃদয়ে রাখিল, এবং বারম্বার চুম্বন করিল। অনবরত বাষ্প বিসর্জ্জন দ্বারা তাহার দুই চক্ষু লাল হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এ সময়ে চিত্ত এত বিবিধ ভাবে পূরিত হইল যে তাহার সমুদয় সংক্ষোভ অন্তরেই রহিল, বাহিরে অশ্রুরূপে প্রকাশ পাইল না।

তখন কহিলাম 'বৎস! আমার কথায় এক বার কর্ণপাত কর। আমি তোমারও বন্ধু, ভর্জ্জীনীরও বন্ধু। যখন সৌভাগ্যসময়ে পরম সুখে কাটাইয়াছি, তখন কত বার বুঝাইয়াছি যে সংসারের সকল সুখ অনিত্য এবং সহসা পতিত বিপত্তিতে একেবারে নিমগ্ন না হইয়া যাও, তজ্জন্যে কত চেষ্টা করিয়াছি। এখন জিজ্ঞাসা করি তোমার যে এত দুঃখ হইতেছে, সে কি নিমিত্ত? তুমি কি আপনার বিষয়ে এত দুঃখ করিতেছ? না ভর্জ্জীনীর দশা ভাবিয়া তোমার শোক উপস্থিত হইয়াছে?

আমি বিলক্ষণ মানি যে তোমার দুঃখের মত দুঃখ নাই। তোমার তেমন গুণবতী বধূ অপহৃত হইল, তোমার তেমন প্রণয়িনী ভাবিপত্নী বিনষ্ট হইল। তোমার জন্য সে ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি ছাড়িয়া দিল, তুমিও কিছু ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত লালসা কর নাই, তাহার সদ্গুণকেই পরম ধন মনে করিয়াছিলে। কিন্তু বল দেখি, যাহাকে চিরসুখী করিবে ভাবিয়াছিলে, সে যে কখন দুঃখ পাইত না ইহার কি কিছু নিশ্চয় আছে? তাহার বিষয় ছিল না, পাইবার সম্ভাবনা গেল। তুমিও অকিঞ্চন, তাহাকে চিরসঙ্গিনী করিয়া কেবল আপন পরিশ্রমের ভাগহারিণী করিতে। লালন দ্বারা সুকুমারী হইয়া এবং দুর্দ্দশা দ্বারা সাহসিক হইয়া সে অবশ্যই তোমার শ্রমের ভাগহারিণী হইত, কিন্তু সেই চেষ্টাতেই অবসন্ন হইয়া যাইত। তাহার উপর যদি আবার দুটা একটা সন্তান হইত, তাহা হইলে ত কষ্টের উপর কষ্ট! বৃদ্ধা দুই জননী, ও বর্দ্ধমান পরিবারের ভরণ পোষণ করিতে তোমরা কোন মতেই ত পারিতে না!

তুমি বলিবে যে, গবর্ণর সাহায্য করিতেন। ভাল, যত দিন লাবুর্দনে সাহেব গবর্ণর থাকিতেন, তত দিন যেন তোমাদিগের কোন ভাবনা হইত না। কিন্তু বল দেখি, যে স্থানে নিত্যই প্রায় গবর্ণর পরিবর্ত্ত হইতেছে, তথায় যে বরাবরই লাবুর্দনের সদৃশ দয়ালু গবর্ণর হইতেন, তাহার কি নিশ্চয় আছে? যখন এক জন অশিষ্ট ও দুর্নীতিশীল শাসনকর্ত্তা হইতেন, তখন

কি হইত? হয় ত তোমার প্রিয়তমাকে চাটু বাক্য দ্বারা তাঁহার মনোরঞ্জন পূর্ব্বক সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইত, হয় ত তাহাকে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া উদরপূরণ করিতে হইত. বল দেখি, সেটা কি পরিতাপের বিষয়! আর যদি তোমার পত্নী দৃঢ়ব্রতা হইয়া আপন ধর্ম্ম বজায় রাখিত, তাহা হইলে হয় ত উভয়কেই দারিদ্রনিবন্ধন অশেষ দুঃখে মগ্ন থাকিতে হইত। ইহাই বা কে বলিতে পারে যে যাহাদিগকে পরম বিশ্বাস্য রক্ষক বোধে আশ্রয় করিতে, তাহারাই ভক্ষক হইয়া তোমার পত্নীর সৌন্দর্য্যলোভে তোমাকে নানা যন্ত্রণায় ফেলিত না?

তুমি বলিবে 'যে সকল সুখ লক্ষ্মীর আয়ত্ত নহে, যাহা কি দরিদ্র কি ধনী সকলেই ভোগ করিতে পারে, সে সকল সুখভোগ করিতাম। পরস্পরকে সুখ দুঃখ নিবেদন করিয়া দুঃখভার লঘু করিতাম, এক দুঃখের ভাগী হইয়া দাম্পত্য স্নেহ পরিবর্দ্ধিত করিতাম, এবং দুঃখভরে খিদ্যমান প্রিয় জনের প্রতি যথাশক্তি মমত্ব দেখাইয়া তাহাকে আপনার প্রতি অধিকতর আসক্ত করিতাম।' অবশ্য সাধুতা ও দাম্পত্য স্নেহ থাকিলে এই সকল দুঃখময় সুখের কিছু কিছু ভোগ হয় বটে। কিন্তু ভর্জ্জীনী ত আর নাই কেবল তোমাকেই যাহাদের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিত, তোমার ও তাহার সেই দুই জননী বর্ত্তমান আছেন। তুমি যদি শোকে অধীর হও, তবে তাঁহাদিগকে অবিলম্বে ভূমিগর্ভে শয়ন করিতে হইবে। দেখ ভর্জ্জীনী জীবদ্দশায় কেবল তাঁহাদিগের সুখের প্রতিই একমনা ছিল, অতএব তাঁহাদিগকে ভরণ পোষণ করা কি তোমার একমাত্র সুখ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নয়?

ভাবিয়া দেখ বৎস, পরোপকারই সাধুদিগের পরম সুখ। ইহার মত স্থির বা ইহার মত উদাত্ত সুখ আর নাই। মানুষ যেরূপ দুর্ব্বল — যেরূপ অনিত্য — যেরূপ ক্ষণধ্বংসী, তাহাতে আমোদ কিম্বা ভোগ তাহার পাইবার যোগ্য নয়। দেখ লক্ষ্মী অভিমুখে এক পা অগ্রসর হইয়াই কেমন তুমি দুরবস্থার অতি নীচ গহ্বরে পতিত হইলে! সত্য বটে যে তাহা কিছু তোমার ইচ্ছাতে হয় নাই, কিন্তু যখন ভর্জ্জীনী ইয়োরোপে গেল, তখন কে না বিশ্বাস করিত যে তদ্দ্বারা তোমাদের উভয়েরই পরিণামে সুখ হইবে? এক প্রবীণ কুটুম্ব ভর্জ্জীনীকে যাইতে কহিল, পরম প্রাজ্ঞ নীতিজ্ঞ গবর্ণর সাহেব পরামর্শ দিলেন এবং পরম ধার্ম্মিক দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মিশনরী মহাশয় অনুরোধ করিলেন এবং অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদন করিলেন। এতগুলি একত্র হইয়া তবে তোমার ভর্জ্জীনীর বিপত্তি ঘটিয়াছে! এই রূপে দেখ যে শুদ্ধ মূর্খের পরামর্শেই দুঃখ ঘটে না, কখন কখন বহুদর্শী হিতৈষী বান্ধবদিগের পরামর্শ শুনিয়াও সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। সত্য বটে, কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিলেই হইত। সংসারে যে প্রবঞ্চিত হইতে হয়, তৎপ্রদত্ত আশাতে মনোযোগ দিলে প্রায়ই যে হতাশ হইতে হয়, এ কথা সত্য বটে। কিন্তু ভাব দেখি, এত যে লোক আছে — যাহারা এই সকল ক্ষেত্রমণ্ডলে কর্ম্মকাজ করিতেছে, কিম্বা যাহারা ধনলোভে ভারতবর্ষে যাইতেছে, কিম্বা যাহারা ইয়োরোপে ঘরে বসিয়া অনুজীবিগণের পরিশ্রমের ফলভোগ করে — ইহাদিগের সকলেরই বিষয় বিবেচনা কর। ইহাদিগের মধ্যে এক জনও আছে, যাহাকে এক দিন না এক দিন পরমপ্রেমাস্পদ বস্তু সকল হারাইতে না হইবে? এমন কি এক জনও আছে, যাহাকে — ধন বল, মান বল, প্রণয়িনী বল, সন্তান বল, মিত্র বল — এই সকল সুখসাধন পদার্থের বিনাশ দেখিতে হইবে বলিয়া কপালে লেখা নাই? অনেকেরই শুদ্ধ যে সর্ব্বনাশের নিমিত্ত দুঃখ করিতে হইবে, তাহা নহে. আপন দোষে

সর্ব্বনাশ ঘটিল বলিয়া অনুতাপ পর্য্যন্ত করিতে হইবে। তোমার বিষয় ভাবিয়া দেখ যে তোমার নিজের কিছু দোষ নাই। তুমি বরাবর বিশুদ্ধমনস্ক ছিলে। তুমি প্রকৃতির পথে স্থির থাকিয়া বাল্যকালে বৃদ্ধের ন্যায় প্রবীণতা দেখাইয়াছ. তুমি যাহা পরামর্শ দিয়াছিলে, শেষ ঘটনা বিবেচনা করিলে তাহাই সাধু বলিতে হয়। তোমার কথাই ফলিয়াছে, তোমার আশঙ্কাই যথার্থ হইয়াছে, তোমার বিবেচনাই অভ্রান্ত হইয়াছে। বাস্তবিকও তুমি যে এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বিবেচক হইবে. তাহা যুক্ত বটে. কারণ ভর্জ্জীনীর উপর তোমার যে স্বত্ব ছিল, তাহাই পরম পবিত্র, কারণ ভর্জ্জীনীর প্রতি তোমার অকৃত্রিম বিশুদ্ধ ও স্বার্থশূন্য প্রীতি ছিল। তাহার উপর তোমার যে অধিকার, উহার নিকট অতুল ঐশ্বর্য্যকেও লঘু ও অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। তুমি তাহাকে হারাইলে বটে, কিন্তু এ দুর্ঘটনা আত্মদোষে হয় নাই, তোমার অবিবেচনা কিম্বা লোভ অথবা মোহ বশত ঘটে নাই। শুদ্ধ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ইহা ঘটিয়াছে — সেই ঈশ্বর — যিনি তোমার সকল বস্তুর প্রদানকর্ত্তা, যিনি অন্যের দুর্বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া তোমার প্রণয়ভাজন জনকে অপহরণ করিলেন. যিনি তোমার পক্ষে কি ভাল সকলই জানেন, এবং যাঁহার অসীম জ্ঞান, 'হায়! আপন দোষে বিপদ ঘটাইলাম' এই ভাবিয়া তুমি যে দুঃখ করিবে কিম্বা নৈরাশ্যে মগ্ন হইবে, তাহার পথ রাখে নাই। অতএব দেখ, তোমার একপ্রকার প্রবোধ আছে। তুমি এই বলিয়া মনকে বুঝাইবে যে 'যা হোক, আমি কিছু স্বীয় দোষের শাস্তি ভোগ করিতেছি না।'

তবে কি তুমি ভর্জ্জীনীর কি হইল এই ভাবিয়া বিলাপ করিতেছ? তুমি কি তাহার দুঃখে দুঃখী হইয়া এত অধীর হইয়াছ? হাজার কুলীনই হউক, ধনীই হউক, আর সুশ্রীই হউক, সকলের ভাগ্যে যাহা ঘটে, ভর্জ্জীনীর তাহাই ঘটিয়াছে। মানুষের জীবন ও তদীয় ব্যাপারসমূহ একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের ন্যায় উন্নত হইতে থাকে, মৃত্যু যেন সেই মন্দিরের চূড়া। যখনই জন্ম তখনই কপালে মৃত্যু লেখা হয়। ভর্জ্জীনীর পক্ষে কি সুখের কথা যে দুই জননী থাকিতে থাকিতে এবং তোমাকে রাখিয়া সে জীবনরূপ শৃঙ্খলা ছিন্ন করিয়াছে — অর্থাৎ বারম্বার মৃত্যুযন্ত্রণা ভুগিবার পূর্ব্বেই তাহার চরম মৃত্যুযন্ত্রণা শেষ হইয়া গিয়াছে।

মৃত্যুর কথা কি বলিব বৎস! মৃত্যু সকলের পক্ষেই পরম প্রার্থনীয় শুভ স্বরূপ। জীবন যেন একটি ক্লেশময় দিন, মৃত্যু তাহার রজনীস্বরূপ। রোগ শোক পরীতাপ বিপত্তি ও ভয় এবং আর যাহা কিছু জন্মীদিগকে নিরন্তর বিলোড়িত করে, সে সমুদায় মৃত্যুরূপ সুষুপ্তিতে বিলীন হইয়া যায়। যাহাদিগকে বড় সুখী মনে কর, তাহাদিগকেই পরীক্ষা কর, দেখিবে তাহাদিগের ভাক্ত সুখ ক্রয় করিতে অনেক দাম লাগিয়াছে। তাহারা গার্হস্থ সুখ পরিত্যাগ করিয়া যশের মুখ দেখিতে পায়, স্বাস্থ্য বলিদান দিয়া ধনসঞ্চয় করে এবং অজস্র স্বার্থ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরের প্রণয় ও তজ্জনিত দুর্লভ সুখ লাভ করে। অনেকে পরার্থসাধনে আয়ু শেষ করিয়াও শেষ দশায় কপটী বান্ধব আর কৃতঘ্ন স্বজন ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পায় না। কিন্তু ভর্জ্জীনী চরম ক্ষণ পর্য্যন্ত সুখেই কাটাইয়াছে। যাবৎ আমাদের নিকটে ছিল, তাবৎ প্রকৃতির বদান্যতা থাকাতে তাহাকে কোন অপ্রতুল দেখিতে হয় নাই। আর যখন আমাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইল তখনও কি সে একেবারে সকল সুখ হারাইল কখনই নহে। তাহার সদৃশ সাধুতা থাকিলে কোন অবস্থাতেই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভাগী হইতে হয় না। তাহার ধর্ম্ম ও সদগুণসমূহ তাহার পক্ষে অক্ষয় সুখের ভাণ্ডারস্বরূপ ছিল। এমন কি মৃত্যুকালেও তাহার সুখের পরিসীমা ছিল না। চাই

তাহার নিমিত্ত রোরুদ্যমান দেশশুদ্ধ লোকের প্রতি নেত্রপাত করুক, চাই তাহার পরিত্রাণের নিমিত্ত ব্যাকুলীভূত ও অসংসাহসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত তোমার প্রতিই দৃষ্টিনিক্ষেপ করুক সে চারি দিকেই দেখিয়াছে যে সকলে তাহাকে কত ভাল বাসে। তাহার জীবন যেরূপ পরিশুদ্ধ ভাবে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাতে কণামাত্র পারত্রিক শঙ্কা তাহার মনে স্থানলাভ করে নাই। বিধাতা ম্রিয়মাণ সাধুজনের হৃদয়কে সুস্থির করিবার নিমিত্ত যে অবিচলিত সাহস পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন, সেই সাহসে ভর করিয়া বিপদের প্রতি সে দৃক্‌পাতও করে নাই। সে মৃত্যুর করাল মূর্ত্তির নিকট বিকারশূন্য মুখশ্রী প্রদর্শন করিয়াছে।

সংসারে যে সকল অতি গুরু বিপত্তি আছে, সাধু জনদিগকেও যে তাহা সহ্য করিতে হয়, ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। বিপদ উপস্থিত হইলে কিরূপ ভাব ধরিতে হয়, কিরূপ মাহাত্ম্য দেখাইতে হয়, তাহা সাধুজনেরাই জানেন। তাঁহারাই দুর্দৈবের তর্জনাতে ভয় পান না, বরং উহা ধিক্কার পূর্ব্বক অতুল কীর্ত্তি লাভ করেন, অনুপম ধীরতা দৃষ্টান্ত দেখান। এই উদ্দেশেই পরমেশ্বর সাধুদিগের উপর বিপদের সুব্যবহার করিবার ভার অর্পণ করেন, কারণ তাঁহারাই বিপদের সুব্যবহার করিতে সমর্থ। যখন অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তিমণ্ডলে সাধু জনকে মণ্ডিত করিতে বিধাতার ইচ্ছা হয়, তখন তিনি সাধুজনকে সংসাররূপ উদাত্ত নাট্যমন্দিরে দণ্ডায়মান করিয়া বিবিধ কষ্ট ও মৃত্যু পর্য্যন্ত সহ্য করান, তখন তাঁহাকে অবিচলিত দেখিয়া সকলে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা গুণের শিক্ষা পায়। তখন তাঁহার বিপত্তি স্মরণ করিয়া উত্তর পুরুষেরা চিরকাল অশ্রুধারা বর্ষণ করে। যে অবনীতে সকলই ক্ষণধ্বংসী, যথায় কত প্রাচীন মহীপালদিগের নাম নিত্য নিত্য বিস্মৃতিসাগরে বিলীন হইতেছে, সেই অবনীতে সাধু জনের কীর্ত্তিই চিরস্থায়িনী হয়। কিন্তু তা বলিয়া কি ভর্জ্জীনীর কীর্ত্তি ব্যতীত আর কিছু নাই। নিঃসংশয় জানিও বৎস, যে সে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহার ধ্বংসদশা হয় নাই। দেখ দেখি, পৃথিবীতে কোন পদার্থের কি ধ্বংস হয়? সকলের কেবল পরিবর্ত্ত ও রূপান্তরমাত্র হইতেছে। মানুষ এমন কোন যন্ত্র উদ্ভাবন করেন নাই, যদ্দ্বারা একটিমাত্র পরমাণু একবারে বিলোপিত হইতে পারে। যখন চতুর্দ্দিকের ভৌতিক পদার্থসমূহ অধ্বংসনীয়, তখন কি এমন হয় যে যাহার জ্ঞান ছিল, অনুভব ছিল, প্রীতি ছিল, ধর্ম্মবোধ ছিল, বিচার ছিল, সেই চিৎপদার্থ ধ্বংস হইয়া যাইবে? ও যদি আমাদিগের সহবাসে ভর্জ্জীনীর সুখ হইয়া থাকে, তবে এখন তাহার কি অনির্ব্বচনীয় সুখই ভোগ হইতেছে। ঈশ্বর আছেন বাছা, তাহাতে সন্দেহমাত্রটী নাই। সকল পদার্থই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা প্রতিপাদন করিতে যুক্তি অপেক্ষা করে না। যাহারা আপন অপকর্ম্ম নিবন্ধন পারত্রিক বিচারের ভয় করে, সেই দুরাত্মারাই কেবল ঈশ্বর মানে না। যেমন তাঁহার কার্য্য সকল তোমার প্রত্যক্ষগোচর হয়, তেমনি জ্ঞানস্বরূপের জ্ঞানবীজ তোমার মনে রোপিত আছে। এখন বল দেখি, তোমার কি মনে হয় যে, তিনি ভর্জ্জীনীকে পুরস্কার দিবেন না? তোমার কি মনে হয় যে, যে অচিন্ত্যশক্তি তাদৃশ উন্নতাশয় মনকে তেমন প্রিয়দর্শন শরীর রূপ পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন করিয়াছিল, যে শক্তি সেই শরীরে অতি চমৎকার দিব্য নির্ম্মাণের সুস্পষ্ট প্রমাণ রাখিয়া দিয়াছিল, সেই শক্তিতরঙ্গ হইতে ভর্জ্জীনীকে তুলিবে না? যিনি আমাদের অপরিজ্ঞেয় নিয়মাবলী দ্বারা ইহকালে মানববর্গের সুখের বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তিনি সেইরূপ অপরিজ্ঞেয় অনাবিধ নিয়মাবলী দ্বারা পরকালে অন্যপ্রকার সুখ দিতে কি অসমর্থ? সত্য

বটে, পারত্রিক সুখের বিষয়ে আমরা কিছুই আকলন করিতে পারি না. পরকাল যে কিপ্রকার তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না. কিন্তু তা বলিয়া কি পরকাল নাই বলা যায ? যখন ভূমিষ্ঠ হইলাম তখন কি এই পৃথিবীর স্বরূপ চিন্তা করিতে পারিয়াছিলাম, তখন কি সংসারের ভাব বিন্দু বিসর্গ বুঝিতে পারিয়াছিলাম ? যাহা কিছু আমাদের বুদ্ধির অগম্য ও চিন্তাশক্তির অগোচর তাহাই অলীক ও অবাস্তবিক ইহা কি কাজের কথা ? আমরা এখন যে অন্ধকারময় ক্ষণধ্বংসী অবস্থায় বর্ত্তমান আছি তথা হইতে পরকালের ভাব কি রূপে বুঝিব ? পরকালের দ্বারস্বরূপ মৃত্যুর মধ্যে কি কাণ্ড ঘটিতেছে তাহা কি রূপে কল্পনা করিব ? ইহা কি সম্ভব যে পরমেশ্বর ভূমণ্ডল ব্যতীত আর কুত্রাপি আপন করুণা ও জ্ঞানের প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই ? যে বিশাল অবকাশ মৃত্যুর ছায়াতে আচ্ছন্ন আছে তন্মধ্যে কি তিনি মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করিতে পারেন না ? সমুদ্রের প্রত্যেক জলবিন্দুতে অসংখ্য সূক্ষ্মশরীর প্রাণী বাস করে। তবে উপরে পরিবর্ত্তমান অসংখ্য তারামণ্ডল একেবারে শূন্য হইয়া আছে ইহা কি বিশ্বাস করা যায় ? কি ! কেবল আমাদের নিবাসভূমি পৃথিবী ব্যতীত আর কোথাও অচিন্ত্য শক্তি ও অপার জ্ঞানের প্রসর নাই ? ঐ সকল উজ্জ্বল অসংখ্য মণ্ডলসমূহ, ঝটিকা বা মহানিশায় অগম্য ঐ সকল জ্যোতির্ম্ময় স্থানসমূহ কি কেবল অনর্থক নির্ম্মিত হইয়াছে এবং মরুভূমি হইয়া আছে ? যদি ঈশ্বরের শক্তির সীমা থাকিত, যদি শত সহস্র প্রমাণ দ্বারা তাঁহার ক্ষমতা অসীম বলিয়া প্রতিপন্ন না হইত, তবে বলিতে পারিতাম বটে যে 'এই যে পৃথিবী দেখিতেছ যথায় ধর্ম্ম ও পাপের যুদ্ধ হইতেছে, যথায় জীবন ও মরণের দ্বন্দ্ব চলিতেছে সেই পৃথিবীই ঈশ্বরের রাজত্বের সীমাভূমি।'

নিঃসংশয়ই এমন স্থান আছে, যথায় ধর্ম্মের পুরস্কার হয় এবং সাধুগণের পরম সুখ লাভ হয়। আহা, যদি সেই দিব্যলোক হইতে ভর্জীনা তোমার সহিত কথা কহিতে পারিত, তাহা হইলে অবশ্যই এই ভাবে সম্ভাষণ করিত 'পোল হে ! জীবন কেবল পরীক্ষামাত্র, পৃথিবী কেবল পরীক্ষার স্থলমাত্র। যত দিন সেই পরীক্ষাস্থলে ছিলাম তত দিন আমি ধর্ম্মের কোন সেতু ভঙ্গ করি নাই, প্রকৃতির উপদিষ্ট কোন আচার পরিত্যাগ করি নাই, এবং প্রণয় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত কোন পথ উল্লঙ্ঘন করি নাই। আমি মাতৃ আজ্ঞা পালনার্থ সমুদ্র পার হইয়াছি, আমি ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া চারিত্র রক্ষা করিয়াছি, আমি কৌমারব্রত ভঙ্গ অপেক্ষা প্রাণনাশ করিয়াছি। বিধাতা দেখিলেন যে আমার জীবনযাত্রাতে যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল তাহা সম্পূর্ণ হইল, অতএব দয়া দৃষ্টি করিয়া ক্লেশময় জীবনযাত্রা সাঙ্গ করিয়া দিলেন। দারিদ্র কিম্বা কুৎসা কিম্বা অসূয়া কিম্বা উদ্বেগজাল কিম্বা পরের বিপত্তিদর্শন ইত্যাদি যে সকল যন্ত্রণা সংসারে সর্ব্বদা আক্রমণ করে তাহাদিগের হাত আমি এখন একেবারে এড়াইয়াছি। মানুষ যে সকল কষ্ট দ্বারা পীড়িত হয় তাহাদিগের একটিও আর আমাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তুমি কি না আমার ঈদৃশ দশাতে শোক করিতেছ ! আমি জ্যোতিঃকণার নির্ম্মল ও নিত্য হইয়াছি, তুমি কি না আমাকে জীবনের অন্ধকারে প্রত্যাহ্বান করিতেছ ! হে চিরমিত্র পোল ! সেই সব দিনের কথা কি তোমার মনে পড়ে, যখন আমরা উভয়ে সূর্য্যকিরণের শৈলশিখরে আরোহণসময়ে এবং তদীয় রশ্মিজালের সহিত বনভূমিতে বিসৃত হইয়া নভোমণ্ডলের রমণীয় রূপ নিধ্যান করিতাম ? কি কারণে যে তেমন চমৎকার আহ্লাদ অনুভব হইত বুঝিতে পারিতাম না, কেবল বালস্বভাব বশতঃ এই অভি-

লাম হইত সে শুদ্ধ নেত্রময় হইয়া উষার সুসম্বদ্ধ শোভা নিরীক্ষণ করি, কর্ণময় হইয়া বিহঙ্গমকুলে সংসক্ত সংগীত শ্রবণ করি, ঘ্রাণময় হইয়া উদ্যানের সৌরভ সম্ভোগ করি এবং হৃদয়ময় হইয়া এই সকল আনন্দের পরিচয় রক্ষা করি! কিন্তু যে সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ হইতে পৃথিবীর সমুদয় সৌন্দর্য্য প্রবাহিত আছে আমি এখন তাহার নিকটে স্থান পাইয়াছি। অন্তরাত্মা পূর্ব্বে যাহা সঙ্কুচিত কতিপয় ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিত ও তৃপ্তি পাইত না এখন তাহা সাক্ষাৎ দর্শন স্বদন ঘ্রাণ শ্রবণ ও স্পর্শ করিতেছে। আমি এখন যে জ্যোতির্ম্ময় উপকূলে অধিষ্ঠান পাইয়াছি, কি বাক্যে তোমার নিকট তাহার বর্ণনা করিব, বুঝিতে পারিতেছি না! অচিন্ত্যশক্তি পরম পুরুষ জীবের দুঃখশান্তির নিমিত্ত যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে পারিতেন, আমার সে সমুদয় ভোগ হইতেছে! আমারই মত অতুলসুখভোগী অসংখ্য জীবের সহিত মিত্রতা হইলে যত প্রমোদ লাভ হয়, তাহা আমার লাভ হইতেছে! অতএব হে বান্ধব! তোমার পরীক্ষার যতটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহা ধীরচিত্তে সহ্য কর, তাহা হইলেই এক সময়ে অবিনাশী প্রীতি দ্বারা তোমার প্রিয়তমা ভর্জ্জীনীর সুখ অনন্তগুণ করিতে পারিবে! তখন আমি তোমার সকল দুঃখ শান্ত করিয়া দিব, সমুদয় বাষ্পজল পুঁছাইয়া দিব। হে মিত্র! হে প্রিয়তম বর! তোমার মনকে সেই নিত্য দশার আশাতে উন্নত করিয়া বর্ত্তমান কালের ক্ষণিক যন্ত্রণা সহ্য কর।'

আপন আন্তরিক ভাবভরে আমার কণ্ঠরোধ হইল। পৌল এক দৃষ্টিতে কতক্ষণ আমার প্রতি চাহিয়া কহিল 'সে আর নাই! হায় সে আর নাই!' এই হৃদয়বেদনাদায়ী কথার পরই সুদীর্ঘ মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। চেতনা হইলে বলিল 'আচ্ছা, তবে ত মরণ একপ্রকার শুভ বলিতে হইবে। তবে আমিও যত শীঘ্র পারি মরিয়া ভর্জ্জীনীর কাছে যাইব।' এই রূপে আমার সান্ত্বনা চেষ্টাবিপরীত ফলে পরিণত হইল এবং তাহার নৈরাশ্য কেবল বাড়িতে লাগিল। যেমন বন্ধুকে নদীতে নিমগ্ন হইতে দেখিলে তাঁহার সুহৃৎ, সাঁতার জানেন না, অথচ উদ্ধার করিতে গিয়া বন্ধুকে আরও বিপদে ফেলেন, আমিও তদ্রূপ হইলাম। হায়! পৌল ছেলেমানুষ, কখন দুর্দ্দশা ভোগ করে নাই, লোকে পাঁচ বার সহিয়াই বড় বড় দুঃখ সহ্য করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু পৌলের একেবারে সর্ব্বনাশ ঘটিল!

অতঃপর তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিলাম। তখন বিবি লিলাতুর এবং পৌলের জননী অত্যন্ত শীর্ণ হইয়াছিলেন। বিশেষত মার্গারেট স্বভাবত প্রফুল্লস্বভাব ছিলেনও বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে বড় শক্ত আঘাত লাগিয়াছিল, তিনি মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। বাস্তবিকও আমোদী লোকে ক্ষুদ্র দুঃখ অনায়াসে বহন করে বটে, কিন্তু নিদারুণ দুর্দ্দশাতে একেবারে অবসন্ন হয়। তিনি আমাকে কহিলেন 'মহাশয় গো! কালি রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যে ভর্জ্জীনী শ্বেত বসন পরিধান পূর্ব্বক পরম রমণীয় একটি উদ্যানে পরিক্রম করিতেছে। আমাকে কহিল 'আমি যে সুখ ভোগ করিতেছি, তাহা সকলের প্রার্থনীয়।' পরে স্মিতমুখে পৌলের কাছে গিয়া তাহাকে আকাশে তুলিয়া লইল। আমি আপন পুত্রকে ধরিব এই চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাদের সঙ্গেই উঠিতে লাগিলাম। তখন যেন অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব হইল। সখীকে সম্ভাষণ করিবার নিমিত্ত মুখ ফিরাইয়া দেখি যে, তিনি দমিঙ্গ ও মেরীকে সঙ্গে লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সখীও কালি রাত্রে ঠিক এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন।' আমি কহিলাম 'ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই ঘটে না। আর, স্বপ্নের কথাও অনেক স্থলে ফলিয়া যায়।'

বিবি দিলাতুরও আমাকে সেইরূপ স্বপ্নের বিবরণ বলিলেন। এই দুই মহিলা কিছুমাত্র কল্পনাপরতন্ত্র ছিলেন না, তাঁহাদিগের কোন কুসংস্কারে শ্রদ্ধা ছিল না, অতএব উভয়ের স্বপ্নসৌসাদৃশ্য দেখিয়া আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। মনে মনেও প্রতীতি জন্মিল যে, স্বপ্নের কথা শীঘ্রই ফলিবে। স্বপ্ন যে অনেক স্থলে সত্য হয় এ প্রত্যয় সর্ব্ব জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। প্রাচীন কালে মহান্ মহান্ পুরুষেরা এ প্রত্যয়ে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারা যে কাল্পনিক শঙ্কার পরবশ ছিলেন ইহা কে বিশ্বাস করিবে? বাইবলেও অনেক স্বপ্ন সত্য হইবার বৃত্তান্ত আছে। আমি নিজেও অনেক স্থলে ভাবী ঘটনা স্বপ্ন দ্বারা প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি। আর যতই কেন বিচার কর না, এ সকল বিষয় নিতান্ত দুরূহ ও দুর্ব্বোধ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ফলে, যদি আমাদের বুদ্ধি পরম পুরুষের বুদ্ধির ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব স্বরূপ হয়, তবে বিশ্বনিয়ন্তা কি গূঢ়রূপে আমাদের বুদ্ধিতে কখন কিছু উদ্বোধ করিতে পারেন না? কত সমুদ্র পার হইয়া কত সংগ্রামপ্রবৃত্ত দেশ অতিক্রমপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির হস্তলিপি তাঁহার বন্ধুর হস্তে উপস্থিত হইয়া আনন্দসঞ্চার করে ইহা নিত্য দেখিতে পাই। তবে যিনি ধর্ম্মের একমাত্র শরণ্য, তিনি কি ঈশ্বরপরায়ণ ভক্তদিগের চিত্তখেদনিবারণের নিমিত্ত কোন বিষয় কি জানাইতে পারেন না? অন্তর্যামী অন্তরেই ভাবোদয় করিয়া সুমতি প্রদান করেন, তবে ভবিষ্য বিষয় বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত বাহ্য উপায় অবলম্বন না করিলে কি তাঁহার চলে না? আর স্বপ্নের কথা এত অলীক মনে করিবার বিষয়ই বা কি? সুখদুঃখাদিব্যাপারপূর্ণ সংসার স্বপ্ন নয় ত আর কি?

সে যাহা হউক সখীদিগের স্বপ্ন ফলিতে বড় বিলম্ব হইল না। দুই মাস পরে পৌলের মৃত্যু হইল, তখন পর্য্যন্ত তাহার মুখে ভর্জ্জিনীর নাম। তাহার জননী ইহার আট দিন পরে প্রাণত্যাগ করিলেন। অন্তকালে ধার্ম্মিক ব্যক্তির যেরূপ আহ্লাদ হয়, তাঁহারও সেইরূপ দেখা গেল। মৃত্যুশয্যায় বিবি দিলাতুরের নিকট বারম্বার সস্নেহে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন 'সখি, এই বার যে দেখা হইবে তাহাতে আর বিচ্ছেদ নাই। আহা, মৃত্যু কি প্রার্থনীয় বস্তু! ইহার মত শুভ আর নাই। জীবন কেবল যন্ত্রণাভোগ মাত্র, ইহা শেষ হইলেই ভাল। যখন পরীক্ষা দিবার নিমিত্তই পৃথিবীতলে আসা, তখন পরীক্ষা যত সংক্ষেপ হয়, ততই সুখের কথা।' দমিঙ্গ ও মেরী কর্ম্মের বাহির হইয়া গিয়াছিল, দয়ালু গবর্ণর রাজকোষ হইতে তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন বিধান করিলেন। আর বেচারা বৃহৎকুক্কুরটী পৌলের মৃত্যুর পরেই শোকে মরিয়া গেল।

তখন বিবি দিলাতুরকে আপন গৃহে আনিয়া রাখিলাম। তিনি এই সমস্ত দৈব বিপত্তি সহ্য করিতে অসাধারণ ধৈর্য্যগুণ প্রদর্শন করিলেন। যেন নিজের কিছুই দুঃখ নাই, এই ভাবে তিনি পৌল ও মার্গারেটের চরম দশা পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তাহারা প্রাণত্যাগ করিলে প্রতিদিনই কহিতেন 'ভাবনা কি? আমারও আর অধিক দিন বিলম্ব নাই। শীঘ্রই তাহাদিগের কাছে যাইতেছি।' বাস্তবিকও মার্গারেটের মৃত্যুর পরে তাঁহাকে এক মাসের অধিক কাল শোকভার বহন করিতে হয় নাই। মৃত্যুকালে পিসীর প্রতি কথামাত্র রোষ প্রকাশ করিলেন না। নির্দ্দয় ভাবে ভর্জ্জিনীকে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার পিসীর সাতিশয় অনুতাপ ও পারত্রিক আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে এই খবর পাইয়া বিবি দিলাতুর বরং পিসীর নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা জানাইলেন 'হে ভগবন্! পিসীর অপরাধ ক্ষমা কর। আপন ক্রূরতা নিবন্ধন তিনি যে সকল অপরাধ-

জনিত হৃদয়বেদনা সহ্য করিতেছেন, তাহা অপনয়ন কর।'

এই পাষাণহৃদয়া পিসীও অল্প দিনের মধ্যেই লোকলীলা সংবরণ করিল। বারংবার জাহাজ আসাতে খবর পাইয়াছিলাম যে, চরম দশাতে বায়ুরোগ ধরিয়া তাহার জীবন মরণ উভয়ই অসহ্য করিয়া দিয়াছে। 'হায়! আমিই নাতিনী ও ভাইঝির অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার হেতু হইলাম' এই বলিয়া কখন আপনাকে ধিক্কার দিত। কখন বা 'হতভাগিনীরা যেমন কুপ্রাশয়া হইয়া কুলে কলঙ্ক দিয়াছে, তেমনি খুন্ করিয়াছি' বলিয়া আত্মপ্রশংসা করিত। পারিস নগরে যে সকল অগণ্য নিরন্ন ভিখারী আছে, পথে তাহাদিগকে যাইতে দেখিলে দারুণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিত এবং কহিত 'কুড়ে মড়ারা উপনিবেশে মরিতে না যায় কেন? পারিসের লোকদিগকে দগ্ধায় কেন?' এক সময়ে বলিত 'দান ধর্ম্ম দয়া সারল্য প্রভৃতি যে সকল কথা মানুষের মুখে শুনা যায়, সে কেবল ভণ্ডামি মাত্র। ধূর্ত্ত বিটেরা ও রাজারা স্বকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত এই সকল চাতুরী বাহির করিয়াছে।' এই ভাবে কিছু দিন কাটাইয়া সে আবার ধর্ম্মে মন দিত, আবার ধর্ম্মমন্দিরে অর্থদানপূর্ব্বক ঈশ্বরের অনুকম্পা প্রার্থনা করিত। জানিত না যে দীনদিগকে পদাঘাত পূর্ব্বক দীনবৎসল ভগবানের কার্য্যে অর্থদান করিলে তাহা কখনই গ্রাহ্য হয় না। কখন খেয়াল দেখিত যে, চারি দিকে অগ্নিক্ষেত্র, প্রচণ্ড তাপে তাপিত পর্ব্বত, ভূতপ্রেতাদি ভৈরব চীৎকার করত ইতস্তত বেড়াইতেছে, এমন এক স্থানে গিয়া পড়িয়াছে। সেই সকল দানবের পাদতলে পতিত হইয়া সে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করিল, তাহারা যেন তাহাকে ধরিয়া নিদারুণ নরকযন্ত্রণায় পাতিত করিল। এই রূপেই ভগবান বিচার করেন, এই রূপেই তিনি নৃশংস ব্যক্তিকে ইহকালেই নারকী শাস্তি ভোগ করান। ঐ বৃদ্ধা শয্যা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এক বার নাস্তিক্যবুদ্ধি অবলম্বন করে, আর বার করাল ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবতী হয়। কয়েক বৎসর এই ভাবে অতিবাহিত হইল। অবশেষে যাহার দর্পে দৃপ্ত হইয়া সে দয়াগুণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল এবং হৃদয়কে পাষাণের ন্যায় নীরসও রুক্ষ করিয়াছিল, সেই অর্থ তাহার হস্তবহির্ভূত হওয়াতেই বৃদ্ধার প্রাণত্যাগ হইল। সে যাহাদিগকে চিরকাল দেখিতে পারিত না, সেই দায়াদেরাই দেশাচার অনুসারে তাহার বিভবের উত্তরাধিকারী হইবে ভাবিয়া তাহার মাৎসর্য্য উদ্বেল হইয়া উঠিল এবং মরিবার পূর্ব্বে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া যাইব এই উদ্দেশে বিভব উড়াইতে লাগিল। কিন্তু তাহার যে বায়ুরোগ মধ্যে মধ্যে দেখা দিত, সেই প্রমাণ দেখাইয়া দায়াদেরা সে ক্ষিপ্তা বলিয়া রটনা করিল। সুতরাং সে বিষয় পত্রাদি অবেক্ষণ করিতে অশক্ত অতএব তাহার ঐশ্বর্য্য দায়াদহস্তেই যাওয়া উচিত এইরূপ রাজাজ্ঞা সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহার জীবদ্দশাতেই দায়াদেরা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিল। বৃদ্ধা উন্মত্তা বলিয়া ক্ষিপ্তশালায় রুদ্ধ হইল। তথায় দুর্গতির শেষ রহিল না, জ্ঞান থাকিতে সকলে পাগল বলে, সমুদায় সম্পত্তি অকিঞ্চিৎ শূল জ্ঞাতি শত্রুর হাতে পড়িয়াছে, চিরকাল যাহারা তাহার কথা শিরোধার্য্য করিত, তাহারা নূতন প্রভুর অনুগামী হইয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি উপেক্ষা অনাদর ও অশ্রদ্ধা করিতেছে ইত্যাদি ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার প্রায় সম্পূর্ণরূপ বুদ্ধিভ্রংশ জন্মিল। কেবল অন্তে বুঝিতে পারিল যে, যে অর্থের অহঙ্কারে ধরাতল শরার মত দেখিয়াছে, সেই অর্থই সর্ব্বনাশ ঘটাইল। ঈদৃশ দশায় তাহার মৃত্যু হয়।

বেণুবীথিতে যে গোলাবগুল্মের তলে ভর্জ্জীনীর শব সমাহিত হয়, তাহার নিকটেই পৌল শয়ন করিল। উভয়ের চারি পার্শ্বে বৎসলা দুই জননী ও প্রভুভক্ত ভৃত্যদ্বয়ের কবর হইল। ইঁহাদের সমাধি-

বল্মীকের উপর কোন শ্বেত প্রস্তর স্থাপনা হয় নাই, কোন প্রশস্তিও লেখা হয় নাই। কেবল যাহাদিগকে দয়া করিতেন, সেই উপকৃত ব্যক্তিরা চিত্তপটে তাঁহাদের মূর্ত্তি অঙ্কিত রাখিয়াছে। যদি দিব্যরূপধারী হইয়াও ধরণীতলের ব্যাপারের সহিত সংস্রব রাখিতে তাঁহাদের ইচ্ছা থাকে, তবে নিঃসন্দেহ তাঁহারা লোকলোচনের অগোচর থাকিয়া কুটীরবাসী সচ্চরিত্র পুরুষের মনে ধৈর্য্যের উদয় করিতেছেন, আপন দশাতে অসন্তুষ্ট দরিদ্র ব্যক্তিকে প্রবোধ দিতেছেন, অথবা নবীনবয়স্ক প্রণয়ীর মনে অবিনাশী অনুরাগ, বিভবে বিরাগ, পরিপাটীশূন্য প্রাকৃতিক সুখে অভিলাষ এবং সর্ব্বসৌখ্য-নিদানভূত কায়িক পরিশ্রমে অভিরুচি এই সকল ভাবের আবির্ভাব করিতেছেন। কত কত নরপতির কীর্ত্তিস্তম্ভ বিষয়ে লোকে কোন কথা কয় না, কিন্তু এই দ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ঈদৃশ নামকরণ হইয়াছে যে ভর্জীনার বিপত্তি কখন বিস্মৃত হইবে না। অম্বর দ্বীপের নিকটস্থিত কতিপয় সমুদ্রশিলার নাম হইয়াছে সেন্টজিরনের প্রবেশ পথ। এ স্থান হইতে নয় মাইল অন্তরে যে স্থলখণ্ড সঙ্কীর্ণ ভাবে জলে প্রবেশিয়াছে, ঝটিকার পূর্ব্বে সেন্টজিরন্ তাহা অতিক্রম করিতে পারে নাই বলিয়া তাহার নাম দুরন্ত অন্তরীপ। যথায় বালুকাতে অর্দ্ধনিমগ্ন ভর্জীনীর মৃত দেহ দেখা গিয়াছিল এবং ভর্জীনীর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের প্রতি দয়াপর হইয়াই যেন সমুদ্র তাহার অন্ত্যেষ্টি সমাধানার্থ যে স্থানে শব আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কবরোপসাগর নামে প্রসিদ্ধ।

হা প্রণয়পরায়ণ বৃদ্ধযুগল! হা সন্তানবৎসলা জননীরা! হা পরমপ্রেমাস্পদ পরিজন! যে অরণ্য তোমাদিগকে ছায়াদান করিত, যে নির্ঝর তোমাদিগের নিমিত্ত প্রবাহিত হইত, যে কুটীর তোমাদিগকে আশ্রয় দিত, সে সকলই তোমাদিগের শোকে অদ্যাপি বিহ্বল! কেহই এই জনশূন্য ভূমিতে বাস করিতে পারে না, কেহই এই কুটীরের সংস্কার করে না! তোমাদের ছাগেরা বন্যভাব ধারণ করিয়াছে, তোমাদিগের বৃক্ষাদি বিনষ্ট হইয়াছে, তোমাদের বিহঙ্গমেরা পলায়ন করিয়াছে, এই শৈলবেষ্টিত উপত্যকা ভূমিতে কেবল পেচকের চীৎকারমাত্র নিরন্তর শুনা যায়। যত দিন তোমাদিগকে হারাইয়াছি, তত দিন আমি সন্তানহারা পিতার ন্যায়, সহচরহারা বন্ধুর ন্যায় পৃথিবীতলে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

ইহা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ বাষ্পপূর্ণ লোচনে চলিয়া গেলেন। আমারো এই শোকাবহ ইতিহাস শুনিবার সময় কত বার যে অশ্রুপাত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না।

সমাপ্ত।

নূতন পুস্তক ও পত্র প্রাপ্তির বিজ্ঞাপন।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ও সাময়িক পত্র দুই খানি আমরা নূতন প্রাপ্ত হইয়াছি। সম্যক্‌ভাবে যথাযথ সমালোচনা করিতে পারি নাই। "গ্রন্থের ভাব ভাল, লেখাও মন্দ হয় নাই।" এবংবিধ দুই চারি ছত্র ঝাড়িয়া মাতৃভাষার যথার্থ হিতৈষী মহাশয় গ্রন্থকারদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে বসা নিতান্ত বাচালতা ও মূর্খতার কার্য্য বলিয়া আমাদের সংস্কার আছে, সুতরাং গ্রন্থ সম্পর্কে দুই এক কথার উল্লেখেও প্রবৃত্ত হই নাই; কেবল বিজ্ঞাপন মাত্র প্রকাশ করিলাম; সহৃদয় গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

শকুন্তলা।

শ্রীযুক্ত হরিমোহন গুপ্ত বিরচিত।
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।
মূল্য এক টাকা

প্রণয়পরীক্ষা নাটক।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।
ষ্টান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।
মূল্য এক টাকা।

ঈশবলিনী।

শান্তিপুর ইংরাজি বিদ্যালয়ের পণ্ডিত
শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী
প্রণীত ও প্রকাশিত।
ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।
মূল্য এক টাকা।

অকাল কুসুম।

অথবা আজমীর রাজতনয়া।
শ্রীযুক্ত কালীবর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত।
সুচারু যন্ত্রে মুদ্রিত।
মূল্য আট আনা।

কুমুদ্বতী নাটক।

শ্রীযুক্ত বাবু বনোয়ারিলাল রায় প্রণীত।
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।
মূল্য ৵৹ আনা।

চাতকভৃঙ্গ বিবাদ।

শ্রীযুক্ত কিশোরচন্দ্র ভক্ত প্রণীত।
কোন কাব্যানুরাগী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
নূতন বাঙ্গাল্য যন্ত্রে মুদ্রিত।
মূল্য ৵১০ মাত্র।

জয়াবতী।

শ্রীযুক্ত বনোয়ারিলাল রায় কর্ত্তৃক বিরচিত।
বিশ্ববিনোদ যন্ত্রে মুদ্রিত।
মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।

রত্নবতী।

শ্রীযুক্ত মীর মসারফ হোসেন্ প্রণীত।
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।
মূল্য ছয় আনা।

কবিতা পরিচয়।

প্রথম ভাগ।
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
হিতৈষী যন্ত্রে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।
মূল্য দুই আনা।

ঐ

দ্বিতীয় ভাগ।
ওরি এন্টল্ যন্ত্রে মুদ্রিত।
মূল্য দশ পয়সা।

নীতিহার।

শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষাল প্রণীত।
হিতৈষী যন্ত্রে মুদ্রিত।
মূল্য দুই আনা।

এই সকল পুস্তকের অধিকাংশ সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ষ্ট্যান্‌হোপ্‌যন্ত্রালয়ে, নূতনবাঙ্গালাযন্ত্রালয়ে বিক্রয় হয়।

চিকিৎসাসংগ্রহ।

অর্থাৎ চিকিৎসাবিদ্যাসম্বন্ধীয় নানা-
বিধবিষয়পূর্ণপত্র।
শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং
কোং কর্ত্তৃক সংখ্যানুক্রমে প্রকাশিত।
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, অগ্রিম ষাণ্মা-
সিক ১।০, প্রতি খণ্ড।৵০।

দেশহিতৈষিণী।

মাসিক পত্রিকা।
শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।
পাতরিয়াঘাটাস্থ কবিরাজ পাড়ায় ৩৩ সংখ্যক
ভবনে "দেশহিতৈষিণীকার্য্যালয়" হইতে
প্রতিমাসে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক
মূল্য ॥৵০, ষাণ্মাসিক।/১০,
প্রতিসংখ্যা /০।

এই দুইখানি পত্রিকা নূতনবাঙ্গালা-
যন্ত্রালয়েও পাওয়া যায়।

দঃখের সন্তান।

প্রথম সর্গ।

১

সুখের সরসী মাঝে, স্নেহ সরসিজ সাজে,
ধীরে ধীরে দুলিতেছে সমীরণভরে;
র'য়ে র'য়ে ক্ষণে ক্ষণে, আনন্দ লহরীগণে,
আদরে বাড়ায়ে অঙ্গ আলিঙ্গন করে।
ঘুমায় দুখের ছেলে শুয়িয়া তাহায়,
হাসি হাসি মুখশশী, জননী শিয়রে বসি,
এক দৃষ্টে তনয়ের মুখপানে চায়।

২

পুলকে প্রফুল্ল দেহ, উথলিয়া উঠে স্নেহ,
মনে মনে বিধাতারে করিয়া স্মরণ,
বলে, 'হে অখিলপতি, তুমি জগতের গতি,
রেখ পদে অধীনীর জীবনের ধন।'
হেন কালে আচম্বিতে করে নিরীক্ষণ,
সুকোমল ওষ্ঠাধর, ক্রমে হ'ল স্বতন্তর,
হাস্যের লোহিত রাগে শোভিল বদন॥

৩

অমনি জননী মন, সুখনীরে নিমগন,
তরুন অরুণ প্রায় হাসি প্রকাশিল,
আচম্বিতে দীপ জ্বলে, নির্ম্মল জাহ্নবীজলে,
প্রতিবিম্ব প'ড়ে চারি দিক উজলিল।
তেমন মধুর আর কি আছে এমন!
নিম্নে ঊর্দ্ধে সুধাকর, বিস্তারি বিমল কর,
মুগ্ধ হ'য়ে পরস্পর করিছে দর্শন॥

৪

কিন্তু তড়িতের প্রায়, সে হাসি মিলায়ে যায়,
'মা, মা,' রবে পুন শিশু কাঁদিয়া উঠিল;
দূরে গেল হাসিখুসি, জননীর মুখশশী,
ঘন ঘোর চিন্তা আসি অমনি ঢাকিল।
তাড়াতাড়ি বালকেরে কোলেতে লইয়া,
স্নেহেতে চুম্বন করি, বলে, 'হায় মরি মরি,
কেন রে কাঁদিছ যাদু কিসের লাগিয়া।'

'ষাট্ রে ষষ্ঠীর ধন,' ব'লে, মুখে দেন স্তন,
মুদিত করিল শিশু নয়নযুগল,
পুন সুখ উপজিল, হাসি আসি দেখা দিল,
উড়িল চিন্তার মেঘ গগন নির্ম্মল।
এই রূপে দিবা নিশি করিয়া যতন,
অনাহারে অনিদ্রায়, ক্রমে ক্রমে শীর্ণকায়,
সোণার শরীর হ'ল পাঙাস্ বরণ॥

৬

সন্তানের সুখে সুখ, তার দুখে ফাটে বুক,
অসুখ হইলে তার নিজে হন রোগী,
এরূপ কঠোর করি, শিশুরে হৃদয়ে ধরি,
একাসনে কাটে কাল যেন মত্ত যোগী।
দিন দিন শশিকলা বাড়িতে লাগিল,
সঙ্গে সঙ্গে আশালতা, সতেজে তুলিয়া মাথা
জননী হৃদয় ক্ষেত্র ব্যাপিয়া ফেলিল॥

৭

ক্রমে মুখে কথা ফুটে, সর্ব্বদা বেড়ায় ছুটে,
হু চটে পড়িয়া পুন উঠে তাড়াতাড়ি;
নাহি কাজ, অবসর, সকলেই অগ্রসর,
বারণ করিলে করে আরো বাড়াবাড়ি;
নূতন দেখিলে করে অমনি জিজ্ঞাসা,
উত্তর পাইলে তার, পুছে তাই বারম্বার,
এটা সেটা নিয়ে করে কতই তামাসা॥

৮

কখন বা আধ স্বরে, মায়ের অঞ্চল ধ'রে,
বাধ বাধ ক'রে কথা কয় মৃদুস্বরে,
বুঝাইয়া দিতে চায়, কথা খুজে নাহি পায়
তাকাইয়া মুখপানে হাসে ফিক্ ক'রে;
অমনি তনয়ে বুকে করিয়া ধারণ,
গদ গদ স্নেহভরে, লোমাঞ্চিত কলেবরে,
চাঁদমুখে ঘন ঘন করেন চুম্বন॥

৯

মায়ের আদর পেয়ে, হেথা সেথা যায় ধেয়ে
মনের হরিষে সদা নাচিয়া বেড়ায়;
আনন্দে উথলে মন, পুত্রে করি দরশন
প্রেমাশ্রুতে জননীর বুক ভেসে যায়।
মনে মনে কত ভাব উদয় হইল,
মানস নিকুঞ্জ বনে, ভাবী সুখপুষ্প সনে,
ভরসা মলয়ানিল খেলিতে লাগিল॥

১০

হায় হায়,পাগলিনী ! জাননা সে, কুহকিনী
দুরাশা, যৌবন বনে র'য়েছে গোপনে,
হরিবে সকল সুখ, দুখেতে দহিবে বুক,
বাসনা কুসুম তব দলিবে চরণে।
মানস নিকুঞ্জ বন ভাঙ্গিয়া সমূলে,
ভরসা মলয়াবাত, হইয়া গো ঝঞ্ঝাবাত,
উড়াইয়া ফেলিবেক নিরাশার কূলে॥

১১

ক্ষুধায় কাতর হ'লে, অমনি করিয়া কোলে,
স্তনদানে যারে সদা করিছ পালন,
বুঝি গো জঠরানল, সময়ে হ'য়ে প্রবল,
যতনের ধনে তব করিবে দহন।
হায় রে জঠর তোর নাহিক তুলনা,
অসীম ব্রহ্মাণ্ড সর্ব, পেলেও না হও খর্ব,
তোমার অনন্ত ক্ষুধা কিছুতে মেটে না॥

১২

রথের চক্রের প্রায়, দিন রাত চলে যায়,
তৃতীয় বৎসরে শিশু করে পদার্পণ;
অসহ্য মনের জ্বালা, সংসার বিষের ডালা,
অজ্ঞান বালক মনে ভাবেনি কখন;
সারল্য অমূল্য মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত,
খেলার পুঁতুল মত, আদরেতে অবিরত,
মাবাপের হাতে হাতে সদাই ফিরিত॥

১৩

এবে বিধি নিদারুণ, কপালে জ্বেলে আগুন,
জননীর চির সুখ হরিয়া লইল,
দুরন্ত বিরহানল, হৃদয়ে হ'য়ে প্রবল,
স্নেহময়ী জননীরে দহিতে লাগিল;
শমন করাল গ্রাস করিয়া বিস্তার,
প্রিয়তম জনকেরে, অকালে উদরে পোরে
অন্ধকার ক'রে যার হৃদয় ভাণ্ডার॥

১৪

ভাই বন্ধু পরিবার, সবে করে হাহাকার,
অবোধ বালক হায় ! কিছুই না জানে,
জননী পড়িয়া ধরা, নয়নে বহিছে ধারা,
সজল নয়নে শিশু চাহে মুখ পানে।
তনয়ে কাতর হেরি অধীরা জননী,
"আয় রে জীবন ধন,"ব'লে অঙ্কে কোলে লন,
অজস্র নয়নধারে ভাসিল ধরণী॥

১৫

বালকে করিয়া বুকে, দ্বিগুণ অধীর দুখে,
বলে 'রে অভাগা তোর ভেঙ্গেছে কপাল,
'কে তোমারে বাছাধন, আর করিবে যতন,
'বিরূপ বিধাতা আজি ঘটালে জঞ্জাল,
'এ পাপ জীবন তরে ভাবিনেরে আর,
'কেনরে পোড়াতে এলি,এসে মোর মাথা খেলি
নহিলে এ দায় থেকে হ'তাম উদ্ধার॥"

১৬

সে দিন স্মরণ হ'লে, এখনো অন্তর জ্বলে,
হুহু ক'রে উঠে প্রাণ বিদরে হৃদয় !
না জানি কি হ'ত আর, হইলে জ্ঞান সঞ্চার,
প্রিয়তম জনকের নিধন সময় !
আহা সে উদার মূর্ত্তি হেরিব না আর,
কিন্তু হৃদয়ে আমার, জাগিতেছে অনিবার,
স্মৃতি পটে চিত্র করা আকৃতি তাঁহার॥

১৭

অধিকাংশ নরগণ, যে পথে করে গমন
ধীরে ধীরে ম্লান মুখে বিস্মৃতির দ্বারে,
যত দিন রাত যায়, তত ই মানব তায়,
ভোলে, শেষে পড়ে গিয়ে ঘোর অন্ধকারে,
হে জনক ! তুমিও কি সেই পথে করিবে গমন?
জানি হায় সবি শেষ, তাহাই ঘটিবে শেষ,
কিন্তু দাস ভুলিবে না থাকিতে জীবন॥

১৮

আহা সে পবিত্র স্নেহ, ভুলিতে কি পারে কেহ,
হৃদয়ে রেখেছি তুলে করিয়া যতন।
তোমার সে গুণরাশি, বর্ণিবারে অভিলাষী,
এ কেবল বামনের গগন স্পর্শন।
তোমার সমান আর কে আছে ভুবনে ?
বল কি আছে আমার, শুধিব তোমার ধার,
সঁপিয়াছি দেহ প্রাণ তোমার চরণে॥

১৯

মরু ভূমে বিন্দুপাত, বালকের অশ্রুপাত,
দেখিতে দেখিতে হায় শুকায় তখনি,
"বাবা কই কই" ব'লে, স্নেহের নয়নজলে,
মাঝে মাঝে অভিষিক্ত করিত ধরণী।
ক্রমে সে মধুর নাম মিলায় অন্তরে,
দেখ দেখ পুনরায়, দুখ নিশি চলে যায়,
উদিত সুখের রবি হৃদয় অম্বরে॥

২০

হায় রে সুখের কাল, দেখা দিয়ে ক্ষণ কাল,
আঁধারে ফেলিয়া মোরে গিয়েছ কোথায় ;
মনে ন হ'লে সমুদায় হৃদয় ফাটিয়ে যায়,
ভুলিবারে কখন কি পারিব তোমায় ?
হায় রে যে সব ছিল সুখের তখন,
এখন এ অভাগারে, বিষধর বেশ ধ'রে,
আসিছে গর্জ্জিয়া সদা করিতে দংশন ॥

বেকন সন্দর্ভ।

১৪।— মানুষের স্বভাব !

লোকে প্রায়ই আপন স্বভাব গোপন করে ; কখন কখন দমন করিয়াও রাখে ; উহা কদাচিৎ একেবারে বিলুপ্ত হয়। বল প্রকাশ করিলে উহা ভয়ানক হইয়া উঠে, উপদেশ ও কথোপকথনে অনেক শান্ত হয় এবং কেবল অভ্যাস দ্বারাই পরিবর্ত্তিত ও বশীভূত হইতে পারে।

যিনি আপন স্বভাব জয় করিতে চান তিনি যেন একেবারেই বহ্বারম্ভ বা অল্পারম্ভ না হন ; কারণ প্রথম পক্ষে যদি তিনি কৃতকার্য্য না হইতে পারেন তবে একেবারে দমিয়া যাইবেন। দ্বিতীয় পক্ষে যদিও তিনি কৃতকার্য্য হয়েন কিন্তু মন্থরগতি হইতে হইবে। অতএব প্রথম সাঁতার শিখিতে হইলে যেরূপ সোলার ভাড়ি বা বাতাস পোরা ভিস্তি লইতে হয় সেইরূপ প্রথমে তাঁহাকেও কিছু কিছু সাহায্য লইতে হইবে। কিছু দিন পরে, যেরূপ নর্ত্তকেরা মোটা জুতা পরিয়া নাচ শিখে সেরূপ তাঁহাকেও কিছু অসুবিধা স্বীকার করিয়া স্বভাব বশীকরণ অভ্যাস করিতে হইবে ; কারণ সচরাচর কাজের জন্য যত দূর দরকার, অভ্যাস যদি তাহা অপেক্ষা কঠিনতর হয় তাহা হইলে বিশেষ নৈপুণ্য জন্মে। যেখানে স্বভাব অতিশয় দুর্দ্দান্ত, সুতরাং তাহা জয় করাও কঠিন ব্যাপার, সেখানে ক্রমে ক্রমে চেষ্টা করা অত্যন্ত আবশ্যক। যেমন কেহ কেহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে মাতৃকাক্ষর পাঠ করিয়া ক্রোধ সংবরণ করে সেইরূপ প্রথমে অবসর বুঝিয়া স্বভাবকে থামাও। তদনন্তর যেমন সুরাপান ত্যাগ করিতে হইলে প্রথমে ভৈরবীচক্র ত্যাগ করিতে হয় ও আহারের সময়ই কেবল যৎকিঞ্চিৎ ব্যবহারমাত্র থাকে এবং শেষে অনায়াসে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় সেইরূপ স্বভাব দমন করিতে হইলেও ক্রমে ক্রমে বশীকরণের পরিমাণ বাড়াইয়া দাও। কিন্তু যাহার এরূপ সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় আছে যে একেবারেই আপনাকে স্ববশে আনিতে পারে তাহার একেবারেই স্বাধীন হওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর।

"যে দুঃখ অন্তর খুলিয়া খায় তাহা একেবারে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দেওয়া ভাল ; তাহা হইলে একটা প্রবল কষ্ট ভোগ করিয়াই যাবজ্জীবন-ভোগ একটা যন্ত্রণার হাত এড়াইতে পারা যায়।"

"যেরূপ একটা বাঁকা ছড়িকে সোজা করিতে হইলে বিপরীত দিকে নোয়াইতে হয় সেইরূপ, যেখানে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলিলে কোন দোষস্পর্শ হয় না সেস্থলে স্বভাবকে সৎপথে আনিবার জন্য বিপরীত দিকে লইয়া যাওয়া ভাল।" এই প্রাচীন নিয়মটী বড় অসঙ্গত নহে। নিরন্তর অনুশীলন দ্বারা কোন একটী সংস্কার বদ্ধমূল করিও না ; মধ্যে মধ্যে উহার বিরাম রাখিও ; তাহা হইলে আরও সবল হইয়া অগ্রসর হইতে পারিবে।

মানুষ সর্ব্বগুণান্বিত নহে। উহার কোন না কোন একটা দোষ আছেই আছে ; সুতরাং যদি সে নিরন্তর কোন প্রকার স্বভাব অভ্যাস করে তবে তাহার গুণও যেরূপ অভ্যাস পাইতে পারে দোষও সেইরূপ বদ্ধমূল হইবার সম্ভাবনা। অতএব সময় বুঝিয়া বিরাম দেওয়া ব্যতীত ইহা হইতে পরিত্রাণের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

কেহ যেন তাহার স্বভাবকে একেবারে জয় করিয়াছে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করে না। স্বভাব স্তম্ভিত হইয়াও অনেক দিন থাকিতে পারে এবং সময় পাইয়া বা কোন প্রলোভন দেখিয়া পুনরায় উত্তেজিত হয়। এ বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ ঈসপরচিত একটী গল্প আছে, যথা "কোন ব্যক্তি একটী বিড়ালকে পরমসুন্দরী যুবতী করিয়াছিল তথাপি ঐ যুবতী, যে পর্য্যন্ত একটী ইন্দুর সম্মুখ দিয়া না যাইত সে পর্য্যন্ত চৌকীর এক ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত" অতএব প্রলোভনের সংসর্গ একেবারেই পরিত্যাগ করা ভাল অথবা বারম্বার উহার সম্মুখে দাঁড়াও তাহাতে চঞ্চল হইবার অত্যল্প সম্ভাবনা থাকিবে।

নির্জ্জনে মানুষের স্বভাব বিলক্ষণ প্রকাশ পায়; কারণ সেখানে আন্তরিক ভাব ঢাকা থাকে না সে সময়ে লোকে আপন শাসনের বাহিরে থাকে। তখন সে নুতন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় সুতরাং পরিচিত অভ্যাসের ফল আর কিছুই খাটে না।

যাহাদের ব্যবসায় স্ব স্ব প্রকৃতির অনুরূপ তাহারাই সুখী অন্যথা তাহারা যে বিষয় ভাল বাসে না তাহার চর্চ্চাকালে বলিতে পারে আমাদের আত্মা অনেক দিন বিদেশী হইয়াছে। শাস্ত্রচর্চ্চাবিষয়ে যে সকল পুস্তক না পড়িলে নয় বলিয়া পড়িতে হয় তাহার জন্য সময় নিরূপণ করা ভাল আর যাহা ভাল লাগে তজ্জন্য সময় নির্দ্ধারণের প্রয়োজন নাই; তাহার মন সে দিকে আপনা হইতেই দৌড়িবে; অন্যান্য কার্য্যের সময় নির্দ্ধারণ করিলেই যথেষ্ট হইল।

মানুষের স্বভাব হয় শস্যপূর্ণ হইবে নয় নিবিড়তৃণাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে। অতএব সময়মত শস্যে জলসেক কর এবং ঘাস উঠাইয়া দাও।

অবোধবন্ধু পত্রের আয় ব্যয়।

১২৭৬ সাল।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

আয়।

কলিকাতা অঞ্চলের গ্রাহকগণের নিকট হইতে আদায়	১৩৮॥০
মফঃসলের	২৩।০
রেজেষ্টরি আফিস হইতে ...	৯৲
আনুকূল্য	২১৩৲
এক রিম রঙ্গিন কাগজ বিক্রয়	৬৲
	৩৮৯৵০

ব্যয়।

কাগজ	৯৯।/১০
মলাটের কাগজ	২০৲
মুদ্রাঙ্কণ	২২৭৲
বইবান্ধাই	১০॥০
ডাকের টিকিট	৩৭।১০
সরকারের মাহিনা	৫৮৲
খুজরা জিনিশ, মুটিয়াভাড়া প্রভৃতি	১৯॥৵০
ঋণদান	১।০
	৪৭৩৲

১২৭৫ সাল।

পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

আয়।

মফঃসল হইতে আদায় ...	১৲
রেজেষ্টরি আফিস হইতে ...	১॥০
আনুকূল্য	৫০৲
	৫২॥০

ব্যয়।

কাগজ	১০॥০
মুদ্রাঙ্কণ	৪০৲
বইবান্ধাই	১॥০
ডাকের টিকিট	৩।৶০
মুটিয়াভাড়া প্রভৃতি ...	১৲
	৫৬।৶০

তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত।